জয়ঢাক

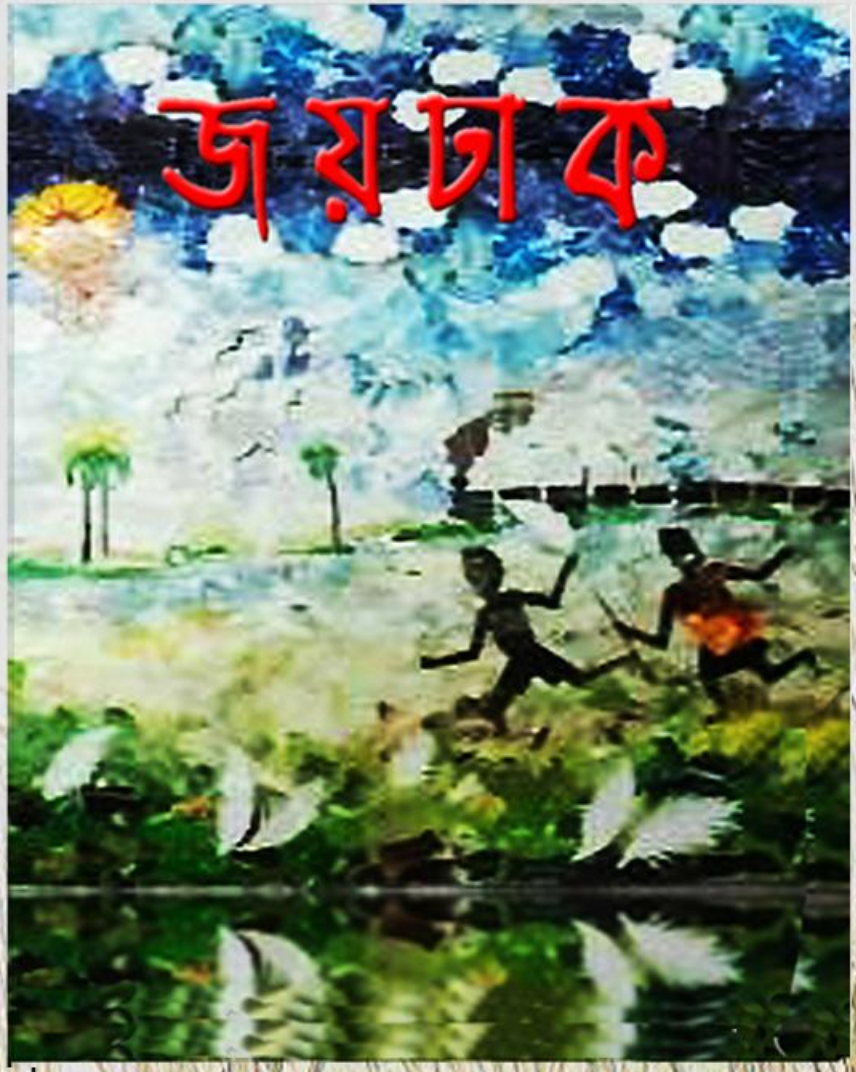

প্রচ্ছদশিল্পীঃ তমোদীপ আইচ

শরত ২০১৫, ৫৪তম সংখ্যা , ৩১তম ইনটারনেট সংখ্যা

জয়ঢাক শারদ সংখ্যা- ২০১৫

সূচিপত্র

নির্দিষ্ট পাতায় পৌঁছোতে লিংকের ওপর ক্লিক করুন

বিভাগ	লেখা	লেখক
মলাট		
জয়ঢাকের দলবল		
সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	গৌরী গাঙ্গুলী
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	পুজোয় চাই ইত্যাদি	তাপস মৌলিক, ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক চিত্রোপন্যাস	দুর্জয়	দেবসেনা নন্দী
কমিক্স	টোটা আর টিটো- প্রাপ্তিযোগ	হ্যারল্ড নের। অনুঃ তাপস মৌলিক
কমিক্স	রাশিয়ান কমিকস- বাপের উপদেশ	তাজিক লোককথা
কমিক্স	সাক্ষি ছিল চাঁদ	দেবসেনা নন্দী
পুজোর উপন্যাস	নরসের	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
পুজোর উপন্যাস	রুদ্রদেব রহস্য	শিশির বিশ্বাস
পুজোর নাটক	এলডোরাডো	সীমা ব্যানার্জি রায়
গল্প প্রতিযোগিতা- পঞ্চম স্থানাধিকারী গল্প	ভয়	অদিতি সরকার
গল্প প্রতিযোগিতা- ষষ্ঠ স্থানাধিকারী গল্প	কেজোভূতের গল্প	অপর্ণা গাঙ্গুলি
গল্প প্রতিযোগিতা- সপ্তম স্থানাধিকারী গল্প	ভূত জোলাকিয়া	মৃগাংক ভট্টাচার্য
গল্প	সাঁঝবাতি	শিবশংকর ভট্টাচার্য
গল্প	দলমা মশায়	অমর মিত্র
গল্প	প্যাঁচে পয়জারে পঞ্চানন	জয়দীপ চক্রবর্তী
গল্প	গজুমামার সঙ্গে পাহাড়ে	তাপস মৌলিক
গল্প	রাজপুত্রের বন্ধু	রতনতনু ঘাটী
গল্প	হাতিশিকারী হালুম মামা	দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়
গল্প	বুঝতে ভীষণ ভুল	অনন্যা দাশ
গল্প	বেনোর কীর্তি	কিশোর ঘোষাল
গল্প	বরুণের দোকানদারি	অদিতি ভট্টাচার্য
গল্প	অরেলস্টাইন ক্যাসেল	পুষ্পেন মণ্ডল
গল্প	চোর চোর	যশোধরা রায়চৌধুরী
গল্প	ছোটুর খাওয়াদাওয়া	চিত্ত ঘোষাল

গল্প	দেশের বাড়ির সাপের গল্প	অলকানন্দা রায়
ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো- দেবগ্রাম	ইন্দ্রনাথ
ভ্রমণ	অতীত ভ্রমণের অন্তরালে	রাখী নাথ কর্মকার
ভূতের আড্ডা	ভূতের গল্প- খুলির আর্তনাদ - দ্বিতীয় পর্ব	মহাশ্বেতা
ভূতের আড্ডা	ভূতের বাড়ি- পুতুল দ্বীপের রহস্য	ইন্দ্রশেখর
ভূতের আড্ডা	দেশবিদেশের ভূতেরা- কানাভুলো আর গেটিসবার্গের ভুত	সংহিতা
ভাষা শেখবার আসর	বোম ফেলেছে জাপানি	দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষা শেখবার আসর	ইতালির ইলিবিলি	অদিতি সরকার
ভাষা শেখবার আসর	ফরাসি- রুকু ও দৈত্য	শাশ্বতী ব্যানার্জি
বিচিত্র দুনিয়া	বড়োদিনের বারবেলা	অরিন্দম দেবনাথ
বিদেশী গল্প	ইংরিজি গল্প - ওরা	আর্থার পোর্জেস অনুবাদ অমিত দেবনাথ
বিদেশী গল্প	জাপানি- গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট (পঞ্চম পর্ব)	বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড অনুঃ সংহিতা
বিদেশী গল্প	রাশিয়ান গল্প- সোনার পাহাড়	অনুবাদঃ দেবজ্যোতি
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	গল্পে বিজ্ঞান- জলের বোতলের কারুকার্যের নেপথ্যকাহিনি	সুজিতকুমার নাহা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মহাবিশ্বে মহাকাশে- বিস্ময় ভরা ‘আদ্রা’ নক্ষত্র	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক- গুহাবাসী মানুষ আজ আকাশবাসী	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক- এতটুকু বাসা	কিশোর ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	ভারতের বৈজ্ঞানিক- জানকী অম্মল	সংহিতা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	লক্ষ করি পক্ষীকে- বাঁশপাতি	মনস্বিনী ঘোষাল

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	বিচিত্র জীবজগত- পোকারা ফেলনা নয়	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	প্রতিবেশী গাছ- হস্তিনী বা হাতিশুঁড়	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কেম্যাজিক	পান্নালাল গোস্বামী
বনের ডায়েরি	ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প - বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়ার বঙ্গানুবাদ	পিয়ালী চক্রবর্তী, (মূল লেখাঃ জন লকউড কিপলিং)
বনের ডায়েরি	ভারতের বনাঞ্চল- অরুণাচল	সংহিতা
বনের ডায়েরি	বাঘের মুখে	রিশলু লাহিড়ী
ছড়ার পাতা	বন্দি রাজপুত্র	রেবন্ত গোস্বামী
ছড়ার পাতা	ইচ্ছেগানের সুরে	দেবাশিস বসু
ছড়ার পাতা	সূর্যমুখীর গান	রাকা দাশগুপ্ত
ছড়ার পাতা	মা দুর্গা	প্রকল্প ভট্টাচার্য
ছড়ার পাতা	কালবোশেখি	মনসুর আজিজ
ছড়ার পাতা	জেলের কথা	গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	বৃষ্টি এলো	রুচিস্মিতা ঘোষ
ছড়ার পাতা	দেশের বাড়ি	দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	একটি পাখি	মঈন মুরসালিন
ছড়ার পাতা	পুজো	আশুতোষ ভট্টাচার্য
ছড়ার পাতা	বুড়ো ও বালিশ গাছ	মীম নোশিন নাওয়াল খান
ছড়ার পাতা	রাত	মাহিম মাহফুজ
ছড়ার পাতা	লুচি কেস	অমিতাভ প্রামাণিক
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	কুইজ	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	জানো কি	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	আশ্চর্য উলকি	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
ধারাবাহিক উপন্যাস	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল
ধারাবাহিক উপন্যাস	অলোকপর্ণার বিড়াল	রোহণ কুদ্দুস
কাতুকুতু	ডেটল সাবান ইত্যাদি	রসিকলাল দাস
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	লকির বলিদান	ঋত্বিক

লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	ভূতের ডাক	শুভশ্রী ও উজান
পুরাণ কথা	নচিকেতা তৃতীয় পর্ব	সংহিতা
পুরাতনী	শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান	কুলদারঞ্জন রায়
স্মরণীয় যাঁরা	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়	উমা ভট্টাচার্য
টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ - অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
টাইম মেশিন	সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
বই পড়া	নতুন বই- চতুষ্পাঠী	তাপস মৌলিক
বই পড়া	পুরোনো বই- বনপথের পাঁচালি	পিয়ালি ব্যানার্জি
বই পড়া	বইবাতিক	দীপক গোস্বামী
বিশ্বের জানালা	ভেনিস	উমা ভট্টাচার্য
লোককথা	দাঁড়কাকের বিয়ে	মহাশ্বেতা
আমার শহর	ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়
সেই মেয়েরা	ঊষা মেহতা	উমা ভট্টাচার্য
দেশ ও মানুষ	রুটি ব্যাংকার	উমা ভট্টাচার্য
খেলার পাতা	এভারেস্ট	এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব চট্টোপাধ্যায়
খেলার পাতা	অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ অনুবাদ তাপস মৌলিক
সুরঢাক	এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখার্জি
ক্যামেরার পেছনে	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার
সিনেমা হল	দা বুক অব লাইফ	মহাশ্বেতা

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প , দেশবিদেশের ভূত

মহাশ্বেতা

লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডা'র গল্প

তাপস মৌলিক

ফিচার লেখা ছাড়াও প্রুফ রিডিং এর শ্রমসাধ্য কাজটি সামলান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক-শব্দগল্পদ্রুম (জয়ঢাকের অডিও ম্যাগাজিন)

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা

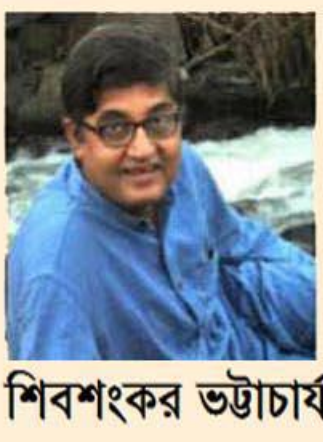

শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিয়ালী

মৌসুমী

শিমুল

শংখ

শ্রীময় দাশ

তমোদীপ

অর্ণব

শাম্ব

মনস্বিনী

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম
দেখতে ছোটো, কিন্তু কি বোর্ডে বেজায়
হাত চলে সবকটার

মহুল

সুজাতা

দেবপ্রিয়া

ঋত্বিক

জয়ঢাকি বোল

রাতের গাড়ির ধুকপুকানি গরম চায়ের হাঁক
শারদ বায়ে আসছে ভেসে সুদূর দেশের ডাক
চলছে ছুটে নদীর পানি বলছে তুইও চল
যাবই বলে নাচছে খুশি ছেলেমেয়ের দল
আলোর মেলা কাশের দোলা আলোয় ভরা দিন
আসছে নয় রে বেজে গেছে মধুর শারদ বীণ
আসছে, আসবে এটাই বুঝি লাগছে বেশি ভালো
এসে গেলেই ফুরিয়ে যাবে নিভবে পুজোর আলো
ঝুপসি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো আলনায়
দুলছে কাপড়, ঝুলছে ছেলে টাঙানো দোলনায়
কাশের ফুলের মেলায় ভরা ঝোপটা ঘরের পাশে
গরিব মানুষ, তার দুয়ারেও মায়ের পরশ আসে।

পুজো আসছে। বেজায় মজা চারদিকে। শিগগিরই দুর্গাঠাকুর আসবেন। আর তাঁর আগে আগে চলে এল পুজোর জয়ঢাক। তার বাদ্য না বাজলে কি পুজো জমে নাকি?
পুজোয় খুব আনন্দ কোরো সবাই। এবারের বোল লিখে পাঠিয়েছেন সাগরপাড় থেকে তোমাদের গৌরীদিদিমণি
ভালোবাসায়

তোমাদের জয়ঢাকি দাদাদিদিরা

আসছে পুজো। পুজোয় চাই পুজোয় চাই চাইই চাই

এখন পুজোর প্রতিটি সকাল—আরো পরিষ্কার দাঁত, আরো পরিষ্কার কান-

নমনীয়তার আরেক নাম

কাদাঁফ্লেক্স

সমস্ত দোকানে ও জয়ঢাকের ওয়েবস্টোরে পাইবেন

পুজোয় চাই নতুন জুতো

পরুন মারুন যা খুশি করুন, যত খুশি করুন

১৭নং চর্মম্ভদ সরণী। গলি-৯১। আমাদের কোন শাখাপ্রশাখা কিচ্ছু নাই

শারদীয় সংখ্যা আসছে!!!

মঙ্গলশঙ্খ

মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা ছোটদের পত্রিকা

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মঙ্গলগ্রহে বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

- কমিকস
- গ্রাফিক স্টোরি
- গ্রহান্তর ভ্রমণ
- বিজ্ঞান
- জোকস
- গল্প
- নিয়মিত বিভাগ

বিশেষ আকর্ষণ!!
এবারের শারদসংখ্যায় থাকছে ঠিক ১০০ বছর আগে পৃথিবী থেকে প্রকাশিত 'জয়ঢাক' পূজাসংখ্যার একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

১৫২২ শারদসংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে মহালয়ার দিন

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ mangalsankha@gmail.mars

www.mangalsankha.mars

TM

পোষা তিমির পিঠে চড়ে মহাসাগর ভ্রমণ

৭ দিনের প্যাকেজ ট্যুর

● ভারত মহাসাগর ● প্রশান্ত মহাসাগর ● আটলান্টিক মহাসাগর

গরমের ছুটিতে বিশেষ ট্যুর

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু

তিমিরবরণ ট্র্যাভেলস

মেছোপট্টি, মেচেদা

TM

বিজ্ঞাপন

ভূতের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য আসল ভূত চাই

পুরুষ ও মহিলা দুইরকম চরিত্রেই অভিনয়ের সুযোগ আছে

ব্রহ্মদৈত্য, শাঁকচুন্নি, মামদো ভূত, পেত্নি, গেছো ভূত, মেছো ভূত, রোগা মোটা বেঁটে ভূত, সাদা ভূত, কালো ভূত – সব রকম চরিত্রই আছে।

অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

ভূতচিত্র প্রোডাকশনস

ম্যানেজারঃ ভূতনাথ সান্ত্রী

মোবাইলঃ ৯৯৪৪●৫৮৪২৭

জয়ঢাকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ইহলোক, পরলোক ও ভিনগ্রহ থেকে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন, joydhak@gmail.com মূল্য ইঞ্চিপ্রতি দুই ঘন্টা মাত্র

শুরু হল

অয়ঢাকের গ্রাফিক উপন্যাস

দুর্জয়

লেখা দেবসেনা নন্দী

চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপঃ- শ্রীময় দাশ

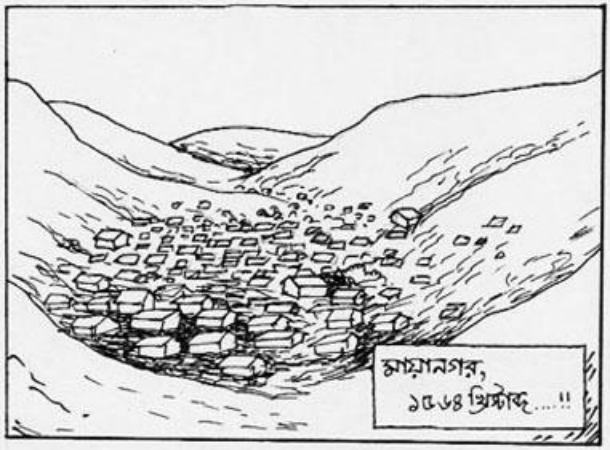
মায়ানগর,
১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ.....!!

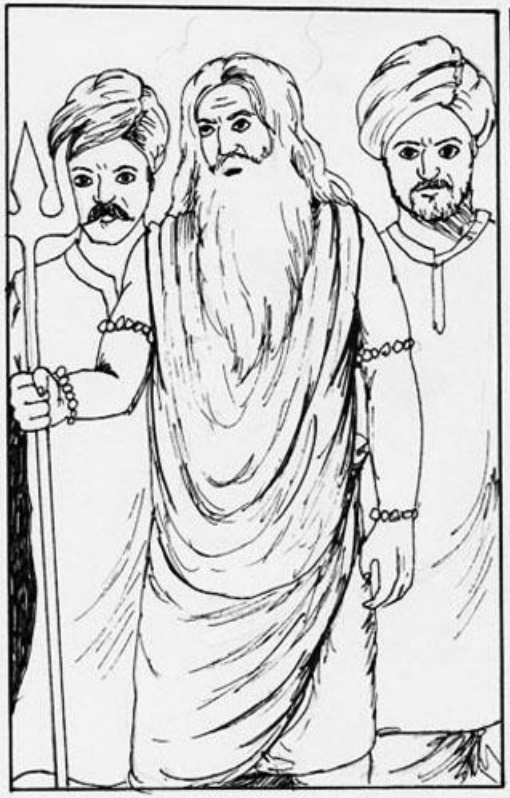

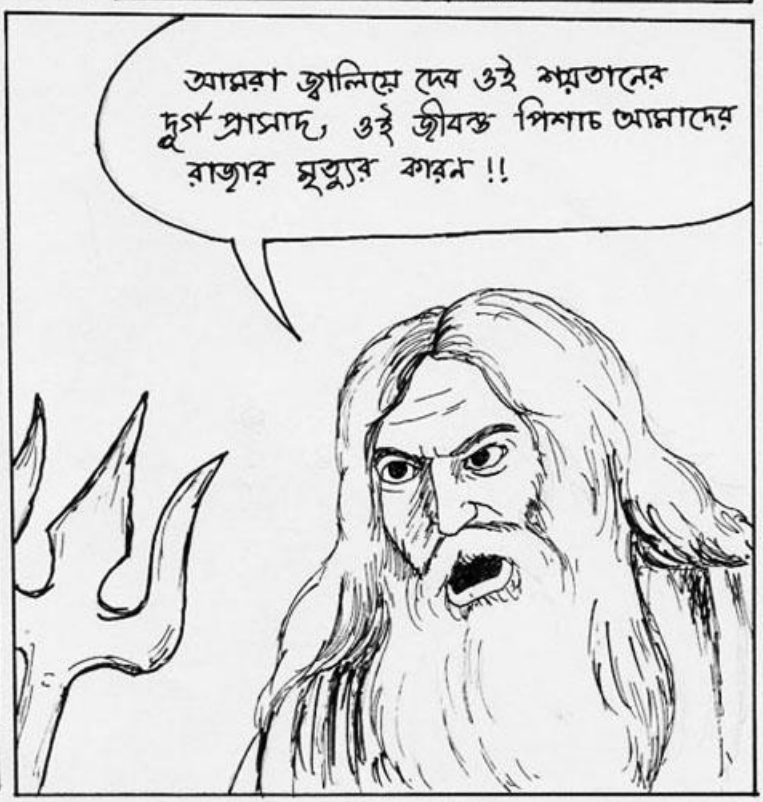
আমরা জ্বালিয়ে দেব ওই শয়তানের দুর্গ-প্রাসাদ, ওই জীবন্ত পিশাচ আমাদের রাজার মৃত্যুর কারন !!

হর হর মহাদেব....!!

হর হর মহাদেব....
হর হর মহাদেব....
শয়তান মায়াকাল! আমি এই রাজবংশের কুলগুরু, আমাদের রাজা দেব সিংকে তুই হত্যা করেছিস! আমি তোকে শেষ করে দেব!!

হা হা হা হা! মূর্খ তুমি রাজগুরু!! মূর্খ তুমি!! আমার বিনাশ নেই, কারও সাধ্য নেই আমার বিনাশ করে।
আমি অজেয়!!

তুই মূর্খ মায়াকাল! আমি যদি প্রভু শিব শম্ভুর প্রকৃত ভক্ত হই, তবে আমি বলছি,
শুভ শক্তির কাছে অশুভের
পরাজয় সর্বদা ঘটে!!

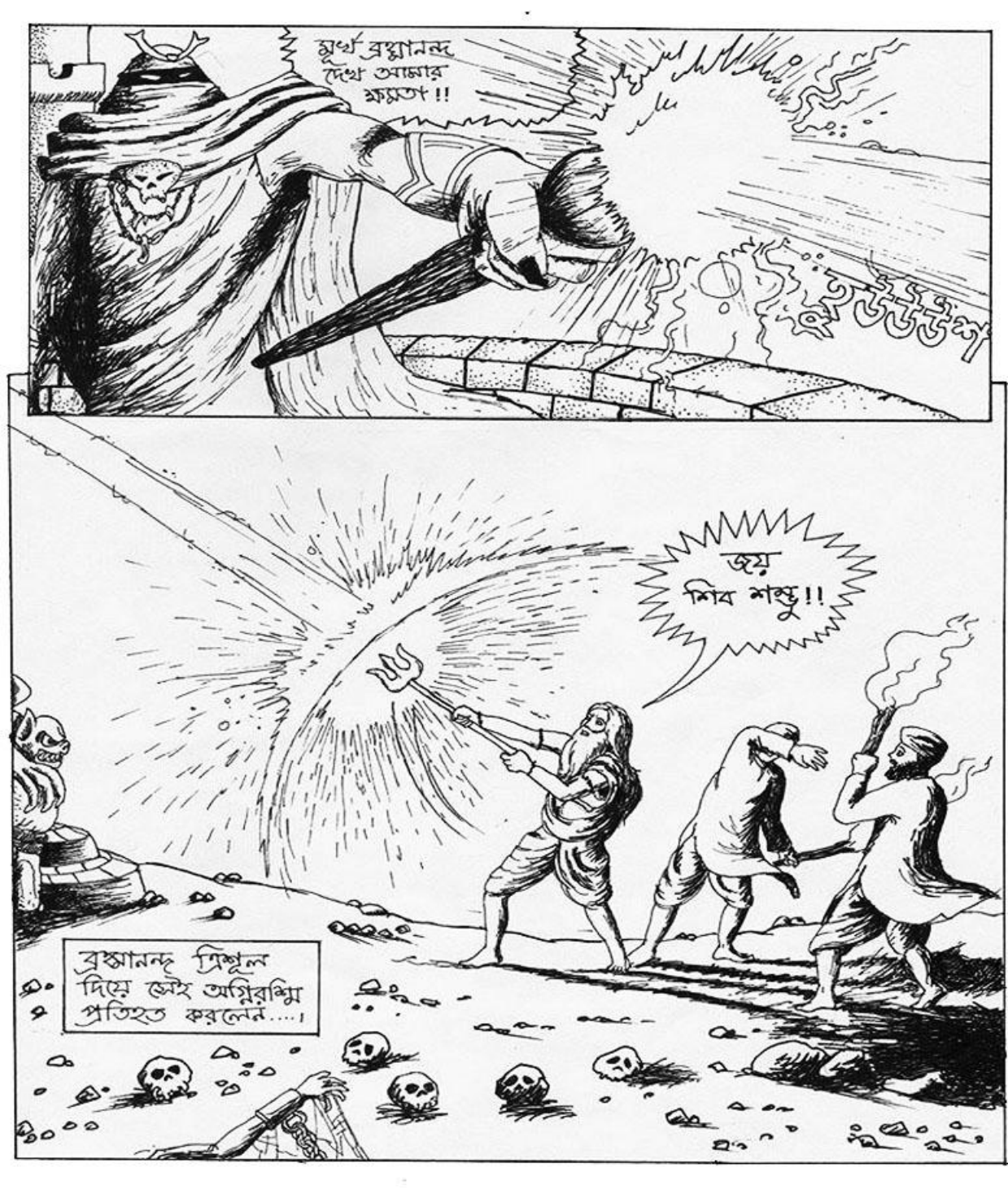
মূর্খ ব্রহ্মানন্দ
দেখ আমার
ক্ষমতা !!
জয়
শিব শম্ভু !!
ব্রহ্মানন্দ ত্রিশূল
দিয়ে সেই অগ্নিরশ্মি
প্রতিহত করলেন....।

?
জ্বালিয়ে দাও
ঐ শয়তানকে !!
হর হর
মহাদেব!!
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ!!

মায়াকাল দন্ড থেকে আগুন ছোড়ে....
?
সরে যাও!!
হা হা হা হা হা
হা হা হা হা
হে ঈশ্বর! দয়া করো।
তোমরা পালাও!
রাজগুরু ও তিনজন গ্রামবাসী এক শিব মন্দিরে প্রবেশ করল।
কি হবে গুরুদেব? আপনিও যে অক্ষম ওকে বধ করতে!!

টোটা আর টিটো

প্রাপ্তিযোগ

মূল কমিকসঃ হ্যারল্ড নের
অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

ক্যাপটেন আছেন? তাঁর কাকা প্রয়াত ব্যারন ভন স্পিৎজবারজেন ক্যাপটেনের জন্য ৫৭০০০০০০০ ডয়েশ মার্ক আর পাহাড়ের ওপর একটা দুর্গ উইল করে গেছেন। আমি ব্যারনের উকিল চন্দ্রচূড় নায়েক। কাগজপত্র সব নিয়ে এসেছি।
উরিব্বাস!! কত মার্ক বলল? টাকায় কত হবে কে জানে!
আসুন, বসুন, উকিল সাহেব। ক্যাপটেন এই আধঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবেন।

টোটা, দ্যাখ তো! আমাকে ঠিক একজন পেশাদার উকিলের মত দেখাচ্ছে না?
হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ হয়েছে! বক্তৃতা ছেড়ে এবার তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে নামা যাক চল।
গ্যাং! গ্যাং!
গ্যাঙর গ্যাং!!
2

উকিল শ্রী শ্রী মতিচূর লায়েক। আপনার কাছে এসেছেন।
আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই প্রীত হলাম, ক্যাপটেন! আপনার পিসেমশাই প্রয়াত মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনার জন্য দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উইল করে গেছেন। আর এই এক ব্যাগ ল্যাংচা পাঠিয়েছেন।
উফফফ!!! দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !! যাক, রান্নাঘরের কলটা এবারে সারানো যাবে!!
3

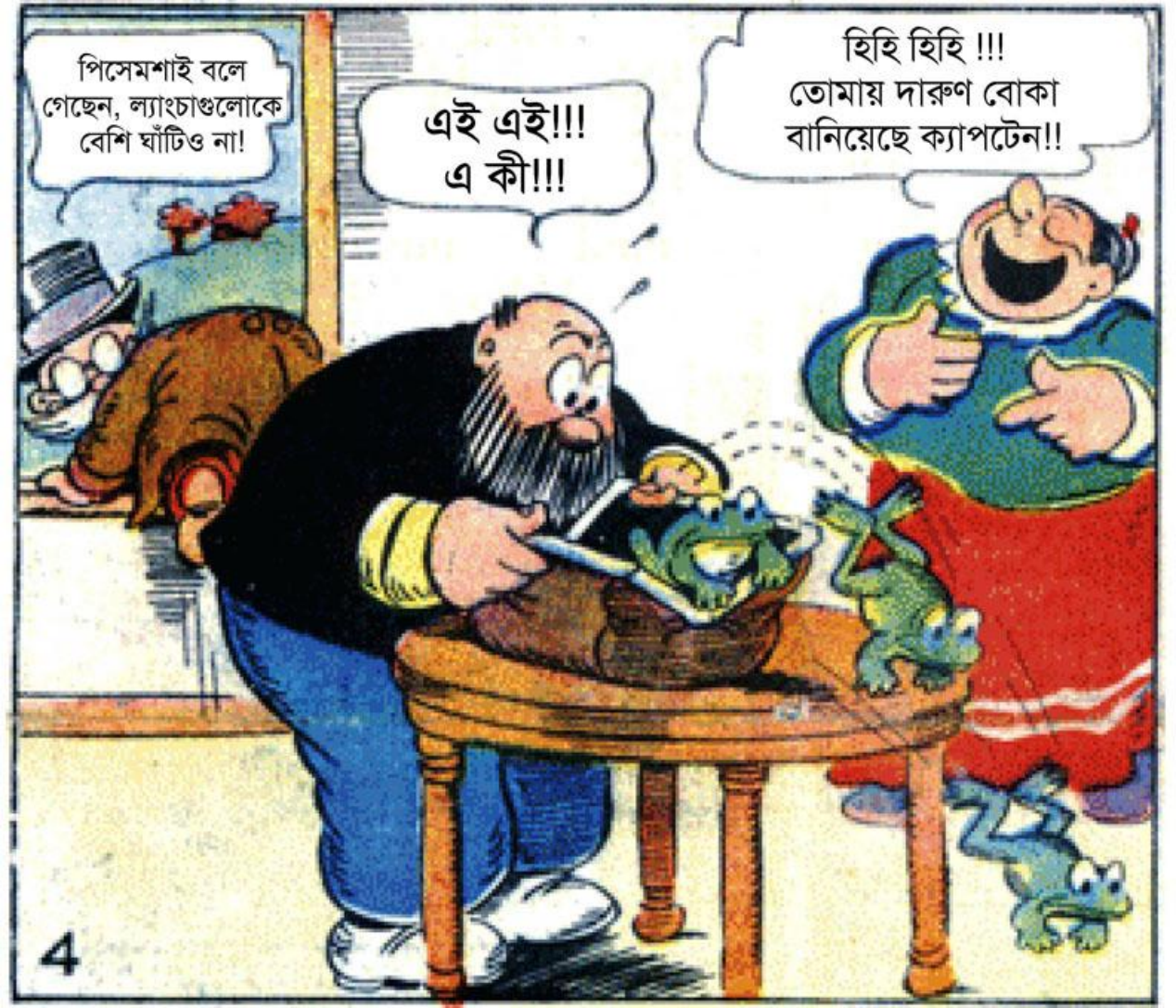
পিসেমশাই বলে গেছেন, ল্যাংচাগুলোকে বেশি ঘাঁটিও না!
এই এই!!! এ কী!!!
হিহি হিহি !!! তোমায় দারুণ বোকা বানিয়েছে ক্যাপটেন!!
4

তাড়াতাড়ি কর, টোটা। লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারতে হয়!
আরে দাঁড়া দাঁড়া!! দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কীভাবে খরচা করবে সেটা ভাবতে ক্যাপটেনকে একটু সময় দে!
৬

আমি উকিল শ্রী শ্রী শঙ্খচূড় পারেখ। আপনার প্রয়াত খুড়শ্বশুর ভুশণ্ডির মাঠের ব্রহ্মদত্যি মহারাজ আপনার জন্য তিন লক্ষ হাড় ও এক লক্ষ মড়ার খুলি উইল করে গেছেন। সাথে একটা হানাবাড়িও পাবেন।
ওই দ্যাখো!! আরেকটা উকিল!!
6

আর মহারাজ বলে গেছেন, সব একবারে উড়িয়ে দিও না।
হিহি!! হোহো!!
ভুশণ্ডির মাঠের ব্রহ্মদত্যি মহারাজ!! তিন লাখ হাড় আর এক লাখ মড়ার খুলি!! সাথে আবার একটা হানাবাড়িও আছে!
দুম
7

উকিল সাহেব, আপনি এবার ভেতরে যেতে পারেন। ক্যাপটেন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন!
ভেতরে এত গোলমাল কিসের বলো তো?
ধড়াম
!!!
!!!
!!!
!!!

এইবার মজা দ্যাখ!!
আমি উকিল শ্রী চন্দ্রচূড় নায়েক। আপনার কাকা আপনার জন্য ৫৭০০০০০০০ ডয়েশ মার্ক আর পাহাড়ের ওপর একটা দুর্গ উইল করে গেছেন। আমি কাগজপত্র নিয়ে এসেছি।
বটে!! উকিল!! তা, উকিল সাহেব, আপনার দর্শন পেয়ে খুবই পুলকিত হলাম! এবার মজা দেখাচ্ছি!!
9

ফাজলামির একটা সীমা আছে! করছিস কর, তা বলে টাকাপয়সা নিয়ে ফাজলামি? বিচ্ছু কোথাকার, এবারে দ্যাখ কেমন লাগে!!
আরে আরে ক্যাপটেন!! ভালো করে দেখ! এটা তো টোটা কিংবা টিটো নয় মনে হচ্ছে!!
এ কী!! এ কী!! এটা কী হচ্ছে?
10

ছোঁড়া দুটো গেল কোথায়??
এইও!! ফাজলামি করছি আমি? বটে!! জানেন আমি কে?

এসো সোনামণিরা। ক্যাপটেন এখন বড়লোক, তাঁর কি আর সময় আছে? এসো আমিই তোমাদের পেটাই।
ব্যাটা মোটু!! তোমায় এক পয়সাও দেওয়া উচিত না! অসভ্য গুণ্ডা কোথাকার!!
কী সব্বোনাশ!! এ যে দেখি সত্যি!! কোটিপতি হয়ে গেলাম তাহলে??
12

বাপের উপদেশ

এবার তাজিক লোককথার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের কচি পাঠকদের। ছবিগুলির শিল্পী ন. এস্তিস্।

একজন ময়দা পেষাই করত। ক্রমে ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়ল। টের পাচ্ছিল এবার কবরে যাবার সময়। ছেলেদের সে ডাকলে।

(১) বড়ো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে: 'কী উত্তরাধিকার তোকে দিয়ে যাব, ধন, নাকি বাপের উপদেশ।' ছেলে জবাব দিলে: 'নিশ্চয় ধন! উপদেশে তো আর পেট ভরবে না।' 'বেশ তাহলে যাঁতাকলটা নে, আর অর্ধেক টাকাকড়ি, থাক যেমন ভালো বুঝিস।'

(২) মেজো ছেলেও ধন চাইলে পেল বাড়িখানা আর অর্ধেক টাকা। বুড়ো ডাকলে ছোটো ছেলেকে...

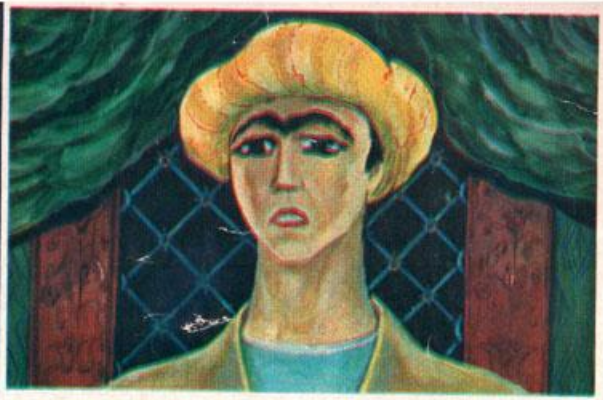

(৩) 'যদি মরেই যাও, তাহলে তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে?' মন ভার করে বলল ছোটোটি, 'ধনে আমার দরকার নেই।' 'তুই সুপুত্র। শোন বলি, আমি যখন মরে যাব, তিন রাত তুই আসিস আমার কবরের কাছে।'

(৪) গোর দেওয়া হল বুড়োকে। দাদারা উত্তরাধিকার ভাগ করে নিলে, ছোটোকে কিছুই দিলে না। ছোটো দাদাদের কৃপান্নে থাকতে চাইল না, তাদের ভেড়া চরাতে লাগল সে।

(৫) প্রথম রাতে গেল কবরের কাছে। বাপের কথা মনে করে কাঁদে। হঠাৎ শোনে ঘোড়ার ডাক। তাকিয়ে দেখে সামনে এক কালো ঘোড়া। 'আমার কেশর থেকে কয়েকটা লোম ছিঁড়ে নে। যদি আমাকে তোর দরকার হয়, একটা লোম পুড়িয়ে ফেলবি।'

(৬) দ্বিতীয় রাতে ফের ঘোড়া এল তার কাছে, তবে এবার লালচে-বাদামী রঙের। তারও কয়েকটা লোম ছিঁড়ে নিল ছোটো ছেলে।

(৭) তৃতীয় রাতে এল শাদা ঘোড়া, আগের গুলোর চেয়ে অনেক সুন্দর। 'জিনে উঠে বস, যেখানে চাস নিয়ে যাব।' 'উপায় নেই, আমি রাখাল, ভেড়া চরাই।' শাদা ঘোড়ার কেশর থেকেও কয়েকটা লোম নিয়ে রাখল সে।

(৮) কতদিন কাটল কে জানে। শুধু একদিন ভেড়া চরিয়ে ফেরার সময় শোনে চকে ঘোষক বলছে: 'যে ঘোড়সওয়ার প্রাসাদের চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে পুরো বেগে উঠতে পারবে বাদশা তাকে সেনাপতি করবেন।

(৯) দেশের সর্বপ্রান্ত থেকে সেরা ঘোড়সওয়াররা আসাতে লাগল প্রাসাদে। সবাই চায় নিজেদের কৌশল দেখাবে। প্রতিযোগিতার দিন চকে বিরাট ভিড়, বড়ো দু'ভাইও জুটল সেখানে।

(১১) অনেক ঘোড়সওয়ারই ততক্ষণে তাদের কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্তও কেউ উঠতে পারে নি। ছোটো ভাই অনায়াসে ঘোড়া ছোটাল সিঁড়ি দিয়ে, কিন্তু... মাঝামাঝি গিয়ে হোঁচট খেল। বড়োই উঁচু সিঁড়িটা।

(১০) ছোটো ভাই ভেড়া তাড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে গেল বাপের কবরের কাছে। কালো ঘোড়ার একটা লোম নিয়ে পোড়ালে। অমনি হাজির হল কালো ঘোড়া, পিঠে তার বাহারে সাজপোশাক। বেশ বদলে নিল ছোটো ভাই...

(১২) প্রথম দিনের প্রতিযোগিতার পর অসাফল্যে মন খারাপ করে দিকে দিকে চলে গেল সওয়ারীরা। দু'ভাই ঘরে ফিরে ফুর্তি করে বলাবলি করলে কালো ঘোড়ার এক অচেনা সওয়ারের কথা, যে উঠেছিল সবার চেয়ে উঁচুতে।

(১৩) দ্বিতীয় দিনেও লালচে-বাদামী ঘোড়ায় চেপে আসে অচেনা সওয়ার, কিন্তু ওপর পর্যন্ত উঠতে পারে না। কেবল তৃতীয় দিনে যখন সে আসে শাদা ঘোড়ায় চেপে, ঘোড়াটা এক দমে উঠে গেল চল্লিশটা ধাপ। তারপর ওপরে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

(১৫) ঝড়ের বেগে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছুটে গেল বাপের কবরের কাছে। সেখানে ফের রাখালের বেশ নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। পরের দিন বরাবরের মতো ভেড়ার পাল নিয়ে গেল চরাতে।

(১৪) সবাই হৈ-হৈ করে উঠল, প্রচণ্ড শব্দে বাজতে লাগল তুরি-ভেরি। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন বাদশা, ঘোষণা করলেন যে বিজয়ীকে তিনি সেনাপতি করছেন। কিন্তু বিজয়ীরই তখন আর পাত্তা নেই।

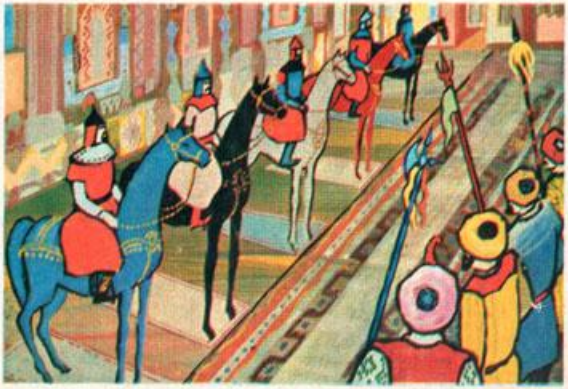

(১৬) সেটা ছিল সৈন্য-পরিদর্শনের দিন। হাজার হাজার সৈনিক জমা হল রাজপ্রাসাদের ময়দানে। হঠাৎ দেখা দিল আগের দিনের বিজয়ী।

(১৭) তার শাদা ঘোড়া যেন শূন্যে ভেসে চলেছে। রাস্তায় যেখানে বড়ো দু'ভাই দাঁড়িয়ে ছিল সেখান দিয়ে যাবার সময় সে হেসে হাত নাড়ল। দেখে তো ওদের চোখ কপালে উঠল।

(১৮) 'ভেড়ার পাল বাড়ি ফিরিয়ে আনতে ভুলো না!' দুই ভাইয়ের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে সে ঘোড়া ছোটাল নিজের সৈন্যবাহিনীর দিকে।

সাক্ষি ছিল চাঁদ

গল্প ঃ- দেবসেনা নন্দী
চিত্র ঃ- নচিকেতা সাহাত

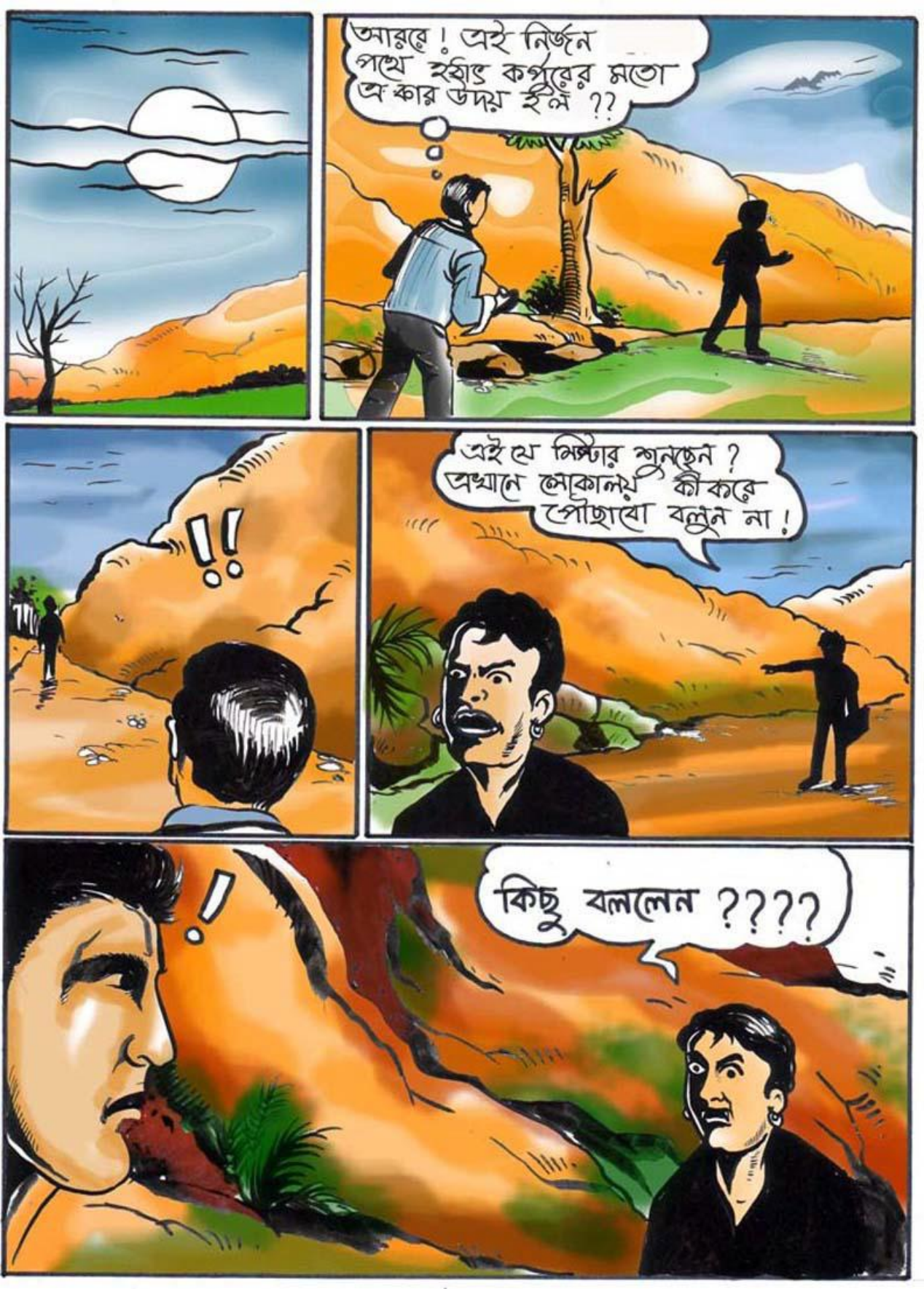
আরেব্বে ! এই নির্জন পথে হঠাৎ কর্পূরের মতো অন্ধকার উদয় হল ??
!!
এই যে মিস্টার শুনছেন ? এখানে সেকালের কী করে পৌঁছাবো বলুন না !
!
কিছু বললেন ????

আঁ-আঁ-আঁ
চিনতে পারছিস রজীব? আমি অরুণ্য।
না-না এ হতে পারে না।
তু-তুই তো মরে গেছিলি? আমি নিজের হা-হাতে আজ বিকে-লে-তো--তা-তোকে...
থামলি কেন? বল?

আজ বিকেলে ব্যাংক লুটের টাকা বখরার সময় তুই বেইমানি করে আমায় খুন করলি, অক্ষা ভোগ করবি বলে ??? তোকে ছাড়বোনা !!
না-ন্না তুই আমাকে ক্ষমা কর অ-অরুন্য,
ম্লি-ম্লিজ
গ-র-র
আঁ-আঁ-আঁ
সেই রাতের ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষি কেউ ছিল না।
সাক্ষি ছিল শুধু চাঁদ॥

এই উপন্যাসের আগের পর্ব থাবার ছাপ পড়তে নীচের লিংকে যাও→ **থাবার ছাপ**

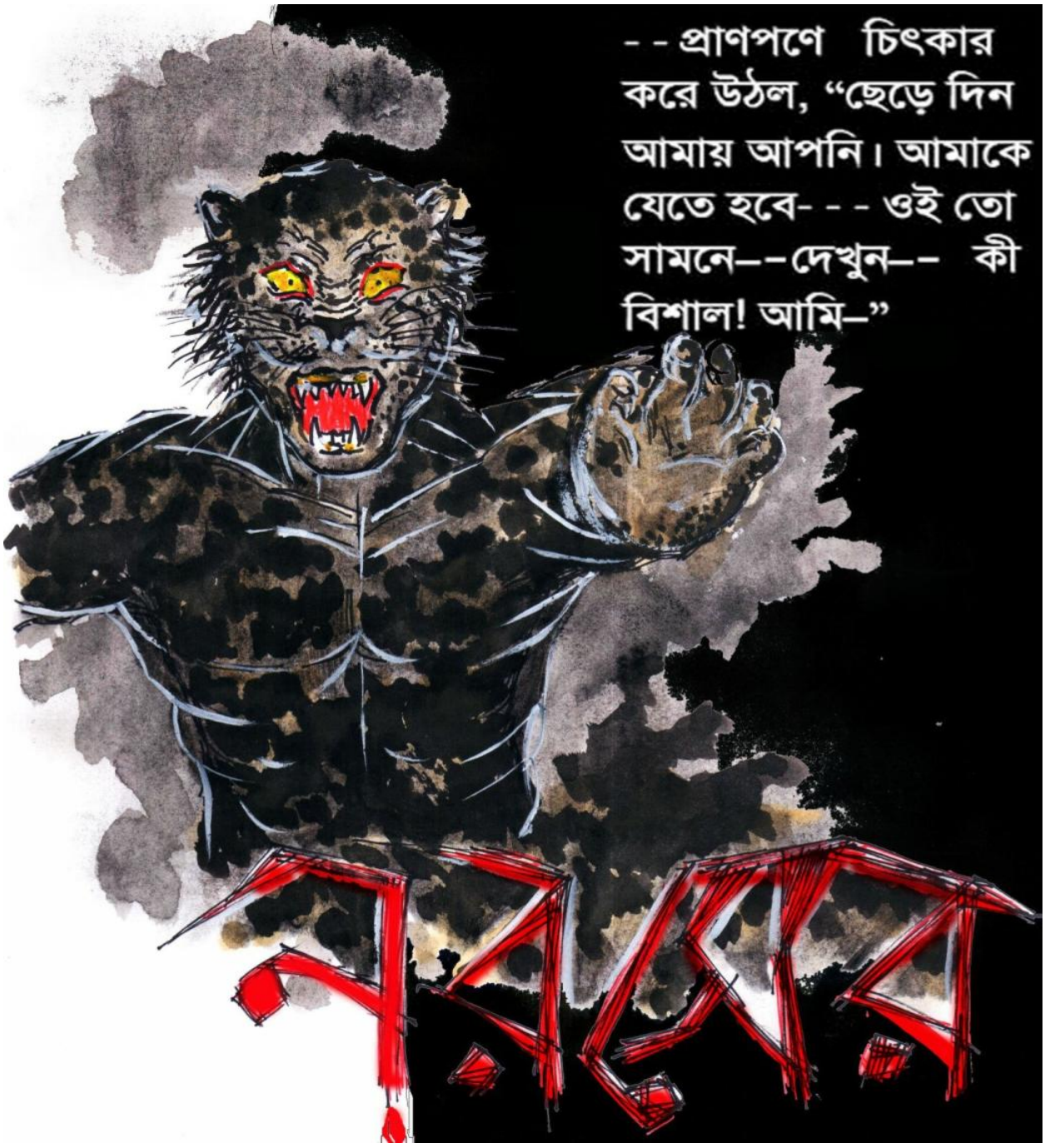

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ফেসবুকে সচরাচর অচেনা লোকজনের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে রাজি হই না আমি। কতরকমের মানুষজন আছে, কে যে কোন মতলবে চলে কে জানে। তা এ মেয়েটা একেবারে নাছোড়বান্দা। বারতিনেক রিকোয়েস্ট বাতিল করবার পর সেদিন সকালে উঠে মোবাইল অন করতেই দেখি চার নম্বর বার ফের রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বসেছে। কৌতূহল হতে মেয়েটার পাবলিক প্রোফাইলে গিয়ে একটু নেড়েঘেঁটে দেখলাম। কিছুই দেয়া নেই সেখানে। ভাবলাম এবারে একে

একটু বকুনি দেয়া দরকার। তার মেসেজ ইনবক্সে গিয়ে একটু কড়া ভাষায় দু চার কথা লিখে দিয়ে খবরের কাগজের দিকে মন দেয়া গেল।

আমাদের এরেরা কলোনি এলাকাটা পুরানা ভোপালের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এখানটা জঙ্গল ছিল শুনেছি। এখন দিব্যি সাজানোগোছানো পল্লী হয়ে উঠলেও তার এখানেওখানে দুটো একটা কেঁদ- মহুয়া- খিরনি- কুল্লুর মতন বুনো গাছ চোখে পড়ে। আমার বাড়ির সামনেটাতেই তেমন কটা গাছ রয়েছে। ভরা বর্ষায় তাদের ক্যানোপিতে সবুজের বাহার। বৃষ্টি পেয়ে নীচের মাটিতে ঝোপঝাড়গুলোও ফনফনিয়ে উঠেছে। দেখলে মনে হবে বুঝি জঙ্গলটা কংক্রিটের ফাঁকফোকর দিয়ে আঙুল গলিয়ে অপেক্ষায় আছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই ফের থাবা মেরে ছিনিয়ে নেবে নিজের রাজত্বকে।

"কী হে ভুবন? আজ অফিস নেই?"

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি বোসসাহেব গেটটা খুলে ছাতা বন্ধ করতে করতে এসে ভেতরে ঢুকছেন।

হেসে বললাম, "রিটায়ার করেছেন তো মাত্র এক বছর। এখনি উইক এন্ড কবে কবে হয় ভুলে গেলেন?"

"ওহো তাইতো। আজ তো শনিবার। ব্যাপার কী জানো, রিটায়ারমেন্ট টেন্ট কিছু নয়, আসলে করেছি তো বনের চাকরি। ওতে উইক এন্ডই বা কী আর উইক ডে- ই বা কী? হিসেব থেকেছে নাকি কোনোদিন?"

কথাটা অবশ্য সাহেব ভুল বলেন নি। বনবিভাগে তো অনেক মানুষই চাকরি করেন, কিন্তু ওঁর মতন কাজপাগল আর পণ্ডিত মানুষ সহজে মেলে না। এখন চাকরিজীবন শেষ হতে পড়াশোনা নিয়েই থাকেন। এখানকার প্রবাসী বাঙালি সমিতিতে এখন আমি সেক্রেটারি আর উনি প্রেসিডেন্ট। মাঝেমধ্যে মর্নিং ওয়াক করতে করতে এসে একটু গল্পসল্প করে যান। দুচারটে কাজের কথা হয়, নতুন কী পড়লেন সে নিয়ে আলোচনাও হয় একটুআধটু।

"জেঠু চা নাও," পিপুল চায়ের ট্রেটা এনে বোসসাহেবের সামনে বাড়িয়ে ধরল। ট্রের ওপর একপাশে আমার ফোনটাও রাখা। সেইটের দিকে দেখিয়ে সে বলে, "তোমার ফেসবুক ইনবক্সে একটা মেসেজ এসেছে বোধায় বাবা। ট্রিং করে শব্দ হল একটা। দেখে নাও।"

ফোনটা হাতে নিয়ে তার গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে লাগলাম আমি।

"জরুরি কিছু?"

পর্দায় তখন ফের সেই আদৃতা চ্যাটার্জি নামটা ভেসে উঠেছে। মেসেজটাকে পর্দায় আনতে আনতেই আমি অন্যমনস্কভাবে কিছু একটা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা বলবার আগেই হঠাৎ একটু চমকে উঠলাম আমি।

"কী হল হে? খারাপ কোন খবরটবর- "

আমি নীরবে ফোনটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

বোসসাহেবের আবার ইংরিজি হরফের বাংলা পড়তে সমস্যা হয়। ধরে ধরে উচ্চারণ করে পড়ছিলেন, "আমি আদৃতা। ড: আর এন চ্যাটার্জির মেয়ে। প্রফেসর জিনি কার্লোসের কাছে পিএইচ ডি করছি ইয়েল- এ--- আপনার সঙ্গে আমার বাবার হারিয়ে যাবার ঘটনাটার ব্যাপারে—
"

ফোনটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে পাথরের মতন বসে রইলেন বোসসাহেব। তারপর খানিক বাদে নিজের মনেই বললেন, "বাপের পথেই হাঁটছে। সেই এক ইউনিভার্সিটি, একই গাইড-- "

আমি চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। ছুটির সকালটা হঠাৎই একেবারে বিস্বাদ ঠেকছিল। খানিক বাদে একটু ইতস্তত করে বললাম, "কী করব বলুন তো স্যার?"

"ওকে ডেকে পাঠাও ভুবন। সব কথা ওর জানবার অধিকার আছে।"

"কিন্তু স্যার, যে কথাগুলো দুনিয়ার কেউ বিশ্বাস করবে না—"

"আমি তো করেছি।"

"আঃ! আপনার কথা আলাদা স্যার। জঙ্গলেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু একটা বাচ্চা মেয়ে, বিদেশের শহরে বড়ো হয়েছে, সে–"

"না ভুবন। ও মেয়ে কেন বাপের পথেই হেঁটেছে তুমি বোঝো নি? আমি নিশ্চিত, রবি কোথায় কীভাবে হারিয়ে গেল, সেইটে ও জানতে চায়। তাই তার ক্লু খোঁজবার জন্য বাপের গবেষণার বিষয়টাকেই নিজের বিষয় করে নিয়ে তাঁর পথে এগিয়েছে। যাঁর কাছে কাজ করছে বলে লিখেছে তাতে তার জন্য দরকা্রি পড়াশোনাও করেছে সে তো বোঝাই যায়। ভারতীয় ট্রাইবাল ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে গবেষণায় এখনও ডঃ কার্লোসই দুনিয়ায় এক নম্বর। তোমার কথাগুলো শুনে সেটা বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ওর থাকবে আশা করি। তুমি এ নিয়ে দ্বিধা কোরো না।"

একটু ইতস্তত করে আমি ফের ফোনটা টেনে নিলাম কাছে।

২

বোসসাহেব ফ্রুট কাস্টার্ডের ট্রেটা এনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ছাইদানির ধার থেকে নিভন্ত চুরুটটা তুলে নিয়ে দাঁতের ফাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, "খেয়ে দেখ। আয়াম আ ফার্স্টক্লাস ডেসার্ট মেকার টু।"

"উ- ম্- ম্,"

এক চামচ মুখে তুলেই আদৃতা একটা খুশির শব্দ করল, "ফিরে গিয়ে ম্যাডামকে বলতে হবে। রান্নাবান্নার ব্যাপারে শি হ্যাজ ফাইনালি মেট হার ম্যাচ।"

"সে কী? তোমার প্রফেসরসাহেব রান্নাবান্নাতেও আছেন নাকি?"

"নয়ত কী? তাঁরও তো তিনকূলে কেউ নেই। বাবার হারিয়ে যাবার খবর ওদেশে গিয়ে পৌঁছোনোর পর থেকে ওঁর কাছেই তো মানুষ হয়েছি। একদিনও কিচেনে ঢুকতে দেন নি। দারুণ রান্নার হাত।"

ওর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছিল আমার। মা মরা মেয়ে। আমার পিপুলের বয়েসি হবে। বিদেশবিভুঁয়ে পরের বাড়ি মানুষ। কিন্তু মুখের হাসিটা ঠিকই আছে। শক্ত চিবুক আর চাপা ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায় ভয়ানক জেদি। ওকে এই বিপদটার মুখে ঠেলে দিতে—

চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল আদৃতার গলার শব্দে, "আংকল, এইবারে আপনি বলুন। ঠিক কী হয়েছিল সেদিন জঙ্গলে? ফ্যাক্টস-এর সঙ্গে আমার অনুমিতিগুলো মিলিয়ে নিতে চাই একবার—"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "বলব। এখনো অবধি যে কথাগুলো বোসসাহেব বাদে দ্বিতীয় কাউকে সাহস করে বলতে পারিনি, সে সবই বলব। কিন্তু ভয় হচ্ছে তুমি তা বিশ্বাস করতে পারবে কি না।"

"ট্রাই মি।"

"যদি বলি দশ বছর আগে তোমার বাবা আমার চোখের সামনে একজন মৃত্যুহীন কালো প্যান্থার হয়ে কাঠেরিয়ার জঙ্গলে সওশির পাহাড়ের কাছে হারিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে বিশ্বাস করতে পারবে?"

আদৃতা হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "মৃত্যুহীন? তার মানে এখনো- "

বাইরে রাত বেড়েছে। বোসসাহেবের বাড়িটা কলোনির একটু একটেরেতে। চারপাশে অনেক গাছ। সেখান থেকে রাতের শব্দ উঠছিল। সেইদিকে চোখ রেখে আমি গল্পটা বলে যাচ্ছিলাম আদৃতাকে। সামনে খোলা ল্যাপটপটার কিবোর্ডে দ্রুত আঙুল চলছিল তার-

দশ বছর আগের স্মৃতি। এখনো তার প্রতিটা মুহূর্ত আমার মনে আছে। কিচ্ছু ভুলিনি। রবি আর আমার কাঠেরিয়ায় যাওয়া, সওশির পাহাড়ের মাথায় সেই গুহায় ঢুকে, ছাদের গায়ে আঁকা ব্যাঘ্রমানবের ছবির নীচে শুয়ে রবির সম্মোহিত হয়ে যাওয়া, নিজের ওপর সম্মোহনের জাল ছিঁড়ে আমার তাকে নিয়ে পালানো, আর সবশেষে, বৃষ্টির সেই রাতে পথহারানো জঙ্গলের ভেতর প্যান্থারবাহিনীর সামনে রবির একলা গিয়ে দাঁড়ানো, তারপর ভেজা মাটির বুকে থাবার ছাপে জমা বৃষ্টির জলে নিজের শরীরের রক্ত মিশিয়ে খেয়ে তার কালো প্যান্থারে বদলে যাওয়া, চলে যাবার আগে আমার দিকে তার সেই করুণ দৃষ্টি, এর কোনকিছু বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটা যখন শেষ করলাম, দেয়ালঘড়িতে তখন রাত বারোটার ঘন্টা বাজছে। বাইরে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ উঠছিল। মহারাষ্ট্রের ওপরে গভীর নিম্নচাপ। আজ রাতে এ বৃষ্টি ধরবে না।

"এই ওয়েদারে এত রাতে হোটেলে ফিরবে, না আজ আমার এখানেই- " বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গেলেন বোস সাহেব। ফিরে দেখি, আদৃতার চোখে দু ফোঁটা জল টলমল করছে।

একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "এখানেই শুয়ে পড়ব'খন স্যার। এখনো অনেক কথা বলবার আছে আমার। আংকলের গল্পটা আমার ডেটা আর থিওরিটাকে সম্পূর্ণ সাপোর্ট করছে।"

বলতেবলতেই আদৃতা দ্রুতহাতে তার ল্যাপটপে আঙুল চালাচ্ছিল। একটু বাদে তাতে একটা স্লাইড প্রেজেন্টেশান এনে সেটা চালিয়ে দিয়ে বলল, "আপনারা এইটা একটু দেখুন প্রথমে। আমি বলে যাই। জিওফ্রে ল্যাং এবং বালাজি দেশমুখের নাম শুনেছেন কি?"

পর্দায় ভেসে ওঠা ছবিদুটোর দিকে তাকিয়ে বোসসাহেব মাথা নাড়লেন, "চিনি। আমিই ওঁদের সওশির পাহাড়ের কাছাকাছি জঙ্গলে এক্সক্যাভেশানের পারমিশান দিয়েছিলাম বছর পাঁচেক আগে।"

"রাইট। বিখ্যাত প্যালেন্টোলজিস্ট। সওশির এক্সক্যাভেশান সাইটে দশ হাজার বছরের পুরোনো ভূস্তর থেকে ওঁরা একটা ইমপ্যাক্ট ক্রেটারের খোঁজ পেয়েছিলেন। সেখানটার পাথরের সঙ্গে এমন কিছু ধাতুর গুঁড়ো মিলেছিল যে ধাতুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই আংকল।"

"কোন উল্কা বা- "

"সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু কেউ বলতে পারেন নি। ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য আরো বাড়িয়ে তুলেছে সে এলাকার মাটির নমুনায় প্রচুর পরিমাণে মিশে থাকা এই বস্তুটা।"

পর্দায় ভেসে ওঠা ছোটো ছোটো স্ফটিকখণ্ডগুলোর দিকে দেখিয়ে ফের আদৃতা বলল, "ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা বহুগুণ বিবর্ধিত ছবি। একধরণের ভাইরাস। পৃথিবীর আর দশটা ভাইরাসের সঙ্গে এর গঠনের মিল নেই কোন। আংকেলের গল্প আর পৃথিবীতে পাওয়া যায়না এমন দুটো বস্তুর একসাথে সে গল্পের ঘটনাস্থলে হাজির থাকা থেকে একটা তত্ত্ব খাড়া হচ্ছে আস্তে আস্তে যে-- "

"কিন্তু এর সঙ্গে তোমার বাবার হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক কোথায়?"

"সরি। তত্ত্বের কথা বলবার আগে আমার সেটা প্রথমে বলে নেয়া উচিত ছিল। সম্পর্ক আছে স্যার। আসলে, 'নেচার'এ ল্যাং ও দেশমুখের মূল গবেষণাপত্রটা বের হবার পর বিষয়টা নিয়ে ওদেশে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। বছরতিনেক আগে অ্যানালস অব এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ক্রিপটোবায়োলজি পত্রিকায় একটা গবেষণাপত্র বের হয়। তাতে মানুষের রক্তের বিভিন্ন ধরণের নমুনার ওপরে এ ভাইরাসটার কার্যপ্রণালী নিয়ে কিছু পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়েছিল। ম্যাডামের নজরে পড়তে তিনি পেপারটা আমায় এনে দিয়েছিলেন।

"একটা বিচিত্র ফলাফল দেখা গিয়েছে সে পরীক্ষায়। পৃথিবীতে সামান্য কিছু মানুষের দেহকোষে কিউ সি ৮০ নামের অ্যাক্টিন গোত্রের একটা জিন পাওয়া যায়। এই ভাইরাসটার মধ্যেও তার উপস্থিতি রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে সেই ধরণের মানুষের কোন কোষের সংস্পর্শে এলে এটা অকল্পনীয় বেগে কোষটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সম্পূর্ণ বদলটা ঘটতে সময় লাগে ষোলো সেকেন্ডের একটু কম।"

"এইরকম একটি পরিবর্তিত দেহকোষের জিনসংকেতগুলোর ভিত্তিতে কমপিউটার সিমুলেশানে যে প্রাণীটার ছবি তৈরি করা হয়েছে সেটা দেখুন আপনারা—"

পর্দায় ফুটে ওঠা অতিকায় ব্ল্যাক প্যান্থারের ছবিটার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। বুকের ভেতর একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ চোখের সামনে ঝাঁপিয়ে আসছিল দশ বছর আগের সেই বৃষ্টিঝরা রাতের ছবিটা। একদল কালো প্যান্থারের সতর্ক পাহারায় আমার গাড়ির সামনে উপুড় হয়ে বসে নিজের রক্ত মেশা জল খেতে থাকা মানুষটা—তারপর—চোখের সামনে তার মানুষের চেহারাটা বদলে গিয়ে—

"দুটো প্রশ্ন আদৃতা," বোসসাহেবের কথায় চমকে ফিরে তাকালাম তাঁর দিকে, "এ দুটো প্রশ্নের সঠিক জবাবের ওপরে তোমার তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, ল্যাং আর দেশমুখের কাজটার সময় সেখানে জনাপঞ্চাশেক লোক গিয়েছিল। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি সেসময় বেশ ক'বার। সওশির পাহাড়েও উঠেছি। কিন্তু ছ মাসের প্রজেক্ট চলাকালীন ওখানে ভুবনের বলা প্যান্থারবাহিনীর কোন অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাইনি। তোমার তত্ত্ব এর কোন ব্যাখ্যা

দিতে পারবে কী? আর দ্বিতীয়ত, তুমি কী করে নিশ্চিত হচ্ছ যে তোমার বাবা ওই দুর্লভ জিনের বাহক ছিলেন?"

"ব্যাখ্যা আছে স্যার। ল্যাং- এর দলবল প্যান্থারদের দেখা না পাওয়া, আংকেলের বেঁচে ফেরা আর বাবার বদলে যাওয়া এ তিনটে ঘটনা একই সুতোয় বাঁধা। সে সুতোটা হচ্ছে ওই কিউ সি ৮০। ও অঞ্চলের যে সমস্ত মিথ নিয়ে আমি কাজ করেছি তাতে একটা কথা বারংবার বলা হয়। সওশিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা যাকে নিজের দলে নেবেন তাকে প্রথমে টেনে আনেন তাঁর ওই গুহায়। সম্ভবত কিছু লক্ষণ বিচার করে তার দেহে এই জিনটার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় সেখানে। সে পরীক্ষায় পাশ করলে—"

"তার মানে তোমার অনুমান- "

"অনুমান নয় আর আংকল। আপনার গল্প আর আমার এতদিনের গবেষণার ফলাফল একত্র করে এইবারে আমি প্রায় নিশ্চিত, আপনার শরীরে ওই জিনের উপস্থিতি খুঁজে পায় নি ঐ শয়তান দেবতা। এ জিনের ধারক মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ। ল্যাং- এর দলের মধ্যেও সম্ভবত তেমন কেউই ছিল না। বাবার দেহে নিঃসন্দেহে ওই জিনের উপস্থিতি ছিল। তাই তারা বাবাকে বেছে নিয়েছিল নিজেরাই।"

"নিছক অনুমান আদৃতা। তোমার বাবার কোষে ওই জিনের উপস্থিতির কোন প্রমাণ- "

"প্রমাণ আমি নিজে স্যার। পরীক্ষা করে দেখেছি আমার দেহকোষ এ জিনের মালিক। একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ছাড়া এই দুর্লভ জিন আমার শরীরে আসবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

একটা দীর্ঘ নৈঃশব্দের পর বোসসাহেব যখন মুখ খুললেন তখন তাঁর গলায় ক্লান্তির স্পর্শ ছিল, "এবারে কী করতে চাও তুমি আদৃতা?"

"আমি ওখানে যাব স্যার। আমার জিনের পরিচয় পেলে ওরা আমার সামনে আসবে। বাবাকে আমি আর একটিবার—" বলতে বলতে গলা কাঁপছিল মেয়েটার। একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে ফের বলল, "আমি তখন দশ বছরের মেয়ে। বাবাকে খুব ভালোবাসতাম স্যার। আমায় একবার ওই পাহাড়ের কাছে যেতে হবে—একটা শেষ চেষ্টা- "

"পাগলামি করছ আদৃতা," আমি মাথা নাড়লাম, "আমি ওদের সামনে থেকে দেখেছি। মানুষের মনকে নিয়ে কত সহজে ওরা খেলা করতে পারে সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণাই নেই। তুমি যা বলছ তার খানিকটাও যদি সত্যি হয় তাহলে ওখানে গিয়ে তুমি ফিরে আসতে পারবে না। রবি পারেনি। কেউ কখনো পারবে বলে আমি মনেও করি না।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না ভুবন,"বোসসাহেব মাথা নাড়লেন, "ভেবে দেখ, সেই এক্সক্যাভেশানের সময় কিন্তু আমরা এদের কাউকেই কোথাও দেখিনি। বড়োসড়ো একটা মানুষের দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির থাকলে হয়ত এদের সে সাহস হবে না। আর হলেও আমরা তার মোকাবিলা করতে পারব বলেই মনে হয়।"

বোসসাহেবের চোখদুটো চকচক করছিল। মানুষটাকে আমি আজও চিনতে পারলাম না। সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে মাটিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছুটে আসা পূর্ণবয়স্ক রয়েলবেঙ্গলকে ট্র্যাংকুলাইজ করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওঁর। অথচ আজ পর্যন্ত কেবল দুটো মানুষখেকো বাঘ আর কিছু রোগ এলিফ্যান্ট ছাড়া শিকারের নামে ফুর্তির জন্য একটা চড়ুই পাখিও মারেন নি। একা

মানুষ। সংসার করলেন না কখনো, সে- ও ওই জঙ্গল আর অ্যাডভেঞ্চারকে ভালোবেসে। তিনকুলে টানমায়া বাড়াবার জন্য কেউ নেই। ষাট বছর পেরিয়েও রক্তের তেজ গেল না মানুষটার।

আদৃতা ম্লান একটু হেসে মাথা নাড়ল, "ঠিক ওই কারণেই বড়ো দলবল নিয়ে ওখানে যাওয়া আমাদের চলবে না স্যার। আমাকে একাই যেতে হবে। নাহলে, আপনিই তো বললেন, সামনে আসবে না ওরা। আমার মিশনটার কী হবে তাহলে?"

বোসসাহেব চুপ করে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার মুখের দিকে। সিনেমার নায়কদের মত কোন কায়দাটায়দা না করে কত সহজ গলায় চূড়ান্ত সাহসী একটা কথা বলে গেল মেয়েটা। তবে সেটা সাহস না বলে বোকামোও বলা যায়। আবেগপ্রবণ একটা কমবয়েসি মেয়ের চূড়ান্ত বোকামো। এ হতে দেয়া যায় না।

উঠে এসে তার পাশে বসে বললাম, "মাথা ঠান্ডা করো আদৃতা। বাবার সন্ধান করতে গিয়ে নিজের একটা বড়ো ক্ষতি ছাড়া আর কী লাভ হবে তোমার বলো দেখি? তাকে তুমি আদৌ খুঁজে পাবে কিনা সেটাতে সন্দেহ আছে। আর খুঁজে পেলেও, তাঁকে তো ফিরিয়ে আনতে পারবে না তুমি। এমন একটা ক্ষ্যাপামোর চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। তোমারও যদি তার মতন দশা হয় তাহলে রবি মনে শান্তি পাবে ভেবেছ?"

মাথা নীচু করে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল আদৃতা। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, "আমি জানি আংকল। অতটা আবেগপ্রবণ আমি নই। সেইজন্যই পেপারটা হাতে পাবার পরও তিনটে বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আপনি যা বললেন ঠিক সেই কারণেই আশা আমিও ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর গতমাসে আমাদের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্য এক গবেষকদল এর ওপরে দ্বিতীয় একটা গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করেন।

"ভাইরাসটার দেহকোষকে বদলে দেবার কৌশলকে ব্যবহার করে তাঁরা পরীক্ষামূলক একটি রেট্রোভাইরাস তৈরি করতে পেরেছেন যেটি যে কোন কারণে বদলে যাওয়া দেহকোষকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে চোখের পলকে। অসুখে নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জিন থেরাপিতে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেয়ার কাজে লাগানো হবে এই রেট্রোভাইরাসটাকে। ক্যানসার চিকিৎসায় এ ভাইরাস কাজে আসবে। কাজে লাগানো হবে বার্ধক্যনিরোধক গবেষণাতেও।

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ—"

বোসসাহেবের চোখদুটো চকচক করছিল। বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁর অবাধ যাতায়াত। তবে আমার মাথায় অবশ্য ঢুকছিল না কিছু। ছোটোবেলা থেকে অংক- বিজ্ঞান আমার দু চোখের বিষ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মানে, ব্যাপারখানা ঠিক- "

"আমি বুঝতে পেরেছি ভুবন," বোসসাহেবের গলায় উত্তেজনার স্পর্শ ছিল, "কোনভাবে যদি এ ভাইরাসটাকে রবির শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যায় একবার-- "

"জানি না স্যার। জিনিসটা ল্যাবরেটরির ভেতরে কয়েকটা মানবকোষের ওপরে খানিক পরীক্ষা হয়েছে এখন পর্যন্ত। জিনি ম্যাডামের দৌলতে তার একটামাত্র নমুনা আমি হাতে পেয়েছি। ওরই ভরসায় একটা চেষ্টা স্যার," বলতে বলতে ঝোলা থেকে ছোট্ট একটা স্টিলের বাক্স বের

করে আনল আদৃতা। তার ওপরে কাচের ছোট জানালা দিয়ে ভেতরে নিরীহদর্শন একটা ধাতব ক্যাপসুল চোখে পড়ে।

বোসসাহেব জিনিসটা হাতে ধরে নিয়ে বসে মাথা নাড়ছিলেন। খানিক বাদে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "তুমি উন্মাদ। একটা অপরীক্ষিত ওষুধের ক্যাপসুলের ভরসায় অর্ধেক পৃথিবী বেড় দিয়ে অচেনা, শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে একলা একলা লড়তে চলে এলে? কিন্তু আমি—আমার গর্বে বুকটা ফুলে উঠছে জানো? রবি সৌভাগ্যবান মানুষ ছিল। এমন মেয়ে যার—"

বলতেবলতেই উত্তেজিত হয়ে উঠে সারা ঘর জুড়ে পায়চারি করছিলেন বোসসাহেব। তারপর হঠাৎ আদৃতার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা বাবাকে খুঁজে পেলে ওষুধটা খাওয়াবে কীভাবে কিছু ভেবেছ?"

আদৃতা দুদিকে মাথা নাড়ল একবার।

"বুঝেছি। হাতে একটা কিছু এসেছে, আর আগুপিছু কিচ্ছু না ভেবে অমনি এরোপ্লেনের টিকিট কেটে চড়ে বসেছ। তা জঙ্গলে যে যাবে, তা বন্দুক পিস্তলে অভ্যেস আছে তো, নাকি ল্যাপটপ দিয়ে বাঘ মারবে ভাবছ?"

সে মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের ওদেশে যা অবস্থা এখন তাতে সব্বাইকে ওইটে আজকাল শিখে রাখতে হয়। আমাদের বাড়িতেও ম্যাডামের লাইসেন্সড পিস্তল আছে। লোকাল শুটিং ক্লাবের মেম্বার আমরা দুজনেই।"

"হুমম্," বলতে বলতে বোসসাহেব দেরাজ খুলে গোটাকয় বন্দুক বের করে টেবিলের ওপর এনে রাখলেন। তার থেকে রিভলভারের মত দেখতে একখানা অস্ত্র বেছে নিয়ে আদৃতার দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, "দেখ। চলবে?"

জিনিসটা দেখতে সাধারণ কোনো পিস্তলের মতন নয়। মাথার দিকে নলটা বেশ সরু। ট্রিগার আছে বটে, কিন্তু বুলেটে ঘা দেবার মত কোন হ্যামার চোখে পড়ছিল না। গুলি ভরবার ম্যাগাজিনও নেই। নলটার পেছনদিকে একটা ফুটো আর বাঁটের পেছনদিকে বাতাসের চাপ মাপবার ডায়াল।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে নিয়ে মেয়েটা বলে, "এটা আমি ঠিক—"

"এটা বাতাসের চাপে চলা একটা ডার্ট গান। ঘুমপাড়ানি ডার্ট ছোঁড়বার কাজে লাগে। ও নইলে তোমার ওষুধটা ডেলিভারি করবে কী করে?"

"কিন্তু স্যার আমি এ বন্দুক কখনো- "

"চালাও নি, তাইতো? অসুবিধে নেই। পিস্তল চালাবার অভ্যেস তো আছে। বাকিটা আমি তোমায় এক মুহূর্তে শিখিয়ে দেব। তোমার ওষুধের ক্যাপসুল আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি ওটাকে একটা ডার্ট সিরিঞ্জে ভরে তৈরি করে রাখব।"

আমি একটু অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "কী বলছেন স্যার? ওকে এইভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আপনার- "

বোসসাহেব আমার কথায় কান না দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে আরো দুটো রাইফেল বেছে নিয়েছেন ততক্ষণে। রাইফেলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "উইলফ্রেড অ্যান্ড ক্র্যামার। সেমি অটোমেটিক। এক বার্স্টে চোদ্দোটা অবধি গুলি ছোঁড়ে। রিকয়েল প্রায় নেই। এইটে তোমার কাছে থাকবে ভুবন। আর আমি—হা হা—এই দ্যাখো, একে আমি বলতাম মনস্টার

লিকার। পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো ক্যালিবার। এর একটার বেশি দুটো শট আজ অবধি কোন পাগলা হাতির প্রয়োজন হয় নি।”

“কী বলছেন স্যার?—আপনি- এই বয়সে- ”

“যাব ভুবন। ওকে একলা ছেড়ে দেব নাকি ওই বিপদের মুখে? তুমি আমি দুজনেই যাব। বাপের জন্য এত করল, সব ছেড়েছুড়ে জীবন নিয়ে বাজি খেলতে চলে এল আধা পৃথিবী ঘুরে, নিজের সুখের জীবন ছেড়ে। কাজেই শেষ চেষ্টাটায় ওর নিজের অধিকার। সেটা ও নিজের হাতেই করুক আমি চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে, ওকেও জ্যান্ত ফিরিয়ে আনতে হবে তো! আমাদের আদৃতা মাকে—” বলতেবলতে তার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দিলেন বোসসাহেব। মোটা মোটা কর্কশ আঙুলগুলো অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে তার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েই সংকোচে পিছিয়ে এল যেন। আদৃতা মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে ফের হাতটাকে নিজের মাথায় ধরে নিয়ে রেখে বলল, “আশীর্বাদ করুন জেঠু।”

“করলাম মা। তুমি সফল না হলে কে হবে? নিজের জন্য কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমায়। তুমি শুধু তোমার হাতের কাজটার দিকে মন দাও। আমরা দুজন সঙ্গে রইলাম তোমার দেখভাল করবার জন্য।”

৩

ইটারসি বাজার থেকে বেরিয়ে খানিক দূর এগোবার পর আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। বোসসাহেব এতক্ষণ নিজেই একটানা চালিয়ে এসেছেন। এইবার একটু রেস্ট নেবেন।

আদৃতা লোভি দৃষ্টিতে একবার স্টিয়ারিঙের দিকে তাকিয়েছিল। বললাম, “চালাবে? ছ গিয়ারের গাড়ি। স্টিয়ারিং, গিয়ার সব ম্যানুয়াল কিন্তু।”

সে খানিক ভেবেচিন্তে বলল, “থাক আংকল। শহরের রাস্তায় ইলেকট্রনিক গিয়ারের হালকাপলকা অটোমেটিক গাড়ি চালিয়ে অভ্যেস। শেষে আবার কোন সমস্যা না হয়। তবে আপনাকে কম্পানি দিতে পারি। জেঠু পেছনে নিশ্চিন্তে রেস্ট নিয়ে নিন একটু।” বলতে বলতেই সে পেছনের সিট থেকে নেমে আমার পাশে এসে বসল।

এ গাড়িটা চালিয়ে ভারী আরাম। ল্যান্ডরোভার ডিফেন্ডার। আর্মার্ড কারের মতন গাড়ি। ভারী। বিশ্বাসযোগ্য। কথা শোনে। দেখবার মতন পিক আপ। সকাল থেকেই বৃষ্টি নেই সেদিন। বিকেলবেলার ঝিমঝিমে রোদ চারদিকে। রাস্তা ফাঁকা ছিল। ফোর্থ গিয়ারে পড়ে আমার হাতে উড়ে যাচ্ছিল যেন গাড়িটা। একটা আশ্চর্য নিস্তব্ধতা ছেয়ে ছিল চারদিকে। হাতের ডাইনে খানিক দূরে সদ্য জল পেয়ে চালু হওয়া বুদনির ঝোরাটার ঝরঝর করে বয়ে যাবার শব্দ আসে শুধু।

পিপ্পল গ্রামের মোড়ে পৌঁছে বেশি খুঁজতে হল না অবশ্য। বাঁয়ের দিকে প্রথম দুটো রাস্তা ছেড়ে তিন নম্বরটা ধরতে হবে এটা মনেই ছিল। তবে হাইওয়ে ছেড়ে সে রাস্তায় গিয়ে ঢুকেই মেজাজটা বিগড়ে গেল। আগে দিব্যি মুরাম ছড়ানো লাল রাস্তা ছিল। বৃষ্টির মধ্যেও কাদাটাদা বিশেষ হত না। কিন্তু এইবার দেখা গেল, গোটা রাস্তা জুড়ে ভাঙা ইটের স্তূপ এদিকওদিক ছড়ানো। রাস্তার ওপরেও বিছোনো রয়েছে খোয়া আর আধলা ইট। সরকারী স্কিমের গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ চলছে বোঝা গেল।

তবে ল্যান্ডরোভার এমন রাস্তাকে বিশেষ পরোয়া করে না। চওড়া চাকা। গিয়ার এক ঘর নামিয়ে বনবন করে তার ওপর দিয়েই চললাম। দেরি করা যাবে না এখন। আকাশে মেঘ ফিরে

আসছিল ফের। খানিক পরেই কাঁচা রাস্তা শুরু হয়ে যাবে। তখন বৃষ্টি নামলে বিপত্তির একশেষ হবে।

ঠোক্কর খেতে খেতে গাড়ি চলেছে। বোসসাহেবের অবশ্য তাতে কোন হুঁশ নেই। ওর মধ্যেই দিব্যি পেছনের সিটে লাফাতেলাফাতে নাক ডেকে চলেছেন। আশপাশের মাঠ, ঘরবাড়ি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল ততক্ষণে। দুপাশ থেকে ক্রমশই আরো কাছে এগিয়ে আসছে জঙ্গল। চাকার নিচে তিরের মতন সোজা পথটা এইবার আস্তে আস্তে অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক সাপের মতন এঁকেবেঁকে উঠছিল। ছুটন্ত গাড়ি তার শরীরে নড়াচড়ার দৃষ্টিভ্রম আনে। ঠিক এই সময় হঠাৎ ঠং করে একটা শব্দ উঠল গাড়ির তলা থেকে। আদৃতা একটু চিন্তিত চোখে আমার দিকে তাকাতে আমি রাস্তা থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললাম, "ও কিছু নয়। আধলা ইটের টুকরো ছিটকে উঠে কাঠামোর গায়ে ধাক্কা খেয়েছে।"

মেয়েটা একটু অস্বস্তিভরা চোখে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। সেখানে তখন কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে সাদাকালো মেঘ। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা। এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে আসছিল চারদিক। নিভন্ত সূর্যের শেষ আলোয় মেঘের গায়ে কমলা রঙের আভাসটুকু চোখে পড়ে শুধু।

****

"ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো আংকল?" হেডলাইটের আলোয় পাশ দিয়ে মাকড়শার জালের মত বের হয়ে যাওয়া ট্রেলগুলোর দিকে দেখতে দেখতে আদৃতা বলে উঠল হঠাৎ। জানালার কাচগুলো সব তোলা রয়েছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে জোর। ওয়াইপারের ক্রমাগত যাতায়াতেও উইন্ডস্ক্রিন স্বচ্ছ থাকছিল না। একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে নিচু গলায় জবাব দিলাম, "আমি এ পথে আগেও এসেছি। রাস্তা ভুল হবে না। তুমি বরং কাচের ভেতর দিকটা একটু মুছে দাও।"

সিটবেল্ট খুলে একটু এগিয়ে বসে গিয়ার বক্সের পাশে রাখা কাচ মোছবার ঝাড়ণটা তুলে নিতে গিয়ে আদৃতা একবার অস্ফুটে উঃ করে উঠল।

বললাম, "কী হল?"

"ছ্যাঁকা খেলাম যেন। গাড়ি খুব গরম হয়ে যাচ্ছে আংকল।"

আমি ইন্ডিকেটারের দিকে তাকালাম। কাঁটাটা লাল এলাকার থেকে অনেক নিচেই তো রয়েছে। তবে? ইঞ্জিন অবশ্য খানিক আগে থেকে হালকা হেঁচকির শব্দ তুলছে। কিন্তু তাতে আমি বিশেষ আমল দিই নি। আর বড়োজোর কিলোমিটার সাতেক পথ বাকি আছে।

গাড়িটা থামিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখে ডায়ালটার গায়ে জোরে জোরে টোকা মারলাম ক'টা। কাঁটাটা আটকে গিয়েছিল বোধ হয় কোনভাবে। টোকা খেয়ে একবার কেঁপে উঠেই সটান ওপরের দিকে উঠে গেল। তারপর লাল এলাকাটার একেবারে শেষ সীমা ছুঁয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

"স্টিয়ারিঙে বোসো আদৃতা। আমি একবার নীচে নেমে দেখি কী হল- " বলতে বলতে সিটের পেছনদিকে ঝোলানো রেনকোটটা টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে আমি ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তীব্র হাওয়ার ধাক্কায় এক মুহূর্তের জন্য বেসামাল করে দিয়েছিল আমাকে। ধারালো ছুঁচের মত বৃষ্টির ধারা এসে বিঁধছে সারা শরীরে। হেডলাইটের আলোদুটো, যেন রাক্ষসের চোখের মত তীব্র দুখানা আলোর কলাম ছুঁড়ে দিচ্ছিল সামনের দিকে।

বনেট খুলে সাবধানে রেডিয়েটরের ঢাকনাটায় একটা পাক দিতেই সেটা ছিটকে এসে শোঁশোঁ শব্দ করে খানিক বাষ্প বের হয়ে এল। জল কমে এসেছে এর মধ্যে। বুঝতে পারছিলাম, রাস্তার ওই ইট বা পাথরের টুকরোটা ঠিকরে এসে লেগেই গন্ডগোলটা করে দিয়ে গেছে। কোন একটা সুক্ষ চিড় ধরেছে রেডিয়েটারে। সেখান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে।

দ্রুত চিন্তা করছিলাম আমি। পথ বাকি নেই বেশি। সঙ্গে জেরিক্যানে লিটার কয়েক মিনারেল ওয়াটার রয়েছে। সেইটা এতে ঢেলে কোনমতে বাকি রাস্তাটুকু পাড়ি দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। কাঠেরিয়ার বনবাংলোতে ছোটোখাটো মেরামতি করার মত জিনিসপত্রের অভাব হবে না।

মুখ তুলে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দের ওপরে গলা তুলে হাঁক দিয়ে বললাম, "আদৃতা, টর্চ আর জলের জেরিক্যানটা নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি।"

কথাটা তার কতদূর কানে গেল বোঝা গেল না। তবে আমার হাতের ভঙ্গী দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিল বোধ হয়। একটু বাদেই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে দরজা খুলে নেমে এল আদৃতা। রঙিন রেনকোটে ঢাকা মানুষটাকে একেবারে বাচ্চা একটা মেয়ের মতই লাগে।

বনেটের ভেতর উপুড় হয়ে ভারী জেরিক্যানটা ধরে রেডিয়েটারের মধ্যে সাবধানে জল ঢালছিলাম আমি। পেছন থেকে টর্চ ধরে রেখেছে আদৃতা। জল ঢালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ ঠং করে টর্চটা তার হাত থেকে এসে গড়িয়ে পড়ল বনেটের ভেতরদিকটাতে। চমকে উঠে পেছন ঘুরে দেখি, মেয়েটা আমার পাশে আর দাঁড়িয়ে নেই। জোড়া হেডলাইটের আলোয় ভূতগ্রস্তের মত আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের রাস্তাটা ধরে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার হাতটা ধরে বললাম, "কী করছ কী?"

হঠাৎ আমার হাতটা ছাড়াবার জন্য ছটফটিয়ে উঠল মেয়েটা। তারপর প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, "ছেড়ে দিন আমায় আপনি। আমাকে যেতে হবে-- ওই তো সামনে—দেখুন—কী বিশাল! আমি—"

আমাদের সামনে হেডলাইটের আলোয় গাছপালা আর ঘন আন্ডারগ্রোথের ওপর অবিরাম বৃষ্টির ধারা নেমে আসছিল। তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া নির্জন পথটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা একবার কেঁপে উঠল আমার। দশ বছর আগে একবার আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম। ওর বাবার মুখে। এইরকমই এক বর্ষার রাতে। এ জায়গাটার কাছাকাছি কোন জায়গাতেই।

হঠাৎ আমাদের পেছন থেকে বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে বোসসাহেবের গলাটা ভেসে উঠল, "মেয়েটাকে নিয়ে নিচু হও ভুবন—মাটিতে শুয়ে পড়। আয়াম গোইং টু- "

পেছন ফিরে দেখি গাড়ির ছাদের মধ্যেকার ঢাকনা খুলে গিয়ে সেখান দিয়ে বোসসাহেবের অন্ধকার মূর্তিটা মাথা তুলেছে। তাঁর হাতের ভারী অস্ত্রের বাড়িয়ে ধরা নলটার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে দেখেই দু হাতে আদৃতাকে টেনে নিয়ে সটান সেই বৃষ্টিভেজা পথের ওপর গড়িয়ে গেলাম আমি, আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের পেছন থেকে গম্ভীর গর্জন করে উঠল পয়েন্ট সেভেন বোরের মনস্টার লিকার। মাথার ওপর দিয়ে শীষ দিয়ে ছুটে গেল আগুনের রেখা। আর গুলির শব্দকে ছাপিয়ে, আমাদের মেরুদণ্ডের ভেতর কাঁপুনি ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গল জেগে উঠল গম্ভীর একটা গর্জনের শব্দে। বিরাট লাফ দিয়ে অতিকায় একটা শরীর যেন ছিটকে গেল পথের পাশের গভীর জঙ্গলে। তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে একরাশ পায়ের শব্দ বৃষ্টির শব্দের ভেতর মিলিয়ে গেল।

"হিট অর মিস?"

গাড়িতে উঠে আসতে, তোয়ালে দিয়ে নিজের মাথাটা মুছতে মুছতে বোসসাহেব আদৃতার

দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

ইঞ্জিনের তাপ এক ঝটকায় বেশ খানিকটা কমে গিয়েছে। গাড়িতে ফের স্টার্ট দিলাম আমি। ভেজা মাটির ওপরে সরসর করে একপাক ঘুরে উঠল চাকাগুলো, তারপর একটা বাঘের মতই লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল বিশ্বস্ত ল্যান্ডরোভার।

আদৃতার ঘোর তখনও কাটে নি। শূন্য দৃষ্টিতে বোসসাহেবের দিকে ঘুরে বলল, "আ-আপনি দেখেন নি?"

"না। আমি দেখিনি। গুলিটা একেবারে আন্দাজে, তোমার গতিপথটা দেখে চালিয়েছিলাম। এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে ভুবনও ওটাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু তুমি দেখেছ, তাই না? চোট হয়েছে?"

আদৃতা এবারে যখন কথা বলল, তার গলা অনেক স্বাভাবিক, "হ্যাঁ জেঠু। দেখেছি। সেই মুহূর্তের ফিলিংটাও মনে করতে পারছি। একটা ম্যাগনেটিক আকর্ষণ ছিল জন্তুটার দু চোখে।

আমাকে টানছিল। ইন্টেলিজেন্ট দৃষ্টি। কিছু কমিউনিকেট করতে চাইছিল। কিন্তু কেবল আমি দেখতে পেলাম এটা আমার ঠিক বিশ্বাস- ”

বোসসাহেব অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, “এখন ওসব কথা ভাববার সময় নয়। আগে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাঠেরিয়া পৌঁছোনো এখন আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। এখন বল, চোটটা লেগেছে?”

“না। তবে একেবারে মাথার কাছ দিয়ে গ্রেজ করে গেছে সেইটা দেখেছি। তারপর জন্তুটা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি।”

“সেটা ওর সৌভাগ্য। দ্বিতীয় শটটা ভুল করত না আর। যেটুকু আওয়াজ ও করেছিল তাতে আর একমুহূর্ত ওখানে দাঁড়ালে আজকে ওকে জ্যান্ত ফিরে যেতে হত না,” বলতেবলতেই বোসসাহেব তাঁর শক্তিশালী অস্ত্রটার গায়ে আদুরে হাত বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন, “সিটের ওপর দিয়ে বেয়ে পেছনে চলে আয় তো মা। আমার পাশে এসে বোস। ভুবন একাই বাকি রাস্তাটা চালিয়ে যাক। তোকে আর সামনের কাচের মুখে বসতে হবে না—”

****

অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর একটা অন্ধকারের দলার মত দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটা। হেডলাইটের

উজ্জ্বল আলো তার গায়ে এসে পড়তে অন্ধকার যেন ভারী অনিচ্ছায় খানিকটা দখল ছেড়ে দিল তার ওপর থেকে। আলোর বৃত্তের ঠিক বাইরে একটা আদিম জন্তুর মতই অপেক্ষা করছিল তা। আমি অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখছিলাম। দশ বছর আগে যখন এসেছি এখানে, এ বাড়ির এমন দুর্দশা ছিল না তখন। তার চারপাশে ঝোপজঙ্গল ভিড় করে এসেছে। উঁচু ভিতের গায়ে বর্ষার জল পেয়ে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে বনজ লতাগুল্মের দল।

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে ততক্ষণে। টিপটিপ করে ঝরে চলেছে যদিও। আদৃতা নেমে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগটা পিঠে বাঁধতে বাঁধতে বলল, "এখানে কেউ থাকে?" বোসসাহেবও দেখলাম একটু অবাকই হয়েছেন। এ রাজ্যের জঙ্গলের সবচেয়ে বড়োকর্তা ছিলেন কিছুদিন আগেও। নিজের রাজ্যপাটে ঘুরতে এসে এহেন অভ্যর্থনা তিনি ঠিক আশা করেন নি। বিড়বিড় করে বললেন, "এখানে তো সূরযভান ক্যাজুয়ালের থাকার কথা! খুব দায়িত্ববান মানুষ। এর আগে যখন এসেছি তখন সাধ্যে যতটা কুলোয় তার চেয়ে বেশিই করেছে। খবর তো ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল—" বলতেবলতেই অধৈর্য হাতে গাড়ির হর্নটা চেপে ধরলেন তিনি।

প্রায় আধমিনিট ধরে হর্ন বাজিয়েও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে যখন ভাবছি বাকি রাতটা গাড়ির ভেতরেই কাটিয়ে ফেলব, ঠিক তখন বাড়ির কোন একটা ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, "আয়া সরজি- "

খানিক বাদে যে মানুষটা বের হয়ে এল তাকে দেখলে দশ বছর আগের সেই সূরযভান বলে চেনা যায় না। হঠাৎ করেই ভীষণ বুড়িয়ে গেছে লোকটা। পরনের পোশাক ময়লা। অযত্নে বেড়ে ওঠা চুলদাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে।

"কী ব্যাপার সূরযভান? বাংলোর এমন হাল করে- "

কথাটা আর শেষ করা হল না বোসসাহেবের। হঠাৎ এগিয়ে এসে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল লোকটা। কাঁদে আর জড়িয়েমড়িয়ে বলে, "মেরা লীলাবিটিয়াকো লে গয়া সা'ব। উসকি জগহ মুঝে কিঁউ নহি লিয়া উস রাকষস্ নে? উসকি শাদি যো তয় হুঈ থী- - "

বোঝা গেল শোকেদুঃখে এমনকি নরসেরজির ভয়টাও চলে গেছে তার মনের ভেতর থেকে। রাগের মাথায় দেবতাকে রাক্ষস ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। থরথর করে কাঁপছিল লোকটা। শরীর বেশ গরম। টলছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার চেহারায় দীর্ঘ অর্ধাহার, ক্লান্তি আর বুক ভাঙা দুঃখের ছাপ। এগিয়ে গিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম আমি তাকে। একেবারে হালকা হয়ে গেছে মানুষটা এই অকাল বার্ধক্যের আক্রমণে।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ দেখি তার চোখ গিয়েছে আদৃতার দিকে। সঙ্গেসঙ্গেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল সে। আঙুল দিয়ে দেখায় আর চিৎকার করে, "কিঁউ লে কে আয়া ইস বিটিয়াকো? ইসকো বলি চঢ়ানা হৈ ক্যা সাহাব? ভাগ যা বেটি – ভাগ—ভাগ যা তু ইঁহাসে—"

তার গায়ের কাঁপুনিটা বেড়ে উঠছিল। খিঁচুনি শুরু হয়ে গিয়েছে হাত পায়ে। আমি এগিয়ে গিয়ে ফের চেপে ধরলাম তাকে।

আদৃতা তার দিকে একঝলক তাকিয়েই তার ব্যাগটা খুলে একমনে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। খানিক বাদে সেখান থেকে একটা বাক্স খুলে ছোটো একটা সিরিঞ্জ বের করে আনল সে। তারপর একটা কাচের অ্যাম্পুল কামড়ে ভেঙে তার ওষুধটা সিরিঞ্জের মধ্যে টেনে নিয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে এসে সূরযভানের হাতের পেশিতে ওষুধটা ঢুকিয়ে দিতেদিতেই চাপা গলায় বলল, "নক আউট পাঞ্চ। সাবধানে ধরে রাখুন।"

গাড়ি থেকে একটা কম্বল বের করে এনে সূরযভানের এলিয়ে পড়া শরীরটা তাতে মুড়ে নিয়ে ঘরের ভেতর উঠে এলাম। এমার্জেন্সি ব্যাটারির আলোয় দেখা যাচ্ছিল অযত্নের ছাপ তার

চারপাশে। তারই মধ্যে একটা জায়গা খানিক পরিষ্কার করে তাকে শুইয়ে দিতেদিতেই বোসসাহেব স্লিপিং ব্যাগগুলো ভেতরে নিয়ে এসেছেন। তার দুখানা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "শুয়ে পড়ো। আমি জেগে থাকব।"

বাইরে বৃষ্টি ফের জোর হয়ে উঠছিল। অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ার শোঁশোঁ আওয়াজ আর বনবাড়ির চালে বৃষ্টির ক্রমাগত শব্দ। মেয়েটা আমার পাশে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গুটিশুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের আলোয় তার মুখটা চোখে পড়তেই সূরযভানের প্রলাপ মনে পড়ে যাচ্ছিল। একে এখানে নিয়ে এসে কোনো ভুল করলাম না তো? বাইরে ওই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে রবি হয়ত এখন কোথাও—

আর ভাবতে পারছিলাম না আমি। বুকের ভেতর একটা গভীর অস্বস্তি পাক দিয়ে উঠছিল। বারবার শুধু দশ বছর আগের সেই রাতটার ছবি ভেসে আসছিল চোখের সামনে। রবি—

******

"মেয়েকে নরসেরজিই নিয়েছেন সেটা বুঝলে কেমন করে সূরযভান?"

সূরযভান দু হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে মেঝের ওপর থেবড়ে বসেছিল। বেলা প্রায় দশটা বাজে। সকাল থেকে বৃষ্টিটিষ্টির বালাই নেই আর। রোদ উঠেছে। বাইরে ঝলমলে আলোয় বৃষ্টিধোয়া জঙ্গল ঝিলিক দিচ্ছিল। অবশ্য বেলা বাড়লে সে কোন রূপ ধরবে সেটার আন্দাজ পাওয়া মুশকিল। ইনটারনেট-এ ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখবার উপায়ও নেই। কোনো ফোন কোম্পানির টাওয়ারই ধরে না এখানে।

লম্বা একটা ঘুম দিয়ে উঠে সূরযভান এখন অনেকটাই তাজা। টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে গ্রাম থেকে হরিদাস নামে এক ছোকরাকে ডেকে এনেছে। সে এখন বাংলো ঝাড়পোঁছ করবার কাজে ব্যস্ত। তাদের দু'জনকে জেরা করে যতটুকু জানা গেছে, তাতে মাসকয়েক আগে ঘটনাটা ঘটেছে। লীলা সূরযভানের নিজের মেয়ে নয়। বউ মরেছে তার অনেককাল আগে। নিজের ছেলেপিলে নেই। একাই থাকত, তারপর বয়স বাড়ছে দেখে কাকা মোহনদাসের এই বড়ো নাতনীটিকে দত্তক নিয়েছিল চেয়েচিন্তে।

ভালোই চলছিল সবকিছু। কিন্তু বিপদ এল গত হোলির আগের দিন রাত্রে। বাংলোর উঠোনে হোলিকাদহন হবার পর আনন্দফূর্তি সেরে সবাই যখন ঘরে ফেরার পথ ধরবে তখন দেখা যায় লীলা নিখোঁজ। অতএব সন্দেহটা গিয়ে পড়েছে নরসেরজির প্যান্থারবাহিনীর ওপরেই। সূরযভান তার পর থেকেই একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে। দু একবার একাই সওশির পাহাড়ে গিয়ে চড়াও হবার মতলব করেছিল। গ্রামের লোকজন ধরেবেঁধে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। সে অবশ্য যতটা না সূরযভানের ভালোর জন্যে তার চেয়েও বেশি নরসেরজির রাগের ভয়ে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর তো সবাই করে।

সেই থেকে সূরযভান একাএকাই এই বনবাড়িতে পড়ে থাকে। তিনকুলে তার জন্য কাঁদবার কেউ নেই। গ্রামের লোকজন দু একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সবাই ধরেই নিয়েছে কোনদিন সকালে এসে দেখবে বেচারা এইখানেই দেহ রেখেছে। তখন শাস্ত্রমতে তার কাজকাম করালেই হবে। চাষের মরসুমে কে আর অন্যের খেয়াল করে।

"কী হল, বলো?"

"তাছাড়া আর কে নেবে সা'ব? এখানে এই জঙ্গলে কে আসবে আমার মেয়েটাকে এভাবে নিয়ে যেতে? বড়ো ন্যাওটা ছিল আমার সাহেব। ওর ঠাকুর্দা চিরটাকাল নরসেরজির পুজো করে এল, আর তার মেয়েকেই শেষে কৃপা করে বসলেন নরসেরজি-- "

"কোনো জন্তুজানোয়ারের আক্রমণও তো হতে পারে?"

"না সাহেব। গোটা এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। মেয়ে দূরস্থান, তার পরনের কাপড়ের একটা টুকরোও চোখে পড়েনি কারো। তাছাড়া-- "

"তাছাড়া –কী?"

"অন্য লক্ষণও ছিল সরজি। আগে বুঝিনি। হারিয়ে যাবার একমাস আগের ঘটনা। সন্ধেবেলা বিজনিয়ার হাট থেকে বাপবেটিতে সওদা করে ফিরছিলাম। তা মেয়ে আমার হঠাৎ বলে, 'বাবা বাঘ।' আমি সঙ্গেসঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়ে চারপাশের জঙ্গল ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। নাক টেনে শ্বাস নিলাম। কোথাও কিছু নেই।

মেয়ের আমার কিন্তু বারবার ওই এক কথা, 'বাঘ- ওই যে ঝোপের আড়ালে- আমাদের পিছু পিছু আসছে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন বাঘ?' তা বলে, 'কালো চিতাবাঘ।' আমি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। জানতাম, নরসেরজি যাকে বলি নেবেন কেবল তাকেই বলি নেবার আগে দেখা দেন। অন্যে দেখতে পায় না। দেখাশোনা হয়ে বলি পছন্দ হলে তারপর তাকে ডেকে নেন নিজের ডেরায়—কিন্তু সরজি, তখন আমার যে কী হয়েছিল, আমি হেসে হেসে তাকে বললাম, 'লীলাবিটিয়া ও তোর চোখের ভুল। অন্ধকারে কী না কী ঝোপঝাড় দেখে কালো বাঘ ভাবছিস।' বাড়ি এসে এই বারান্দায় বসে কত হাসাহাসি হল সেই নিয়ে।"

বলতেবলতেই গলা ভারী হয়ে এল তার। কাঁদে আর বলে, "কেন আমি তখনই তাকে জঙ্গল ছাড়িয়ে ইটারসিতে তার পিসির বাড়িতে দিয়ে আসিনি? আমি আমার নিজের হাতে আমার বিটিয়াকে বলি হবার জন্য রাক্ষসের মুখে এগিয়ে দিলাম সরজি—আমি পাপী—পাপী—" এই বলে, আর দুহাতে দমাদম নিজের বুক চাপড়ায় সূরযভান।

হঠাৎ পেছন থেকে আদৃতার গলায় অস্ফুট একটা শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে মুখটা তার। আমাকে তাকাতে দেখে প্রায় জোর করেই মুখের ভাবটাকে বদলে ফেলল সে। তারপর দৃঢ় গলায় বলল, "না আংকেল। যা ভাবছেন তা মুখ ফুটে বলবেন না। আপনাদের অমান্য করতে ভালো লাগবে না আমার। বিপদ আসতে পারে না জেনে আমি এ পথে পা দিই নি।"

বললাম, "কিন্তু- "

"কোন কিন্তু নয় ভুবন। এটা মানুষের দুনিয়া। এখানে এসে একটা অজানা কোনকিছু রাজত্ব চালিয়ে যাবে, যখন খুশি মা বাপের কোল থেকে ছেলেমেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তা হতে দেয়া যায় না," হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বোসসাহেব বলে উঠলেন। চোখদুটো চকচক করছিল তাঁর, "এ যদি নরসের হয়, তাহলে আমিও পল্লব বোস। আমার এলাকায় বসে থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে যাবে আর আমি লেজ গুটিয়ে পালাব?"

আদৃতা আমার হাতটা ছুঁয়ে বলল, "হ্যাঁ আংকল। আমারও খুব ভয় লাগছে আমি স্বীকার করছি। কিন্তু পালিয়ে আমি যাব না। কাল রাতে আমি ওকে দেখতে পেয়েছি। আপনারা পান নি। জেনেটিক ম্যাচিং- এর কোন একটা জাদু আছে এর মধ্যে। আর কোন ব্যাখ্যা হয় না এর। সম্ভবত

জীবটাও এই পরীক্ষাটা করেই প্রথমে তার সম্ভাব্য শিকার বেছে নেয় অনেক লোকজনের মধ্যে থেকে। আমি তাতে কাল রাতে পাশ করেছি। এবারে ও দলবল নিয়ে যেভাবে হোক আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেই। আপনি বলেছিলেন না, চলে যাবার আগে বাবা আপনার দিকে ঘুরে দেখেছিল একবার? এখনো যদি সেটুকু চেতনাও থেকে থাকে তাঁর মধ্যে, তাহলে একটা চেষ্টা করব আমি। আমার সঙ্গে আপনি আছেন, জেঠু আছেন। আ- আমি পারবই—আমি-- ”

বোসসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আদৃতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি জানি তুমি পারবে মা। আর এত সাহসে বুক বেঁধে এত বিপদ মাথায় নিতে যখন রাজি হয়েছিস, দেখবি ভাগ্যও তোর সহায় হবে। হবেই। তাছাড়া, আমরা দুজন তো রইলাম সঙ্গে। পল্লব বোস শুধু দুতিনটে বন্দুকের ভরসায় এ খেলা খেলতে নামে নি এইটে জেনে রাখিস। আরো কিছু চমক আমার কাছে জমানো আছে।”

সূরযভান বাংলাটা একটু আধটু বোঝে। গোটা কথাবার্তাটাই মন দিয়ে শুনেছে বসে বসে। তার খানিক খানিক যে বুঝেছেও সেইটে বোঝা গেল তার এর পরের কাজটায়। সটান উঠে এসে আদৃতার পায়ের কাছে মাথা ঠোকে আর বলে, “আপ দেবী হৈ মাঈয়া। হমরা বিটিয়াকো ভি লওটা দো। উসকে লিয়ে মেরা জান কসম।”

তার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম নীরবে। বুলেট তো মাত্র একটাই রয়েছে আদৃতার কাছে। একটাই সুযোগ মিলবে আমাদের। তার পর—কিন্তু সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে’খন।

****

“সকাল থেকেই একটা কথা ভাবছিলাম জেঠু,” আদৃতা হঠাৎ বোসসাহেবের দিকে ঘুরে বসল। দুপুর পেরিয়ে বিকেল নামছে জঙ্গলে। সারাদিন পরিষ্কার থাকবার পর ফের আকাশে মেঘ জমছে আস্তে আস্তে। সামনে খানিক দূরে দুটো গাছের এমাথা ওমাথায় একটা অতিকায় ফ্লাইং স্কুইরেল ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। বনবাড়ির বেড়ার ওধার দিয়ে একদল সম্বর খাওয়াদাওয়া সেরে রাতের বিশ্রামের জায়গার দিকে চলেছে।

“বলছিলাম, শিকারের ময়দানটা নরসেরকে বেছে নেবার সুযোগটা না দিলে কেমন হয়?”

বোসসাহেব একটা নতুন চুরুট বের করে নিয়ে তার মাথাটা কাটছিলেন। সেটা করতেকরতেই বললেন, “কী বলতে চাইছ?”

“বলছিলাম, নরসের এ জঙ্গলকে আমাদের চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে জানে। ফলে আক্রমণ যখন করবে তখন সে নিঃসন্দেহে এমন একটা সময় আর জায়গা বেছে নেবে যেখানে তার সুবিধেটা সবচেয়ে বেশি হয়।

“সময়টা যে রাত্রি হবে সেটার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,” আমি বললাম, “যতগুলো ঘটনা শুনেছি বা দেখলাম, তাতে এরা আক্রমণ করে রাত্রে।”

“ঠিক। তার মানে মুখোমুখি হবার জন্য দিনের বেলাটা এদের কাছে সুবিধের নয় বলে ধরে নেয়া যায়। আমরা যদি দিনের বেলা ওর গুহায় গিয়ে- ”

“দিনের বেলা? বোসসাহেবরা যখন ওখানে দিনের বেলা সার্ভে করতে গিয়েছিলেন, তখন এদের কোনো চিহ্ন পাননি কিন্তু সওশিরের পাহাড়ে। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে ঘাঁটি গেড়ে থাকে

এরা সেটাও কারো জানা নেই। সে খবর আগে জোগাড় না করে দিনদুপুরে নরসেরের গুহায় গিয়ে কোন লাভ হবে না আদৃতা।"

বোসসাহেবের চুরুটের মাথা কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেইটে ধরিয়ে একরাশ নীল নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস, হবে। অন্তত তার একটা ভালো সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। হিসেবে ভুল না হলে আমাদের ওখানেই তার দেখা পেয়ে যাওয়া উচিত।"

"এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে আপনি?"

"নিশ্চিত হচ্ছি এ জঙ্গলটাকে আমি হাতের তালুর মত চিনি বলে। এ আমার গত ত্রিশ বছরের কর্মক্ষেত্র ভুবন। ব্ল্যাক প্যান্থার একটা দুষ্প্রাপ্য জীব। অতগুলো সেই জন্তু যদি এ জঙ্গলের কোনোখানে লুকিয়ে থাকত তাহলে বনবিভাগের কোন না কোন সার্ভেতে তাদের দেখা যেতই। নরসের নিজে অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু তার চ্যালাচামুন্ডারা তা নয়। এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। এরা ওই পাহাড়ের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ঘাঁটি গেড়ে আছে। সাধারণভাবে সেটা কারো চোখে পড়ে না। সেইটেকে খুঁজে বের করতে হবে শুধু প্রথমে। গুহার ভেতরের ছাদে নরসেরের যে অতিকায় ছবিটা আছে বললে, ওর তলায় শুয়ে থাকতে গিয়েই তো রবিকে প্রথম ধরেছিল। নিতান্ত তোমার বন্দুকের জোরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলে তোমরা। ওইখানে গিয়ে এবার আদৃতা আমাদের টোপ হবে। আসতে ওকে হবেই ভুবন। লোভ বড়ো মারাত্মক বস্তু হে!"

আমার চোখে হঠাৎ ভেসে উঠল, নরসেরজির গুহা থেকে রবিকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সেই রাতটার কথা—এতক্ষণ এ দৃশ্যটা মনে পড়েনি কেন? পাহাড়ের সারা গায়ে অজস্র ছোটোবড়ো গুহামুখে জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখেদের সার—

নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম, "আছে। ওই সওশির পাহাড়ের মধ্যেই এ রহস্যের চাবিকাঠি আছে—"

বোসসাহেব মাথা নিচু করে বাঁহাতটা মুঠো করে তার ওপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টোকা মারছিলেন। মুদ্রাদোষ। খানিক বাদে মাথা ঘুরিয়ে ডাক দিলেন, "সূরযভান—"

"আয়া সারজি—" রান্নাঘরের দিক থেকে তার গলার শব্দ পাওয়া গেল।

"আসতে হবে না। হরিদাসকে বলো, গাড়ির চাবি নিয়ে গিয়ে ডিকিতে একটা ট্রাংক রাখা আছে সেইটে নিয়ে আসতে এখানে।"

বের হবার সময়েই ট্রাংকটা গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন বোসসাহেব। তাতে কী আছে জিজ্ঞাসা করতে রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, "এমার্জেন্সি র‍্যাশন। কখন কী কাজে লেগে যায়?"

খানিক বাদে ট্রাংকটা দুহাতে বুকের কাছে ধরে হরিদাস এসে হাজির। বস্তুটা যে বেজায় ভারী সেটা তার হাঁটবার চালেই পরিষ্কার বোঝা যায়। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ফের। ট্রাংকটা মেঝেতে এনে নামাতে তার গায়ের জলের ফোঁটাগুলো মুছে নিয়ে সেটাকে খুলে ফেললেন বোসসাহেব। ভেতর থেকে প্লাস্টিকে জড়ানো মেশিনগানের মতো একটা বস্তু বের করে এনে দেখিয়ে বলেন, "টিয়ার গ্যাস লঞ্চার। লেটেস্ট মডেল একেবারে। আটটা কার্ট্রিজ লাগানো যায় ম্যাগাজিনে। ষোলোখানা কার্ট্রিজ নিয়ে এসেছি।"

আমি অবাক হয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, "এ জিনিস পেলেন কোথায়?"

“পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাপ্লাই। ভুঁইয়া সাহেবকে চেনো তো?”

“হ্যাঁ। অ্যান্টি রায়টের ডিআইজি তো? এরেরা কলোনিতেই তো থাকে।”

“প্রমোটি বুড়ো। আমার সঙ্গে বেজায় ভাব। টেনিস ক্লাবে যাই একসাথে রোজ। তায় আবার বাঙালি। সেই সুবিধেটা কাজে লাগিয়ে ফেললাম। খুশি হয়েই জোগাড় করে দিয়েছে। বলে, ‘যা শান্ত শহর, এসব যন্তোর পড়ে থেকে জং ধরে যাবে। আপনি দু একটা শট মেরেটেরে আনুন। মেশিন চালু থাক।’”

বলতেবলতে আরো কটা পুঁটুলি বের হয়েছে বাক্সের ভেতর থেকে। তার মধ্যে বেশ কটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে বড়ো সাইজের হোমিওপ্যাথির গুলির মতো একরাশ করে বস্তু ভরা। সেইসঙ্গে একটা ছোটো সাইজের গাড়ির ব্যাটারি, তার, আরো কীসব টুকিটাকি জিনিস। বস্তুগুলোকে আমি চিনি। আনফো এক্সপ্লোসিভ।

“হিঞ্জম্যান সিমেন্ট কোম্পানির ক্যাপটিভ মাইনিং প্ল্যান্ট আছে একটা সিহোরের দিকে। ওর এমডিকে বলেকয়ে জোগাড় করে আনলাম খানিকটা।’”

“ও দিয়ে কী করবেন?”

“দরকার আছে ভুবন। খোলা জঙ্গলে রাত কাটাবার প্রয়োজন হলে জায়গাটাকে ওই দিয়ে বুবি ট্র্যাপ করে নেব বলেই নিয়ে এসেছিলাম। সিমেন্ট কোম্পানির এক্সপ্লোসিভ লৌকিক অলৌকিক ভূত ভগবান বোঝে না। ওর গণ্ডির মধ্যে থাবা রাখলে আস্ত ফিরতে পারবে না তোমাদের নরসেরজি বা তার দলবল। কিন্তু এর খানিকটা আজ এখানেই কাজে লাগাবার দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে।”

“এখানে বাংলোর মধ্যে- ”

“ফাঁদ পাতব ভুবন। বাংলোর মধ্যে নয়। উঠোনে। একবার আদৃতা ওর হাতছাড়া হয়েছে যখন, তখন আজ রাত্রেও ওর একটা চেষ্টা করবার সম্ভাবনা আছে এইখানে।”

বাইরে সন্ধের অনেক আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে উঠেছে আবার। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা হাওয়া বয়ে আসছিল। তাতে বনের গন্ধ মাখানো। সেইদিকে একবার দেখে নিয়ে একটা রেনকোট টেনে নিয়ে অন্যটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বোসসাহেব বললেন, “পারলে একটু রেস্ট নিয়ে নাও এখন আদৃতা। রাত জাগতে হবে আজ। আমরা বাইরের কাজটা সেরে ফিরে আসছি।”

উঠোনের ওপারে বাংলোর চারপাশের তারকাঁটার বেড়াটা মোটামুটি অক্ষতই রয়েছে এখনো। তার মাঝখানে চওড়া একটা খালি জায়গা। ওখানে এককালে একটা গেট লাগানো ছিল। এখন আর নেই। সেখান থেকে মুরামের পায়েচলা পথ যেখানটায় এসে বাংলোর বারান্দার নিচে ঠেকেছে সেখানটায় একটা হাতখানেক লম্বা গর্ত খুঁড়ে ফেললাম বোসসাহেবের নির্দেশে। আনফো এক্সপ্লোসিভের দানাভরা দুটো প্যাকেটের সঙ্গে একটা ডিটোনেটোর একসঙ্গে প্লাস্টিকে প্যাক করে নেয়া হয়েছিল আগেই। জিনিসটাকে গর্তের মধ্যে রেখে সেটাকে ভালো করে বুজিয়ে দিয়ে ডিটোনেটারের তারের মাথাটা হাতে ধরে বারান্দায় উঠে এলাম যখন, ততক্ষণে রেনকোট থাকা সত্ত্বেও দুজনেই পুরো ভিজে গিয়েছি প্রায়।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে অবশ্য মনটা ভালো হয়ে গেল। আদৃতা বিশ্রাম নেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নয় দেখলাম। এর মধ্যেই কখন রান্নাঘরে গিয়ে সূরযভানকে দিয়ে বড়ো বড়ো

তিনকাপ চা আর একরাশ সেঁকা পাঁপড় তৈরি করিয়ে রেখেছে। বোসসাহেবের অবশ্য সেদিকে মন ছিল না। তারের অন্য মাথা ব্যাটারিতে আটকে সুইচটুইচ লাগিয়ে যতক্ষণে চায়ের কাপ হাতে নিলেন ততক্ষণে পাঁপড়ভাজা অর্ধেক শেষ। তাতে লম্বা একটা আরামের চুমুক দিয়ে বলেন, "আসুক এবারে দেখি। গেঁইয়ো ভূতদের মধ্যে সর্দারি করে ওস্তাদ হয়েছে। পল্লব বোস থাকতে এই রাজ্যের জঙ্গলে ওসব নরসের টেরের দাপট বের করছি।"

****

"ভুবন—"

কখন যেন চোখদুটো জড়িয়ে এসেছিল একটু। কানের কাছে বোসসাহেবের মৃদু ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। মৃদু একটা আলো ছেয়ে ছিল চারপাশে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়ে চাঁদ উঠেছে। মাঝরাতের আধখাওয়া চাঁদ। তারই আলো চুঁইয়ে আসছিল ঘরের ভেতর। উঠে বসতে বোসসাহেব ইশারায় আদৃতার দিকে দেখালেন। আমার পাশে বসে থাকা তার শরীরটা মৃদু দুলছিল। চোখদুটো খোলা। বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে এসে পড়েছিল তার মুখের ওপর।

"আদৃতা মা- "

কানের কাছে বোসসাহেবের ডাকটা কানে যেতে হঠাৎ একটু শিউরে উঠে তাঁর দিকে চোখ ঘোরালো সে। তারপর ফিসফিস করে বলল, "সদর দরজার কাছে। এইদিকে তাকিয়ে আছে। আমায় ডাকছে—আমায়—"

"তোমার বাবার কথা মনে আছে আদৃতা? অতবড়ো বৈজ্ঞানিক, এখন একটা মূক জন্তু হয়ে-- এই পশুটাই কিন্তু তাঁর জীবনটাকে–"

বোসসাহেবের নিচুতারে বাঁধা গলায় ইস্পাতের মত কাঠিন্য ছিল। এইবারে কাজ হল যেন। হঠাৎ চমকে উঠল আদৃতা। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল তার। মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "থ্যাংক ইউ জেঠু। একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। এবারে আমি ঠিক থাকব।"

"যেমন যেমন করতে বলেছি সেগুলো মনে রাখবে। আমার সিগন্যাল পেলে সঙ্গেসঙ্গে—"

"মনে আছে জেঠু। আ- আমি চেষ্টা করব- "

আমার চোখ তখন আর সেদিকে নেই অবশ্য। চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয়, বৃষ্টি ভেজা উঠোনের নরম মাটির বুকে একটা আশ্চর্য জাদু দেখছিলাম আমি। সেখানে তখন নিজেনিজেই ফুটে উঠছে চারটে থাবার চলমান ছাপ। আস্তে আস্তে সেগুলো এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকে।

আদৃতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আমাদের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে মুখে হাসল একবার। তারপর, যেন কোন অদৃশ্য শেকলের টানে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে গিয়ে বারান্দার ওপরে উবু হয়ে বসল।

একটা আশ্চর্য নাটক ঘটে চলেছিল আমাদের চোখের সামনে। বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে আদৃতা। তার গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হয়ে আসছিল। আর, সামনের উঠোনের ওপর অদৃশ্য কোন মহাজীবের পদচারণায় কেবলই ফুটে উঠছিল সারসার থাবার চিহ্ন। আদৃতার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। অনুমান করতে পারছিলাম, একটা মরণপণ যুদ্ধ চলেছে দুটো মনের

মধ্যে। একদিকে একটা প্রাচীন, হিংস্র, অভিজ্ঞ মন আর অন্যদিকে তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর কিন্তু অনভিজ্ঞ একটা চেতনার মধ্যে নিঃশব্দ লড়াই চলছে।

বোসসাহেব হাতে সুইচটা নিয়ে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর সমস্ত মনোযোগ তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে চলমান ছাপগুলোর দিকে। আস্তে আস্তে তা তখন এগিয়ে আসছিল মুরামের পথের ওপর মার্কা দেয়া বিস্ফোরণবিন্দুটার ওপরে। ভূতে ভগবানে কোনকালেই বিশ্বাস নেই আমার। কিন্তু সেই মুহূর্তে শুধু একটাই প্রার্থনা ঘিরে রেখেছিল আমার মনকে—শেষ নির্দেশটা যখন আসবে আদৃতার সে সময় যেন সেইটা পালন করবার মত আত্মনিয়ন্ত্রণটুকু বেঁচে থাকে—

"আদৃতা—জাম্প—"

বন্দুকের বুলেটের মতই তীক্ষ্ণ শব্দ করে বোসসাহেবের আদেশটা রাতের নিস্তব্ধতাকে হঠাৎ ফালাফালা করে দিয়ে গেল। আর সঙ্গেসঙ্গেই গোটাকয়েক ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একটা লম্বা ব্যাকভল্টে আদৃতা ছিটকে এসে আছড়ে পড়ল আমাদের দুজনের মাঝখানে। বোসসাহেবের হাত থেকে সুইচটা ছিটকে গেল, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর কাজ শেষ। সুইচের একটা চাপে গম্ভীর গর্জন করে উঠোনের ওপর মাটি ভেদ করে জেগে উঠেছে বিস্ফোরণের আগুন, একটা অদৃশ্য ভারী শরীর গিয়ে আছড়ে পড়েছে কিছুটা দূরে। বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল একটা অপার্থিব, গম্ভীর হুংকারের শব্দ।

"আই ক্যান সি ইট—মাই গড- ইটস বিগ- " বোসসাহেবের গলা শুনে তাড়াতাড়ি তাঁর বন্দুকের নলটা অনুসরণ করে দেখলাম, মাটির ওপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটা অতিকায় প্যান্থারের অবয়ব। চোট পেয়েছে বটে কিন্তু তাতে কাবু হয় নি সে। ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসতে থাকা অবয়বটা। বোসসাহেব নিশানা নিয়েছিলেন, কিন্তু গুলিটা চালাবার অবসর দিল না সে। একটা অর্ধস্বচ্ছ কাচের জীবের মত চেহারা নিয়ে বিরাট লাফে তারকাঁটার বেড়া পার হয়ে উল্টোদিকের ঝোপঝাড়ের ভেতরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

বন্দুকটা হাতে করে বোসসাহেব ছুটে বের হয়ে গিয়েছিলেন উঠোনের ওপর। আদৃতা আমার পাশে মাটিতে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে তখনও। ঘোরটা তার পুরোপুরি কাটেনি। পাশ ফিরে তার গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়ে বললাম, "চোখ বুজে থাকো। আর ভয় নেই কোন।"

হঠাৎ দু হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে জড়ানো গলায় সে বলল, "মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে আমার আংকল। কী ভয়ানক শক্তি ওই চোখদুটোতে—আর এক মুহূর্ত দেরি হলে আমি বোধ হয় আর—"

"এদিকে এসো ভুবন। দেখে যাও। নরসেরের অদৃশ্য রহস্য উদ্ধার হয়েছে।"

মেয়েটাকে শুইয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম। মাটির ওপর এখানে সেখানে রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে। আঙুলে করে তার একটুখানি তুলে ধরে আমায় দেখিয়ে বোসসাহেব বললেন, "রক্ত। ওতেই ওর রহস্যটা লুকিয়ে আছে ভুবন। রবির সঙ্গে তোমার অ্যাডভেঞ্চারের গল্পটা মনে কর। বাঘটাকে গুলি করবার পর তার কাঁধে একটা ক্ষত হয়েছিল। শুধুমাত্র তখনই তুমি ওটাকে দেখতে পেয়েছিলে তাই না?"

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। বোঝা যাচ্ছিল, অদৃশ্য ওই নরসের সাধারণ অবস্থাতে কেবল তার শিকারের চোখেই ধরা দিলেও, দেহ থেকে রক্তপাত হলে যতক্ষণ সে ক্ষত রক্ত ঝরায়, ততক্ষণ তার অদৃশ্য হবার শক্তি হারিয়ে যায়।

হাতের ঘড়িতে দেখলাম তিনটে বাজছে। দেরি করতে মন চাইছিল না আমার। আহত পশুকে অনুসরণ করবার মধ্যে একধরণের উত্তেজনা আছে। বোসসাহেবের দিকে ফিরে বললাম, "ট্রেল করবেন?"

উনি মৃদু হেসে বললেন, "এই রাত্রে? চারপাশে তাকিয়ে দেখো ভুবন। এই আদিম জঙ্গল ওর নিজের জমি। রাতের অন্ধকার ওর শক্তির উৎস। আর আমরা? দশ পনেরো হাতের বেশি দৃষ্টি চলবে না আমাদের এখন। বোকার মত প্রাণ দেবার জন্য এ খেলায় আমি নামিনি। ঘরে ফিরে চলো। ঘন্টাদুয়েক জেগে কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গেসঙ্গে রওনা হব আমরা। পালিয়ে ও যাবে কোথায়? ঘাঁটি বলতে তো ওই সওশির পাহাড়।"

৪

শালবনের পাতায় বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। বেলা প্রায় সাড়ে নটা হবে। মাথার ওপর ঘন মেঘের আড়ালে সূর্য কোথায় মুখ লুকিয়েছে কে জানে। তার হালকা আলোর আভাস সে জঙ্গলকে আলোকিত করতে পারে নি। চারপাশের ঝোপঝাড়ে সন্ধ্যেবেলার মতই অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে পথ চলছিলাম আমরা। আদৃতাকে মধ্যে রেখে আগেপিছে আমরা দুজন। আদৃতা মাঝেমাঝেই রেনকোটের ওপর দিয়ে তার কোমরে বাঁধা ডার্টগানটার গায়ে হাত ছুঁইয়ে দেখে নিচ্ছিল। মনের অবস্থাটা তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না আমার। একটা ক্ষীণ আশা। অনেকগুলো অনিশ্চয়তা রয়েছে গুলিটা চালানো আর তার ফল হবার মধ্যে। তবু সেই সামান্য আশাটুকুকে অবলম্বন করেই বাঘের গুহায় মাথা গলাতে চলেছে সে।

শালবন শেষ হয়ে আসছিল। গাছের ভিড় সামান্য হালকা হয়ে আসছে। সামনে, হাতের বাঁয়ে সওশিরের পাদদেশ আর বেশি দূরে নয়। গাছের ফাঁক দিয়ে খানিক দূরে মেঘের দিকে সটান উঠে যাওয়া নীলচে কালো নিস্তব্ধ চূড়াটা চোখে পড়ছিল। রাস্তাটা বাঁহাতে একটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে তার পাদদেশের দিকে।

"একটা জিনিস খেয়াল করেছ ভুবন?" হঠাৎ বোস সাহেব পেছন থেকে নিচু গলায় বলে উঠলেন,

“একটা অন্যরকম শব্দ আসছে কাছাকাছি কোথাও থেকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কানে আসছে আমার- ”

আমি কান খাড়া করে চুপ করে রইলাম। চারপাশের নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে মাথার ওপর শালবনের ক্যানপির মধ্যে জল ঝরবার ঝরঝর শব্দ পাওয়া যায় শুধু।

“নাঃ। আমি কিন্তু অন্যরকম কিছু- ” কথাটা শেষ করবার আগেই শব্দটা এবারে আমার কানেও ধরা পড়ল। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে থাকা মৃদু একটা আলাদা রকমের আওয়াজ। হাতের ডানদিক থেকে আসছে। বনেজঙ্গলে চাকরির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা না থাকলে একে জঙ্গলের আর পাঁচটা স্বাভাবিক শব্দের থেকে আলাদা করে চিনতে পারা কারো সাধ্যের বাইরে।

বোসসাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলছিলেন, “হালকা কোনো জীব। দোপেয়ে। আমি দেখছি। তুমি আদৃতাকে কভার করবে- ”

আমার ইশারা পেয়ে আদৃতা আস্তে আস্তে পিছিয়ে এসে বাঁদিকের একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে বসেছে ততক্ষণে। তাকে আড়াল করে ভেজা পথের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কাঁধের বন্দুক নামিয়ে আনতে আনতেই মাটির ওপর চার হাতপায়ে উবু হয়ে ক্ষিপ্র একটা শ্বাপদের মতই উল্টোদিকের জঙ্গলের ভেতরে ছুটে গেল বোসসাহেবের শরীরটা, আর তার পরেই ধপ করে একটা শব্দ উঠল সেখানকার ভেজা মাটিতে। সেইসঙ্গে সাহেবের চিৎকার, “কৌন হৈ তু? কাপড়া উতার আপনা মুহ সে—”

ছুটে গিয়ে দেখি, আপাদমস্তক চটে ঢাকা একটা মানুষের শরীর কাদার ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে, আর বোসসাহেব তার ওপরে ঝুঁকে হাঁক ছাড়ছেন। কাছে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই অবশ্য রহস্যের উন্মোচন হয়ে গেল। লোকটা সূরযভান। বোসসাহেবের পায়ের নিচে শুয়ে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে। বলে, “মুঝে আপনা সাথ লে চলো বড়াসাব। বঁহা মেরি লড়কি ভি তো হৈ—” বলতেবলতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে তার মাটিতে ছিটকে পড়া অস্ত্রটা ফের হাতে তুলে নিল। একটা তীক্ষ্ণধার বল্লম। কোমরে একটা দা- ও বেঁধেছে।

জেরায় জানা গেল, সাহেবরা নরসেরের আস্তানায় হামলা বোলতে যাবেন জানতে পেয়ে আগের রাত থেকেই তার ঘুম হয় নি আর। আগে থেকে বললে সাহেবরা অনুমতি দেবেন না তা সে ঠিক বুঝেছিল। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে পিছু নিয়েছে। আমাদের দুজনের রাগি মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে সে চায় আর ভেউ ভেউ করে কাঁদে। শেষে পেছনে আদৃতাকে এসে দাঁড়াতে দেখে তার শরণ নিল সূরযভান। বলে, “বিটিয়া তু ইনলোগোকো সমঝা। উসনে তেরি বাপকো ছিনা, ঔর মেরা জিগর কা টুকরাকো ভি ছিন লিয়া। উনসে লড়না তেরে জৈসা মেরা ভি হক বনতা হৈ।”

আদৃতা বিপন্ন চোখে একবার তার দিকে আর একবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। বোসসাহেবের মুখটা দেখি একটু নরম হয়ে এসেছে। মাথা নেড়ে বলেন, “ব্যাটা যে যুক্তি দিয়েছে তার ওপরে কিছু বলার নেই। ঘরের মা মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে এ মুল্লুকের লোকেরা এইভাবেই জান কবুল করে। এইটাই দস্তুর।” তারপর সূরযভানের দিকে ফিরে বলেন, “ঠিক আছে চল তবে। অস্ত্রশস্ত্র তো ভালোই সঙ্গে এনেছ। তা চালাবার জোর আছে কবজিতে নাকি- ”

সূরযভান বোসসাহেবের দিকে একঝলক কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলে বলল, “অগর জরুরত পড়া তো দেখ লিজিয়ে গা সা’ব।” তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে পথটার ওপর দাঁড়িয়ে সওশির

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, "ইস খুলে রাস্তে সে যানা ঠিক নহী হোগা সা'ব। হমারে সাথ আইয়ে- "

পথ ছেড়ে বাঁদিকের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমরা। বৃষ্টির জল পেয়ে বেড়ে ওঠা আন্ডারগ্রোথ আমাদের কোমরের কাছাকাছি উঠেছে। তাই ভেঙে এগোতে এগোতেই খেয়াল করছিলাম জমি আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে।

জঙ্গল ভেঙে খানিকদূর এগিয়ে একটা শুঁড়িপথ নজরে পড়ল। না জানা থাকলে এর অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভব নয়। গাছপালা, ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে সাপের মতন পাক খেয়ে তা উঠে গেছে সওশিরের চুড়োর দিকে।

"একে সঙ্গে নিয়ে কাজটা ভালোই করেছি বলে মনে হচ্ছে হে," পেছনপেছন হাঁটতে হাঁটতে বোসসাহেব বলে উঠলেন একবার, "লোকাল লোক। পথঘাটের ঘাঁতঘোত ভালোই চেনে। খোলা রাস্তা দিয়ে গেলে নরসেরের চ্যালাচামুন্ডাদের চোখে পড়বার যতটা ভয় থাকত, এখানে ততটা হবে না।"

সরু রাস্তাটা তখন একটা খাড়া চড়াইয়ের রূপ নিয়েছে। ভেজা, পিচ্ছিল পথ বেয়ে সাবধানে উঠতে হয়। চারপাশে ঝুলে থাকা ভেজা ঘাসের মুথা আর শেকড়বাকড় ধরে ধরে উঠতে উঠতে হঠাৎ একসময় বৃষ্টিঝরা মেঘের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছুরির ফলার মতন আকাশের দিকে মাথা তোলা পাহাড়চূড়াটা দেখা গেল ফের। এইবারে তা একেবারে সামনে এগিয়ে এসেছে। আদৃতা একমুহূর্তের জন্য আমার হাতে সজোরে একটা চাপ দিয়ে ধরেই কী মনে করে ফের ছেড়ে দিল তা। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল সামনের খোলা জায়গাটার দিকে।

চারপাশে ঢেউখেলানো মসৃণ মাথার পাহাড়ের দলের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ ব্যতিক্রমের মত দেখায় এই চূড়াটাকে। তার একেবারে গোড়ায় ফুট দেড়েক উঁচু আর ত্রিশফুট লম্বা ফাটলটা একটা ভূতুড়ে হাসিমুখের মতন জেগে রয়েছে। এই হল নরসেরের গুহায় ঢোকবার পথ।

নিরন্ধ্র অন্ধকার ফাটলটার সামনে দাঁড়িয়ে যার যার ঝোলা থেকে আলো লাগানো হেডব্যান্ডগুলো বের করে কপালের সঙ্গে বেঁধে নিচ্ছিলাম আমরা তিনজন।

"দরকার না হলে একত্রে আলোগুলো জ্বালাবে না। একবারে একটাই আলো জ্বলবে," হেডব্যান্ডের ক্লিপ আটকাতে আটকাতে বোসসাহেব সাবধানবাণী দিচ্ছিলেন, "একএকটা আলো দুঘন্টা পর্যন্ত চলে। হিসেব করে চললে অন্তত ঘন্টাছয়েক আলো পাওয়া যাবে তিনটে মিলে।

"প্রথমে আমার আলোটা জ্বালব। সাবধানে আমার পিছু পিছু এস।" বলতেবলতেই কপালের আলোটাকে জ্বালিয়ে নিয়ে ফাটলটার মুখে পা দিয়ে উঠে বসে তার ভেতরে নেমে গেলেন বোসসাহেব।

আগের বারও দেখেছি, তবু অতটুকু উচ্চতার ফাটলের ভেতর দিয়ে ঢুকে অত বিশাল একটা গুহায় পৌঁছে ফের একবার আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বহুকাল সমুদ্রের নিচে ডুবে থাকা এই পর্বতশ্রেণীর শরীরে সমুদ্রের জল এরকম অনেক স্থাপত্যই গড়ে দিয়েছে। বোসসাহেবের হেডব্যান্ডে বাঁধা আলোর তীব্র রশ্মি তার ভেতরের জমাট অন্ধকারকে ফালাফালা করে দিচ্ছিল। দেয়ালজোড়া অজস্র গুহাছবির যুদ্ধরত অর্ধমানব আর অর্ধপশুর দল যেন বহুদিন পরে হঠাৎ আলোর স্পর্শ পেয়ে বহুবর্ণ ঝিলিক দিয়ে উঠছে আমাদের চারপাশে।

গুহার ঠিক মাঝখানে ছাদের গায়ে অতিকায় ব্যাঘ্রমানবের ছবিটা সিংহাসনের ওপর রাজার মতন বসে ছিল। তার চোখের জীবন্ত দৃষ্টি বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলছিল আমার। দশ বছর

আগে—ওই ছবির নিচে রবির পাশাপাশি আমিও শুয়ে পড়েছিলাম। পরীক্ষায় পাশ করিনি, তাই বেঁচে গিয়েছিলাম হয়ত। কিন্তু সেই তীব্র মানসিক আক্রমণের অনুভূতিটা এখনও আমার স্মৃতিতে আছে। আর এ মেয়েটা স্বেচ্ছায় বাঘ ধরবার টোপ হয়ে সেখানে-

বাতাসে স্যাঁতসেঁতে গন্ধের সঙ্গেই একটা বুনো বোঁটকা গন্ধও ভাসছিল। গন্ধটা আমাদের অচেনা নয়। বোসসাহেব সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে নিয়ে আমি নীরবে গুহার একপাশে ঢালু হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া গলিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তীব্র গন্ধটা ওইদিক দিয়েই ভেসে আসছে।

আগে থেকেই কী করা হবে তার একটা পরিকল্পনা ছকেই নেয়া ছিল। সেইমত আদৃতাকে গুহার ঠিক মাঝখানে ছাদের সেই অতিকায় ছবিটার নীচে শুইয়ে দেয়া হল। সুড়ঙ্গটার মুখে গিয়ে পোজিশান নিয়ে দাঁড়ালেন বোসসাহেব। বাইরের দরজায় পাহারায় থাকা সূরযভানকে ইশারায় সতর্ক করে দিয়ে আমি গিয়ে আদৃতার পাশে বসে ইশারা করতেই বোসসাহেবের আলোটা নিভে গেল।

অন্ধকারটা সঙ্গেসঙ্গেই ঝাঁপিয়ে এল চারদিক থেকে। পেছনে অনেক দূরে ফাটলের মুখটা একটা লম্বা দাগের মত আলোকিত হয়ে আছে। কিন্তু সে আলো গুহার দরজা পেরিয়ে ভেতরে পৌঁছোয় না।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছিল আমাদের সেই নিঃসীম অন্ধকারের রাজত্বে। তারপর হঠাৎ আদৃতার গলার মৃদু গোঙানির শব্দে সতর্ক হয়ে উঠলাম আমি। শব্দটা বোসসাহেবের কানেও গিয়েছিল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তীব্র আলোর একটা ফলা ধেয়ে এল আদৃতার শরীরটা লক্ষ্য করে। আর তারপরই বোঁটকা গন্ধের একটা ঝটকা নাকে এসে লাগল আমার। মাথা ঠান্ডা করে বোসসাহেবের দিকে আলো ফেললাম একবার। তিনি একইভাবে বসে রয়েছেন ঢালু হয়ে যাওয়া গলিটার দিকে তাকিয়ে। তার মানে ওদিকে নতুন কিছু ঘটেনি। তাহলে গন্ধটা—

সন্তর্পণে আদৃতার মুখটাকে দেখলাম একবার। চোখদুটো খোলা। স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। ঠোঁটদুটো অস্ফুটে নড়ছে। কথাগুলো ভালো করে শোনবার জন্য মুখটা তার কাছে নামিয়ে আনতেই হঠাৎ গন্ধটা বেজায় তীব্র হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে মৃদু গরগর করে একটা শব্দ উঠে আসছিল। আদৃতার ঠোঁটদুটো নড়ছে। ফিসফিস করে অচেনা কোনো ভাষায় কিছু একটা বলে চলেছে সে—গরগর শব্দটা তার মুখ থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি--

মাথার মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করছিল আমার। আদৃতাকে ঘিরে মেঝেটার ওপরে আলো ফেলে ফেলে সন্তর্পণে পাক দিতে শুরু করলাম আমি। মেঝের এ জায়গাটা সম্ভবত ফাঁপা। আগে খেয়াল করিনি, পা ফেললে মৃদু ফাঁকা শব্দ হচ্ছে। একটা লম্বাটে চৌকো পাথরের স্ল্যাব রয়েছে ছবিটার ঠিক নীচে। আদৃতা শুয়ে রয়েছে তার ঠিক ওপরটাতে। স্ল্যাবটা ওপর থেকে বসানো। তার জোড়ের কাছে মাথা নামালে গন্ধ আর শব্দ দুটোই বেড়ে উঠছিল! ওখানে কেউ বা কিছু একটা আছে— সবার চোখের আড়ালে শিকারের একেবারে কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে--

ভাবনাটা মাথায় আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে আদৃতাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ধরলাম আমি। হেডব্যান্ডের আলোটা জ্বেলে তার ফাঁকা মুখের ওপরে ঘুরিয়ে ধরলাম। হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ বের হয়ে এল তার মুখ থেকে। তার ফাঁকা দৃষ্টিতে তীব্র ভয়ের ছাপ ফিরে আসছিল।

ঝটাপটির শব্দ পেয়ে বোসসাহেব আর সূরযভান ততক্ষণে দুপাশ থেকে এগিয়ে এসেছেন গুহার কেন্দ্রের দিকে। আদৃতাকে সূরযভানের দিকে ঠেলে দিলাম আমি। ততক্ষণে সে চেতনা

ফিরে পেয়েছে খানিকটা। তবু ঘোরলাগা ভাবটা পুরো কাটে নি তার। বৃদ্ধ সূরযভান তাকে দুহাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মৃদু গলায় কিছু বলছিল। আমাদের তখন সেদিকে কান নেই। স্ল্যাবটার ঠিক মাঝখানে একটা ছোটো গর্তমত রয়েছে। তার মধ্যে অ্যানফো এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটোরের একটা পুঁটুলি রেখে দিয়ে দ্রুতহাতে তার টেনে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেলাম আমরা তিনজন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিস্ফোরণের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা গুহাটা। আর সেই শব্দকে ছাপিয়ে উঠল মেঝের নিচে থেকে আসা একটা বুনো গর্জন। শব্দটা হয়ে একটা উপকার হল অবশ্য। আদৃতার ঘোরলাগা ভাবটা দেখি একেবারে কেটে গিয়েছে। সূরযভানের হাত ছাড়িয়ে সে নিজেই সবার আগে এগিয়ে এল বিস্ফোরণের জায়গাটার দিকে।

পাথরের স্ল্যাবটা উড়ে গিয়ে তার ঠিক নীচে অন্ধকার একটা গর্ত দেখা দিয়েছে। সেদিকে দেখে বোসসাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করছিলেন, "ইনজেনিয়াস। ওপরের ছবিটা একটা ধোঁকার টাটি। এই স্ল্যাবের নীচ থেকে কোন সুড়ঙ্গ এর ঘাঁটির দিকে গিয়েছে। এইখানে এসে শিকারের শরীরের নীচে দাঁড়িয়ে তার সম্মোহন চালাত ব্যাঘ্রদেব নরসের। এইবার-- একে বাগে পেয়েছি।"

গর্তটার ভেতরে আলো ফেলে দেখা গেল সেটা বেশি গভীর নয়। একে একে লাফ দিয়ে সেখানে নেমে এসে এদিক ওদিক একটু তাকাতেই নজরে পড়ল তার একপাশ দিয়ে লম্বা একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে পাহাড়ের অন্দরমহলের দিকে। সেইদিকে দেখিয়ে বোসসাহেব মৃদু গলায় বললেন, "চলো। এইবার শেষ মোকাবিলার পালা।" বলতেবলতেই দ্রুত ঝোলা খুলে গ্যাস মুখোশক'টা বের করে আমাদের দুজনের হাতে দিয়ে নিজেও একটা নাকে বেঁধে নিলেন, তারপর পেছন ফিরে সূরযভানের দিকে ঘুরে তার কাঁধের বৃষ্টিভেজা গামছাটা নিয়ে তার নাকেমুখে বেঁধে দিয়ে নিজের পাওয়ারলেস চশমাটা তার চোখে এঁটে দিতে দিতে বললেন, "খুলিস না। নইলে ধোঁয়াকামান চললে জ্বলুনি কাকে বলে টের পাবি।" আমি ততক্ষণে আমার স্যাক থেকে টিয়ার গ্যাস লঞ্চারটা বের করে এনে তার কার্ট্রিজগুলো একবার পরীক্ষা করে নিয়ে ফিতেটা গলায় পরে নিয়েছি।

"সবার সামনে থাকবে ভুবন। কোন আক্রমণ হলে কী করতে হবে তা তোমাকে আমি আগেই ব্রিফ করেছি। আমি তোমার ঠিক পেছন থেকে তোমায় ফায়ার কভার দেব। আমার পেছনে থাকবে আদৃতা, আর সূরযভান সবার পেছনে আসবে—" বোসসাহেবের নির্বিকার, ঠান্ডা গলায় দেয়া নির্দেশগুলো শুনলে মনে হবে ড্রয়িংরুমে বসে রাঁধুনিকে রান্নার রেসিপি বলে দিচ্ছেন। এমন গলা চরম বিপদের মুখেও বুকে ভরসা আনে। আলো নিভিয়ে আমরা নিঃশব্দে সেই অন্ধকার শুঁড়িপথটা ধরে এগিয়ে চললাম।

ক্রমশই ঢালু হয়ে উঠছিল রাস্তাটা। হাওয়ায় দমচাপা ভ্যাপসা ভাবটা বেড়ে চলেছে। কপালে ঘাম জমে উঠছিল আমাদের। এঁকেবেঁকে পথটা এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের একেবারে শেকড়ের দিকে। চারপাশে তখন কাঁধ ঘেঁষে এসেছে নিরেট পাথরের দেয়াল। ছাদটা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে আসছিল। সরু একটা লাইন বেঁধে আস্তে আস্তে মাথা ঝুঁকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু খানিক বাদে সেটাও আর সম্ভব হল না। একটা বাঁক ঘুরতেই কপালে সজোরে ঠোকা খেয়ে পিছিয়ে এলাম আমি। আলোটা জ্বালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বোসসাহেব আমাকে বারণ করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোটো টর্চ বের করে এনে সেটা একমুহূর্তের জন্য জ্বেলে নিয়েই ফের

বন্ধ করে দিলেন। ক্ষীণ, লালচে আলোর ক্ষণস্থায়ী আবছায়ায় দেখলাম, নতুন রাস্তাটার ছাদ মাথা থেকে বড়োজোর ফুটচারেক ওপরে।

বোসসাহেব গ্যাসমুখোসটা খুলে একবার বাতাস শুঁকলেন। তারপর মুখোশটা ফের পরে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে আমার পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "বাঘের গন্ধ। কাছাকাছি এসে পড়েছি। সাবধান। কোন শব্দ নয়-- "

নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গটার মধ্যে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম আমরা। পথ মোটামুটি সমতল। মেঝের ওপর ধুলোর আবরণ পুরু হয়ে থাকায় এগিয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু তারপর, অঘটনটা ঘটে গেল একেবারে হঠাৎ করেই। আগে থেকে কোন ইঙ্গিত না দিয়ে অন্ধকার পথটা একেবারে হঠাৎ খাড়াই হয়ে প্রায় আশি ডিগ্রি নতিতে ঝাঁপ দিল নীচের দিকে। টাল সামলাতে না পেরে নিচের দিকে গড়িয়ে গেলাম আমরা--

****

নীচে এসে আছড়ে পড়বার প্রথম কটা মুহূর্তের হতভম্ব ভাব কেটে যেতে খেয়াল হল খুব বেশিদূর গড়িয়ে পড়িনি। জায়গাটার পাথুরে মেঝের ওপর জমে থাকা পুরু শ্যাওলার স্তর আঘাতকে অনেকটাই রুখে দিয়েছে।

গ্যাস মুখোসের আবরণ ভেদ করে, শ্বাস বন্ধ করা একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে। মেঝেটার ওপরে এখানে ওখানে জমে আছে গুহার ছাদ চুঁইয়ে নেমে আসা জল। তীব্র পচা গন্ধ উঠছিল তার থেকে। তার সঙ্গে মিশে থাকা পশুদেহের বোঁটকা গন্ধ আর পচা মাংসের গন্ধ মিলে জায়গাটার বাতাস ভারী হয়ে আছে।

সম্বিত ফিরতে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে দেখলাম একবার। ভেলভেটের মত অন্ধকারের ভেতর যতদূর চোখ যায় জোনাকির মত রাশ রাশ সবজেটে আলোর ফুলকি জ্বলছে। আস্তে আস্তে আমাদের ঘিরে সেগুলো কাছে এগিয়ে আসছিল নিঃশব্দে—

যন্ত্রের মতন কাজ করছিলাম আমরা। চারজন চারদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আদৃতাকে ঘিরে একটা ব্যূহ তৈরি করে নিয়েছি। আলো নিয়ে কৃপণতা করবার উপায় নেই আর। তিনটে আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে তিনজনের কপালে। সেই আলোয় যতদূর চোখ যায় সেই অতিকায় গুহার ভেতরে অসংখ্য কালো প্যান্থারের ভিড়। জানি হয়ত কোন লাভ হবে না, তবু আমাদের হাতের অস্ত্রগুলো তৈরি হয়ে আছে যেকোন মুহূর্তে প্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য।

নিঃশব্দে আমাদের ঘিরে একটা গোল বৃত্ত তৈরি করে অপেক্ষা করে চলেছিল প্যান্থারের দলটা। অতিকায় এই পাতাল গুহার চত্বর আমাদের আলোর সীমারেখাকে ছাড়িয়ে আরো দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে তখন ক্রমশই ভিড় জমাচ্ছিল আরো অসংখ্য সবুজ জোনাকির মত চোখের দল। পেছনদিকে, যেখানটা দিয়ে এসে নেমেছি সেই দিকটাতেও তখন সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে তাদের কয়েকজন।

হঠাৎ আমার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এল আদৃতা। আর তার পর বিরাট সেই গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণ গলার স্বর, "বাবা, আমি তোমার আদৃতা, আমি এসেছি বাবা। তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি। এখানে তুমি থেকে থাকলে—" কথাগুলো বলবার সঙ্গেসঙ্গে তার মাথার হেডল্যাম্পের আলো ঘুরে চলেছিল গুহার চারদিকে। ঝিকিয়ে উঠছিল অপেক্ষমান অজস্র চোখ।

তার বাকি কথাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ গুহার দূরতম প্রান্তে ডেকে উঠল একটা বাঘ। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে সে জায়গাটায়। হেডল্যাম্পের আলোয় দেখা যাচ্ছিল, জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা প্যান্থারের দলটার মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে একটা মাঝারি চেহারার বাঘ।

বৃত্তটার মধ্যে পৌঁছে জীবটা হঠাৎ একেবারে থেমে গেল। তার সবুজ চোখের দৃষ্টিতে কোন হিংস্রতার আভাস ছিল না। ধীরে—খুব ধীরে তার চোখে চোখ রেখে আদৃতা এগিয়ে যাচ্ছিল তার দিকে- তার হাতে তখন উঠে এসেছে সেই অদ্ভুতদর্শন ডার্টগান।

কিন্তু জীবটার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোবার আগেই গুহার অন্য একটা দিক থেকে জেগে উঠল আরেকটা গম্ভীর গর্জন। আমাদের আলোগুলোর মুখ সেদিকে ঘুরে গেছে। ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা প্যান্থারের দল দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে ভারী পায়ে সামনে এগিয়ে আসছিল রাজকীয় চেহারার একটা প্যান্থার। এগিয়ে আসতে আসতেই বারবার মুখ ঘুরিয়ে সে চেটে নিচ্ছিল কাঁধের ওপরের গভীর ক্ষতচিহ্নটাকে। সেখান থেকে তখনও সামান্য রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে।

বৃত্তের মাঝখানে এসে, ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া অন্য জীবটাকে থাবার এক আঘাতে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে ফেলে দিল সে। তারপর শীতল, গভীর চোখদুটোকে তুলে ধরল আদৃতার চোখের দিকে।

একবার একটু কেঁপে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল আদৃতা। তার হাত থেকে ডার্টগানটা মাটির ওপর খসে পড়েছে। হঠাৎ গুহার বদ্ধ হাওয়ায় বাজের মত ফেটে পড়ল প্যান্থারদের মিলিত গর্জনের শব্দ। নিজেদের জায়গায় স্থির থেকে বারংবার গর্জে উঠছে তারা। সেই মিলিত জয়ধ্বনির শব্দের মধ্যেই আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ছিল আদৃতা। পায়ের নিচে একটা গর্তের ভেতর জমে থাকা জলের ওপর উবু হয়ে বসে হঠাৎ নিজের ডানহাতটার মণিবন্ধে কামড়ে ধরল সে।

সম্মোহিতের মতন সেইদিকে তাকিয়েছিলাম আমরা দুজন। বুঝতে পারছিলাম আর দেরি নেই। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল আমার। ফুলের মত মেয়েটা দুনিয়া পেরিয়ে এসে এইখানে—তার পরিচিত পৃথিবীর চোখের আড়ালে—

কিন্তু সেই মুহূর্তে এক আশ্চর্য কঠিন বাঁধনে বাঁধা ছিল আমাদের মনগুলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের শিকার। তার কাঁধের ওপর দিয়ে সরাসরি হৃৎপিন্ডে একটা গুলির আঘাত শুধু—অথচ সেই মুহূর্তে নিজের হাতের একটা আঙুলও নাড়াবার মত ইচ্ছাশক্তিও অবশিষ্ট ছিল না আমাদের কাছে।

তীক্ষ্ণ দাঁতের খোঁচায় আদৃতার মণিবন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বের হয়ে তখন মিশে যাচ্ছে গর্তের জলের সঙ্গে। প্যান্থারদের গর্জন থেমে গেছে একেবারে। নিঃশব্দে অপেক্ষা করে চলেছে তারা সে নাটকের পরের অবশ্যম্ভাবী দৃশ্যটার জন্যে, যে দৃশ্যে একদিন তাদের প্রত্যেকেই হয়ত অংশ নিয়েছিল। ধীরে ধীরে রক্তমেশা সেই জলের দিকে মাথা নামিয়ে আনছিল মেয়েটা। তার সামনে গর্বিত চোখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল ব্যাঘ্ররাজ নরসের।

কিন্তু জলের মধ্যে মুখ আর ঠেকানো হল না তার। হঠাৎ সেই গুহাকে কাঁপিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় একটা গর্জন ভেসে উঠল। চমক ভেঙে তাকিয়ে দেখি ছিটকে পড়ে থাকা প্যান্থারটা ফের উঠে দাঁড়িয়েছে এবারে। নরসেরের থাবার আঘাতে তার ঘাড়ের কাছে খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে উঠে এসেছে। রক্ত ঝরছিল সেখান দিয়ে। দ্বিতীয় আরেকটা গর্জন বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে সে এক লাফে এসে পড়ল নরসেরের পিঠের ওপর। তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল তার শরীর। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই একসঙ্গে গর্জন করে উঠল সেই অপেক্ষমান প্যান্থারের দল। হেডলাইটের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল মাড়ি বের করা সারসার তীক্ষ্ণ দাঁতের আক্রমণসংকেত। আমাদের ঘিরে তাদের বৃত্ত দ্রুত ছোটো হয়ে আসতে শুরু করেছে তখন।

আকস্মিক আক্রমণে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল জীবটা। আদৃতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাথা বেঁকিয়ে হিংস্রভাবে সে আক্রমণ করল অন্য প্যান্থারটাকে। আর তার সঙ্গেসঙ্গেই টের পেলাম, আঙুলে সাড় ফিরে আসছে আমার।

কিন্তু হাতের অস্ত্রটা তুলে ধরবার আগেই আমাদের পেছন দিক থেকে হঠাৎ ছিটকে এল সূরযভানের রোগাভোগা শরীরটা। চোখের সামনে তার মেয়েরই বয়সী আরো একটা মেয়ের আসন্ন দুর্ভাগ্যের ছবিটা তার মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে দিয়েছে। অতিকায় জীবটার কাছাকাছি পৌঁছে তার হাতের বল্লমের ফলা একবার ঝিকিয়ে উঠেই বিঁধে গেল তার শরীরে। সঙ্গেসঙ্গে একটা যন্ত্রণার শব্দ করে তার দিকে বিরাট মাথাটা নামিয়ে আনল নরসের।

আমার হাতে উঠে আসা লঞ্চার থেকে তখন আমাদের বৃত্তটার মধ্যে বারবার আছড়ে পড়ছে টিয়ার গ্যাসের গোলা। ধোঁয়ায় ঢাকা এলাকাটার মধ্যে ছুটে ঢুকে আসতে গিয়েও গর্জন করে বারংবার পিছিয়ে যাচ্ছিল প্যান্থারের দল। তীব্র জ্বলুনীধরা ধোঁয়া ব্যাঘ্ররাজকেও ব্যতিব্যস্ত

করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। হঠাৎ মাটির দিকে মাথাটা একবার নীচু করেই এক মুহূর্তের জন্য পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল সে। তার দাঁতের ফাঁকে সূরযভানের রক্তমাখা শরীরটা দুলছিল। বুকটা অরক্ষিত অবস্থায় আমাদের সামনে খোলা।

সেই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল বোসসাহেবের জন্য। গুহার বাতাসকে কাঁপিয়ে পরপর দুবার গর্জন করে উঠল তাঁর হাতের মনস্টার লিকার। রক্তের একটা ধারা ফোয়ারার মত লাফ দিয়ে উঠল নরসেরের বুকের ভেতর থেকে। ক্লোজ রেঞ্জে পয়েন্ট সাত ক্যালিবারের দুটো বুলেট তার হৃৎপিন্ডকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই আস্তে আস্তে দুলছিল তার শরীরটা। মুখের থেকে সূরযভানের প্রাণহীন শরীরটা খসে পড়ে গেছে নিচে। আর সেইসঙ্গেসঙ্গেই ঝড়ের মতন একটা বদল আসছিল তার চেহারায়। মাথা বাদে তার বাকি শরীরটা দ্রুত বদলে গিয়ে এক অতিকায় মানুষের চেহারা নিচ্ছে তখন।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই দু হাতে হাওয়া আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মাটির ওপর

আছড়ে পড়ল ব্যাঘ্রমুখ অতিকায় জীবটির শরীর।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই গোটা গুহাটার মধ্যে একটা নৈঃশব্দ জেগে উঠল। যেন কোন মন্ত্রবলে থেমে গেছে প্যান্থারদের মিলিত যুদ্ধের ডাক। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ার আবরণ মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে। কিন্তু তবু আমাদের দিকে এগিয়ে আসবার কোন চেষ্টা করছিল না হিংস্র চেহারার প্রাণীগুলো। খানিকক্ষণ আগের সেই হিংস্রতার কোন চিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই প্রাণীগুলোর মধ্যে। নরব্যাঘ্রের মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে তাদের মনের ওপর তার আধিপত্যের যুগ।

"অন্তত ছ'টা বুলেট এর শরীরে না ঢুকিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব না," গ্যাসমুখোশটা এক টানে খুলে ফেলে দিয়ে ফের একবার মাটিতে পড়ে থাকা মূর্তিটার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরছিলেন

বোসসাহেব। কিন্তু হঠাৎ আদৃতা এগিয়ে এসে বন্দুকের নলটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল তাঁর। ক্লান্ত গলায় বলল, "না জেঠু। একটু সময় দিন আমায়। ওখানে- "

তাকিয়ে দেখি, নরব্যাঘ্রের পিঠের ওপর তখনও লেপটে রয়েছে তার আক্রমণকারী প্যান্থার। তার রক্তমাখা শরীর দেখে বোঝা যাচ্ছিল, অসম সেই যুদ্ধে গভীর চোট পেয়েছে সে। আদৃতাকে সামনে দেখতে পেয়ে এইবার সে ধীরে ধীরে নেমে এসে আহত শরীরটাকে টানতে টানতে এগিয়ে এল তার কাছে। তারপর তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা রেখে বড়ো নিশ্চিন্তে চোখদুটো বুজে ফেলল।

বোসসাহেব নীরবে তাদের কাছে এগিয়ে এসে প্রাণীটার পাশে বসে পড়লেন। তার দেহের নানা জায়গায় হাত ঠেকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু অনুভব করে নিয়ে যখন মুখ তুললেন, তখন তাঁর চোখে হাসির স্পর্শ, "ত্রিশটা বছর জীবজন্তুদের নিয়েই তো কাটালাম মা, যতটুকু জ্ঞানগম্যি আমার আছে সেই দিয়েই বলছি, কোন গভীর আঘাত পায় নি এ। দেহের চামড়া আর মাংসে ঘা খেয়েছে কিছু। তুমি ভয় পেয়ো না।"

কৃতজ্ঞ চোখে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল আদৃতা। তারপর নিজের মুখ থেকে গ্যাসমুখোশটা খুলে ফেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুদূরে ছিটকে পড়ে থাকা ডার্টগানটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। শুয়ে থাকা জীবটার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে সেটা তাক করে ধরতে হঠাৎ চোখদুটো খুলে গেল প্রাণীটার। সামনে উদ্যত অস্ত্র দেখে এক মুহূর্তের জন্য একটা আদিম হিংস্রতার স্পর্শ বুঝি খেলে গেল সেই চোখদুটোতে। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই ফের একবার শান্ত, কোমল হয়ে এল তা। মাথাটা উঁচু করে পূর্ণদৃষ্টিতে আদৃতার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে রইল সে।

একটুক্ষণ ওইভাবে স্থির থেকে তারপর বন্দুকটা ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল আদৃতা। ওষুধভরা ডার্টটাকে তার থেকে খুলে এনে হাতে নিল। অজানা একটা রাসায়নিক। একটা জীবদেহে তার সম্পূর্ণ ডোজ কীভাবে কাজ করবে তা কেউ জানে না। হাতটা একবার কেঁপে উঠল বুঝি তার। তারপর বাঘটার মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে বসে বড়ো যত্নে, সন্তর্পণে সে ডার্টের তীক্ষ্ণমুখ ছুঁচটা সজোরে গেঁথে দিল তার গলার পাশে দপদপ করতে থাকা ধমনীর ওপর।

যন্ত্রণাদায়ক আঘাতটা পেয়ে একটা করুণ শব্দ করে ডেকে উঠল জীবটা। তার শরীরে মৃদু একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে তীব্র খিঁচুনিতে বদলে যাচ্ছিল। তীক্ষ্ণ নখওয়ালা থাবাগুলো আছাড়িপিছাড়ি করে ছুঁড়ে চলেছে সে চারদিকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে আদৃতাকে একরকম টেনে সরিয়ে নিয়ে এলাম আমি। জীবটার গায়ে হাতের ছোঁয়া লেগেছিল আমার। তার গায়ের উত্তাপ একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। দেহের প্রতিটা কোষের মধ্যে যেন একটা আগুনে লড়াই চলেছে তার। আর সেই ছটফটানি চলতেচলতেই একটা বদল আসছিল তার চেহারায়। গায়ের কুচকুচে কালো লোমগুলো ঝরে পড়ে বের হয়ে আসছিল বাদামি রঙের চামড়া। দ্রুত বদলে যাচ্ছিল শরীর আর চারটে থাবার গড়ন। বোসসাহেবের বন্দুক তখন কানফাটানো শব্দ করে ফের আগুন উগড়ে চলেছে পাশে পড়ে থাকা নরব্যাঘ্রের নিঃসাড় দেহের ওপর।

"ভুবন," একটা ক্ষীণ গলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকালাম আমি। মাটির ওপর শুয়ে থাকা রবি আমাকে ডাকছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার গায়ের ওপর স্যাক থেকে বের করে আনা একটা তোয়ালে ছড়িয়ে দিলাম আমি।

"ও—ও কে?"

তার প্রসারিত আঙুলের দিকে একবার তাকিয়ে আমি বললাম, "তোর মেয়ে রে। কত বড়ো হয়ে গেছে দ্যাখ একবার। বিরাট বড়ো পণ্ডিত হয়েছে। কতো নামডাক। পৃথিবী উজিয়ে এইখানে এসেছে তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন ওঠ। বাড়ি চল।"

"আমায় একটু বসিয়ে দে তো," রবির প্রসারিত হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নিল আদৃতা। তারপর বড়ো যত্ন করে তুলে বসিয়ে দিল তাকে। চারদিকে অপেক্ষা করতে থাকা জন্তুগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল রবি। তারপর মুখের কাছে দুহাত জড়ো করে গম্ভীর একটা ডাক ডেকে উঠল পরপর তিনবার। ডাকটা শুনে সচকিত হয়ে কান খাড়া করল জন্তুগুলো। তারপর হঠাৎ পেছন ঘুরে দ্রুতপায়ে মিলিয়ে গেল গুহার অন্যপাশের গভীর অন্ধকারের মধ্যে।

****

"কিন্তু ওরা? ওদের কী হবে ভুবন?"

রবির দেখানো পথ ধরে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফিরে এসেছি তখন মাটির ওপরের নরসেরের গুহায়। সূরযভানের শরীরটা বয়ে আনছিলাম আমি আর বোসসাহেব। এইবারে একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। শরীরটা মাটির ওপর নামিয়ে রেখে আমি বললাম, "এর জবাব আমার কাছে নেই রবি। কিছু করতে পারলে আদৃতা পারবে।"

আদৃতা আলো ফেলে ফেলে গুহার দেয়ালের ছবিগুলো দেখছিল। দেয়ালের কাছে থেকেই উত্তর দিল, "ভেব না বাবা। আমরা আবার ফিরে আসব এখানে। পথ যখন পেয়েছি তখন এদের প্রত্যেককে আবার নিজের জীবনে ফিরিয়ে দেব আমরা। নরসেরের অভিশাপ শেষ হয়ে গেছে।"

তার হাতের আলোটা তখন দেয়ালের একপাশে একটা বিরাট ছবির প্যানেলের ওপর গিয়ে পড়েছে। সেখানে দুটো গ্রামের মাঝখানে বিস্তীর্ণ খোলা জমির ওপর চিতাবাঘের দুটো দল একে অন্যের সঙ্গে মরণপণ লড়াইতে ব্যস্ত। তাদের বেশ খানিকটা পেছনে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নরসের, মহিষাসুর, পক্ষীমানব আমন রা, কুকুরের মাথাওয়ালা আনুবিস, ছাগমুণ্ড দক্ষজীবের দল।

হঠাৎ সেইদিকে তাকিয়ে একটু শিউরে উঠল রবি, "ভুল করছিস আদৃতা। শেষ হয়ে যায় নি এখনো। ছবিগুলো ভালো করে দ্যাখ। ওরা সবাই আছে। মাত্র একজন নরসেরকে আমরা শেষ করতে পেরেছি। কিন্তু সভ্য দুনিয়ার চোখের আড়ালে আজও নেপালের অরণ্যে রাজত্ব করে চলেছে মহিষাসুর। মিশরের মরু অঞ্চলে এখনো আনুবিসের অন্ধকার শাসনের শেষ হয় নি। ব্রাজিলের গভীর জঙ্গলের দ্বিপদ পুমাজীব, লক নেসের অতিকায় মৎস্যমানব, জাভাদ্বীপের উড়ন্ত দানব আ হুল—ওদের শেষ নেই।

"এতগুলো বছর তাদের একজনের সঙ্গে থেকে আমি এদের সবার কথা গভীরভাবে জেনেছি। জেনেছি মানুষের সভ্যতার শুরুতে, সূর্য নিভে যাওয়া এক প্রাচীন গ্রহের অন্ধকার, আর্দ্র বুক থেকে মহাকাশ সাঁতরে তাদের আলোহীন তারকাযানের এই গ্রহের বুকে নেমে আসবার ইতিহাস, জেনেছি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ছড়িয়ে পড়বার কাহিনী। আমাদের কাজ শেষ হয় নি মা। সবে তার সূচনা হল এইখানে।"

****

পাহাড় বেয়ে সূরযভানের মৃতদেহ বয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসছিলাম আমরা। এখন শেষ বিকেল। বৃষ্টি থেমে গিয়ে বনের মাথায় মাথায় সোনালি রোদ খেলছে। সেইদিকে তাকিয়ে আদৃতা হঠাৎ নিচু গলায় বলল, “ভেবো না বাবা। তুমি দেখে নিও। আমরা পারবই—”

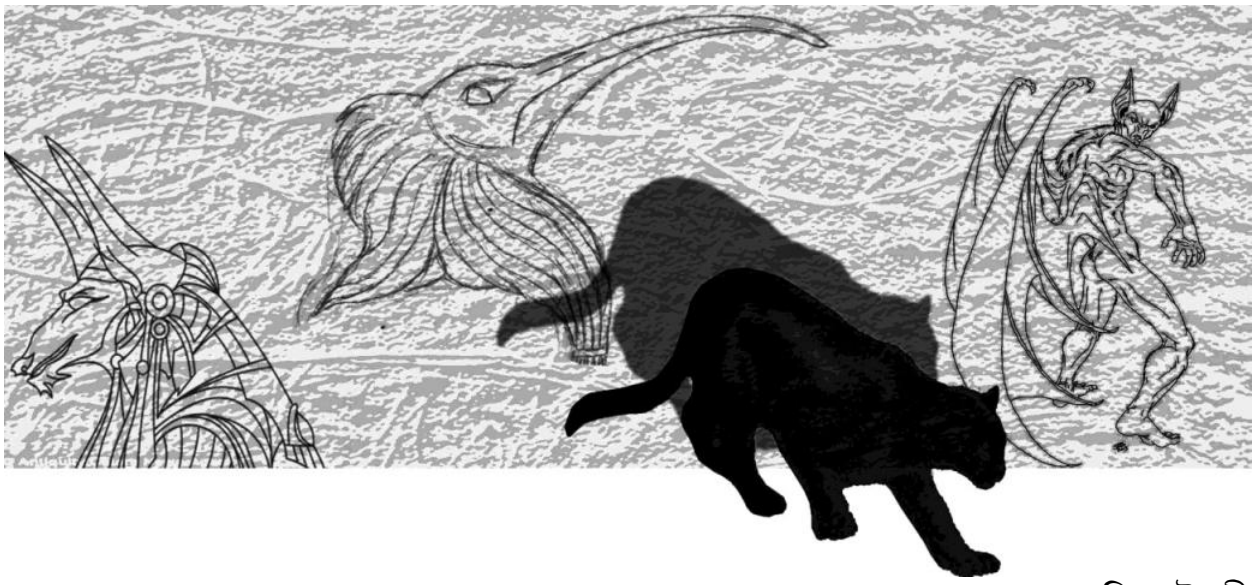

ছবিঃ মৌসুমী

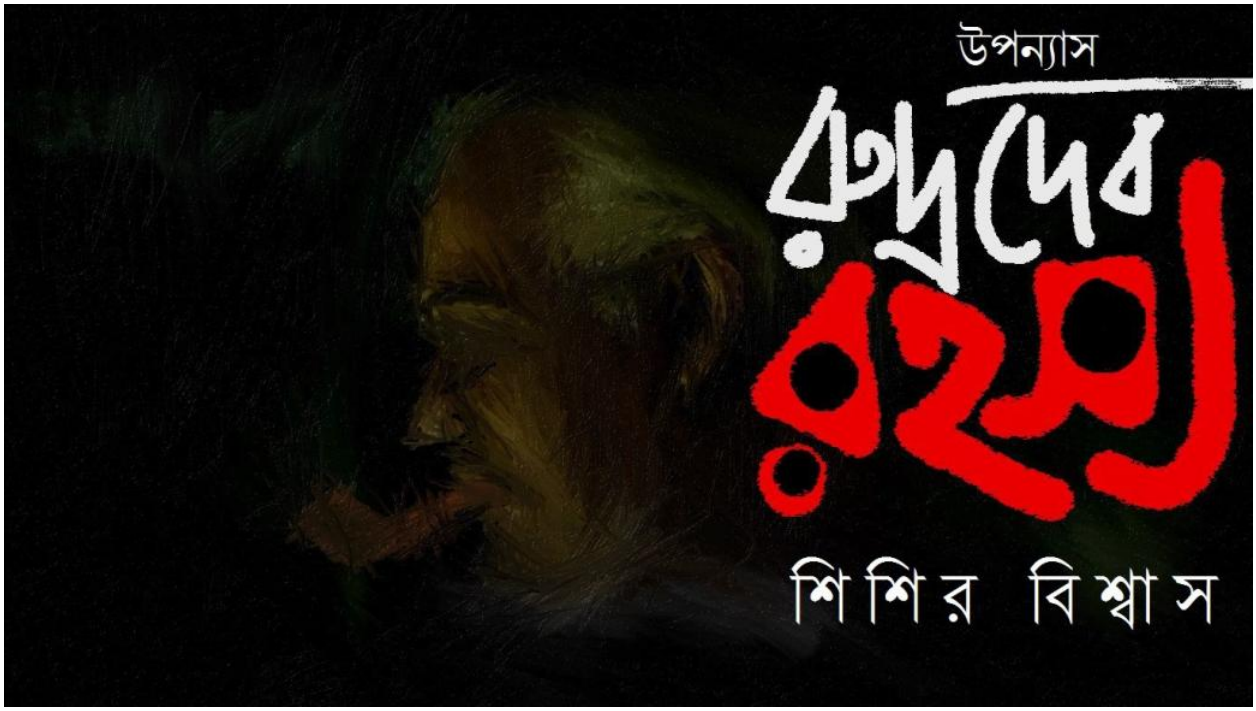

কথায় আছে, বিদেশে বাঙালি সজ্জন। কিন্তু রুদ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রমী মানুষ। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। নামি এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে নতুন চাকরি নিয়ে মুম্বাই পাড়ি দিয়েছি। তখন অবশ্য নাম ছিল বোম্বাই। এই কাহিনিতে সেই নামটিই ব্যবহার হয়েছে। যাই হোক। পরিচিত পরিবেশ থেকে ছিটকে আমার তখন ডাঙায় তোলা মাছের মতো অবস্থা। যে সংস্থায় চাকরি, সেখানে আমিই একমাত্র বঙ্গসন্তান। আর যেখানে থাকতাম, সেই সাকিনাকাতেও একই অবস্থা। না, সামান্য ভুল হল। আমার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ত বড় রাস্তা থেকে সামান্য উঁচুতে এক পাথুরে টিলার উপর ছোটমতো এক পুরোনো বাংলো বাড়ি। মিনিট পাঁচেকের পথও নয়। রুদ্রনাথ লাহিড়ী ওই বাড়িতেই থাকতেন। উনি যে নির্ভেজাল বাঙালি, তা জানতেই আমার বছর খানেক লেগে গিয়েছিল।

বাংলোটা বেশ নিরিবিলিতে। চারপাশ ফাঁকা, নির্জন। প্রায়ই দেখতাম, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাংলোর হাতায় আরাম কেদারায় বসে একমনে পাইপ টানছেন। নয়তো নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়ছেন। এছাড়া আকাশ ভাল থাকলে প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে বের হতেন। বয়স হলেও ছ” ফুটের উপর দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরে সামান্য মাত্র ভাঁজ পড়েনি। প্রশস্ত কপাল। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঠোঁটের উপর কাঁচাপাকা ভারী একজোড়া গোঁফ। ডান হাতটা সর্বদা প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। পরে বুঝেছিলাম, হাতটা আর্টিফিশিয়াল। বাঁ হাতে ছোট একটা ছড়ি নিয়ে যখন মর্নিং ওয়াকে বেরুতেন, দু-এক দিন সামনে পড়ে গেছি। কিন্তু মানুষটির গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আলাপ করতে ভরসা হয়নি। কোনও দিন রাস্তায় কারো সঙ্গে কথা বলতেও দেখিনি তাঁকে।

যাই হোক, এরপর যেদিন ভদ্রলোকের নাম কানে এল, প্রায় চমকে উঠেছিলাম। প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই পারিনি। যে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতাম, তার সর্বক্ষণের চৌকিদার ছিল প্রমোদ কামলে। সবাই কামলে বলে ডাকত। সদর ফটকের পাশে এক খুপরিতে আস্তানা। নিরীহ ভালোমানুষ। প্রয়োজনে ছোটখাটো ফাইফরমাশ নীরবেই করে দিত। এখানে শুরু থেকেই আছে জেনে একদিন ভদ্রলোকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওকে। উত্তরে কামলে নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে দু''হাত কপালে ছুঁইয়ে বলল, ''শেঠ, উনি রুদ্রদেব। স্বয়ং ভগবান।''

বলা বাহুল্য, এমন উত্তর একেবারেই আশা করিনি। থতমত খেয়ে বললাম, ''প্রায় দিনই তো দেখতে পাই ওনাকে। কিন্তু তোমাদের কাউকে তো ওনার কাছে দেখিনি! বরং সামনে পড়ে গেলে দ্রুত সরে পড়তেই দেখেছি!''

উত্তরে কামলে সামান্য ঘাড় ঝোঁকাল। দু''হাত ফের কপালে ঠেকিয়ে বলল, ''আমরা গরীব মানুষ শেঠ। ইচ্ছে করলেই কি ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? উনিও চান না। তাই দূর থেকে সালাম জানাই।''

নিরক্ষর মানুষ প্রমোদ কামলেকে সেই মুহূর্তে ঘাঁটাইনি। তবে কৌতূহল দমন করাও সম্ভব হয়নি। পরবর্তী দিন কয়েক নানাভাবে প্রশ্ন করে ওর কাছ থেকে যা জানতে পেরেছিলাম, তা অবশ্য যথেষ্টই চিত্তাকর্ষক। তাতে কৌতূহল কমার বদলে বরং আরও বাড়ল।

বছর পনেরো আগের কথা। বোম্বাই শহরের প্রান্তে এই সাকিনাকা অঞ্চল তখন যথেষ্টই ফাঁকা। পাহাড়ি টিলার ফাঁকে বড় এক নালা। রুক্ষ পাথুরে জমি, ঝোপঝাড়। খানিক দূরে পাওয়াই লেকের দিকে নতুন বসতি গড়ে উঠলেও, এদিকটা তখনও বেশ খালি। বসতি বলতে কিছু গরিবগুরবো মানুষের ঝুপড়ি।

কিন্তু অবস্থা হঠাৎই পালটাতে শুরু করল। স্বাধীনতার পরে এদেশে যে শহরগুলির জাঁকজমক আগে বেড়েছে, বোম্বাই তাদের মধ্যে প্রথম। নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি আর অফিস। দেশের নানা জায়গা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বোম্বাই শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। সবার দরকার মাথা গোঁজার আস্তানা। শহরের ভিতর যেখানে যা ফাঁকা জমি ছিল, ভরতি হয়ে যাবার পরে নজর পড়ল আশপাশে। বাদ গেল না সাকিনাকাও। আগেই বলেছি, আন্ধেরীর কাছে এই অঞ্চলে ছোট পাহাড়ি টিলার মাঝে তখন বিস্তর ফাঁকা জায়গা। সামান্য কিছু গরিবগুরবো মানুষের বাস। তাদের হটিয়ে একের পর এক বাড়ি উঠতে শুরু করল। জমির দখল নিয়ে কিছু ঝামেলাও হয়েছে। কিন্তু পুলিশ আর প্রমোটারদের মস্তান বাহিনীর সঙ্গে গরিবগুরবো মানুষ পেরে ওঠেনি। প্রাণও গেছে কয়েকজনের। পুলিশের সামনেই। কোনও প্রতিকার হয়নি। গোড়ার দিকে তাই বাধা দেবার চেষ্টা হলেও, পরে নিজেরাই ঘরবাড়ি ফেলে চলে গেছে অন্য কোথাও। এই সময় একদিন এক ব্যাপার ঘটল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছেই ঝুপড়ি বেঁধে বাস করত প্রমোদ কামলেরা কয়েক ঘর মানুষ। হঠাৎই এক সকালে ট্রাক বোঝাই একদল গুণ্ডা–মস্তান চড়াও হল ওদের উপর। ঘরবাড়ি ভেঙে তুলে নিয়ে যাবে।

কানাঘুষো কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অন্য ব্যবস্থা তখনও কেউ করে উঠতে পারেনি। অগত্যা কাকুতি–মিনতি, আর কয়েকটা দিন যেন সময় দেওয়া হয়

ওদের। কিন্তু অন্য পক্ষ সেসব শুনতে আসেনি। আজ ঝুপড়ি ভেঙে একেবারে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাবে। অযথা সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। কয়েকজন ইতিমধ্যে ঝুপড়ির ভিতর ঢুকে জিনিসপত্র তুলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করেছে। টেনে নামাচ্ছে একের পর এক ঝুপড়ির চাল। এক ঝুপড়ির ভিতরে খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছিল কোলের এক শিশু। মাত্রই মাস দুয়েক বয়স। একজন তাকে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল বাইরে। পাথুরে মাটি, নীচে পড়লে হয়তো মৃত্যু ঘটত তৎক্ষণাৎ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে শিশুর দেহটি দরজা দিয়ে ছিটকে এসে খানিক দূরে এক বস্তিবাসীর কোলে এসে পড়ল। যেন কেউ আলতো করে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল কোলের মাঝে। অদ্ভুত ব্যাপারটা যাদের চোখে পড়েছে, তারা থমকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। ওই সময় ভারি গলায় কেউ হেঁকে উঠল।

"হেই, স্টপ ইট।"

অদূরে পথের উপর দাঁড়িয়ে রুদ্রনাথ লাহিড়ী। সম্ভবত মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছিলেন। কণ্ঠস্বর তাঁরই। অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মস্তান বাহিনীর যারা থমকে গিয়েছিল, ততক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। পালটা হেঁকে একজন বলল, "কেও রে?"

লম্বা পা ফেলে রুদ্রনাথবাবু ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছেন। স্থির দৃষ্টিতে লোকটির দিকে খানিক তাকিয়ে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, "আমি বলছি।"

মানুষটির পোশাক, গলার আওয়াজে প্রতিপক্ষ খানিক থতমত খেয়ে গেলেও খানিক দূরে কোট–প্যান্ট পরা একজন লক্ষ্য রাখছিল। সম্ভবত মালিক পক্ষের কেউ। কাজের তদারকির জন্য এসেছে। ব্যাপার দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে কেয়া দেখ রহে বিরজু। ল্যাংড়াকো হঠা দে।"

বিরজু নামে বিশাল চেহারার লোকটা এরপর মুহূর্তে হাত তুলেছিল রুদ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল তারপর। উদ্যত হাত রুদ্রনাথবাবুর উপর পড়ার আগেই সে ছিটকে পড়ল হাত কয়েক দূরে। বিরজু বাউন্সার মানুষ। মাসলম্যান। এসব কাজে অভ্যস্ত। স্বভাবতই খেপে গিয়েছিল তারপর। মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল রে–রে করে। কিন্তু কাছে পৌঁছোবার আগেই তার বিশাল দেহ শূন্যে ছিটকে উঠে লুটিয়ে পড়ল ফের। পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

বিরজু মস্তান বাহিনীর সর্দার। তার এই অবস্থা দেখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই। ব্যাপারটা কী হল, তখনো যেন কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। মালিক পক্ষের সেই লোকটা হেঁকে উঠল, "আরে মারো হারামজাদেকো। খতম কর দো।"

ব্যাপার দেখে উপস্থিত বাউন্সারের দল তখন ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারই মধ্যে রুদ্রনাথবাবু গটমট করে এগিয়ে গেলেন সেই কোট–প্যান্ট পরা লোকটার কাছে। মুহূর্তে বাঁ হাতে সপাটে একটা চড় কশিয়ে দিলেন গালে। সেই চড়ে হাত কয়েক দূরে ছিটকে পড়ল লোকটা। রুদ্রনাথবাবু কিন্তু ফিরেও তাকালেন না। ঘাড় ফিরিয়ে অদূরে বস্তিবাসী মানুষগুলির দিকে হাত তুলে নাড়লেন সামান্য। তারপর চলে গেলেন নিজের পথে।

সেদিনের সেই ঘটনার জের যে সহজে মেটেনি, তা বলাই বাহুল্য। কোটপ্যান্ট পরা মানুষটি বিনোদ জয়সোয়াল। জাঁদরেল প্রমোটার। ধুরন্ধর মানুষ। হাত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেদিন সবার সামনে ওই ভাবে হেনস্তা হয়েও মাথা গরম করেননি। দলবল নিয়ে তখনকার মতো ফিরে

গেলেও কাজে লেগে পড়েছিলেন সেই দিনই। প্রথমেই বিস্তারিত খোঁজখবর। তারপর দিন কয়েকের মধ্যেই যখন জানতে পারলেন, রুদ্রনাথ লাহিড়ী নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ। হাত বেশিদূর না বাড়লেও চলবে। যোগাযোগ করেছিলেন লোকাল থানায়। ওসি সঞ্জয় ঘোড়পোড়ে করিৎকর্মা মানুষ। দিন দুয়েকের মধ্যে গোটা কয়েক খুন আর মারদাঙ্গার কেসে জড়িয়ে রুদ্রনাথ লাহিড়ীর নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের করে ফেলেছিলেন। বছর দশেকের জন্য শ্রীঘর বাঁধা।

পরের দিন বের হয়ে পড়েছিলেন নিজেই। নিজস্ব জিপে ওসি সাহেব আগে। পিছনে পুলিশ ভরতি বড় এক প্রিজন ভ্যান। বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে অপেক্ষাকৃত সরু এক রাস্তায় বাঁক নিয়ে অল্প এগোলেই পথের পাশে টিলার উপর রুদ্রনাথ লাহিড়ীর বাংলো। প্রিজন ভ্যান কিছু পিছিয়ে পড়েছিল। বাঁক নিয়ে ওসি সঞ্জয় ঘোড়পোড়ের জিপ সেই টিলার সামনে এসে দাঁড়াতে তিনি অপেক্ষা করছিলেন প্রিজন ভ্যানের জন্য। অদূরে বড় রাস্তা এখান থেকে ভালই দেখা যায়। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, প্রিজন ভ্যান বাঁ দিকে নির্দিষ্ট পথে না ঢুকে সোজা বেরিয়ে গেল। এমন নয়, প্রিজন ভ্যানটা অনেক পিছনে ছিল, ওসির জিপ দেখতে পায়নি। তাছাড়া, এসব অঞ্চল থানার ড্রাইভারদের হাতের তালুর মতো চেনা। ভুল হবার কথা নয়। ব্যাপারটা কী হল জানবার জন্য,

জিপে ওয়্যারলেসের হ্যান্ডসেট সবে হাতে নিয়েছেন তিনি, টিলার উপর থেকে মড়মড় শব্দে

আচমকা বিশাল একটা বোল্ডার তীব্র বেগে গড়িয়ে এসে পড়ল জিপের উপর। বিকট আওয়াজে আরোহীসমেত গাড়িটা ছিটকে উঠল। হঠাৎ ওই ঘটনায় যারা কাছে ছিল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। দারুণ আঘাতে গাড়িটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও আরোহী ওসি, ড্রাইভার এবং দু''জন পুলিশ কর্মীর তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লেও কারও তেমন চোট লাগেনি।

অদ্ভুত ওই ঘটনায় ওসি এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, সেদিন কিছুই আর করতে পারেননি। পরের দিন লম্বা ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সাতারা, দেশের বাড়িতে। থানায় সেই ওয়ারেন্টেরও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন করেও কোনও উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া যায়নি। এজন্য মাস কয়েক সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হয়েছিল।

যাই হোক, সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ কিন্তু কোনও সুরাহাই করতে পারেনি। অত বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে দেওয়া দু"একজন মানুষের কাজ নয়। অথচ তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছিল, সেই সময় টিলার উপর কেউ ছিল না। রুদ্রনাথ লাহিড়ীর বাংলোও ফাঁকা ছিল। তিনি কী কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। চেষ্টা তারপরেও কম হয়নি। নতুন কেস ইস্যু হয়েছিল পুলিশের তরফে। কিন্তু নানা অদ্ভুত ঘটনায় রুদ্রনাথ লাহিড়ীর কেশাগ্রও স্পর্শ করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল রুদ্রনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে যাবতীয় কেস তুলে নিতে।

প্রমোটার বিনোদ জয়সোয়াল অবশ্য সেই কারণে দমে যায়নি। তিনি এরপর পুলিশ দিয়ে বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন। ততদিনে শুধু স্থানীয় থানাই নয়, শহরের পুলিশ দপ্তরেও ব্যাপারটা নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। তবু কোর্টের অর্ডার আর উপর মহলের চাপে একদিন কমিশনার মর্যাদার এক অফিসারের তত্ত্বাবধানে বাছাই করা বড় এক পুলিশবাহিনী পাঠানো হয়েছিল।

সেদিন কমিশনার সাহেবের জিপ ছিল সবার পিছনে। সামনে চার গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ। যথাস্থানের কাছে এসে কমিশনার সাহেব হঠাৎ খেয়াল করলেন, সামনে পুলিশের অন্য গাড়িগুলো বাঁ দিকে টার্নিং না নিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে। দেখে তৎক্ষণাৎ ওয়্যারলেসে ধরলেন তাদের। প্রত্যেকের জবাব, গলির মোড়ে পৌঁছে চেষ্টা করেও ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘোরাতে পারেনি। কমিশনার সাহেবের চোখের সামনেই এক এক করে চারটে ভ্যানই নির্দিষ্ট দিকে টার্নিং না নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল। তাই দেখে কমিশনার সাহেবেরও মনে হয়েছিল, তাঁর নিজের গাড়িও হয়তো ঘোরানো যাবে না। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে যখন দেখলেন, ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘোরাতেই গাড়ি দিব্যি বাঁ দিকের নির্দিষ্ট গলিতে বাঁক নিয়েছে। অদূরে পথের পাশে রুদ্রনাথ লাহিড়ীর টিলার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রায় আঁতকে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে মানা করেছিলেন। ড্রাইভারও মুহূর্তে উলটো দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দ্রুত পার হয়ে গিয়েছিল জায়গাটা।

বস্তির মানুষের কাছে এর কোনও কথাই চাপা থাকেনি। একদিন সবাই দল বেঁধে হাজির হয়েছিল রুদ্রনাথ লাহিড়ীর বাংলোয়। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রস্তাব করেছিল, সাহেবের বাড়িতে যখন কোনও কাজের মানুষ নেই, ওরা সেই দায়িত্ব নিতে পারে। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে।

কিন্তু সেকথায় একেবারেই পাত্তা দেননি তিনি। বরং তাদের প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বলা যায়।

শুধু বস্তির মানুষ কেন। এসব চাপা থাকেনি অন্যদের কাছেও। বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টার হানা দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু রুদ্রনাথ লাহিড়ী তাদের কারো সঙ্গেই দেখা করেননি। হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েকটি কাগজ সত্য-মিথ্যা মনগড়া কিছু খবর ছেপেছিল অবশ্য। তারপর সব থিতিয়ে গেছে ক্রমে। তবে এত কিছুর পরেও প্রমোটার বিনোদ জয়সোয়ালকে দমানো যায়নি। প্রমোদ কামলেদের বস্তিও রক্ষা পায়নি। চিরাচরিত পথে কাজ হচ্ছে না দেখে লোকটা এরপর অন্য পথ ধরেছিল। নগদ টাকার থলি নিয়ে হাজির হয়েছিল কামলেদের কাছে। গোড়ায়

দু''চারজনের বেশি রাজি হয়নি। কিন্তু নগদ টাকার লোভ সামলাতে পারেনি কেউ। টাকা পেয়ে চলে গেছে একে একে। প্রমোদ কামলেও ব্যতিক্রম হয়নি।

এসব অনেক দিন আগের কথা। প্রমোদ কামলেদের মতো কয়েকজন ছাড়া ভুলে গেছে সবাই। তবে এসব শোনার পরে আমার কৌতূহল যে আরও বেড়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। কামলে বলতে না পারলেও ততদিনে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমার অনুমানে ভুল নেই। মানুষটি আদি ও অকৃত্রিম বঙ্গ–সন্তান। অতঃপর এক ছুটির দিনে সাহস করে ঢুঁ মারলাম ওঁর বাংলোয়। পাথুরে টিলার গায়ে ধাপকাটা সিঁড়ি। সামান্য উঠলেই বাংলোর হাতা। যথাস্থানে আরামকেদারা খালি পড়ে আছে। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হল, ভদ্রলোক ভিতরেই রয়েছেন। এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করলাম।

গোড়ায় সাড়া না পেলেও বার কয়েক টোকা দেবার পরে ভিতর থেকে ভারি গলায় আওয়াজ ভেসে এল, ''কৌন?''

উত্তর দেবার আগেই সশব্দে ভারি দরজাটা খুলে গেল। ওধারে দাঁড়িয়ে রুদ্রনাথ লাহিড়ী ভীষণ বিরক্ত মুখে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে নির্ভেজাল বাংলায় বললাম, ''স্যার, আমি আপনার প্রতিবেশী। আপনার পরিচয় জেনে—+''

আমার কথা শেষ হতে পেল না। তার আগেই ভদ্রলোক আমার মুখের উপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। ভিতর থেকে কোনও সাড়াই আর পাওয়া গেল না। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম। তবে সেজন্য রাগ হয়নি মানুষটির উপর। কাগজের বাঘা বাঘা রিপোর্টারই যখন ঘোল খেয়ে গেছে, সেখানে আমি তো খড়কুটো। বলা বাহুল্য, এরপর রুদ্রনাথবাবুর বাংলোর দিকে আর যাইনি। তবে কখনও রাস্তায় মুখোমুখি পড়ে গেলে চলার গতি কমিয়ে অপেক্ষা করেছি, যদি উনি মুখ খোলেন। কিছু বলেন। কিন্তু প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। মানুষটি আপন মনে পার হয়ে গেছেন পাশ দিয়ে।

এর প্রায় বছর খানেক পরের কথা। সেও এক ছুটির দিন। বিকেলে সামান্য কেনাকাটা করতে ম্যারোল বাজারের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখোমুখি। অভ্যাস মতো চলার গতি কমিয়ে দিয়েছি। যদিও জানি, ভদ্রলোক যথারীতি পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে গেল। উনি আমার সামনে প্রায় পথরোধ করে দাঁড়ালেন, ''নমস্কার ভাই।''

প্রায় থতমত খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। ভদ্রলোকের কৃত্রিম ডান হাতটা যথারীতি প্যান্টের পকেটে ঢোকানো থাকলেও বাঁ হাতটা তখনো কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল। মাত্র কয়েক মাসের ভিতর মানুষটির বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। জ্যা–মুক্ত ধনুকের মতো সেই শরীর অনেকটাই ন্যুব্জ। মুখমণ্ডলে সেই গাম্ভীর্যের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

তাড়াতাড়ি দু''হাত তুলে নমস্কার করে তাকিয়ে আছি। উনি হাত নামিয়ে বললেন, ''সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি সত্যিই ভীষণ দুঃখিত প্রশান্তবাবু। পরে খুব খারাপ লেগেছিল। আজ চলুন না আমার ওখানে। কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে। কফি চলে তো? নইলে চলার পথেই অল্প চা নিয়ে নেব। নো প্রব্লেম।'' মানুষটির দু''চোখে আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভদ্রলোকের এই ব্যবহারে অবাক হয়েছিলাম অবশ্যই। কিন্তু তার চাইতেও বেশি অবাক মানুষটির মুখে আমার নাম শুনে। ফস করে বলে ফেললাম, "কী আশ্চর্য, আমার নাম কার কাছে জানলেন? প্রমোদ কামলে?"

"প্রমোদ কামলে?" উনি অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তারপর অল্প চোখ নাচিয়ে বললেন, "ওহ্, আপনাদের হাউজিংয়ের চৌকিদার ছেলেটা? না ভাই। তবে ওর কাছে ভগবান রুদ্রদেবের অনেক খবর যে পেয়েছেন, তা জানি। গরিব বেচারা। ওদের জন্য কিছুই করতে পারিনি অবশ্য। তা যাকগে, চলুন না আজ।"

ভদ্রলোকের কথায় কৌতূহল যে বেড়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তবু ভদ্রতার খাতিরেই বললাম, "স্যার, কোথাও গিয়েছিলেন হয়তো। সবে ফিরছেন। সামনেই যখন রবিবার। বরং ওইদিন আপনার ওখানে যাব। কখন থাকবেন?"

কিন্তু উনি শুনলেন না। হাত ধরে বললেন, "সে তো ভাই সেই পরশু। হয়তো না–ও থাকতে পারি। দেখা যখন পেয়েছি, ছাড়ছি না।"

এরপর আর আপত্তি করা যায় না। তা ছাড়া বাজারে তেমন জরুরি কিছু নেই। ততক্ষণে উনি অবশ্য হাত ধরে প্রায় টানতে শুরু করেছেন।

ছোট আকারের বাংলো। একটাই বড় ঘর। গোটা কয়েক বেতের চেয়ার। একটা বড় গোলাকার টেবিল। একপাশে নিপাট বিছানা পাতা খাট। আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকলেও যত্নের ছাপ রয়েছে। টাইলস বসানো ঝকঝকে মেঝে। নিয়মিত পরিচর্যার ছাপ সুস্পষ্ট। একপাশে চমৎকার পর্দা ফেলা সরু দরজা। পরে বুঝেছিলাম, ওটা কিচেন।

ভিতরে বসিয়ে অল্প দু"চার কথার পরে উনি উঠে গেলেন হঠাৎ। পর্দা সরিয়ে কিচেনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যে ট্রেতে কফির সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এলেন। সঙ্গে মিল্ক–পট। সুগার–কিউব। এত কম সময়ের মধ্যে কী করে তৈরি করলেন, বুঝে উঠতে পারলাম না। তারই মধ্যে উনি যখন পট থেকে ধূমায়িত কফি কাপে ঢালতে শুরু করলেন, গন্ধেই বুঝলাম, জিনিসটা ইনস্ট্যান্ট নয়। ফোটানো অরিজিনাল কফি–বীন। মনে হল, হিটারে চাপিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়েছিলেন। একটা কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উনি বসতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, "ওই দেখুন, কফি খান কিনা, সে তো আর জানা হয়নি!"

সত্যি কথা বলতে কী, আমি একেবারেই কফির ভক্ত নই। তবু আজকালের ইনস্ট্যান্ট কফি এক- আধ কাপ চলে। ফোটানো কফি বিনের কড়া স্বাদ একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই উনি বলে উঠলেন, "দাঁড়ান তাহলে চা"ই নিয়ে আসছি।"

সেই কথায় প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "সে কী স্যার, এখন আবার দোকানে ছুটবেন নাকি!"

"কেন?" উনি অবাক হলেন যেন।

"তখন যে দোকান থেকে চা নেবার কথা বললেন।"

"বলেছিলাম বুঝি!" ভুরু কুঁচকে অল্প হাসলেন উনি। তবে এখন মনে হচ্ছে, চা বোধ হয় ঘরে রয়েছে। একটু বসুন।"

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উনি ফের কিচেনের দিকে চলে গেলেন। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে পর্দা ঠেলে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে এলেন। কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উলটো দিকে বেতের আরাম কেদারায় বসলেন।

ভদ্রলোক কীভাবে এত দ্রুত চা করে নিয়ে এলেন, যখন ভাবছি, কফির কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে উনি তাকালেন আমার দিকে।

"সেদিন আপনার সঙ্গে ওই ব্যবহারের পরে খুব খারাপ লেগেছিল। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। তারপর রাস্তায় দেখা হলে আপনার মনের ইচ্ছে বুঝেও কিছু করতে পারিনি। শেষে ভাবলাম, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে কেন আর একজনের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব।" মানুষটির কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভারি হয়ে আসছিল। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, "না–না, এতে অপরাধী মনে করার কী আছে! সেদিন কোনও কারণে আপনার মন নিশ্চয় ভাল ছিল না। অসময়ে এসে ভুলটা আমিই করেছিলাম হয়তো।"

রুদ্রনাথবাবু ম্লান হাসলেন। "সত্যি আমি অসামাজিক মানুষ। কুড়ি বছরের উপর এখানে আছি। অথচ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া একজন মানুষের সঙ্গেও সেভাবে আলাপ হয়নি।" থামলেন উনি। আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত সিলিংয়ের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, "অথচ সার্ভে দপ্তরের ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ার রুদ্রনাথ লাহিড়ী চিরকাল এমন ছিল না। সেই স্কুল–কলেজ থেকে শুরু করে অফিস, বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না কোথাও। তারপর হঠাৎ একদিন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম।" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন উনি। কেদারায় সোজা হয়ে বসলেন।

"আপনাকে আজ ডেকেছি, একটা গল্প শোনাব বলে। হ্যাঁ, গল্পই। শুনলে তেমনই মনে হবে। কিন্তু ঘটনা হল, এই গল্পের প্রতিটি অংশ সত্যি। ঘটেছিল আমার জীবনেই।" থামলেন উনি। সামান্য বিরতি দিয়ে বললেন, "তবে তার আগে একটা জিনিস আপনাকে দেখাব।"

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ হাতের কাপ নামিয়ে উঠে গেলেন উনি। ঘরের একধারে দেরাজের ভিতর থেকে কী একটা নিয়ে ফিরে এলেন। কাছে আসতে বুঝলাম, একটা ধাতব আংটি। দেখেই চিনতে পারলাম। এর আগে ভদ্রলোকের বাঁ হাতের মধ্যমায় পাথর বসানো বড়সড় আংটিটা দেখেছি। সন্দেহ নেই, সেই কারণেই আজ প্রথম থেকে ভদ্রলোকের হাত কেমন খালি মনে হচ্ছিল। তবে আংটির কথা মনে আসেনি। ইতিমধ্যে ফের কেদারায় বসে রুদ্রনাথবাবু আংটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। "ভাল করে দেখুন তো এটা।"

হাতে নিয়ে আংটিটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। বড় ব্যাসের আর পাঁচটা আংটির মতোই। তবে বেশ ভারি। রং কালচে হলেও মনে হল, লোহা বা ওই জাতীয় কোনও ধাতু নয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। মেটালার্জির উপর কিছু পড়াশুনাও রয়েছে। তবু ভাল করে দেখেও বুঝে উঠতে পারলাম না। মাঝারি আকৃতির একটা পাথর বসানো। বেশ উজ্জ্বল। বললাম, "এই আংটিটাই তো আপনার আঙুলে দেখেছি। তাই না?"

সামান্য মাথা নাড়লেন উনি, "মাত্র গত সপ্তাহে খুলে রেখেছি। ওই যে পাথরটা দেখছেন, বছর কয়েক আগে ঔজ্জ্বল্য আরও বেশি ছিল। এখন কিছুটা হলেও, ঝাপসা হয়ে গেছে। ভাল করে দেখুন তো, পাথরটার ভিতরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

রুদ্রনাথবাবুর কথায় ফের আলোর সামনে এনে পাথরটা দেখলাম। কিন্তু তেমন কিছুই নজরে পড়ল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় সেটা বুঝতে পারলেন উনি। বললেন, "দুটো রঙের বিন্দু।"

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তেমন কিছু নজরে পড়ল না। আমি নীরবে সামান্য মাথা নাড়তেই রুদ্রনাথবাবু আগ্রহে কেদারা ছেড়ে উঠে ঝুঁকে পড়লেন আংটির উপর।

"কিছু দেখতে পাচ্ছেন না!" মানুষটির কণ্ঠস্বরে চাপা উচ্ছ্বাস। প্রায় ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে আংটিটা নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন। উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখ দুটো মুহূর্তে কেমন নিবে গেল। বিষণ্ন গলায় বললেন, "দেখতে পেলেন না! সামান্য ধারের দিকে। খানিক আগে মাঝখানে ছিল। সরে এসেছে। আসলে ওই বিন্দু দুটো আংটির চোখ। ব্যাপারটা বুঝতে অবশ্য আমার কয়েক বছর সময় লেগেছিল।"

ভদ্রলোকের ওই অদ্ভুত কথায় হাঁ করে তাকিয়ে আছি। রুদ্রনাথবাবু অল্প হাসলেন। "গত চল্লিশ বছরে আংটিটা আমি অনেককেই দেখিয়েছি। লক্ষ করেছি, ভিতরের ওই বিন্দু দুটো কেউ দেখতে পেলেও অনেকেই পাননি। তবে বিশেষজ্ঞ যাঁদের দেখিয়েছি, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন, আংটিটা যে ধাতু দিয়ে তৈরি, তা আমাদের চেনা কোনও ধাতু নয়। আমার এক জিওলজিস্ট বন্ধুর অনুমান, আংটির ধাতু পৃথিবীতে ছিটকে পড়া কোনও মহাজাগতিক উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া। রহস্যময় ওই আংটি আমার গোটা জীবনটাই পালটে দিয়েছে।"

উপর্যুপরি গোটা কয়েক চুমুকে কফির কাপ শেষ করে নামিয়ে রাখলেন রুদ্রনাথবাবু। "আপনার চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

সামনে চায়ের কাপের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি সেটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলাম। বড় কাপ। দ্রুত চুমুক দিয়েও শেষ হতে সময় লাগল। রুদ্রনাথবাবু নিঃশব্দে পাইপে তামাক ভরলেন ততক্ষণ। তারপর মুখে নিয়ে অগ্নি সংযোগ করে গোটা কয়েক মৃদু টান দিয়ে বললেন, "আংটিটা পেয়েছিলাম অদ্ভুতভাবে। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। মণিপুরে এক দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে সার্ভে করতে গিয়েছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে কুলি, ভারবাহী অশ্ব আর অশ্বতর নিয়ে এক বিশাল টিম। যার উপর দায়িত্ব ছিল, তিনি স্থানীয় কুলি জোগাড় করতে না পারায় আনতে হয়েছিল বাইরে থেকে। তাই যথাস্থানে পৌঁছোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বর্ষা একটু আগেই শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য বাধাবিপত্তির মধ্যেও কাজ চলছিল যথাসম্ভব দ্রুত গতিতেই। আসলে তখন ব্রিটিশ আমল। কাজে ফাঁকি ছিল না।

সেদিন একটা পাহাড়ের ঢালে জরিপের কাজ চলছে। ঢালের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গা দেখে সেখানেই জরিপের যন্ত্রপাতি বসাতে বললাম। কাজে নেমে কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। মস্ত এক পাথর সেই সমতলের ঠিক মাঝখানে পড়ে রয়েছে। উপায় না দেখে জনা কয়েক কুলি লাগিয়ে সেই পাথর ঠেলে নীচের খাদে গড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম। পাথরটা দেখে যেমন মনে হচ্ছিল, তুলনায় অনেক ভারি। তাই যথেষ্টই বেগ পেতে হল। জনা কয়েক কুলি দিয়ে শুরু হয়েছিল। ব্যাপার দেখে একে একে টিমের প্রায় সবাইকেই কাজে লাগাতে হল। অনেক কসরতে সেই পাথর যখন সরানো হল, বেলা পড়ে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। হাতে সময় তেমন নেই। অগত্যা সেদিনের মতো বিরতি দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। কোনও কারণে আমার বেরোতে দেরি হয়েছিল। তাঁবু থেকে অকুস্থল দূরে নয়। তবু তখনো সেখানে পৌঁছোতে পারিনি। হঠাৎ দেখি সহকারী জগবীর প্রায় ছুটতে ছুটতে তাঁবুর দিকে আসছে। মুখোমুখি হতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তাজ্জব ব্যাপার স্যার! গতকাল যে পাথরটা গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটা ফের সেই আগের জায়গাতেই পড়ে আছে। যন্ত্রপাতি কিছুই বসানো যায়নি।"

শুনে প্রায় ধমকে উঠলাম, "কী বাজে বকছিস!"

"বাজে কথা নয় স্যার। দেখবেন চলুন।" দু"হাত তুলে মাথা ঝাঁকাল জগবীর।

প্রায় ছুটতে ছুটতে অকুস্থলে পৌঁছুলাম। জগবীর কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেনি। গতকাল যে পাথরটা ইউনিটের প্রায় সমস্ত কুলি নীচে গড়িয়ে ফেলতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল, সেটা যথাস্থানে পড়ে আছে। প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর খাদে ফেলে দেওয়া পাথরটা ফের কীভাবে এখানে এল, অনেক ভেবেও কিনারা করা গেল না। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আলতো করে তুলে এনে ফের যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেছে। এমন কাজ যার পক্ষে সম্ভব, সে মানুষ না অন্য কিছু! একবার মনে হয়েছিল, কাকতালীয় ভাবে উপর থেকে একই আকৃতির অন্য কোনও পাথর হয়তো গড়িয়ে এসেছে। কিন্তু অচিরাৎ সেই ধারণা বাতিল করতে হল। এতবড় একটা পাথর উপর থেকে গড়িয়ে এলে যেসব চিহ্ন থাকে, তার কিছুই নেই।

আসামের এদিকে ফিল্ডওয়ার্ক এই প্রথম নয়। কিন্তু এমন কখনও হয়নি। সবাই হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ইউনিটের প্রধান হিসেবে আমার নির্দেশের অপেক্ষায়। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে খানিক দূরে পাথরের এক ভগ্ন দেয়ালের অংশ নজরে পড়েছে। সম্ভবত পরিত্যক্ত কোনও গৃহের অবশেষ। মনস্থির করে পাথরটা আবার সরিয়ে দিয়ে জায়গাটা খুঁড়ে দেখতে বললাম।

পাথরটা সরাতে সময় লাগলেও খুব বেশি খুঁড়তে হল না। সামান্য মাটি- পাথর সরাতেই একটা নরকঙ্কালের অংশ বিশেষ নজরে পড়তে বোঝা গেল, পুরোনো এক কবর। বেজায় ঘাবড়ে গেলেও কুলিরা কাজটা শেষ করল অবশ্য। বেরিয়ে এল একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের কঙ্কাল। যথেষ্ট পুরোনো হলেও তখনো বেশ ভাল অবস্থায়। ডান হাতের উপরের সামান্য অংশ ছাড়া বাকিটা নেই। দেখে বোঝা যায়, কোনও দুর্ঘটনায় কাটা গেছে। তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, কঙ্কালের বাঁ হাতের মধ্যমায় একটা আংটি। কৌতূহলে তুলে নিলাম।

বড় ব্যাসের আংটি। বোঝা যায়, মানুষটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আরও দুটো ব্যাপার বুঝেছিলাম। প্রথমত, আংটিটা সম্পূর্ণ অচেনা কোনও ধাতুর। দ্বিতীয়টি আংটির পাথর। মসৃণ ডিম্বাকৃতি পাথরটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। প্রায় হীরের মতো। কাটাই না হলে হীরের ঔজ্জ্বল্য আসে না। এটা কিন্তু তেমন নয়, মসৃণ। সেই মুহূর্তে এই দুটি জিনিসই আমাকে আংটিটার ব্যাপারে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তাই স্থির করলাম, নিজের কাছে রেখে দেব। কোথায় রাখা যায়, ভাবতে গিয়ে নিজের আঙুলের কথাই আগে মনে পড়ল। পরতে গিয়ে দেখি, ডান হাতের অনামিকায় দিব্যি মানিয়ে গেছে।

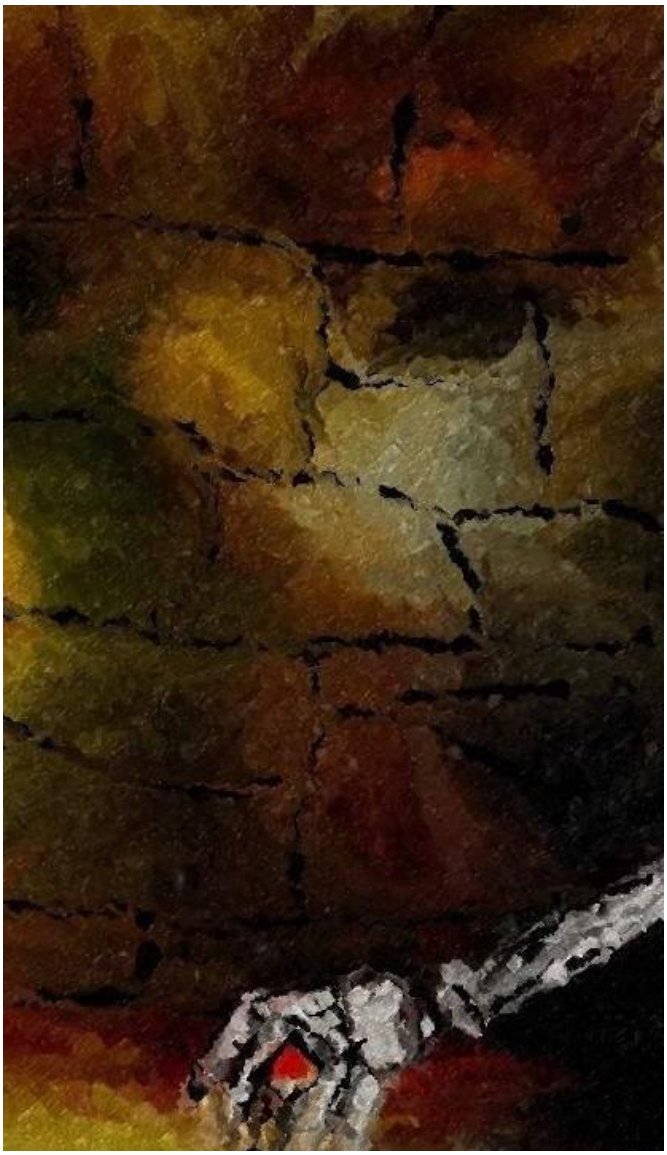

আমার কাণ্ড দেখে ইউনিটের সবাই তখন প্রায় সিটিয়ে রয়েছে। কুলিদের সর্দার কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়ে বলল, "এটা ঠিক হল না হুজুর। জিনিসটা যেমন ছিল, সেখানেই রেখে দিন। জায়গাটা ভাল নয়।"

কুলিসর্দার কী ভেবে অমন কথা বলেছিল, জানি না। আমি কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

সেদিন কাজ শেষে সন্ধেয় টেন্টে ফিরে কফির কাপ হাতে লণ্ঠনের আলোয় আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলাম। লণ্ঠনের মৃদু আলোতেও আংটির পাথর থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ এক অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ল। দুটি অতি ক্ষুদ্র কালো বিন্দু সেই পাথরের ভিতর নড়ে বেড়াচ্ছে। খুব ধীর গতিতে। গোড়ায় মনে হয়েছিল, চোখের ভুল। কিন্তু অচিরেই বুঝলাম, দেখায় কিছুমাত্র ভুল হয়নি। খুব ধীরে হলেও বিন্দু দুটো সচল। তবে দুটির মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বদলাচ্ছে না। একই থাকছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, উজ্জ্বল পাথরটার ভিতর দুটো জীবন্ত চোখ যেন চারপাশে নজর রেখে চলেছে। ভাবনাটাকে সেই মুহূর্তে তেমন গুরুত্ব দেইনি অবশ্য। তবে পরে বুঝেছিলাম, সেদিনের সেই প্রাথমিক অনুমানে ভুল ছিল না।

সকাল থেকে পরপর যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে ওই আংটি এরপর কেউ হাতে রাখত কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্বভাবে বরাবরই ছিলাম কিছুটা ডাকাবুকো। তখন তো বয়স আরও কম। একটু ঘাবড়ে গেলেও পরোয়া করিনি। ভাবলাম, দেখাই যাক না কী হয়। সুতরাং আঙুলেই রইল সেটা।

এরপর দিন কয়েক কাজ হল প্রায় ঝড়ের গতিতে। এছাড়া উপায় ছিল না। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। রেডিওতে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, দিন কয়েকের মধ্যেই হয়তো মনসুন শুরু হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ি অঞ্চলের বর্ষা বড়ো ভয়ানক। তার আগেই যতটা সম্ভব কাজ শেষ করে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজের চাপে আংটির কথা তাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এর মধ্যেই এক রাতে আশঙ্কা সত্যি হয়ে হঠাৎই মনসুন শুরু হয়ে গেল।

এসব অঞ্চলে বর্ষা কখনও যে কী ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, যাদের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের বোঝানো মুশকিল। অভিজ্ঞতা আমাদেরও তেমন ছিল না। থাকলে আগেই হয়তো ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলতাম। বৃষ্টি শেষ রাতে শুরু হয়েছিল, পরের দিনটাও অবিশ্রান্তভাবে চলল। শুধু কাজকর্ম নয়, রান্নাবান্নাও বন্ধ। শুকনো খাবার খেয়ে সারাদিন কাটালাম। সন্ধেয় তাঁবুর ভিতরে ক্যাম্পকটে বসে লণ্ঠনের আলোয় যখন একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি, বাইরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। তাঁবুর ভিতর দিয়ে স্রোতের মতো জল বইছে। জলের তোড়ে ভিতরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। ভয় হচ্ছে, ক্যাম্পকটও ভেসে না যায়। ওই অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। সেই ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরে। ঝড়বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। ঝকমকে মিষ্টি রোদ তাঁবুর চিলতে ফাঁক দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে সাতটা। ভারতের পূর্ব প্রান্তে এসব অঞ্চলে সূর্যোদয় অনেক আগে হয়। অর্থাৎ, রোদ ইতিমধ্যে অনেকটাই চড়ে উঠেছে। শিয়রের কাছে লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছে। কী আশ্চর্য, কুলি, চাপরাশিরা সব গেল কোথায়! এত বেলা হয়েছে, অথচ কেউ ডেকে দেয়নি! লণ্ঠনটাও নেবায়নি!

বাইরে কারও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে আসতেই মুহূর্তে কেঁপে উঠল বুকটা। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! চারপাশে শুধু প্রকৃতির করাল তাণ্ডবলীলার চিহ্ন। একটা পাহাড়ের ঢালে ক্যাম্প করা হয়েছিল। পাশাপাশি গোটা কয়েক তাঁবু। একমাত্র আমার তাঁবু ছাড়া বাকি একটিরও চিহ্নমাত্র নেই। সর্বনাশা পাহাড়ি ধ্বসে সব ভেসে গেছে। চারপাশে এই ভয়ানক ধ্বসের মাঝে কীভাবে একমাত্র আমার তাঁবু রক্ষা পেয়ে গেল, অনেক ভেবেও কিনারা পেলাম না। শুধু তাঁবু কেন, চারপাশে কোনও গাছপালারও চিহ্নমাত্র নেই। মাটি সরে গিয়ে শুধু এবড়ো খেবড়ো পাথর। রাতে এতবড় প্রলয় ঘটে গেছে, বিন্দুমাত্র টের পাইনি!

প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে কীভাবে ফিরে এলাম, সে কথা এই কাহিনির জন্য অবান্তর। আমাদের পুরো ইউনিট সেবার সেই সর্বনাশা ধ্বসে তলিয়ে গিয়েছিল। দিন কয়েক পরে উদ্ধারকাজ শুরু হলে ছিন্নভিন্ন কিছু গলিত দেহাবশেষ আর ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের কিছু টুকরো শুধু উদ্ধার করা গিয়েছিল।

আকস্মিক সেই ঘটনার প্রভাব সামলে উঠতে সময় লেগেছিল। ইম্ফল হয়ে গৌহাটি পৌঁছেই কলকাতায় ট্রান্সফার চেয়ে আবেদন পাঠালাম। সেই সাথে মাস দেড়েকের ছুটিও নিয়ে নিলাম। এই সময় এক বিকেলে গৌহাটির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। শহরের প্রান্তে পাহাড়ের কোল ঘেঁষা পথটা বেশ নিরিবিলি। আমার মতোই দু''চারজন পদযাত্রী ছাড়া অন্য কেউ নেই। হঠাৎ তাদের ভিতর জটাজূটধারী এক সাধু উলটো দিকে থেকে বড় বড় পায়ে আমার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার ডান হাতের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে মুখের দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বললেন, ''বেটা, এটা কোত্থেকে পেয়েছিস তুই?''

সাধুজির প্রশ্ন গোড়ায় ঠিক ধরতে পারিনি। আশপাশে অন্য কাউকে করছেন ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি, উনি আমার হাত চেপে ধরলেন। প্রায় নির্জন রাস্তায় ওই অবস্থায় পড়ে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। সাধুজির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। উনি আমার হাতের আংটির দিকে আঙুল তুলে সেই একই প্রশ্ন করলেন।

ইতিমধ্যে কিছুটা সামলে নিয়েছি। আংটিটা সেই থেকে হাতে থাকলেও অবস্থার কারণে তেমন আর নজর দিইনি। হঠাৎ ওই প্রশ্নে চমকে উঠলাম। মনে হল, পথের মাঝে অচেনা মানুষকে আসল কথা না বলাই ভাল। শুধু বললাম, "কেন সাধুবাবা?"

"বেটা, এ রুদ্রভৈরবের আংটি। এ জিনিস সংসারী মানুষের জন্য নয়। এটা তুই আমাকে দিয়ে দে।"

লোভে চকচক করছিল তাঁর চোখ। সেদিকে তাকিয়ে মনে হল, সাধুজি ভড়কি দিয়ে জিনিসটা বাগিয়ে নিতে চাইছেন। বললাম, "মাফ করবেন সাধুবাবা।"

ভেবেছিলাম, সাধুজি সহজে ছাড়বেন না। কিন্তু তেমন কিছু হল না। শুধু বললেন, "বেটা, ভাল করলি না কিন্তু। এ জিনিস তোর জন্য নয়। দিতে না চাস, যেখান থেকে পেয়েছিস, যত তাড়াতাড়ি পারিস, তাকে ফিরিয়ে দিস।"

কথা শেষ করে হনহন করে চলে গেলেন উনি। এত সহজে ছাড়া পেয়ে আমিও হাঁফ ছাড়লাম। ব্যাপারটা ঘটল তার পরের দিন। আংটিটা আঙুলে রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। এতদিন সেভাবে আর লক্ষ্য করিনি। সেদিন সাধুর ওই ঘটনার পরে কিছুটা বাড়তি কৌতূহল নিয়ে রাতে আংটিটা খুলে দেখছিলাম। থাকতাম গৌহাটির সার্কিট হাউসে। রাতে খাবার সময় আর ডাইনিং রুমে যেতাম না। খানসামা ছোকরাকে বলা ছিল। খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত। সেদিন আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি, খানসামা ট্রেতে ডিনার নিয়ে এল। তাকে দেখেই মনে পড়ল, আজ সন্ধেয় সার্কিট হাউসে ঢোকার সময় রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, রাতে আপাতত গেস্টদের ঘরে ডিনার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকক্ষণ হল ন'টা বেজে গেছে। অনেক আগেই রেডি হয়ে গেছে ডিনার। কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, "আজ রুম সার্ভিস পাওয়া যাবে না শুনেছিলাম! "

টেবিলে ডিনার নামিয়ে ছেলেটা কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যার, সবাই খেয়ে গেছেন, আপনি আসছেন না, তাই নিয়ে এলাম।"

রাতে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যাস। খিদেও পেয়েছে। অযথা কথা না বাড়িয়ে খেতে বসে গেলাম। খানসামা ছোকরা চলে গেল।

পরের দিন খানিক বেলায় ট্রেনে রিজার্ভেশনের জন্য বের হয়েছি। স্টেশনের আগে লেভেল ক্রসিং। পার হাবার আগে দু"দিকে তাকাবার জন্য ঘাড় ফিরিয়েছি, চোখে পড়ল, অদূরে লাইনের পাশে পড়ে রয়েছে একটা আস্ত কাটা হাত। সম্ভবত অল্প আগে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখনও মাছি বসতে পারেনি। ওই দৃশ্য দেখে চোখ ফিরিয়ে পার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ততক্ষণে সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখ প্রায় স্থির হয়ে গেছে। কাটা হাতটার আঙুলে আমার সেই আংটি! খানিক দূর থেকেও জ্বলজ্বল করছে পাথরটা। মুহূর্তে হাতের দিকে তাকালাম। আংটি নেই। ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, গত রাতে যখন ওটা খুলে নিয়ে দেখছিলাম, সেই সময় খানসামা ডিনার নিয়ে আসতে তাড়াতাড়িতে আর আঙুলে পরা হয়নি। টেবিলে নামিয়ে রেখে খেতে বসে গিয়েছিলাম। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম।

সেই আংটি লাইনের পাশে পড়ে থাকা এই ছিন্ন হাতের আঙুলে কীভাবে এল যখন ভাবতে শুরু করেছি, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অজান্তেই কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেই ছিন্ন হাতের আঙুল থেকে আমি খুলে নিয়েছি সেটা। তারপর যখন সংবিৎ ফিরে এসেছে, মুহূর্তে পিছিয়ে এসেছিলাম কয়েক পা। ওই সময় তাকিয়ে দেখি, ছিন্ন হাতের কব্জির কিছু উপরে জোড়া ত্রিশূল আঁকা একটা উল্কি। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, গত কাল সেই সাধু যখন আমার হাত ধরেছিলেন, এই উল্কি তাঁর হাতে দেখেছিলাম। তবে কী এটা সেই সাধুবাবার হাত! ছিন্ন হাতের কব্জিতে জড়ানো রুদ্রাক্ষও সেই সাধুর হাতে দেখেছি।

রিজার্ভেশনের জন্য আর স্টেশনের দিকে যাওয়া হল না। দ্রুত সার্কিট হাউসে ফিরে এলাম। ম্যানেজারের কাছে সেই খানসামা ছেলেটির খোঁজ করতে তিনি জানালেন, সাবির নামে খানসামা ছেলেটি আগের দিন দুপুরে হঠাৎ মায়ের অসুস্থ হবার খবর পেয়ে বাড়ি চলে গেছে।

এই কারণেই যে গত রাতে গেস্টদের ঘরে ডিনার পৌঁছে দেওয়া যায়নি, ততক্ষণে বুঝতে বাকি নেই। তবু রহস্যে ভরা বাকি অংশের কথা ম্যানেজারের কাছে আর বলা গেল না। তাতে লাভও হত না। তাই দ্রুত ঘরে ফিরে এলাম। সন্দেহ নেই, খানসামা সাবিরের মতো দেখতে অন্য কেউ রাতে ডিনার নিয়ে এসেছিল। আমার অসাবধানতার সুযোগে টেবিলে রাখা আংটিটা তুলে নিয়ে গেছে। তারপর কোনও ভাবে পৌঁছে গেছে সেই সাধুর কাছে। কলকাতায় ফেরার ট্রেন ধরেছিলাম এই ঘটনার দিন কয়েক বাদেই।”

রুদ্রনাথ লাহিড়ীর পাইপ ইতিমধ্যে নিবে গিয়েছিল। গল্প থামিয়ে সেটা টেবিলের উপর নামিয়ে পরিষ্কার করে সুদৃশ্য পাউচ থেকে সযত্নে নতুন তামাক ভরলেন। তারপর মুখে নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় এক হাতে দেশলাই জ্বেলে অগ্নি সংযোগ করে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ টানবার পরে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “আমার জীবনে দ্বিতীয় ভয়ংকর ঘটনা সেই রাতে। ওই ট্রেনে।”

সিট পেয়েছিলাম দুই বার্থের এক কূপে। বাকি সিট খালি থাকায় অন্য কেউ ছিল না। তবু আরামে শুয়েও ঘুম আসছিল না। কদিন আগের সেই ভয়ানক ঘটনা তখনও প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। ঘুরেফিরে সমানে পাক খেয়ে যায় মাথায়। ইউনিটের অনেকেই খুব কাছের মানুষ ছিলেন। অনেক দিনের পরিচয়। তাদের এই ভয়ানক মৃত্যু সহজে মন থেকে দূর হবার নয়। রাত তখন প্রায় একটা। প্রচণ্ড গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে। কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে শুধুই অন্ধকার। ঘণ্টা খানেক এপাশ- ওপাশ করে মনে হল, চোখেমুখে জল দিয়ে এলে মন্দ হয় না। কামরার শেষ প্রান্তে বেসিন। উঠে গিয়ে ঘাড়ে, চোখেমুখে জল দিয়ে কিছুটা যেন আরাম বোধ হল।

রাতের ট্রেন। কামরার প্রায় সমস্ত জানলাদরজা বন্ধ। বেসিনের পাশে দরজাটা সামান্য খুলে দিলাম। এক ঝলক টাটকা বাতাসে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। বোধহয় আরামে চোখ দুটো সামান্য বুজে এসেছিল, হঠাৎ ট্রেনটা ভয়ানক দুলে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলাম। মনে হল, কেউ যেন ছুঁড়ে ফেলল আমাকে। তারপর কিছুই আর মনে নেই।

ব্যাপারটা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, এমন কিন্তু পরে মনে হয়নি। হঠাৎ খেয়াল হতে দেখি চারপাশে শুধুই অন্ধকার। তারপর কিছুটা সংবিৎ ফিরে আসতে টের পেলাম, গাঢ় অন্ধকারের ভিতর কোথাও শুয়ে আছি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম বটে, তবে মাথাটা সাফ হতে সময় লাগল। সম্ভবত মিনিট দুয়েক ওই ভাবেই ছিলাম। তারপর ঘোর কাটতেই একে একে মনে পড়ল সব কথা। ততক্ষণে অন্ধকার চোখে কিছুটা সয়ে এসেছে। তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, এক ধানখেতের ভিতর বসে রয়েছি। সামনে খানিক দূরে আবছা রেল লাইন। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, হঠাৎ সেই ঝাঁকুনিতে সম্ভবত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে গেছি। কিন্তু ওই প্রচণ্ড গতির ট্রেন থেকে ছিটকে পড়েও কীভাবে এমন বহাল তবিয়তে রয়েছি, ভাবতে গিয়ে ফের ধন্দে পড়ে গেলাম। অন্ধকারেই সামান্য হাত- পা খেলিয়ে নিয়ে বুঝলাম, সামান্যতম চোট- আঘাত কোথাও নেই।

ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি আর মাথা ঘামানো যায়নি। হঠাৎ খেয়াল হল, যাই হোক না কেন,

এই জনমানবহীন প্রান্তরে খোলা আকাশের নীচে এভাবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। অল্প আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি, ধানের পাতা ভিজে সপসপে। আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সওয়া একটা। অর্থাৎ, ইতিমধ্যে মাত্র পনেরো মিনিট পার হয়েছে। রাতের জন্য একটা আস্তানা অন্তত চাই। চারপাশে তাকিয়ে কোথাও আলোর চিহ্ন পেলাম না। অবশ্য এই রাতে কাছে যদি লোকালয় থাকেও, আলো জ্বেলে কে আর জেগে থাকবে? অগত্যা রেল লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বোধহয় আধ ঘণ্টার মতো হেঁটেছিলাম। হঠাৎ দেখি দূরে লাইনের

উপর গোটা কয়েক আলোর বিন্দু। সম্ভবত টর্চের। দেখে প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। অন্ধকার তখন চোখে আরও সয়ে এসেছে। অনেকটা চলার পরে দেখি অন্ধকারে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। গোড়ায় সেভাবে বুঝতে পারিনি। আরও এগোতে পিছনের কোচসহ গার্ডের কামরা নজরে পড়ল। গাঢ় অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার গার্ডের কামরায় কেউ নেই। কিন্তু ট্রেনটা আমাদেরই।

অন্ধকার রাতে সেই বিজন প্রান্তরে প্রায় অযাচিতভাবে ট্রেনের দেখা পেয়ে মনটা নেচে উঠলেও সন্দেহে দুলে উঠল ফের। গাড়ি এইভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন! অন্ধকার কামরার ভিতর মানুষের সাড়া পাওয়া গেলেও দরজা বন্ধ। আলোর বিন্দুগুলো ট্রেনের সামনের দিকে ঘোরাফেরা করছে। কাউকে আর ডাকাডাকি না করে এগিয়ে গেলাম সেই দিকে।

পুরো ট্রেনটাই অন্ধকার। কোনও কারণে ব্যাটারি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, টর্চ হাতে দু"একজনের কৌতূহলী মুখ। জিজ্ঞাসা করতে কেউ কিছু বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানা গেল, ট্রেন স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। তারপরে হঠাৎই সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে গতি ক্রমশ কমতে কমতে থেমে গেছে। সেও বেশ কিছুক্ষণ আগে। গার্ডের সঙ্গে কয়েকজন সামনে ইঞ্জিনের দিকে গেছে। এখনো ফেরেনি। অযথা কালক্ষেপ না করে লাইনের পাশ দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। আমার কামরা ওই সামনের দিকে। ইঞ্জিনের একটা কোচ পরেই।

দূর পাল্লার মেল ট্রেন। কোচের সংখ্যা এসব ট্রেনে বেশিই থাকে। তবু যেন বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। বোধহয় বেশ জোরেই হাঁটছিলাম। সামনে কয়েকজন মানুষ প্রায় উদভ্রান্তের মতো টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে। তাকিয়ে দেখি, গাড়িটা হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে। সামনে ইঞ্জিনের চিহ্নমাত্র নেই। কাপল ছেঁড়া। আতঙ্কে মাথার চুল মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠল।

সেই সময় আসাম থেকে কলকাতার ট্রেন আসত ইস্ট বেঙ্গলের উপর দিয়ে। নদীনালার দেশ। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখি সামনে বড় এক নদী, ভাঙা ব্রিজের অবশেষ। গোটা কয়েক স্প্যানের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ট্রেনের ইঞ্জিন সহ সামনের গোটা কয়েক কোচ কোথায় গিয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তলিয়ে গিয়েছে নদীর জলে। সামান্য চিৎকার, সাড়াশব্দ কোথাও নেই। শুধু বর্ষার দুরন্ত নদীর কলকল আওয়াজ। একটি প্রাণীও বেঁচে নেই।

হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে প্রায় হিম হয়ে গিয়েছিল সারা শরীর। ট্রেন থেকে ওইভাবে ছিটকে না পড়লে, এতক্ষণ কী অবস্থা হত, ভাবতেই হিম হয়ে আসছিল বুকের ভিতর। ওই অবস্থায় অদূরে ছোট এক জটলার দিকে ছুটলাম। ট্রেনের গার্ডকে ঘিরে ধরেছে কয়েকজন। মানুষটি নিজেও তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন ভয়ানক দুর্ঘটনা ভাবাও যায় না। তাঁর কাছেই জানা গেল, সম্ভবত জলের তোড়ে ব্রিজটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ড্রাইভার অন্ধকারে বুঝতে পারেননি। কাছে আসার পরে ব্যাপারটা বুঝে ব্রেক চাপলেও গাড়ির গতি পুরো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ইঞ্জিন সহ সামনের তিনটি কোচ নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে।

ওই তিনটি কোচের একটায় আমি ছিলাম, ভাবতে গিয়ে মাথাটা ফের ঝিমঝিম করে উঠলেও হঠাৎ অন্য এক ব্যাপার মাথার মধ্যে খেলে গেল। এর আগেরবার ওই রকম অদ্ভুতভাবে রক্ষা পাওয়ার পরে তেমন চিন্তা মাথায় আসেনি। মনে হয়েছিল, প্রকৃতির খেয়ালেই আমার তাঁবু ধ্বসের কবলে পড়েনি। তাই বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রথম অনুভব করলাম,

কোনও এক অদৃশ্য শক্তি অলক্ষ্যে আমার পিছনে কাজ করে চলেছে। তা না হলে দুর্ঘটনার অব্যবহিত আগে ওইভাবে ট্রেন থেকে ছিটকে গেলাম কী করে! শরীরে সামান্য আঘাতও লাগল না! ভয়ানক এই দুর্ঘটনা ঘটবে বলেই কি আমাকে ট্রেন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? সেই প্রথম সন্দেহ হল, এসব ওই আংটির জন্যই নয়তো?"

রুদ্রনাথ লাহিড়ী থামলেন আবার। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে গল্প গিলছিলাম। শুকনো গলা সামান্য ঝেড়ে নিয়ে বললাম, "তারপর?"

ওই সময় বাইরে হঠাৎ ঝিঁঝিঁর কোরাস শুরু হল। বেশ জোরাল। এতদিন আছি, ঝিঁঝিঁর আওয়াজ কখনও শুনিনি। তাও এত জোরাল! রুদ্রনাথবাবু হঠাৎ উঠে গিয়ে জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। বিকেলের আলো ইতিমধ্যে অনেকটাই মরে এসেছে। নিঃশব্দে কয়েক মিনিট অপেক্ষার পরে ফিরে এসে বললেন, "প্রশান্তবাবু, আজ থাক বরং। অন্য আর একদিন শুনবেন।"

অদ্ভুত গল্পে এতটাই মজে গিয়েছিলাম, মানুষটির সেই কথায় প্রায় আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু উপায় ছিল না। হয়তো কোনও দরকার আছে ওনার। বললাম, "ঠিক আছে স্যার। আগামী কাল শনিবার। তবু অফিস থেকে বেরোতে হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার পথে চলে আসব।"

"সন্ধেয়!" কতকটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল রুদ্রনাথ লাহিড়ীর কথা। তারপর গলাটা সামান্য ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "নাহ্, আজই বলি তাহলে। অনেক কথা বাকি হয়ে গেছে এখনো। তবে একটু সংক্ষেপেই সারব এবার।"

হয়তো অন্য কোনও কাজ আছে ভদ্রলোকের। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না বুঝেও গল্পের লোভে চুপ করে রইলাম। উনি শুরু করলেন আবার, "বদলির আবেদন মঞ্জুর হবে কিনা, তা নিয়ে কলকাতায় ফিরে কিছু দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমাদের যা চাকরি, কলকাতায় পোস্টিং সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু অবাক করে দিয়ে ছুটি ফুরুবার আগেই কলকাতায় বদলির অর্ডার এসে গেল। খবর জেনে বাড়ির সবাই খুব খুশি। দিন কয়েক পরে মা একদিন বললেন, "রুদ্র, এতকাল তো বাউণ্ডুলের মতো বনেজঙ্গলে ঘুরে কাটালি। এবার বিয়ে করে একটু সংসারী হ বাপু। দেখে যাই।"

আপত্তির কারণ ছিল না। দাদা আর ছোট বোনের বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। দাদার পোস্টিং বাইরে। বাড়িতে মা একা। রাজি না হবার কারণ ছিল না। মা পাত্রী পছন্দ করেই রেখেছিলেন। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল।"

রুদ্রনাথ লাহিড়ী ফের অল্প থামলেন। পাইপে মৃদু কয়েকটা টান দিয়ে জানলা দিয়ে অদূরে ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক। তারপর শুরু করলেন আবার, "আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু এখান থেকেই। পরে কতদিন আপসোস করেছি, কলকাতায় যদি ট্রান্সফার না নিতাম, জীবনটা হয়তো কিছু অন্য রকম হতেও পারতো।

আগে বলিনি, কলকাতায় এসে যখন তখন আংটির দিকে তাকিয়ে থাকা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ট্রেনের সেই ঘটনার পরে জিনিসটিকে তখন অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি। বিয়ের দিন দুই আগের কথা। সেদিন আনমনে আংটির দিকে তাকিয়েছি। চমকে উঠলাম। এ কী!

এমন তো আগে হয়নি! আংটির সবই ঠিক আছে, শুধু ভিতরের কালো বিন্দু দুটোর রং আমূল পালটে গেছে। কালোর বদলে টকটকে লাল। দুটো রক্তবিন্দু যেন জমাট বেধে আছে ভিতরে। কেন এমন হল, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বিয়ের দিন এসে গেল। এর মধ্যে অনেকবার আংটির দিকে নজর করেছি, রং সেই লাল–ই রয়েছে। পরিবর্তন হয়নি।

পাত্রীপক্ষের বাড়ি কলকাতার বাইরে। বিহার সীমান্তের কাছে। রিজার্ভ বাসে ঘণ্টা কয়েকের পথ। বাবা গিয়েছিলেন বরকর্তা হয়ে। সঙ্গে দাদা, বউদি, বোন আর ভগ্নীপতি। এছাড়া ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়–স্বজন। সব মিলিয়ে জনা কুড়ি মানুষ। অনেকটা পথ। তাই বিয়ের রাতে বরযাত্রীদের ফেরা সম্ভব নয়। ঠিক ছিল, পরের দিন নবদম্পতিসহ সবাই এক সাথে ফিরবে।

পরের দিন নানা স্ত্রীআচার সামলে রওনা হতে কিছুটা দেরিই হয়ে গিয়েছিল। সন্ধের মধ্যে নাকি বাড়ি ফেরা চাই। বাবা খুব তাড়া লাগাচ্ছিলেন। হাইওয়ে ধরে কলকাতার পথে বাস তখন প্রায় উড়ে চলেছে। সামনে একটা মালবোঝাই ট্রাক অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করছিল। চেষ্টা করেও আমাদের ড্রাইভার ওভারটেক করার জন্য সাইড পাচ্ছিল না। ওদিকে বাবার তাগাদা। সামান্য সাইড পেয়ে প্রায় মরিয়া হয়ে ড্রাইভার গিয়ার বদলে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড গতিতে আমাদের বাস সামনের ট্রাককে পাশ কাটালো। তারপরেই আচমকা দুলে উঠল গাড়ি। চারপাশে আর্তনাদ। কিছু বুঝবার আগেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সিট থেকে ছিটকে গেলাম। তারপর কিছুই আর মনে নেই।

জ্ঞান যখন হল, তখন হাসপাতালে। মাথাটা প্রচণ্ড ভারি, যেন হাজার মণ বোঝা চাপানো রয়েছে। পরে শুনেছিলাম, ওই অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে ছিলাম পুরো বাইশ দিন। আচমকা উলটো দিক থেকে আসা একটা ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রায় বিশ ফুট নীচে জল ভরতি খাদে ছিটকে পড়েছিল বাস। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একমাত্র আমি ছাড়া বাসের আর কেউ রক্ষা পায়নি। আশ্চর্য ব্যাপার, প্রায় ঘণ্টা দুই পরে স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় যখন জলের তলায় সেই অভিশপ্ত বাস থেকে আমাকে উদ্ধার করা হয়, তখনও নাড়ির গতি অতি ক্ষীণ হয়ে এলেও সচল। প্রায় দু''ঘণ্টার উপর জলের তলায় থেকেও কীভাবে এটা সম্ভব, ডাক্তারদের কেউই বুঝে উঠতে পারেননি। ভয়ানক থেঁতলে যাওয়ার কারণে ডান হাতটা অবশ্য কনুইয়ের উপর থেকে বাদ দিতে হয়েছিল।

আরও মাস দেড়েক পরে সামান্য সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। শরীর ভীষণ দুর্বল। কোনও মতে চলে বেড়াতে পারি। তার উপর ডান হাত হারিয়ে তখন নিতান্তই এক পঙ্গু মানুষ। বিধবা মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনা। মা অবশ্য যথাসাধ্য নজরে রাখতেন। কিন্তু আমি নিজেই ভিতরে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। মাস ছয়েক কেটে গেলেও শরীরে সামান্য উন্নতিও হল না। ওই অবস্থা দেখে মা ঠিক করলেন, আমাকে নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যাবেন। দেওঘরে যাওয়ার সব ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় একদিন বড়মামা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। হঠাৎ পকেট থেকে সেই আংটি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ''রুদ্র, তোর ডান হাতের সেই আংটি। রিলীজের দিন হাসপাতাল থেকে দিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম। রেখে দে।''

সত্যি কথা বলতে কী, আংটির কথা এর মধ্যে আর মনেই পড়েনি। অবস্থার বিপাকে পড়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বড়মামার হাতে জিনিসটা দেখে মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সেই লাল বিন্দু দুটোর কথা। দ্রুত হাত বাড়িয়ে আংটিটা নিলাম। কী বলব, আংটিটা হাতে নিতেই ভিতরে যেন এক অন্য অনুভূতি টের পেলাম। মনে হল, একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। মুহূর্তে অনেক হালকা হয়ে গেল শরীর। ব্যাপারটা অবশ্য বলিনি কাউকে। বড়মামাকে দিয়েই সেটা বাঁ হাতের আঙুলে পরে নিলাম। মধ্যমায় বেশ সেট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি, পাথরের সেই ক্ষুদ্র বিন্দু দুটোর রং আর লাল নেই। আগের মতোই ফের কালো হয়ে গেছে।

দেওঘরে চেঞ্জে যাবার ব্যাপারটা মাকে বলে পরের দিনই বাতিল করে দিলাম। কারণ, সেদিন আংটি হাতে নেবার পরেই বুঝেছিলাম, অযথা চেঞ্জে যাবার আর দরকার নেই। সত্যিই তাই। আংটি হাতে পরার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রায় মিরাকল ঘটে গেল। এই অল্প সময়ের মধ্যে শরীর শুধু আগের অবস্থায় ফিরে এল না, অনভ্যস্ত বাঁ হাতটাও ডান হাতের মতো কর্মক্ষম হয়ে উঠল। লেখা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজই দেখলাম বাঁ হাতে চমৎকার করতে পারছি। অথচ অন্য আর পাঁচ জনের মতো কোনও দিনই বাঁ হাতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। মিরাকল ছাড়া একে আর কী বলা যায়? আমার সেই উন্নতি দেখে ডাক্তারও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

অবশ্য আমার কাছে ব্যাপারটা তখন আর তেমন ছিল না। হাতের ওই আংটির রহস্য আমার কাছে তখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুঝতে তখন আর বাকি নেই, গৌহাটির রাস্তায় সেই জটাজূটধারী সাধুবাবা জিনিসটা ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। এ জিনিস সংসারী মানুষের জন্য নয়। আগের দু''বার নিজের কিছু হয়নি। কিন্তু

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেই অনতিবিলম্বে খোয়াতে হয়েছে একটা হাত। হারাতে হয়েছে নিজের একান্ত আপনজনদের। বাবা, দাদা–বউদি, বোন আর ভগ্নীপতিকে।

এর আগে জিনিসটা কখনও তেমন ভীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। কিন্তু এবার তাই হল। ক্রমে আংটিটা আমার কাছে প্রায় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। চোখ পড়লেই সারা শরীর প্রায় সিটিয়ে যেত। অথচ খুলে রাখার কথা ভাবতেও পারতাম না। মনে হত, ওটা খুলে ফেললেই সেই আগের মতো পঙ্গু হয়ে পড়ব। এভাবেই কাটল আরও মাস কয়েক। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও আংটির ভীতি কিন্তু বাড়তেই থাকল। শেষে ঠিক করলাম, যাই ঘটুক, আংটিটা যেখান থেকে এনেছিলাম, সেখানেই রেখে আসব। সেই কবরের ভিতর কঙ্কালের আঙুলে। গৌহাটির রাস্তায় সাধুবাবা তেমনটাই বলেছিলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন মণিপুরের পথে রওনা হয়ে পড়লাম। বাড়িতে মাকে ঘুণাক্ষরেও জানাইনি ব্যাপারটা। সেই সময় বন–জঙ্গলে ভরা মণিপুরের প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে পাড়ি দেওয়া সহজ ছিল না। অনেকটাই হাঁটা পথ। গাইড, মালপত্র বইবার কুলি ছাড়া এক পা''ও চলা সম্ভব নয়। আগের বার ইম্ফলে সদানন্দ থিয়ামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিছু সাহায্যও করেছিল আমাদের। প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। ইম্ফলে পৌঁছে সেই সদানন্দ থিয়ামের কথাই মনে পড়ল আগে। সদানন্দ ঠিকেদারের কাজ করে। ভেবেছিলাম সহজেই কাজটা হয়ে যাবে। কিন্তু গন্তব্যস্থানের কথা শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, ''স্যার জায়গাটা ভাল নয়। ওদিকে যাবার লোক পাওয়া মুশকিল।''

সদানন্দের কথায় মনে পড়ল, আগের বার চেষ্টা করেও স্থানীয় কুলি জোগাড় করা যায়নি। তবে সেবার দায়িত্বটা আমার উপর ছিল না। তাই তেমন মাথা ঘামাইনি। অধীর হয়ে বললাম, ''মি. থিয়াম, ওসব শুনতে চাই না আমি। দু''চারজন কুলি জোগাড় করে দিতেই হবে। খুব দরকার।''

আমার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দ থিয়াম অল্প সময় কী ভাবলেন। তারপর এক টুকরো কাগজে কয়েক লাইনের একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ''স্যার, এই ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে পারলে একমাত্র হাওবিজন সিংহ''ই পারবে। ও কৈরাঙের দিকে থাকে। এই চিঠি নিয়ে একবার দেখা করুন।''

কৈরাঙে হাওবিজন সিংহর সঙ্গে সেই দিনই দেখা করলাম। যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ। তিনি আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, ''স্যার, শুনেছেন নিশ্চয়, পাহাড়ের ওই অঞ্চলে মণিপুরের মানুষ বড়ো একটা যায় না। এড়িয়ে চলে। তবু সদানন্দ যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। তবে তার আগে জানা দরকার, ঠিক কী কাজে ওই দিকে যেতে চাইছেন?''

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধা হল না, কোনও কথাই মানুষটির কাছে গোপন করা ঠিক হবে না। সামান্য ঢোঁক গিলে বললাম, ''সব বলব। তবে তার আগে যদি বলেন, কী কারণে ওদিকে কেউ যেতে চায় না।''

“সে অনেক দিন আগের কথা স্যার।” হাওবিজন সিংহ বলতে শুরু করলেন, “কতদিন আগে, কেউ বলতে পারে না। একরাতে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে আকাশ থেকে স্বয়ং রুদ্রদেব নেমে এসেছিলেন ওই পাহাড়ে। রাতের মধ্যেই সেখানে এক মন্দির গড়েছিলেন। ওদিকের ওই পাহাড়ে তখন প্রচুর জনবসতি ছিল। দলে দলে মানুষ তাঁর শিষ্য হতে লাগলেন। এভাবে হয়তো সারা মণিপুরের মানুষ ভগবান রুদ্রদেবের অনুগামী হয়ে যেতেন। কিন্তু কোনও এক কারণে ভয়ানক বিরূপ হয়ে তিনি এক রাতে হঠাৎই স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই মন্দিরও ভেঙে পড়েছিল। এর অল্প দিনের মধ্যেই পাহাড়ে নানা অঘটন ঘটতে শুরু করল। ঘন ঘন ধ্বস আর ভূমিকম্পে মারা পড়ল বহু মানুষ। প্রাণভয়ে একে একে পালিয়ে এল সবাই। অল্প দিনের মধ্যেই জনশূন্য হয়ে পড়ল। রুদ্রদেবের অভিশাপে সেই থেকে নানা অঘটন আজও ওই অঞ্চলে ঘটে চলছে।”

হাওবিজন সিংহের ওই কথায় প্রমাদ গুনলেও কিছুই গোপন না করে সব খুলে বললাম ওকে। সব শুনে বৃদ্ধ মানুষটি চিন্তিত মুখে বললেন, “যা বললেন, মনে হচ্ছে, সেই রুদ্রদেবের মন্দির থেকেই আপনি আংটিটা পেয়েছেন! এখন ফিরিয়ে দিতে গেলে মনে হয়, আরও বড় বিপদে পড়তে পারেন। ভগবান রক্ষা করুন।” বলতে বলতে বার কয়েক কপালে হাত ছোঁয়ালেন উনি।

“হয়তো ঠিকই বলেছেন।” মাথা নাড়লাম আমি। “কিন্তু বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় অন্য কোনও পথ আমার কাছে আর খোলা নেই। ওই আংটি কাছে রাখলে শুধু মা নয়, আত্মীয়স্বজন অন্য যাঁরা এখনও বেঁচে রয়েছেন, তাঁদেরও এরপর হারাতে হবে।”

“আমি, আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য।” বৃদ্ধ মানুষটি অল্প মাথা নাড়লেন। “আপনি দুটো দিন অপেক্ষা করুন।”

হাওবিজন সিংহ দুটো দিন সময় চেয়ে নিলেও একদিনের মধ্যেই তিনজন নাগা পোর্টার জোগাড় করে দিয়ে বললেন, "মাফ করবেন স্যার, চেষ্টা করেও তেমন ভাল কোনও মণিপুরি গাইড জোগাড় করতে পারলাম না। ওদের কেউ থাকলে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। তবে কুলিদের সর্দার সুমি আও বিশ্বস্ত মানুষ। যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখবে।"

প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র নিয়ে পরের দিনই রওনা হয়ে পড়লাম অকুস্থলের উদ্দেশ্যে। যদিও অল্প দিন আগের কথা। তবু পাহাড়, বন–জঙ্গলের ভিতর কোনও বিশেষ জায়গা খুঁজে বের করা সহজ নয়। আগেরবার কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অক্ষাংশ–দ্রাঘিমাংশ সংক্রান্ত কোনও তথ্যও ছিল না। কিন্তু সুমি আও সত্যিই কাজের মানুষ। বলা যায়, তার চেষ্টায় দিন কয়েক পরে খুঁজে বের করলাম সেই কবর। তারপর মাটি খুঁড়ে কী দেখলাম জানেন?"

বলতে বলতে রুদ্রনাথ লাহিড়ী হঠাৎ থামলেন। নিঃশব্দে শুনছিলাম। ঢোঁক গিলে কোনওক্রমে বললাম, "কী?"

"সেই অত বড় কঙ্কালটা, মাত্র মাস কয়েক আগেও যেটিকে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় দেখে গেছি, তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে রয়েছে। যেন ভারি জাঁতায় ফেলে পেষাই হয়েছে হাড়গুলো। খানিকটা সাদা গুঁড়ো শুধু মিশে রয়েছে মাটিতে। সাধুজি বলেছিলেন, আংটিটা যার কাছ থেকে আনা হয়েছে, তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। কিন্তু এই অবস্থায় তা কীভাবে সম্ভব, ভেবে উঠতে পারলাম না। কঙ্কালের কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই! তবু অনেক ভেবে সেই কবরের মধ্যেই আংটিটা রেখে দিলাম।

অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল তারপর। অযথা দেরি না করে পরের দিন ভোরেই ফেরার পথ ধরেছিলাম। সকাল থেকে শরীরটা তেমন জুত মনে হচ্ছিল না। সামান্য জ্বরও ছিল। কিন্তু তেমন গা করিনি। মনে হয়েছিল, একটানা পাহাড়ি পথে চলার কারণেই হয়েছে। সেদিন ওই অবস্থার মধ্যেও চলে এসেছিলাম অনেকটা পথ। সন্ধেয় তাঁবু ফেলা হতে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তারপর কিছুই আর মনে নেই। পরে কুলিদের কাছেই শুনেছি, দারুণ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। রাতে কেউ টের পায়নি। সকালে আমার ওই অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবু ফেলে পালায়নি। নিজেদের মতো করে যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষা করেছিল। পরের দুটো দিন সেই তাঁবুর মধ্যেই কোমায় পড়ে ছিলাম। সেই অবস্থা দেখে ওরা যখন আমাকে ফেলে চলে যাবে কিনা ভাবছে, সেই সময় সুমি আওয়ের মাথায় এসেছিল ব্যাপারটা। কুলিদের একজনকে আমার কাছে রেখে অন্যজনকে নিয়ে ফের চলে গিয়েছিল সেই কবরের ভিতর রেখে আসা আংটির খোঁজে। অনেকটাই পথ। ফিরতে পরের দিন বিকেল হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুমি আও সেই আংটি পরিয়ে দিয়েছিল আমার আঙুলে। আমার জ্ঞান ফিরে আসে তার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। সন্ধের আগেই একদম সুস্থ।

এই ঘটনার পরে বুঝতে বাকি থাকেনি, আংটিটা আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। চাইলেও আর ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা টের পাবার পরে কর্তব্য ঠিক করে নিতে আর দেরি করিনি। বাকি জীবনটা কারো সংস্পর্শেই আর থাকব না। অযথা অন্যের বিপদের কারণ আর হতে চাই না।

গৌহাটি ফিরেই প্রথমে মাকে চিঠি লিখলাম। তারপর রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিলাম অফিসে। এরপর চলে এলাম পুনায়। ছিলাম প্রায় কুড়ি বছর, তারপর এই বোম্বাই শহরে। নয় নয় করে এখানেও তো প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল।"

"পুনা ছাড়লেন কেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"সে আর এক ইতিহাস। পুনা থেকে কখনও যে চলে যেতে হবে, সত্যিই ভাবিনি। পাহাড়–ঘেরা ছিমছাম শহরটা ভালও লেগে গিয়েছিল। কিছু বাঙালিও ছিলেন ওখানে। বেশ ভালই ছিলাম। তারপর——।"

বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গেলেন ভদ্রলোক। বাইরে ঝিঁঝিঁর আওয়াজ ইতিমধ্যে আরও জোরাল হয়েছে। সেই সাথে তীব্র বেগে বাতাস আছড়ে পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমন দমকা একটা আওয়াজ। অথচ বাইরে জোরাল বাতাস বইছে, এমন মনে হল না। জানলার পর্দা স্থির। রুদ্রনাথবাবু কেদারায় বসেই সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে উঠল। মনে হল, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টাও করছেন। তারপর নড়ে উঠে বললেন, "আজ থাক সেকথা। শুধু বলি, ততদিনে রহস্যময় ওই আংটির অনেক কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুঝতে বাকি থাকেনি, গৌহাটির পথে জটাজূটধারী সেই সাধুবাবার চোখও সেদিন কেন লোভে চকচক করে উঠেছিল। কিন্তু আমি তো সাধু–সন্ন্যাসী বা স্বামীজি নই। হবার ইচ্ছেও ছিল না। তাই হঠাৎই একদিন চলে আসতে হল। এই সাকিনাকায় যখন আসি, প্রায় ফাঁকাই ছিল এদিকটা। প্রমোদ কামলেদের কিছু ঝুপড়ি ছাড়া তেমন কিছুই ছিল না। বেশ নিরাপদ মনে হয়েছিল। কিন্তু সেও তো ভরে উঠল দেখতে দেখতে। প্রমোদ কামলেদের কাছেও তো হয়ে গেলাম ভগবান রুদ্রদেব। হয়তো এইভাবেই বহু বছর আগে আমার মতোই অন্য কোনও রুদ্রনাথ মণিপুরে সেই পাহাড়ের মানুষের কাছেও ভগবান হয়ে উঠেছিলেন। তবু প্রমোদ কামলেরা সরল, সহজ মানুষ। কখনও সমস্যার কারণ হয়নি। কিন্তু যাক সে কথা। বরং যে জন্য আপনাকে আজ ডেকেছি, সেটাই বলি।"

রুদ্রনাথবাবু অল্প থামলেন। মুখের পাইপ ইতিমধ্যে নিবে গেছে। টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, "ওই প্রমোদ কামলেরা ছাড়া সবাই আমাকে দাম্ভিক বদমেজাজি বলেই জানে। আমিও সেটাই চেয়েছি। বিশ বছর আছি এখানে, হাটে বাজারে প্রয়োজনীয় দরকার ছাড়া বিশজন মানুষের সঙ্গেও আলাপ হয়নি। সেজন্য অনেকেই ক্ষুব্ধ। তবু আসল কারণ কাউকেই বলিনি। হয়তো আপনাকেও শোনাতাম না। কিন্তু হঠাৎই ঘটেছে ব্যাপারটা। সপ্তাহ খানেক আগে হঠাৎ এক সকালে দেখি, আংটির কালো বিন্দু দুটো আবার লাল হয়ে উঠেছে। সেই যে বিয়ের আগে একবার হয়েছিল, তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে এই প্রথম। সেবার একটা হাতের উপর দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার আরও ভয়ানক কিছু ঘটবে বলেই মনে হয়। আংটির চোখ দুটো সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য এসবে এখন আর ভিতরে তেমন প্রতিক্রিয়া হয়না। তাই সেই দিনই খুলে রেখেছি ওটা।"

থামলেন ভদ্রলোক। ভেবেছিলাম, হয়তো আরও কিছু বলবেন। কিন্তু খানিক অপেক্ষার পরে তেমন সম্ভাবনা নেই বুঝে বললাম, "স্যার, মনে হচ্ছে, আরও অনেক কিছুই বলার আছে

আপনার। সে যাই হোক, একটা কথা বলি, আপনি আংটির পাথরের ভিতর লাল বিন্দুর কথা বলছেন, আমি কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পাইনি। অযথাই চিন্তা করছেন।"

বাইরে ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। টেবিল ল্যাম্পটা আগেই জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল, রুদ্রনাথবাবু উঠে গিয়ে ঘরের বাতিগুলো জ্বেলে দিলেন এবার। আংটিটা সেই থেকে টেবিলের উপরেই রয়েছে। কেদারায় ফিরে এসে সেটা হাতে নিয়ে মিনিট কয়েক ঘরের জোরালো আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফের নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হয়তো তাই। তবে লাল বিন্দু দুটো কিন্তু রয়েছে। মৃদু নড়ছেও। আগের জায়গা থেকে কিছু সরেও গেছে।"

ভদ্রলোকের কথায় ইচ্ছে হল আংটিটা ফের হাতে নিয়ে দেখব। টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়েছি, প্রায় হিমশীতল গলায় ভদ্রলোক বললেন, "সন্ধে হয়ে গেছে প্রশান্তবাবু। ভিতরে বিন্দু দুটো যখন আপনি দেখতে পাননি, এই রাতে আর টাচ করতে যাবেন না।"

"কেন?" অবাক হয়ে বললাম।

"বলেছি তো, ওই আংটির সব রহস্য এখনও পরিষ্কার না হলেও কিছু কিছু এখন বুঝতে পারি। বিপদ হতে পারে আপনার।"

এসবে একেবারেই বিশ্বাস নেই। ভদ্রলোকের গল্পটা শোনার জন্য দারুণ হলেও তার বাইরে অন্য কিছু এই বিংশ শতাব্দীতে ভাবা যায় না। তবু ওই কথার পরে কী ভেবে শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলাম। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে রুদ্রনাথবাবু বললেন, "আপনার জায়গায় আমি হলেও তাই ভাবতাম প্রশান্তবাবু।"

"ক—কী!" ভদ্রলোকের কথায় প্রায় চমকে উঠলাম। মনের কথা উনি জানলেন কী করে!

"আজ থাক ওসব।" প্রসঙ্গ পালটে রুদ্রনাথ লাহিড়ী বললেন, "বরং চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

সামান্যই পথ। সবে সন্ধে হয়েছে। ভদ্রলোককে অকারণে ব্যস্ত করা হবে। আপত্তি জানালেও উনি একেবারেই কান দিলেন না। এগিয়ে দিলেন আমার ফ্ল্যাটবাড়ি গেট পর্যন্ত। অনুরোধ করেছিলাম, একবার ঘরে আসতে। রাজি হলেন না। ফিরে যাবার আগে বললেন, "অনেক দিন পরে আজ আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পেরে ভাল লাগল। চলি এবার।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ভাল লাগল আমারও স্যার। আপনার আপত্তি না হলে সামনের রবিবার ফের যেতে পারি।"

"না না, আর আপত্তি করব না। খুশিই হতাম বরং।" অল্প হাসলেন উনি। "তবে মনে হয়, আপনারই হয়তো সময় হবে না।" আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

পরের রবিবার সত্যিই কিন্তু ওনার কাছে যেতে পারিনি। পরের দিন শনিবার অফিসে যেতেই আদেশ এল, নাগপুরে নতুন যে প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, আমাকেই যেতে হবে সেখানে। অগত্যা রবিবার সকালেই জরুরি ব্যাগ গুছিয়ে ছুটতে হল ট্রেন ধরতে।

তেমন বড় কাজ নয়। ভেবেছিলাম মাস দেড়েকের মধ্যেই সেরে ফেলা যাবে। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে শেষ হতে প্রায় মাস তিনেক লেগে গেল। এর মধ্যে এক–আধ দিনের জন্য

বোম্বাই আসাই যেত। কিন্তু দূরত্বের কারণে ইচ্ছে হয়নি। তবে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও রুদ্রনাথ লাহিড়ীর কথা ভুলিনি। ভেবে রেখেছিলাম, ফিরেই দেখা করতে যাব। ভি.টি থেকে ট্যাক্সিতে বাসায় পৌঁছেই তাকিয়েছিলাম রুদ্রনাথ লাহিড়ীর বাংলোর দিকে। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। কী ভয়ানক! টিলার মাথায় বাড়িটা প্রায় লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে। সামান্য জিরিয়ে নিয়েই বোম্বাইয়ের অফিসে ছুটতে হবে। তার আগে ফাইনাল রিপোর্টে একবার চোখ বুলিয়ে নেব ভেবেছিলাম। কিছুই হল না। হাতের মালপত্র নামিয়ে রেখেই ছুটলাম প্রমোদ কামলের খোঁজে।

প্রমোদ কামলে কোথাও বেরিয়েছিল তখন। পেলাম না। কিন্তু তার জন্য সমস্যা হয়নি।

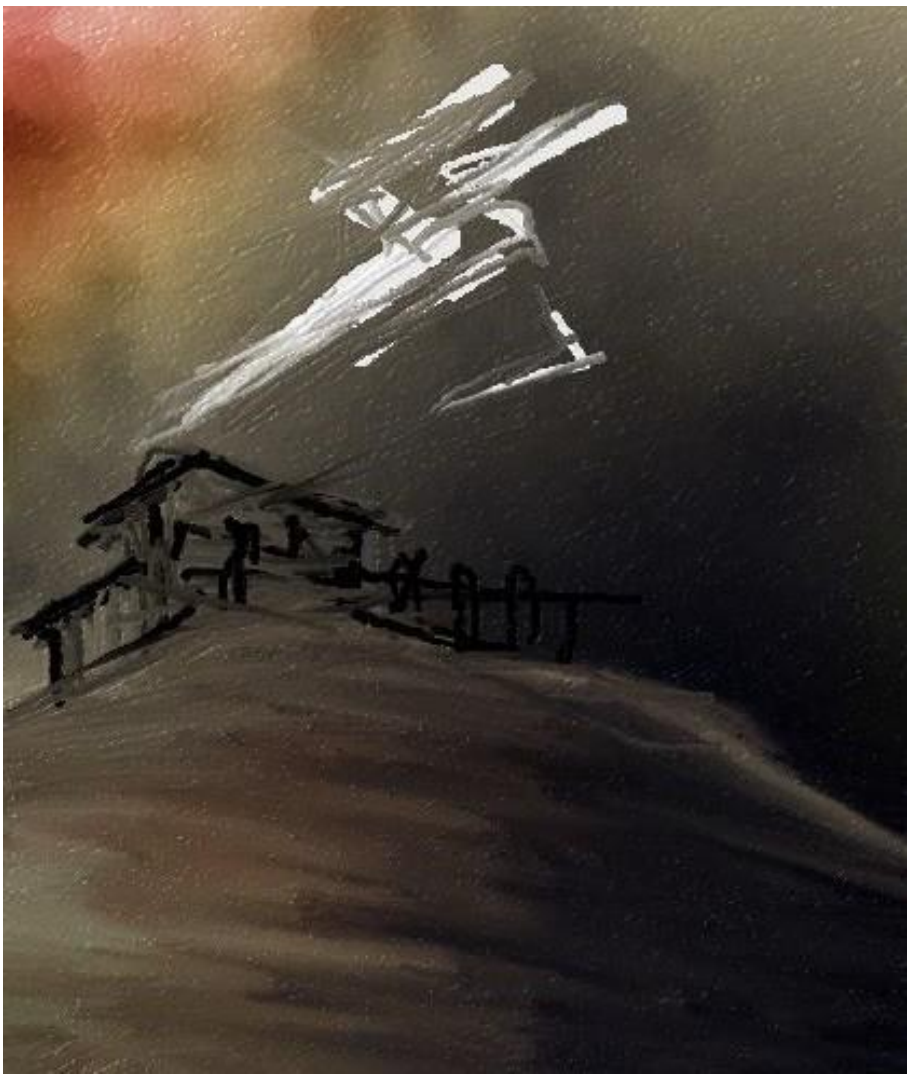

ব্যাপারটা যথেষ্ট আলোড়ন ফেলার কারণে জানা ছিল অনেকেরই। আমি যেদিন বোম্বাই শহর ছাড়ি, তার পরদিন রাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রুদ্রনাথবাবুর বাংলোর উপর ভয়ানক শব্দে বাজ পড়েছিল। তাতেই বাড়িটার ওই অবস্থা হয়েছে। সেই রাতেই ফায়ার ব্রিগেড আর পুলিশ ছুটে এসেছিল। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর রুদ্রনাথবাবু বা তার দেহের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, ভদ্রলোক সম্ভবত তখন বাড়িতে ছিলেন না। অন্য কোথাও গিয়েছিলেন।

পুলিশের তরফ থেকে তাই আশা করা হয়েছিল, রুদ্রনাথবাবু অচিরেই ফিরে আসবেন একদিন। কিন্তু তাঁদের সেই ধারণা এখনও পূর্ণ হয়নি।

গোড়ায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এক এক করে আরও কয়েক মাস কেটে গেল, রুদ্রনাথ লাহিড়ী আর ফিরে আসেননি। গোড়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে আলোচনা হত তাই নিয়ে। তারপর ক্রমে পুরোনো হয়ে যেতে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। শুধু পুলিশের খাতায় রয়ে

গিয়েছিল কেসটা। এমনকী ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম আমিও। ততদিনে অবশ্য আমার ধারণা কিছু পালটেছে। সেদিন রুদ্রনাথবাবুর অনেক কথাই কেমন হেঁয়ালির মতো ছিল। জিজ্ঞাসা করলেও ভাঙেননি। খুলে না বললেও, সম্ভবত এই ভাবেই উনি একদিন পুনা থেকে পাট গুটিয়েছিলেন। সেদিন সামান্য আভাসও দিয়েছিলেন, লোকবসতি বেড়ে যাওয়ায় সাকিনাকা অঞ্চলও তেমন আর পছন্দ নয় এখন। হয়তো সেই কারণেই হঠাৎ পাট গুটিয়ে চলে গেছেন। ব্যাপারটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

রুদ্রনাথবাবুর ব্যাপারটায় এখানেই হয়তো দাঁড়ি পড়ে যেত, যদি না নিজেই একদিন জড়িয়ে পড়তাম ব্যাপারটার সঙ্গে।

বছর দুই পরের কথা। সাকিনাকার ফ্ল্যাট ছেড়ে আমি তখন চেম্বুরে। প্রচুর বাঙালির বাস ওই অঞ্চলে। রাস্তায় বা হাটে-বাজারে হামেশাই দেখা মেলে। বাঙালিদের নিজস্ব দুর্গাপুজোও হয়। দিনগুলো তাই বেশ কাটছে। রুদ্রনাথবাবুর কথা প্রায় ভুলেই গেছি। হঠাৎ সাকিনাকা অঞ্চলে আমাদের সংস্থা নামী এক কোম্পানির অফিস এবং কোয়ার্টার তৈরির বরাত পেতে দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। যথেষ্ট বড় প্রজেক্ট। প্রচুর লোকলশকর নিয়ে যথাসময়ে কাজ শুরুও হয়ে গেল। পুরোনো জায়গায় ফের আসতে হলেও কাজের চাপে রুদ্রনাথবাবুর কথা সেভাবে আর মনে পড়েনি। যদিও সেই টিলার দিকে চোখ পড়লে রুদ্রনাথবাবুর সেই ভাঙাচোরা বাংলোটা নজরে পড়ত। ওই সময় একদিন ফিল্ডে কাজ করছি, হঠাৎ দেখি সামনে দাঁড়িয়ে প্রমোদ কামলে।

"আরে কামলে যে! কেমন আছো?"

উত্তরে কামলে সেলাম ঠুকে হাত কচলে বলল, " শেঠ, একটা অনুরোধ করব?"

"কী?"

"শেঠ।" ফের হাত কচলাল প্রমোদ কামলে। "রুদ্রদেবের বাড়িটা বড্ড অযত্নে পড়ে আছে। তাকালে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়। একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করলে খুব ভাল হয়। মনে শান্তি পাই।"

"সে তো তোমরাও পারো!" একটু অবাক হয়েই বললাম।

"পারতাম তো।" কামলে ফের হাত কচলাল। "কিন্তু উনি যে আমাদের বারণ করে গেছেন।"

প্রমোদ কামলেকে বিলক্ষণ চিনতাম। তাই আর কথা বাড়াইনি। সম্মতি জানিয়ে বিদায় দিয়েছিলাম। কিন্তু জায়গাটা আমাদের প্রজেক্টের বাইরে। ইচ্ছে করলেও তাই সম্ভব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। প্রজেক্টের কাজ তখন অনেকটাই এগিয়েছে। একদিন বড় সাহেবকে নিয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইনস্পেকশনে এসেছেন। সুযোগ পেয়ে বড় সাহেবকে বললাম ব্যাপারটা। এতবড়ো একটা অফিস, হাউজিং। অথচ পাশেই পোড়ো ভাঙা বাড়িটা যথেষ্টই দৃষ্টিকটু। প্রয়োজনীয় অনুমতি পেলে সাফ করে দেওয়া যায়।

প্রস্তাবটা বড় সাহেবের মনে ধরেছিল। তক্ষুনি তিনি ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিলেন। পুলিশ কেস হয়ে রয়েছে। তার উপর মালিক নিখোঁজ। অনুমতি পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু এদেশে ঠিক জায়গায় মাথা গলাতে পারলে কোনও কিছুই অধরা নয়। উপর মহলে যোগাযোগের পরে অনুমতি এসে গেল মাস খানেকের মধ্যে। তারপর একদিন পুলিশের তদারকিতে কাজ শুরু হল।

আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম সেদিন। ভাঙাচোরা চারটে দেয়াল ছাড়া বাড়িটার তখন কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। দুপুরের আগেই চারপাশ সাফ করে মজুরের দল ভিতরে প্রবেশ করে জমা ইটপাথর সরাতে শুরু করেছে। নজরে পড়ল ঘরের মেঝেতে বিশাল আকারের এক বোল্ডার। এতবড় পাথরের চাংড় ঘরের মেঝেতে কীভাবে এল বলতে পারল না কেউ। এমন কী পুলিশও। রুদ্রনাথবাবু নিখোঁজ হবার পরে থানা থেকে যাঁরা তদন্তে এসেছিলেন তাঁরা না থাকলেও সেই সময়ের "কেস ডায়েরি" সঙ্গে ছিল। তা থেকেও তেমন কোনও রিপোর্ট পাওয়া গেল না। যাই হোক, লোকজন লাগিয়ে সেই বোল্ডার সরিয়ে দিতে যা নজরে পড়ল তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পাথরটা যেখানে ছিল তার নীচেই বাঁধানো মেঝের টালিগুলো বেশ আলগা। সন্দেহ হতে তৎক্ষণাৎ খুঁড়ে ফেলা হল জায়গাটা। ফুট তিনেক মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কাল। ডান হাতটা নেই। কনুইয়ের নীচ থেকে কাটা। বাঁ হাতের আঙুলে রয়েছে একটা আংটি। স্থানীয় যারা রুদ্রনাথবাবুকে দেখেছে, তারা সবাই এক বাক্যে জানাল, কঙ্কালটা রুদ্রনাথবাবুরই। ওই আংটি তাঁর আঙুলে সর্বদাই দেখা যেত। একই স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম আমিও।

খুনের কেস সন্দেহে ফের তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। কিন্তু একটুও এগোতে পারেনি। অনেকদিন মনে হয়েছে, রুদ্রনাথবাবুর সেদিনের সেই গল্পের কথা পুলিশ দপ্তরে জানাব। কিন্তু আমি নিজেই সেদিন যা বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি তা কি অন্য কেউ বিশ্বাস করবে? তাই আর বলা হয়নি। সেই আংটি হয়তো এখনো পড়ে রয়েছে থানার মালখানার কোথাও। প্রমোদ কামলেদের ভগবান রুদ্রদেব তাই পুলিশ দপ্তরে আজও এক রহস্য।

ছবিঃ
শ্রীশাম্ব

পুজোর নাটক

এলডোরাডো

সীমা ব্যানার্জ্জী- রায়

<u>যে চরিত্রদের লাগবে</u>

দিদিমার মাঃ সিয়ানা,
দিদিমাঃ(রজিয়ানা তাকে সুসুমা বলে ডাকে) সিসিয়ানা,
মেয়েঃ জিয়ানা,
নাতনিঃ রজিয়ানা
পাখিঃ তুতলি,

<u>প্রথম দৃশ্য</u>

রজিয়ানা বসে আছে লিভিং রুমের জানলার ধারে। ঘরটায় দুটো সুদৃশ্য লেদারের সোফা সেট। মাঝখানে একটা গোল কাঁচের টেবিল। জানলার গা ঘেঁষে সোফা সেটের মতন তৈরি

একটা বেঞ্চকে সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। রজিয়ানা ওখানে বসে থাকতেই বেশি ভালবাসে। ওখান থেকে সে নীল বা মেঘলা আকাশ দেখতেই বেশি ভালবাসে। আজ পরেছে একটা সুন্দর গোলাপি ফ্রক। গালে হাত আর চোখ তার নাগালের বাইরে দূরে বহুদূরে। বাড়ির সামনের শিরীষ গাছটাকে দেখে মাঝে মাঝে তার বাবার আর দাদুর জন্য মনটা বড় কাঁদে । কত আদর ছিল ওঁরা থাকতে। শুনেছে তার বাবা সাঁতার কাটতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। তার দাদুও নাকি পার্কে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। মা বা দিদিমাকে তা নিয়ে জিগেস করেনি রজি কোনোদিনও। আজকের এই স্কুল ছুটি থাকাতে নিঃঝুম দুপুরে কেন জানি না ওর মন হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে যাচ্ছে। তাকিয়েই আছে জানলার বাইরে. . . ।

(হন্তদন্ত হয়ে মা জিয়ানার প্রবেশ :)

জিয়ানাঃ রজি ডার্লিং কী ভাবছো একা একা বসে? শরীর ভাল আছে তো?

(রজির মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বোলায়)

রজিঃ মা আমি সুসুমার সাথে পার্কে যেতে চাই। আমার সব বন্ধুরা আসবে আর ত কদিন পরেই স্কুল খুলে যাবে। যাব মা? প্লিজ লক্ষ্মীটি মা আমার। আই লাভ ইউ মা। প্লিজ না বোলো না।

জিয়ানাঃ নাঃ! রজি না। আমি যেন না শুনি তুমি আবদার করেছ সুসুমার কাছে। তাকে বিরক্ত করেছো! আমাকে এখন হসপিটাল- এ যেতে হবে। বাইরে দারুণ গরম তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাক, আমি তা চাই না। আর জানোই তো তোমার শরীর খারাপ হলে আমি আর তোমার সুসুমা কত ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তুমি নিশ্চয় তা চাও না। চাও কি?

(সুসুমার ভেতরে প্রবেশ)

সুসুমাঃ কী হয়েছে জিয়ানা? বকছ কেন আমার ছোট্ট সোনা রজি- কে? ও তো কখনও বকার কাজ করে না। ওকে বকলে আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়। আর জানোই তো ওর চোখে জল মানে আমার হার্ট- এর প্যালপিটিশনটা জোরে জোরে দৌড়োতে শুরু করে। সব জেনে শুনেও তুমি. . .

জিয়ানাঃ মা! রজি এই গরমে বাইরে যেতে চাইছে, তাই ওকে বারণ করছিলাম। ওকে বাইরে নিয়ে যাবে না। আজকে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহিট- এর ওপরে। হাসপাতালে কাতারে কাতারে রোগিদের ভিড়। বেশিরভাগ রজির বয়সি। ডাক্তার- নার্সরা হিমশিম খাচ্ছে, তার সাথে আমরা ফার্মাসিস্ট- রাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।
(সাদা কোট –এর বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মা রজির কপালে একটা চুমু দিল)-

“বাই মা আর রজি”

(জিয়ানা বেরিয়ে গেল। গাড়ি চলে যাবার আওয়াজ)

সিসিয়ানা “কী ভাবছো রজি হানি? আমাকে বলবে না?”

রজিঃ সুসুমা! ভাবছি আমি যদি পাখি হতাম বেশ উড়ে চলে যেতাম পার্কে । আবার ভাবছি না, যদি মাছ হতাম বেশ এই গরমে জলের ভেতর বন্ধুদের সাথে খেলা করতাম । মা বকত না বেশ। কি ভাল হত, তাই না সুসুমা?

(সুসুমা একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। রজির আড়ালে ফুলস্লিভ জামার হাতায় চোখটা মুছে নিলেন।)

রজিঃ কী ভাবছ সুসুমা? আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছো ?

সুসুমাঃ রজি! আয় হানি আমার সাথে । আজ আমি তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। তোর মায়ের আসতে আজ দেরি হবে. . .

(দুজনের প্রস্থান)

(বাড়ির পেছনদিকে সাজানো বাগান। সেখানে একটা বিরাট শিমুল ফুলের গাছের তলায় গিয়ে দুজনে দাঁড়ায়। গাছের গোড়ায় একটা বন্ধ ঢাকনা। সেইটে দেখিয়ে--)

সুসুমাঃ এই ঢাকনাটা খুলে দেখ, রজি।

(রজি ঢাকনা খুলল। ভেতরে আধো আলো। একটা সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেছে বেশ কিছুদূর।)

রজি *(উৎফুল্ল)* সুসুমা ! আমি একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি জানো তো। আর নীচে কি সুন্দর অনেক রঙ- বেরঙের আলো দেখতে পাচ্ছি। এ তুমি কোথায় আমাকে নিয়ে এলে সুসুমা? আমি যে নিচে যেতে চাই। তুমি কি আমায় পারমিশন দেবে নিচে যাবার জন্য। প্লিস দাও না সুসুমা! আমি আর কোনদিন যেতে চাইব না শুধু একটিবার, একটিবার মাই ডিয়ারেস্ট অনলি সুসুমা।

সুসুমাঃ ঠিক আছে আমার হানি। সাবধানে নিচে নেমে যা। এসে আমাকে গল্প করিস। হাতে ঘড়ি আছে তো? মায়ের কাজ থেকে আসার আগে উপরে উঠে আসিস কেমন।

কাজ থেকে মা এসে তোকে দেখতে না পেলে রাগারাগি করবে কিন্তু। তোকে তো বকবেই তার সাথে আমাকেও বাদ দেবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চের একধারে সিঁড়ির মাথা। রজি সেখান দিয়ে নেমে মঞ্চে এল। একটা নীল, লাল আর সবুজ রঙ মেশানো টিয়াপাখি বসে আছে ঠিক সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে।)

পাখি: "কে তুমি?"

(রজিয়ানা ঘাবড়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখছে)

পাখিঃ আমি তুতলি। এক দুষ্টু ডাইনির শাপে পাখি হয়ে আছি। সব গল্প করব তোমার সাথে। কিন্তু তুমি এখান এলে কীভাবে মেয়ে? তোমার নাম কী গো?

রজিঃ আমার নাম রজিয়ানা।

তুতলিঃ বাহ! বেশ মিষ্টি নামখানা ত? এখানে কেন এসেছ? এখানে ফিয়েতারা নামে একটা ডাইনি আছে। সে কিন্তু মাটির দেশের থেকে আসা মানুষ দেখলেই রেগে যায় । তাদের মাছ কিংবা পাখি করে রেখে দেয়।

রজিঃ আমার দিদিমা সিসিয়ানা আমাকে পাঠিয়েছে এখানে। মা কাজ থেকে ফিরে আসার আগেই আমাকে আবার ওপরে উঠে যেতে হবে নয়ত আমার মা খুব রেগে যাবে।

তুতলিঃ কী বললে? "সিসিয়ানা! ?"- সে কী? এসো আমার সাথে। সিসিয়ানার মায়ের কাছে নিয়ে যাই, তোমাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

(পাখিটা হেঁটে হেঁটে রজির সাথে চলল। রজি যেতে যেতে দেখে কি সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট পুকুর। তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর মানুষের মতন মুখ কিন্তু বাকি শরীরটা রঙ বেরঙের মাছের মতন। নীল , লাল, সাদা সব নাম না জানা ফুলেরাও ভেসে বেড়াচ্ছে জলের মধ্যে। চারিদিকে কত নাম না জানা ফুল ফুটে আছে। কী সুন্দর তাদের রঙ আর গন্ধ। (এ দৃশ্যটা মঞ্চের পেছনের দেয়ালে নানান ছবি আটকে তার ওপরে লালনীল আলো ফেলে দেখানো যায়)

রজিঃ ওরা কারা? ওদের-ই কি মাছ করে রেখেছে? আর ওই ফুলগুলোকে আমি কোনদিন দেখি নি।ওরাও কি তোমার মতন কথা বলতে পারে, তুতলি?

তুতলিঃ হ্যাঁ! ওরাও কথা বলে ঠিক আমার মতন। একদিন এরাও সবাই মানুষ ছিল কিন্তু ওই ডাইনি ফিয়েতারা এদেরকে মাছ করে রেখেছে কথা না শোনার জন্য। ওরা ডাঙায় উঠতে পারে না। ডাইনি সব সময় খেয়াল রাখে। নিজে জলের মধ্যে গিয়ে ওদের রোল কল করে। তোমার দিদিমার পিসি ইলিয়ানা আর বাবা ইসিউন এই ফিয়েতারাকে রেখেছে সব দিকে খেয়াল রাখতে। ওর দুষ্টু চোখ আর কান রেখেছে এই জলে সব সময়।

(কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে গেল একটা কি সুন্দর স্ফটিকের রাজপ্রাসাদের মধ্যে।)

তৃতীয় দৃশ্য

তুতলিঃ *(জোরে জোরে ডাকতে লাগলো)* সিসিয়ানার নাতনি রজিয়ানা এসেছে।

(একজন, সুন্দর মহিলা ছুটে এলেন প্রাসাদের মধ্যে থেকে। ইনি আসলে রজির মা সিয়ানা। রজিয়ানাকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর নিজের মনে বললেন,)

সিয়ানাঃ তাইত ঠিক সিসিয়ানার মত টানা টানা চোখ। মুখে মিষ্টি হাসি। তারপর রজির কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন।

(অবাক হয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রজির।)

রজিঃ তুমি কি আমার দিদিমা সিসিয়ানাকে চেনো?

সিয়ানাঃ আমার একমাত্র মেয়ে ছিল সিসি। কেমন আছে সে? মানুষের মত কি বুড়ি হয়ে পড়েছে? না আমার মত আছে। তোমার নাম কী গো মেয়ে?

রজিঃ আমার নাম রজিয়ানা। আমাকে রজি বলে ডাকতে পারো। ভাল আছে সুসুমা। কিন্তু, তোমরা সবাই নীচে আছ আর আমার সুসুমা ওপরে গেল কী করে বলবে?

সিয়ানাঃ আগে আয় ভেতরে। একটু আরাম করে আগে কিছু খেয়ে নে আমার রজি সোনা।

চতুর্থ দৃশ্য

(রজি ভেতরে গিয়ে দেখে সোনার থালায় কত মিষ্টি, ফল ফুল, ফলের রস তাও সোনার গেলাসে। ওকে একটা সুন্দর জামা পরিয়ে মণিমুক্তো বসান চাদর ঢাকা চেয়ারে বসিয়ে খাওয়ালেন সিয়ানা। তারপর সোনার চাদর পাতা বিছানায় শুতে বলে ওর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেনঃ)

সিয়ানাঃ- সিসি এই বিছানায় শুতো। ওর পিসি ইলিয়ানা খালি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখত। এই রাজত্ব ওর বাবা ইসিউন আর পিসির নামে। আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। সিসিকে কেন ঘুম পাড়িয়ে রাখত জানি না। আজও জানি না তার কারণ। একদিন এরকম ঘুমাচ্ছে , হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে জেগে দেখে—

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার থেকে একটা ছেলের গলার গানের শব্দ। সে গাইছে-

ছেলেঃ ঘুমিয়ে ছিল রাজকুমারী
চোখে স্বপন নিয়ে
তার ছবিটি নিলাম ধরে
জিয়ন কলম দিয়ে--

ফের আলো জ্বলতে দেখা গেল বিছানায় কমবয়েসের সিসিয়ানা শুয়ে আছে আর একটা সুন্দর ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতে সিসিয়ানার একটা পেন্টিং। দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল সিসিয়ানা। তারপর ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে বলল,)

সিসিয়ানাঃ- এ কী? তুমি এই রাজপ্রাসাদে কী করে ঢুকলে? আর আমার এই ঘরেই বা কী করে এলে?

ছেলেঃ আমার নাম আলফ্রাস। রাজপ্রাসাদের বাইরে আমি রোজ বসে ছবি আঁকতাম। রাজপ্রাসাদের ফটক সব সময় বন্ধ থাকে দেখি। খুব ইচ্ছে হত ভেতরে ঢুকি, কিন্তু ভয়ে পারতাম না। আজকে খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি। কোথাও কাউকে না দেখতে পেয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি তোমার এই ঘর একটু ফাঁক করা আছে। আস্তে করে ঢুকেই তোমাকে দেখতে পাই। তুমি কি সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে ছিলে। তাই থাকতে না পেরে তোমায় আঁকতে শুরু করেছিলাম। আঁকা হয়ে গেলে সেই আনন্দে গান গেয়ে উঠেছি অমনি তোমার ঘুম ভেঙে গেল।

সুসুমাঃ (ছবিটার দিকে দেখছে) তুমি এঁকেছ? কী সুন্দর। কিন্তু—কেউ তোমায় দেখে ফেলেনি তো? পিসি বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছে। এখন চুপি চুপি আমার সাথে এসো। আমি আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব তোমায়।

রাজকুমার দেখে সিসিয়ানা ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দুজন দুজনকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল।

পঞ্চম দৃশ্য

(সিসিয়ানার মায়ের ঘর। সিসিয়ানা আর আলফ্রাস এসে ঢুকল। সিয়ানা রাজপুত্রের মতন আলফ্রাসকে অবাক হয়ে দেখছেন।)

সিয়ানাঃ কোথা থেকে এসেছো তুমি ছেলে? কী তোমার নাম? কী করে আমার মেয়ের কাছে গেছিলে? কেউ দেখে নি তো?

আলফ্রাসঃ আমার নাম আলফ্রাস। কাছাকাছি থাকি। আমি সিসিয়ানাকে বিয়ে করতে চাই।

সিয়ানাঃ শীঘ্র এখান থেকে চলে যাও। নয়ত সিসিয়ানার পিসি এসে তোমাদের দুজনকে ঘরে বন্দী করে রাখবে। খুব কষ্ট দেবে। আমি তা দেখতে পারব না। (সিসিয়ানার দিকে ফিরে) তুই কি আলফ্রাসের সাথে যাবি, সিসিয়ানা? তাহলে এখনি পালিয়ে যা তোর পিসি আসবার আগে।

তারা দুজন মাথা নেড়ে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে গেল রাজপ্রাসাদের বাইরে।

(আলো নিভল। ফের জ্বলতে দেখা যায় সিয়ানা আর রজি সেই ঘরে কথা বলছে।)

সিয়ানাঃ তারপর থেকে আলফ্রাস আর সিসিয়ানাকে কোনদিনও খুঁজে পাই নি আমি। আজ সি্সিয়ানার নাতনি এসেছে সিসিয়ানার মুখের আদল নিয়ে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।
(সিয়ানা রজিকে আবার জড়িয়ে ধরলেন। ফ্রিল দেওয়া ফুলস্লিভ জামার হাতায় নিজের চোখ মুছলেন। রজি সিয়ানার চোখ নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে দুইগালে চুমু খেল।

সিয়ানাঃ –সিসিয়ানার পিসি এখনও খুঁজে চলেছে সিসিয়ানাকে কেউ কিছু জানে না। একমাত্র সেই রাজকুমার যে নাকি সিসিয়ানাকে ভালবাসত ছোট থেকে সে খালি দেখেছিল তাকে তোর দাদুর সাথে চলে যেতে। কিন্তু পিসিকে সে কিছুতেই বলে নি। তাই তাকে নীলকন্ঠ করে রেখে দিয়েছে পিসি। এই নীলকন্ঠই হচ্ছে তুতলি।

রজিঃ- সুসুমার পিসিটা এরকম কেন বলত? আমি দেখতে পেলেই জিগেস করব। বলব, তুমি একদম ভালো না।

সিয়ানাঃ না না হানি, কিছছু জিগেস কোরো না। তার আগে আমি তোমাকে তোমার সিসিয়ানার কাছে পাঠিয়ে দেবো। জানো? আজও মাটির জগত থেকে কেউ ভুল করে এলেও তাকে বন্দী করে রাখে নয়ত মাছ করে রাখে সিসির পিসি।

(এই বলে দিদিমার মা সিয়ানা অনেক কিছু ধন রত্ন দিয়ে রজিয়ানাকে সাজিয়ে দিল। আর জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল রজিকে।)

সিয়ানাঃ - ভুলেও যেন আর কখনও এখানে এসো না ডার্লিং। তাহলে যে কী হবে আমি জানি না। তুতলি- ই- ই?
(তুতলি এসে ঢুকল)
যা রজিকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে আবার পৌঁছে দিয়ে আয়। ও যতক্ষণ না ওপরে উঠে যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকিস। নয়ত সুসির পিসি দেখে ফেললেই বিপদ।

তুতলিঃ এসো রজি আমার সাথে।

(রজি দেখলো সিয়ানা এক দৌড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ও আবার তুতলির সাথে ওর বাড়ীর পথে পা বাড়ালো। দুজনে গল্প করতে করতে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। সিঁড়ির ওঠার মুখে এসে দেখে তুতলির চোখে জল।)

তুতলিঃ সিসিয়ানাকে আমার কথা বোলো রজি। আরো বোলো যে এখনও সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে তুতলি রাজকুমার, শুধু সিসিয়ানাকে একটিবার দেখার অপেক্ষায়। আমার এই কথাক'টি লুকিয়ে বোলো তোমার সুসুমাকে। আর এই নাও আমার গায়ের একটা লাল পালক, তাকে দিও। ভাল থেকো রজি।

(পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে তুতলি মিলিয়ে গেল।)

রজিঃ বাই তুতলি। ভালো থেকো। আমি সব গল্প করব সুসুমার কানে কানে। তোমার চিন্তা নেই। আর কেউ শুনতে পাবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রজিদের ঘর। ঘর ফাঁকা। রজি বসে আছে। চোখ কচলাচ্ছে। হাই তুলছে। তখন সিসিয়ানা এল।

সিসিয়ানা (*রজির কাছে এসে কানে কানে জিজ্ঞাসা করল)* ঘুমুচ্ছিলি নাকি হানি?

রজিঃ সুসুমা আমি কী স্বপ্ন দেখছিলাম জানো? একটা ওয়ানডারল্যান্ড- এ গিয়েছিলাম।

সুসুমাঃ বাহ! দারুণ তো। আমাকে বল না আমি বেশ শুনি।

রজিঃ বলছি শোনো--
(আলো কমে এল তারপর গল্প করতে থাকা দুজনের ওপরে লালনীল আলো পড়বে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলবে। এরই মধ্যে রজি খুব হাত পা নেড়ে নেড়ে গল্প বলবার মূকাভিনয় করতে থাকবে। খানিক বাদে বাজনা থামবে। স্বাভাবিক আলো ফিরবে। দেখা যাবে সিসিয়ানা কাঁদছে। চোখ মুছছে।)

সিসিয়ানাঃ এই জন্য তোর মা তোকে একা একা বাইরে যেতে বারণ করে। বুঝলি এবার তো। কোনদিন আর আবদার করিস না ডার্লিং।

রজি (হাসি হাসি মুখ) তুমি তো রাজকন্যা ছিলে সুসুমা. . আর তুতলি- হি হি হি- *(খিল খিল করে হেসে উঠল রজি। সিসিয়ানাও হেসে উঠলেন তার সঙ্গে। ইতিমধ্যে জিয়ানার প্রবেশ। সাদা কোটটা খুলতে খুলতে -)*

জিয়ানাঃ ব্যাপার কী? খুব যে হাসি হচ্ছে দুজনের?

রজিঃ ও মা, জানো দিম্মা না- আসলে- একটা রাজকন্যা- হি হি হি-
জিয়ানাঃ ওই দেখো পাগলি , শুধু শুধু হেসেই গেল—

(বলতে বলতে জিয়ানাও হেসে উঠল তাদের সঙ্গে। হাসতে হাসতে তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরল। পর্দা নেমে এল)

ছবিঃ পিয়ালী ব্যানার্জি

গল্প প্রতিযোগিতা- পঞ্চম

অদিতি সরকার

দূরে, অনেক দূরে, যেখানে আকাশ নেমে এসে মাটি ছোঁয়, যেখানে সব কেমন ছায়া ছায়া, ধোঁয়া ধোঁয়া, সেইখানে ভয় থাকে। দিনের বেলা পষ্ট আলোয় তাকে দেখা যায় না। তার যত কেরামতি সব আঁধার রাতে। সূর্য ডুবতে শুরু করলেই আস্তে আস্তে সে কোটর থেকে একটু একটু করে বাইরে পা বাড়াতে থাকে। দিনের আলো যত কমে, তত তার পা লম্বা হয়। অন্ধকার বাড়তে বাড়তে টুপ করে এক সময় চারদিকে আর কিচ্ছু দেখা যায় না, মায় নিজের আঙুল-টাঙুলও না, আর তক্ষুনি ভয় গা ঝাড়া দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে আসে।

এর জানালার ফাঁক দিয়ে, ওর দরজার তলা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকে পড়ে ঘরের একেবারে ভেতরে। ঘরের মানুষগুলো কেউ কিছু বোঝে না, দেখতেও পায় না। শুধু হঠাৎ কেমন একটু শিউরে ওঠে। পিঠ শিরশির করে, ঘাড়ে কাঁটা দেয়। কেউ পেছনে তাকায় না, জানালার বাইরে ঝুপসি অন্ধকারের দিকে দেখে না, কেবল আরও একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। ভয় মহানন্দে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

রোজ রাতে এ রকম। সব বাড়িতেই ভয় ঢোকে, কিন্তু তার সবথেকে পছন্দ ছোটকুর ঘরখানা। ছোটকু সে ঘরে একলা শোয় যে। কে- ই বা শোবে তার সঙ্গে। বাড়িতে তো শুধু দাদিমা

আর বুয়াজি, মানে ছোটকুর পিসি। মাকে ছোটকুর মনেও পড়ে না। বাবা ফৌজের হাবিলদার। খুব লম্বা চওড়া, খুব সাহসী। কখনও মরুভূমি, কখনও পাহাড়ে তাঁর কাজ। বছরে একবার করে আসেন। তখন খুব মজা। সারাদিন যখন তখন বাবার জোর গলার হা- হা হাসি। রাতে রুটি আচারের সঙ্গে মাংস। এ ঘরে বাবার সঙ্গে শোওয়া। দেওয়ালের পেরেক থেকে বাবার ফৌজি উর্দি ঝোলে, তাতে রোদ- রোদ ঘাম- ঘাম গন্ধ। বাবা থাকলে ভয় ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু বাকি দিনগুলোয় তো ওই তিনজন। তা দাদির পায়ে ব্যথা, সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। রাতে কাতরায়, তখন বুয়াজি রসুন তেল মালিশ করে দাদির পায়ে। তাই বুয়াজিও নীচেই শোয়। ওপরের এই পুঁচকে ঘরখানা তখন শুধু ছোটকুর। রাতে একা একা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ভয় ছোটকুর চারপাশে ইলিবিলি কাটে। কাঠের সিঁড়ি মটমট করে, খাপরার চালে খড়খড় আওয়াজ তুলে বড়ো বড়ো ইঁদুর চলে, ছোটকু কানে বালিশ চাপা দেয়। ঘরের কোণে অন্ধকার জমে থাকে, ভয় সেখানে আরাম করে বসে। ছোটকু লেপ দিয়ে আচ্ছা করে মাথা মুখ ঢাকে।

এমনই রোজ। সকাল হলেই আবার সব যেমন কে তেমন। কে বলবে তখন, যে রাতে অমন ছমছম করে বুক কেঁপেছিল? রোদের আলোয় চারদিক ঝলমল করে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, লুকোনো- চুরোনো অন্ধকার নেই, সব ফটফটে পরিষ্কার।

সক্কাল সক্কাল বুয়াজির হাত থেকে বড়ো পেতলের গেলাসে গরম ফেনাওঠা দুধ আর ভৈঁসা ঘিয়ে ভাজা পরোটা খেয়ে ছোটকু লাফাতে লাফাতে ইশকুলে যায়। গোটা রাস্তায় কোথাও ভয়ের দেখা নেই। আলো ফুটলেই যে ভয় কুঁকড়ে মুকড়ে এ্যাত্তোটুকু হয়ে পালায় কোথায় কত দূরে। মাঝে মাঝে একটু উঁকি দেয় ঠিকই। মাস্টারজির চশমা পরা বড়ো বড়ো চোখ থেকে, কিংবা খেলার মাঠে উঁচু ক্লাসের ছেলেদের পাকানো ঘুঁষিতে, তা সে নিয়ে ছোটকুর মাথাব্যথা নেই। পড়া ঠিকঠাক তৈরি করে নিয়ে গেলেই মাস্টারজির চোখ শান্ত। আর খেলার মাঠে ছোটকুকে কেউ ধরতে পারলে তবে তো কিল দেবে? প্রত্যেক বছর একশো মিটার দৌড়ে ফার্স্ট প্রাইজটা কি এমনি এমনি আসে নাকি? নাঃ, দিনের বেলা ভয়কে ছোটকু পাত্তাও দেয় না। ভয়কে নিয়ে ছোটকুর যত ঝামেলা সব শুধু সূর্য ডোবার পর।

আজকাল কদিন ধরে অবশ্য একটু অন্যরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে। সেদিনও রাতে ছোটকু ওরকম মুড়িঝুড়ি দিয়ে পড়ে আছে আর মনে মনে প্রাণপণে রামজিকে ডেকে যাচ্ছে যাতে ঘুমটা তাড়াতাড়ি এসে যায়, হঠাৎ মনে হল পায়ের ওপর যেন কী। নরম নরম, গরম মতো। অমনি তো হাত পা ঠান্ডা, পেটের মধ্যে খালি খালি। ও বাবা, ও রামজি। একটুও না নড়েচড়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে কোথায় কী। রাতে আর সে সব মনেও ছিল না। কিন্তু শোয়ার একটু পরেই আবার সেই। পায়ের ওপর নরম নরম। ছোটকু অনেক সাহস- টাহস করে একটু ডান পাটা নাড়াল। দুটো চোখই শক্ত করে বুজে। পা নাড়তেই ভারী জিনিসটা বলল, "ম্যাও।" ম্যাও মানে? ম্যাও মানে কী? এবার ছোটকুর চোখ দুটো পটাং করে খুলে গেল। ঘরের কোণায় কোণায়, চারপাইয়ের চারদিকে ভয় ঘুরঘুর করছে, তাও। ও মা, পায়ের ওপর কম্বল, কম্বলের ওপর গুটিশুটি মেরে ওটা কী রে? আরেকবার একটু বেশি

করে দুটো পা- ই নাড়াল ছোটকু। আর পায়ের তালে তালে নরম গরম পুঁটলিটা বলল, "উমম, উমম, মিউ।"

এখন রাতে ভয় ঘরে থাবা গেড়ে বসে থাকলেও ছোটকুর অতটা অসুবিধে হয় না। বিল্লোরানি রোজ পায়ের ওপর ঘুমোয় তো। ও হ্যাঁ, পুঁটলিটার নাম ছোটকু রেখেছে বিল্লোরানি। ভয় বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছোটকু পা দুটো একটু নাড়ায়, অমনি বিল্লোরানি পিঠ গোল করে সবুজ সবুজ চোখ করে বলে, "ফ্যাঁ- শ্"; আর ভয়ও তাড়াতাড়ি ছোটকুর চারপাই থেকে দূরে ঘরের কোণে সরে যায়। ছোটকুর রাতগুলো তাই আজকাল মোটামুটি শান্তিতেই কাটছে। ওদিকে বুয়াজিও খুব খুশি, ছোটকু আজকাল রাতে একটা রুটি বেশি খায়। বুয়াজি বিল্লোরানির কথা জানে না। জানলে তাড়িয়ে দেবে। বেড়াল বুয়াজির দু চোখের বিষ। ছোটকু সবার চোখ বাঁচিয়ে শেষ রুটিটা কায়দা করে পকেটে করে নিয়ে আসে ওপরে, বিল্লোরানি ঠিক সময় বুঝে খেয়ে নেয়। ভোর হলেই চারদিক ফরসা, বিল্লোরানিও ধাঁ।

আজও বেশ ঠিকঠাকই ঘুমোচ্ছিল ছোটকু। বিল্লোরানি আজকাল পা থেকে উঠে এসে পেটের কাছে শোয়া ধরেছে। ঘুঁজিমুজি তুলতুলে পুঁটলিটাকে জড়িয়ে ছোটকুর দিব্যি চোখ বুজে যায়। রামজিকে ডাকাডাকি না করেই। ঘরের কোনায় ভয় রেগে হিসহিস করে, ছোটকু উলটো- পাশ ফিরে শোয়। সেই ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ বুয়াজির কাঁদো কাঁদো গলা কানে এল — "ও ছোটকু, কত ঘুমোচ্ছিস রে বেটা। ডেকে ডেকে যে গলা শুকিয়ে গেল। ওঠ না রে বাবুয়া।"

ছোটকু বিছানা থেকেই সাড়া দেয়, "কী হল বুয়াজি?"

"একবার নীচে আয় না বাবা। দ্যাখ তোর দাদি কেমন যেন করে।"

কী সর্বনাশ! নীচে? এখন? এই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে? বিল্লোরানি তো বুয়াজির আওয়াজ পেয়েই সটকেছে। এবার কী হবে? ঘরের আনাচে কানাচে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে তো ভয়।

"কী হয়েছে বলো না।"

"আরে নীচে আয় না তুই। অত চ্যাঁচাতে পারি না রাত দুপুরে। কী ছেলে রে বাবা। একবার টঙে উঠল তো ভোর না হলে আর নামবে না।"

কী করে যে নেমেছে ছোটকু সে আর জিজ্ঞেস করে কাজ নেই। জড়িয়ে মড়িয়ে পড়ে ঠ্যাং ভাঙেনি যে, সে- ই রামজির কৃপা। কম্বল মুড়ি, চোখ বন্ধ, তার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে নামা। বুয়াজি দেখেই আরেক চোট হাঁউমাঁউ লাগাল, "আরে তুই পাগল নাকি? এমনি করে কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামে? ঘুম ভাঙেনি এখনও? পড়ে হাত পা ভাঙলে তোর বাবাকে কী বলব শুনি? আমার হয়েছে যত জ্বালা।"

"দাদির কী হয়েছে?"

অমনি বুয়াজির গলার আওয়াজ পালটে গেল। আবার সেই কাঁদো কাঁদো ভাব। "কী জানি কী হয়েছে। দ্যাখ না কেমন করে শুয়ে আছে, ঠোঁট- টোঁট সব নীল। ঠেললে সাড়াও দিচ্ছে না। কী করি বল দেখি।"

ছোটকু আস্তে করে দাদির হাতটা ধরল। বাপরে কী ঠান্ডা হাত। কষ্ট করে নিশ্বাস নিচ্ছে দাদি, ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

"একবার বৈদজির বাড়ি যাবি ছোটকু? যদি আসেন দয়া করে।"

ছোটকুদের গ্রামে ডাক্তার নেই, যা কিছু চিকিৎসা ওই বৈদজিই করেন। পাতালতা দিয়ে তৈরি নানা রকম ওষুধ, বেশিরভাগই বিদঘুটে তেতো। কিন্তু নিয়ম করে খেলে অসুখ সেরে যায়। গ্রামের সবাই বৈদজিকে ভগবান মানে। বৈদজিও কখনও কাউকে ফেরান না, সে বেলা দুপুরই হোক, কি মাঝরাত। একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হল।

"যা না বাবু, বড়ো টর্চটা নিয়ে।"

"ভোরবেলা গেলে হত না? এখন এত রাতে..."ছোটকু একটু মিনমিন করে বলার চেষ্টা করে।

"ভোরবেলা পর্যন্ত কি বুড়ি টিঁকবে রে?" বুয়াজি এবার কেঁদেই ফেলে। "আমিই যেতাম, কিন্তু মা- কে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাই কী করে?"

বুয়াজিকে আজ পর্যন্ত কোনওদিন কাঁদতে দেখেনি ছোটকু। তার ভেতরটাও যেন কী রকম করতে থাকে।

"আচ্ছা, আচ্ছা যাচ্ছি। তুমি কেঁদো না বুয়াজি। টর্চটা দাও।"

বুয়াজি চোখ মুছতে মুছতে চার ব্যাটারির টর্চখানা এনে দেয়। "তাড়াতাড়ি যাস মণি। সাবধানে যাস।"

দরজার বাইরে পা দিতেই ভয় ভীষণ খুশি হয়ে ঝাঁপিয়ে আসে। অন্ধকার রাত ঝিমঝিম করছে, তারা- টারাও দেখা যাচ্ছে না। চারদিক শুনশান, নিশুতি। রাস্তার মোড়ে সেই কতদূরে একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে, আর কোত্থাও কিচ্ছু নেই, কেউ নেই। সবার বাড়ির সব জানালা দরজা এঁটেসেঁটে বন্ধ। এ দিক ও দিক সব দিকে শুধু ভয় আর ভয়। ছোটকুর পা দুটো পাথরের মতো ভারী লাগে। বুয়াজি বলেছে তাড়াতাড়ি যেতে, পা- ই তুলতে না পারলে যাবে কী করে? তার উপর রাতে এ দিকে নেকড়ে বেরোয়। ছোটকুর গায়ে কাঁটা দেয়, সারা শরীর শিউরে শিউরে ওঠে। টর্চ থেকে বেরোনো আলোয় সামনে যে একটুখানি গোলমতো জায়গা দেখা যায়, সেই দিকে চোখ রেখে ছোটকু জোর করে একটা একটা করে পা তোলে আর ফেলে। ভয় চলে তার ঠিক পাশে পাশে, পিছনে পিছনে।

বৈদজির বাড়ি অনেকটা উঁচুতে, বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। কিছুটা উঠলেই বাড়িঘর কমে আসে, দূরে দূরে এক একটা। তারপরে জোয়ারের ক্ষেত, তারও পরে জঙ্গল শুরু। জঙ্গলের ঠিক ধারটাতেই বৈদজির ছোট্টো বাড়ি। এত রাতে জঙ্গল থেকে কত রকম অদ্ভুত আওয়াজ আসে, ভয়ও আসে তার সঙ্গে সঙ্গে। ছোটকু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়তে থাকে। ঠিক জানে, থামলেই ভয় খপ করে চেপে ধরবে।

খটখট কড়া নাড়ার শব্দে বৈদজির ঘুম ভাঙে বোধ হয়, একটা ঘরে লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। এদিকে সব বাড়িতে বিজলি আসেনি এখনও। ঘুম জড়ানো একটা মোটা গলা হাঁক দেয়, "কে ওখানে?"

"আমি বৈদজি, ছোটকু।"

"কে ছোটকু?" গলাটা একটু বিরক্ত শোনায়।

“হাবিলদার লাখন সিং রাওয়াতের ছেলে বৈদজি, ছোট্টন সিং রাওয়াত, ছোটকু।” ভয়ে ছোটকুর ঠোঁট থরথর করে কাঁপে।

“আরে রে বেটা, এত রাতে এখানে কী করে এলি?” তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে যায়। বুড়ো বৈদজি হাতে লণ্ঠন নিয়ে চোখ কুঁচকে ছোটকুকে দেখেন। “কী হয়েছে বেটা? আয়, ভিতরে আয়।”

“না বৈদজি, তুমি তাড়াতাড়ি চলো, আমার দাদির খুব অসুখ। তুমি এক্ষুনি না গেলে দাদি আর বাঁচবে না।” ছোটকুর গলা ধরে আসে বলতে গিয়ে।

“তুই একা একা এতখানি রাস্তা এলি, এই অন্ধকারে? তোর তো খুব সাহস বাচ্চা! তা হবে না- ই বা কেন? কার ছেলে দেখতে হবে তো। লাখন সিং- এর মতো সাহস এই গ্রামে আর কারই বা আছে? একটু দাঁড়া, আমি আসছি তোর সঙ্গে। বাক্সটা নিয়ে আসি।” বৈদজি ভেতরে যান। লণ্ঠনটা নিয়েই যান, খেয়াল করেন না যে ছোটকুকে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ছোটকু কিন্তু কিছু টেরই পায় না, আলো না অন্ধকার। বৈদজির বলা কথা ক’টা তার মাথার মধ্যে গুনগুন করে শুধু ঘুরতেই থাকে। সাহস আছে তার? সাহস? তার বাবার মতন সাহস? তার ছোট্ট বুকটার মধ্যে কেমন একটা অন্য রকম অনুভূতি হতে থাকে, শরীরটা টানটান সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সাহসী বাবার সাহসী ছেলে সে, ভয় আবার কী? আসলে ভয় বলে কিছু সত্যি সত্যি ছিলই না কোনওদিন কোথাও। যা কিছু ছিল সব এই মনের মধ্যে। আজ বৈদজি তার মনটাকেও এক্কেবারে সারিয়ে দিলেন যেন। সাধে কী আর গ্রামের লোকেরা বৈদজিকে এত ভক্তি করে! দাদিমাও ঠিক সেরে যাবেন এবার, বৈদজির ওষুধ পড়লেই।

‘ম্যাও’ করে একটা ছোট্ট আওয়াজ। ছোটকু ভারী অবাক আর ভারী খুশি হয়ে দ্যাখে বিল্লোরানিও এতটা রাস্তা তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। সাহস জোগাতে। ও তো আর জানে না, ছোটকুর আর বাইরে থেকে জোগানো সাহসের দরকার নেই। তবু নিচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নেয় ছোটকু। আদর পেয়েই বিল্লোরানি অমনি বলে, “উমম, উমম, মিউ।”

ভয় সব টের পায়, আর কুঁকড়ে গুটিয়ে এইটুকুটা হয়ে যায়। শেষ চেষ্টায় দু- একবার ঘোরে ছোটকুর এ পাশ ও পাশ, ছোটকু বুঝতেও পারে না। হাতে লণ্ঠন নিয়ে বৈদজি, বৈদজির বাক্স নিয়ে ছোটকু আর ছোটকুর কাঁধে চড়ে বিল্লোরানি উৎরাই ধরে নেমে যায়। ভয় যায় না ওদের সঙ্গে। ভয় পিছোতে থাকে, পিছোতে থাকে, পিছিয়ে পিছিয়ে চলে যায় রাত পেরিয়ে, অন্ধকার পেরিয়ে সে- ই কত দূরে, যেখানে আকাশ নেমে এসে মাটি ছোঁয় তার থেকেও দূরে। ভয় আজ নিজেই ভয় পেয়েছে যে।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

গল্প প্রতিযোগিতা- ষষ্ঠ

কেজো ভূতের গল্প

অপর্ণা গাঙ্গুলি

আমাদের পাড়া দিয়ে সম্প্রতি রোজ রাতদুপুরে একটি তালশিড়িঙ্গে লোক হেঁকে যায়।

"ভূত চাই, ভূত...

ভালো ভালো ভূত আছে

ভালোভূত, আলোভূত, মেছোভূত, গেছোভূত, ছানাভূত, দানোভূত, কেজোভূত, হেজোভূত, বাসিভূত, কেশোভূত, মেসোভূত, হরেক রকম ভূত চাই- ই- ই- ই..."

প্রথম প্রথম ভারী অবাক হয়েছিলুম। ভয়ে ভয়ে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতুম লোকটাকে। সোজা নাক বরাবর হেঁটে যেত সেই লম্বাগিজাং লোকটা পরিত্রাহি ডাকতে ডাকতে। আর লোকটার ডাক শুনেই যে কটা বাড়ির জানলা খোলা থাকত, সব দুদ্দাড় করে বন্ধ হয়ে যেত। সত্যি তো , এতো আর 'সিলললললল কাটাউউউউউউউ'- এর ডাক নয়, কিম্বা জয়নগরের মোয়াওয়ালার মধুর ডাক নয়। নিদেনপক্ষে 'ছাতাসারাই' কিম্বা 'এইনাআআআআ বাসুনলাগবেননননননন' এর ডাকও না। এ হলো রীতিমত যাকে বলে রাতদুপুরে ভূত কেনার আমন্ত্রণ। কে আর শখ করে বাঁশঝাড় ঘাড়ে নেয় বাপু।

আমি একলা থাকি এই তিন কামরার একতলা বাড়িটিতে। বিয়ে থা করিনি। একটা শক্ত অসুখে এখন হুইলচেয়ারে আটক। তবে মাঝেমাঝে আমার কিছু উদ্ভট খেয়াল চাপে। হঠাৎ মনে হল, তাই তো একটা ভূত কিনলে বেশ হয়। একা থাকি, মানুষ না হোক, ভূতই সই। আর আজকাল মানুষজনের যা নমুনা দেখছি, তাতে বরং ভূতই ভালো সঙ্গী। দরদস্তুর করে যদি একটা ভালো দেখে ভূত কেনা যায়, মন্দ কী? কী খায়- দায় অবশ্য জানা নেই। তা সে জিজ্ঞাসা করলেই হবে'খন। এই না ভেবে একদিন তক্কেতক্কে ছিলুম। যেই না ভূতওয়ালা হাঁক পেড়েছে, অমনি ডাক দিলুম – "ও ভাই ভূত, শোনো, এই যে এদিকে..."

লোকটি আমাকে দেখতে পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পড়ল, "এগ্গে আপুনি আমাকে ভূত বলে ডাকতেছিলেন কেন ? আমি ভূত নই, আমি ভূত বেচি গো বাবু।"

"হা? ও ভুল হয়ে গেছে খুব বাবা, ঠিক খেয়াল করিনি তো।" আমিও ততোধিক বিনয় করেই বলি।

মনে ভাবি, কী জানি বাবা তুমি ভূত কিনা, অমন মূলোর মতো দাঁত আর কুলোর মতো কান কেন তোমার? আমার গা শিরশিরিয়ে ওঠে লোকটার ভাঁটার মতো চোখ দেখে। আর গায়ে কী একটা বিকট গন্ধ। তা হতে পারে। সব ভূতগুলো ওর পিঠের ওই বস্তায় কিনা। ভূতেদের গায়ে শুনেছি একটা বিজাতীয় গন্ধ বের হয়।

সে যাকগে, অনেক ভেবে ঠিক করলুম একটা কেজো ভূত কিনব। এমনিতে একটু আধটু লেখালেখি করি, তাই অনেক সময় কাজ করার সময় পাইনে। ভূত যদি কাজকম্ম গুলো সেরে দেয়, আমার খুব উপকার হবে। লোকটা অভয় দেয়, "বাবু, এ আপনার সমস্ত কাজ করবে, কোনও সময় একটু বসতে পারবে না। আপনাকে ওকে সারাক্ষণ কাজ দিয়ে রাখতে হবে। আর এদের বয়স চারশ বছরের উপরে, ছানা ভূত কেউ নয় এরা।" আমিও ভাবলুম, যাক বাপু, শিশুশ্রমিক দিয়ে তো আর কাজ করাচ্ছি না।

তা সে আর এমন কী কথা। কাজ তো মেলাই থাকে, করবে এখন। শেষকালে ঠিক তিনশ তিন টাকা দিয়ে একটা জম্পেশ কেজোভূত কিনে ফেললুম। আর আমার এহেন প্রগতিতে আমি নিজে যারপরনাই খুশি হলুম। তিনটে একশ টাকার কড়কড়ে নোট আর তিনটি এক টাকার কয়েন গুণে নিয়ে লোকটা পিচিক করে একটা বোতল থেকে কী যেন বের করে ঘরের কোণে ছেড়ে দিয়ে সেই যে হাঁটা দিল, আর এমুখো হল না।

ও মাগো, ওটা কী! এইটুকু একটা ছাই রঙের জেলির মতো। ওমা! ওই তো একফুট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দেখো। আবার হেঁট হয়ে ও কী করছে? নমস্কার? তাই বোধ হয়। আমিও

প্রতিনমস্কার করি। "হা বাপু কেজো ভূত, নমস্কার। যাও বাবা ঘরদোর বেশ পোক্কার করে ফেলো তো। পুজোবার্ষিকী লেখার তাগিদে এসব কাজে মন দিতে পারিনি। একা থাকি, লোকজন রাখার ঝামেলি নিই না বড়ো।"

কেজো ভূত চোখের সামনে থেকে উধাও হল। ঠিক দশ মিনিটে আমার বাড়ি একেবারে ঝকঝকে তকতকে। এমন পরিষ্কার যে নিজের ছবি ঘরের লাল মেঝেতে দেখে আমি প্রায় চমকে উঠেছিলুম। আমার আর কিচ্ছু বলার নেই। ভূতওয়ালাকে মনে মনে খুব আশীর্বাদ করলুম। আর মিষ্টি জেলিপারা ওই কেজো ভূতটিকে মনে মনে চুমো দিলুম।

মুখে অবশ্য বললুম, "বেশ করেছ।"

এরপর যাই কাজ দিই, নিমেষের মধ্যে সারা।বলব কী আমাকে রাতে যা ভালো রুটি আর আলুর দম করে খাওয়ালে, আমি অমন আলুর দম মা গত হবার পর থেকে আর খাইনি। কেজো তো কিচ্ছু খায় না। বলে গেছে লোকটি, "বাবু ওরা বায়ুভুক নিরাশ্রয় প্রাণী, এই আপনি ওকে আশ্রয় দিলেন... খুব ভালো হোক আপনার।"

এরপর একটু মুশকিলে পড়লুম। জামাকাপড় কাচা, রান্নাবান্না করা, একতলার ছাদের এক টুকরো ঘরের জমা জিনিস পরিষ্কার করা, কুয়ো থেকে জল তোলা, উনুন পরিষ্কার করা, আমার পিঠ মালিশ করা সেরেও যখন ভূতের এনার্জি অটুট, তখন আমার প্রায় কাজ দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে। কী করি, কী করি। বেজায় বিপাকে পড়লুম। কাজ না পেলে কী করবে জানা নেই। ঘাড় মটকাবে কিনা কে জানে। তখন আমার নিরেট মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি একা মানুষ বলে মনে একটু দুঃখু- টুঃখু আছে, সে সব চেপেচুপে রাখি। সটান শুয়ে পড়ে কেজো ভূতকে হুকুম করলুম, "কেজো ভূত, আমার মনের দুঃখুগুলো একে একে বের করতে পারো?" সে আর দ্বিরুক্তি না করে লেগে গেল দুঃখু বের করার কাজে।

হলো কী, একটা একটা করে দুঃখু টেনে টেনে বের করে সে আর আমার আরামে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় বুকের ভেতর একটা সুখের পালক কে বুলিয়ে দিচ্ছে যেন। সেই ইস্তক অন্য কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, কেজো এখন যা দুঃখু জমা হয় বের করে দেয়। এই করে করে আমার যদি আর দুঃখই না থাকে? তাই তো ভাবছি কী করা যায়। আমি ভাবছি, সব দুখী মানুষদের ডেকে তাদের দুঃখগুলো বের করবার কাজে লাগাব কেজো ভূতকে। ভালো লাগাও হবে আর মানবসেবাও হবে। কী বলো, তোমরা?

পৃথিবীতে এত দুঃখু কষ্ট, বড়ো খারাপ লাগে।

ছবিঃ শাম্ব

গল্প প্রতিযোগিতা- সপ্তম

ভূত জোলাকিয়া

গরম গরম ভাতে বেগুনসেদ্ধ আর দু ফোঁটা সর্ষের তেল। সঙ্গে একটু নুন আর কাঁচা লংকা। কী তার স্বাদ, কী তার গন্ধ! এক গরাস মুখে দিয়ে মনে হল যেন অমৃত। লংকায় একটা বড়োসড়ো কামড় বসিয়েছিল ভানুমতী। তাতেই হয়েছে বিপদ। দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে ব্রহ্মতালু। জিভে যেন একটুও সাড় নেই। হেঁচকি উঠতে শুরু করেছে পরপর। চোখ আর নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে স্রোতের মতো।

ঘটনা দেখে হাঁ হয়ে গেছে পটললাল। ভানুমতীকে বারবর দেখে এসেছে টিয়াপাখির মতো টপাটপ লংকা খেতে। বউয়ের জন্য খুঁজে খুঁজে সবচাইতে ঝাল লংকা কিনে নিয়ে আসে পটললাল। তবুও ভানুমতীর আশ মেটে না। তাদের অফিসের নাইটগার্ড গুপিনাথ গুঁই পাঁচ ক্রোশ দূরের সাহেবপোতা থেকে আসে। সেখানকার আকাশি লংকার খুব নাম। গুপিনাথকে দিয়ে সাহেবপোতা থেকে কয়েকবার আকাশি লংকা আনিয়েছে পটললাল। অন্য লংকার মতো নীচের দিকে ঝুলে থাকে না, আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে থাকে এই লংকা। আর ঝালও মোক্ষম। পটললাল একবার সেই লংকার ছালে একটু জিভ ঝুলিয়ে দেখতে গিয়ে ভিরমি খেয়েছিল। তা সেই লংকা খেয়ে ভানুমতী বহুদিন খুশি ছিল। কিন্তু একটা সময় সাহেবপোতার লংকা বিস্বাদ লাগতে লাগল ভানুমতীর মুখে।

এমন সময় সন্ধান পাওয়া গেল সিরাজগঞ্জের ধানি লংকার। পটললালের অফিসে এসে লটারির টিকিট বিক্রি করে জগবন্ধু সাহা। পটললাল লটারির টিকিট কাটে না বটে, তবে জগবন্ধুর সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা হয়। জগবন্ধুর বাড়ি সিরাজগঞ্জে। গল্পে গল্পে একদিন জগবন্ধু বলছিল, তার গাঁয়ের ধানি লংকার তেজ নাকি মারাত্মক। চেহারায় ছোটো কিন্তু প্রত্যেকটা লংকা যেন এক একটা পরমাণু বোমা। আগ্রহী হয়ে জগবন্ধুকে দিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে কয়েক কেজি ধানি লংকা আনিয়েছিল পটললাল। সেই ঝাল লংকা খেয়ে ভানুমতী খুশি থাকল কিছুদিন। কিন্তু বিধি বাম। কয়েক মাস পর আবার গিন্নির মুখ ভার। এর থেকেও ঝাল লংকা চাই তার।

পটললালের অফিসের বড়োবাবু লালু বোস সিকিম ঘুরতে গিয়ে সকলের জন্য কাঠের কারুকার্য করা চাবির রিং নিয়ে এসেছিলেন। শুধু পটললালের জন্য এনেছিলেন এক ব্যাগ লংকা। গোল গোল দেখতে, কিন্তু অসম্ভব ঝাল। তার স্থানীয় নাম ডলে খরসানি। একটা লংকা খেলে হিহি ঠান্ডাতেও শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মাত্র একটা লংকা দিয়েই দু কেজি মাংস রান্না করে ওদিকের লোক। তা লালু বোসের আনা সেই ডলে খরসানি দিয়েই অ্যাদ্দিন কাজ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন হল ভানুমতীর আবার মন খারাপ। ওই ঝালস্য ঝাল লংকাও আজকাল আমসি লাগতে শুরু করেছে তার মুখে।

পটললাল নিচুতলার চাকুরে। অভাবের সংসার। কচুসেদ্ধ- বেগুনসেদ্ধ দিয়েই ভাত খেতে হয় বেশির ভাগ দিন। তবে একদিক দিয়ে বাঁচোয়া তার বউয়ের মাছ- মাংসের ওপর লোভ নেই। শাড়ি গয়নার দিকেও ফিরে তাকায় না ভানুমতী। শুধু ওই একটা জিনিসের প্রতিই তার দুর্বলতা। মনের মতো ঝাল লংকা পেলে ভানুমতী শুধু নুন দিয়েই এক থালা ভাত খেয়ে নিতে পারে, আর কিচ্ছুটি চাই না তার। কিন্তু সেই তুচ্ছ জিনিস জোগাড় করতে গিয়েই পটললাল হিমসিম।

সেদিন অফিসে হাজিরা খাতায় সই করছিল পটললাল। লালু বোস জিজ্ঞাসা করলেন, তোর ভাঁড়ারের ডলে খরসানি তো এখন নিশ্চয়ই শেষের পথে। আমার এক বন্ধু সিকিম যাচ্ছে বেড়াতে। তাকে দিয়ে ডলে খরসানি আনাব? পটললাল ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল, "নাহ্ ছেড়ে দিন বড়োবাবু। ডলে খরসানি এখন আলুনি হয়ে গেছে ভানুমতীর মুখে। লোকে যেমন মুখশুদ্ধি খায়, তেমনি করে ভাত খাবার পর দুটো করে ডলে খরসানি আজকাল চিবিয়ে খায় ভানুমতী।"

লালু বোস হাঁ হয়ে গেলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, "আমাদের প্রত্যেকের জিভে টেস্ট বাড থাকে। যাকে বলে স্বাদেন্দ্রিয়। সেটাই কোনও খাবারের টক- মিষ্টি- নোনতা- ঝাল স্বাদ আমাদের মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়। তোর বউয়ের জিভে নির্ঘাত টেস্ট বাড বলে কিছু নেই। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলে একটা সংস্থা আছে। তাদের একটা চিঠি লিখব ভাবছি। ওরা যদি পরীক্ষা করে দেখে যে, প্রকৃতির খেয়ালে তোর বউ ওই স্বাদেন্দ্রিয় বস্তুটি ছাড়াই জন্মেছে তাহলে... তাহলে কিন্তু লটারি লেগে যেতে পারে রে পটল!"

ধড়াস ধড়াস করছিল বুক। পটললাল ঠোঁট চেটে জানতে চাইছিল, "কেন বড়োবাবু?" লালু বোস বলেছিলেন, "তোর বউকে বিরাট টাকার চেক দেবে কোম্পানি!" পটললাল ঢোক গিলে বলেছিল, "কত টাকা?" লালু বোস চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "অত জানি না। তবে দু-চার কোটি না হোক দু-চার লাখ তো দেবেই!" পটললাল মাথা চুলকে বলেছিল, "ইয়ে, মানে- তাহলে চিঠিটা কবে করবেন বড়োবাবু?" লালু বোস ফাইলের কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিলেন, "একটু সবুর কর। আগে ওদের ঠিকানাটা জোগাড় করে নিই, তারপর দেখছি।"

লালু বোসের কথা শুনে ঘুম ছুটে গিয়েছিল পটললালের। কতগুলো একশ টাকার নোট জড়ো করলে এক লাখ বা এক কোটি টাকা হয়, সেটা ভাবতেই গুলিয়ে যাচ্ছিল মাথা। কিন্তু একটা জায়গাতেই খটকা। শরীরে জন্ম থেকেই খুঁতো মানুষ তো কত আছে। তাদের সবাইকেই কি পুরস্কার দেয় এই কোম্পানি? তার সঙ্গে বড়োবাবু মশকরা করছেন না তো?

কথাটা শোনার পর থেকেই পটললালের কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। বায়ু চড়ে গেলে যেমন হয়। রাতে ঘুম আসছিল না। বুকের মধ্যে সবসময় একটা ঢিপঢিপ ভাব। তাদের ছেলেপুলে নেই, টানাটুনির দুজনের সংসার। অতগুলো টাকা কোথায় রাখবে, কীভাবে খরচ করবে সেসব ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কদিন ধরে। এখন ভানুমতীকে লংকার ঝালে নাকের জলে চোখের জলে হতে দেখে পটললাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বড়োলোক হবার হাজার ঝামেলা। এই বেশ ভালো আছে, উটকো টাকার দরকার নেই তার। তবে হ্যাঁ, ভূত জোলাকিয়ার প্রতি পটললালের বেশ একটা শ্রদ্ধাভক্তিও হল। ওইটুকু বামনবীরের মতো চেহারা, তার এত তেজ! তুখোড় লংকাখেকো ভানুমতীকে কিনা শেষ পর্যন্ত এভাবে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল!

ভানুমতীর ভাই জয়গোপাল থাকে বঙ্গাইগাঁওতে। বাজারে চালের আড়ত। গত বর্ষার সময় বঙ্গাইগাঁওতে গিয়েছিল দুজনে। দিদি আর জামাইবাবুর জন্য ব্রহ্মপুত্রের ইলিশ নিয়ে এসেছিল জয়গোপাল। কালো জিরে কাঁচা লংকা দিয়ে ঝাল ঝাল ইলিশ রেঁধেছিল জয়গোপালের বউ। পটললাল শিসোচ্ছিল সেই রান্না খেয়ে। কিন্তু ভানুমতীর মুখ ভার। একটুও নাকি ঝাল হয়নি রান্নায়। জয়গোপালের বউ কাঁচুমাচু। এঁটো হাতে দিদিকে বসিয়ে রেখে জয়গোপাল স্কুটার নিয়ে ছুটল বাজারে। অসমের সবচাইতে ঝাল লংকা নিয়ে এল একটুক্ষণ পর। সেই লংকা এক মুঠো ডলে নিয়ে তবেই সেবার কয়েক গরাস ভাত মুখে তুলতে পেরেছিল ভানুমতী।

সপ্তাহখানেক বাদে ফেরার পালা। বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছিল জয়গোপাল। একটা মোড়া প্যাকেট পটললালের হাতে দিয়ে জয়গোপাল বলেছিল, "ভূত জোলাকিয়া লংকার বিছন আছে এর মধ্যে। নাগাল্যান্ড থেকে আনিয়েছি। এর থেকে ঝাল লংকা সারা দেশে আর নেই। প্রবাদ আছে, মানুষ তো দূরস্থান ভূত পর্যন্ত এই লংকা জিভে ছোঁয়াতে ভয় পায়!"

সেই লংকার বিছন নিয়ে এসে বাগানে লাগিয়েছিল পটললাল। এবার প্রচুর লংকা গাছ হয়েছে বাগানে। লংকাও ধরতে শুরু করেছে গাছে। গোল গোল বনকুলের মতো দেখতে। বেগুনি আর লাল মেশানো রং। গাছ থেকে লংকা ছিঁড়ে আজ প্রথম ভাতের পাতে তার স্বাদ নিতে গিয়েছিল ভানুমতী। তারপর এই লংকা কাণ্ড।

পাম্প স্টেশন চত্বরে পটললালের কোয়ার্টার। পাশেই গভীর অরণ্য। দিনের বেলাতেই নিঝুম অন্ধকার। শাল সেগুন চিকরাশি ওদালের জঙ্গলের মধ্যে শ্বদন্ত বের করে ঘুরে বেড়ায় বুনো জন্তু। কখনও সখনও দু- একটা চিতাবাঘ ছিটকে চলে আসে লোকালয়ে। পটকা ফাটালে বা সার্চ লাইট জ্বালালে তারা আবার ফিরে যায় বনে। ভুট্টা আর সুপারির চাষ করে দিন গুজরান করে এদিকের লোক। ভুট্টা যখন পাকে জঙ্গল থেকে হাতির পাল চলে আসে তাণ্ডব চালাতে। তখন মশাল জ্বালিয়ে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে তাদের তাড়াতে হয়।

পটললালের দু কামরার কোয়ার্টারের হাতা কিন্তু বেশ বড়ো। সেখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে ফুলগাছ করেছে পটললাল। বিকেলবেলা নিয়ম করে গাছে সার- জল দেয়। গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গন্ধরাজ, হাসনুহানা ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে থাকে ফুলবাগান। একদিকে লাগিয়েছে কিছু লেবুগাছ। লেবুগুলো ছোটো হলেও খুব রস। কাঁটাওলা লেবুঝোপের পাশে কীভাবে যেন ঢেঁড়স গাছের মতো দেখতে বেশ কিছু লতা কস্তুরি গাছ জন্মেছে নিজে থেকে। এই গাছ সুগন্ধি তৈরিতে কাজে লাগে তবে এর রোঁয়া বিচুটি পাতার বাবা! গায়ে একবার লাগলে সারাদিন ধরে চুলকোতেই থাকে। ফুলবাগানের অন্যদিকে টিনের দরজার গা ঘেঁষে আছে ঝুপ্পুস একটা কাঁঠালগাছ। এবার প্রচুর ফল হয়েছে গাছে।

বর্ষাকাল শুরু হবে হবে ভাব। ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে গোটা পাম্প স্টেশন চত্বর ম ম করছে পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণে। বনের মধ্যে আজকাল আর কাঁঠাল গাছ নেই। এদিকে দু পা বাড়ালেই লোকালয়। আর গেরস্ত বাড়িতে যদি পাকা কাঁঠালের মতো এমন লোভনীয় বস্তু থাকে, তাহলে হাতিরা দল বেঁধে আসবেই। কাল সন্ধেবেলা কপাল পুড়েছে দু নম্বর কোয়ার্টারে তারকেশ্বর লোহারের। হাতির পাল এসেছিল ভুট্টা খেতে। একটা দলছুট দাঁতাল কাঁঠালের গন্ধে গন্ধে চলে এসেছিল এদিকে। তারকেশ্বরের গাছের সব কাঁঠাল সাবাড় করে দিয়ে গেছে কাল।

হাতি এসে কাঁঠাল খেয়ে গেছে কিন্তু কারোর প্রাণ যায়নি এটাই বাঁচোয়া। এসব বন লাগোয়া বসতিগুলোতে মাঝেমধ্যেই হাতির উপদ্রব হয়। জমির ফসল নষ্ট করে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে হাতির পাল। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। পা দিয়ে পিষে আর শুঁড় দিয়ে আছাড় মেরে শুধু এই তল্লাটেই গত দু বছরে বারো জনকে মেরেছে হাতির দল। বন দপ্তর যে ক্ষতিপূরণ দেয় না, তা নয়। কিন্তু সে টাকা দিয়ে কিছুই হয় না। তাছাড়া প্রাণের কি আর দাম হয়! বাড়ির রোজগেরে মানুষটার কিছু একটা হয়ে গেলে বাকিরা পথে বসে। প্রত্যেক বছর হাতির হানায় যে বিপুল ক্ষতি হয়, সেটা সামলাতে বাসিন্দারা নাজেহাল হয়ে পড়ে।

সন্ধেবেলা রেডিওতে খবর শুনছিল পটললাল। হঠাৎ একটা শোরগোল — পটকা ফাটানোর আওয়াজ, ক্যানেস্তারা পেটাবার শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দটা ক্রমশ যেন আরও কাছে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘটাস করে একটা শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ চিৎকার। টর্চ হাতে নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বাইরে বেরোলো পটললাল। ঘরের বাইরে এসেই তার চোখ স্থির হয়ে গেল।

একটা বিরাট চেহারার হাতি টিনের দরজা ভেঙে সটান ঢুকে পড়েছে তার কোয়ার্টারের হাতায়। এটা নির্ঘাত কালকের সেই দাঁতালটা। কাল তারকেশ্বরের গাছের কাঁঠাল খেয়ে লোভ বেড়ে গেছে।

আজ ঢুকেছে পটললালের কোয়ার্টারে। লম্বা শুঁড় দিয়ে গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে খাচ্ছে। নাগালের মধ্যে যে ক'টা কাঁঠাল ছিল সবগুলো শেষ করে এখন মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে শুরু করেছে গাছের কাণ্ডে। হাতির শরীরে অসীম জোর। পাকা কাঁঠালগুলো গাছ থেকে খসে পড়ছে ধপধপ করে। মাটিতে পড়ে থাকা কাঁঠাল শুঁড় দিয়ে তুলে টপাটপ খেয়ে নিচ্ছে হাতিটা। চারদিকে এত হৈ চৈ চলছে তবুও তার একটুও ভ্রুক্ষেপ নেই।

খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসেছে। মশাল জ্বালিয়ে, পটকা ফাটিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে চেষ্টা করছে হাতিটাকে বনে ফেরাতে। সার্চ লাইট জ্বালিয়ে হাতিটার চোখে ফেলেছিল একজন। তাতেই হয়েছিল বিপদ। কাঁঠাল খাওয়া ছেড়ে লোকটার দিকে তাকাল হাতিটা। ভয় দেখাবার জন্য একজন বনকর্মী দু রাউন্ড শূন্যে গুলি চালিয়েছিল। চোখের পলক ফেলার আগেই ছুটে এসে লোকটার বন্দুক শুঁড় দিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে দাঁতালটা। এক আছাড়ে ভেঙে ফেলে দিল বন্দুক। লোকটা ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। হাতিটা কেমন একটা আওয়াজ করে তাকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা দিল একটা। ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা।

পটললাল খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। হঠাৎ করেই মাথার মধ্যে একশ ওয়াটের বাতিটা জ্বলে উঠল তার। পা টিপে টিপে ঘরের ভেতরে গেল পটললাল। দু মিনিট বাদে যখন বেরোল তখন তার হাতে শালপাতার দোনা দিয়ে বানানো একটা পুঁটলি। বাতাবিলেবুর মতো তার সাইজ। সন্তর্পণে হাতিটার দিকে এক পা দু পা করে এগোল পটললাল। পুঁটলিটা ছুঁড়ে দিল দাঁতালটার দিকে। কাঁঠাল খেতে খেতে মুখ তুলে পটললালকে একবার দেখল হাতিটা। মাথা নিচু করে শুঁড় দিয়ে পুরো পুঁটলিটাকে নাড়ল চাড়ল একটুক্ষণ। শুঁড় দিয়ে টেনে পুঁটলিটা পেটে চালান করে দিল এক নিমেষে।

হাতিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো ছোটো চোখ দিয়ে পটললালকে দেখছে এক দৃষ্টে। বুক ঢিপঢিপ করছে পটললালের। হঠাৎ একটা সাংঘাতিক পিলে চমকানো আওয়াজ তুলল হাতিটা। তারপর ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। সাড় নেই একটুও। মিনিট পাঁচেক গেল। দাঁতাল শুয়ে আছে শুয়েই আছে, ওঠার নামগন্ধ নেই। পটকা ফাটানো, টিন পেটানো থেমে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতা।

আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে দাঁতালটা। ধপ ধপ করে ছুট দিয়েছে সামনের দিকে। যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকে না গিয়ে লেবুগাছের ওদিকটা দিয়ে বেরোবার পথ খুঁজছে হাতিটা। লেবুর কাঁটা লেগে ছড়ে গেছে সমস্ত গা। ছাই ছাই প্রকাণ্ড শরীর থেকে গড়িয়ে নামছে লাল রক্ত। এমনিতে হাতির স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। এসেছে যে পথ দিয়ে, সেটা ভুলে যাবার কথা নয় তার। কিন্তু কোনও কারণে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে হাতিটার।

দাঁতালটা লতা কস্তুরি গাছগুলোর দিকে এসেছে এবার। তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল আবার। তারপর ধপ করে পড়ে গেল নরম মাটিতে। অতি কষ্টে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। লতা কস্তুরির রোঁয়া লেগে গেছে সারা গায়ে। নিশ্চয়ই চুলকোতে শুরু করেছে সারা শরীর। হাতিটা এখন পাগলের মতো গা ঘষছে দেওয়ালে। কার্ডবোর্ডের পলকা বাক্সের মতো ভেঙে পড়ল সিমেন্টের দেওয়াল। পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে সামনের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে

ছুট লাগিয়েছে দাঁতাল। পিছন পিছন ছুটছে বনকর্মীরা। টিন আর ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে ছুটছে উৎসাহী জনতা।

হাতিটার গমনপথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ভানুমতী। একটুক্ষণের মধ্যেই দাঁতালটা দৃশ্যের আড়ালে চলে গেল। ভানুমতী গলায় উৎকণ্ঠা মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল, "পুঁটলির মধ্যে কী ছিল গো? সেঁকো বিষ নাকি?"

পটললাল মুচকি হাসল, "উঁহু। ছিল ভূত জোলাকিয়া।"

ভানুমতী চোখ গোল গোল করে বলল, "মানে?"

পটললাল পায়রা ওড়ানো হাসি হাসল, "ওহ্ জব্বর জিনিস দিয়েছিল জয়গোপাল। কী ঝাল কী ঝাল! মাত্র একটা লংকা খেতে গিয়েই তোমার মতো সাংঘাতিক লংকাখোর মানুষ পর্যন্ত কুপোকাত হয়ে পড়েছিল। সেই ঝাল লংকা কুড়ি- পঁচিশটা খেয়ে হাতিটা যা শিক্ষা আজ পেয়েছে তাতে ওর জন্মের মতো কাঁঠাল খাওয়ার শখ ঘুচে গেছে। ব্যাটা জীবনে আর এদিক মাড়াবে না!"

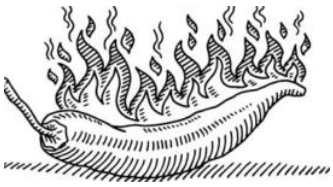

ছবি শাম্ব

সাঁঝবাতি

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

চাংরীপোতা থেকে হরিনাভির গঙ্গার ঘাট বড়োজোর দেড় ক্রোশ পথ। এ পথটুকু হাঁটতেই সার্বভৌম মশায়ের পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গেল। বড্ড বয়েস হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় হারজিচণ্ডীতলার মাঠ, গোড়ের খাল, ঠাকুরঝিপুকুর পেরিয়ে কালীক্ষেত সুতানুটি অবদি হেঁটে যেতেন তুড়ি মেড়ে। পালকি আর নৌকো থাকলেও পয়সা লাগত বলে চড়তেন না। আর আজকালকার বাবুদের তো এপাড়া থেকে ওপাড়া যেতেও পালকি চাই। পোড়ারমুখো সাহেবরা আবার ঘোড়ায় টানা হাওয়াগাড়ি বার করে ছেলেছোকরাদের মাথা খেয়েছে। ত'বিলে কড়ি থাকলে অমন আরো কত কী বা হবে!

তালপাতার ছাতাখানা পুরোনো হয়ে প্রায় খসে পড়েছে, এবার নতুন আর একখানা না হলেই নয়। খড়মটাও পাল্টানো দরকার। পাঠশালের চাল ছাইবার খড়ও চাই কয়েক কাহন। চাই বললেই তো হবে না, তার জন্য কড়িও চাই ঢের। শুধু তাঁরই নয়, এ তল্লাটের আরও দশ বিশটা পাঠশালের ওই একই অবস্থা। কালাজ্বরে গাঁয়ের পর গাঁ উজাড়, লোকে আসবে কোত্থেকে? বারুইপুরের বড়ো কাছারিতে এক ম্যাজিস্ট্রেট এয়েছে। নৈহাটির চাটুয্যে। বড়ো

ভালো ছোকরা। এত বড়ো চাকুরে তার কোন দেমাক নেই। ওই ভরসা। চাটুয্যে ছোকরা কথা দিয়েচে কোম্পানি না করলে ও নিজের থেকেই সাহায্য করবে। আহা বেঁচে থাক, এটুকু ভরসাই বা কে দেয় আজকাল।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে টুক টুক করে হাঁটছেন বুড়ো মানুষটা। পথে দেখা হলো দুকড়ি ডোমের সাথে। দুকড়ির ছায়া হয়ে সেঁটে আছে ওর ছেলে পরাণ। পথের ধুলোর ওপরেই সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম করলেন দুকড়ি। তাড়ির গন্ধে বাতাস ভরপুর।

"পেন্নাম হই গো পণ্ডিতমশাই।"

"ওরে ধুলোর ওপর গড়াস না , বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্। শরীর গতিক ভালো তো?"

"আপনাদের কিপায় ভালোই আজ্ঞা। বউটার সান্নিপাতিক হয়ে যাই যাই হয়েছেল, দয়াময়ী সতীমায়ের থানে হত্যে দেবার পর থেকে অষুধ ধরতেছে, কবরেজ মশাই আজ্ঞা করেছেন গেল হপ্তায় ঠিক হয়ে যাবে'খন।"

দয়াময়ী সতীমায়ের কথা শুনে সার্বভৌম ঠাকুর আনমনা হয়ে পড়লেন। চোখের কোণায় জল। ছেলেবেলায় দয়াময়ী ঠাকরুণকে সতী হতে দেখেছেন তিনি। দশ বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে কড়া সিদ্ধি খাইয়ে বুড়ো বরের সাথে চিতায় পুড়িয়ে মেরেছিল সামন্তরা। ধর্মের নামে কত বড়ো অন্যায়! তাঁর নিজেরও তখন দশ বারো। দয়াময়ীর খেলার সাথি। দয়াময়ীর বুড়ি সতীনের ছেলে পিতেম্বর সামন্ত সেই চিতার ওপর মঠ বানিয়েছিল। টাকাকড়ির মুখে আগুন! আশি বচ্ছর আগেকার সেই তুমুল ঢাকঢোলের শব্দ আজও তাঁকে অসাড় করে দেয়। রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। দয়াময়ীর পর আর কেউ সতী হয়নি এ গাঁয়ে। ছোকরা পণ্ডিতের দল লাঠি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

"হত্যে দিয়ে আর মন্তর দিয়ে কিছু হয়না রে ব্যাটা, কবরেজের ওষুধই সব। সান্নিপাতিক বড়ো সাধারণ অসুখ নয়! সাবধানে রাখিস।"

বেলা পড়ে আসছে। হেমন্তের বিকেলে বাতাসে শীত শীত ভাব। গঙ্গার জলে জোয়ারের টান লেগেছে। বুড়ো বটগাছের ছায়ায় চওড়া বাঁধানো ঘাটে বসে হাঁপ ছাড়লেন নব্বই বছরের ভবনাথ সার্বভৌম। লাল কাপড়ে যত্ন করে বাঁধা তল্‌পি কপালে বুকে ঠেকিয়ে নাবিয়ে রাখলেন। আড়াইশো বছরের পুরোনো চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি আছে এতে। ভবনাথের ভুরু কোঁচকানো। দুকড়িকে বলা হয়নি, কথাটা 'গেল হপ্তায়' নয়, বলতে হবে 'আসছে হপ্তায়'। বামুন কায়েতরাই ভুল করে, এ হতভাগা তো ডোম। এদের লেখাপড়া শেখাবে কে?

"নমস্কার পণ্ডিত মশাই।"

অবেলায় নজর ঠিক থাকে না, তবু গলার আওয়াজে চিনতে পারলেন ভবনাথ।

"আরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মশাই! আসতে আজ্ঞা হোক আসতে আজ্ঞা হোক!"

"ঠাকুর্দা! দয়া করে আপনি আজ্ঞে করবেন না। তার চাইতে গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি, চড় মারুন একটা।"

"আয় আয় বোস্। তুই তোকারি করলেই কি আর পান্ডিত্য কমবে তোর! তুই আমার বিদ্যার জাহাজ।"

"আর তোমার বিদ্যের সাগরটি কী রকমের?"

"কে, ঈশ্বর! ওরে বাবা ওতো জলবিছুটি, বুনো ওল্। মাথাটা দেখেছিস! যশুরে কই। ওর তো আজ আসবার কথা এখেনে। এতো দেরি তো করেনা সে!"

“বলেছে যখন আসবেই। হাঁটাপথে পটলডাঙ্গা থেকে হরিনাভি, অনেকটা দূর। তোমার তল্পিতে আজ কার অধিষ্ঠান? মনসা, কালিকা না চণ্ডী? ”

“ওদিকে নজর দিস্নে ছোঁড়া, ঈশ্বরের বায়না করা আছে।”

“কার রচনা ?”

“তাঁর নামের জায়গাটি উই না ইঁদুর রসিকতা করে খেয়ে রেখেছে, মূল অংশটা অবশ্য ঠিক আছে এখনও। আড়াইশো বছরের প্রাচীন পুঁথি, চণ্ডীমঙ্গল।”

“কালকেতু- ফুল্লরা!”

“ফুল্লরার বারোমাস্যার জায়গাটি কেমন খাসা বল! ঠিক যেন আমাদের ঘরের ঠাকুরানীদের চোপা থেকে তুলে সাজানো। পদকর্তার গিন্নীটি নির্ঘাৎ কুঁদুলে ছিলো। আহাঃ

আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায় আকুল হই লোটাই আক্ষি ক্ষিতি।।
ক্ষণে ক্ষণে উর্বি অক্ষি চারিদিকে চাহি।
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি যাই।।”

******

“জয় মাকালী ঘ্যাচাং!”

কচি গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে পরাণ। কলাগাছের থোরের গায়ে কাঠের টুকরোর ঘা পড়ছে ঘপা ঘপ্। পরনের ত্যানাটুকু কোথায় গেছে কে জানে। কালো হাড় জিরজিরে শরীরে তেজের অবশ্য কমতি নেই। কম নেই কাদামাটিও। হুঁকোর কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে হাসছে দুকড়ি।

“চুপ করবি রে ছোঁড়া!”

“পাঁঠা বলি দিচ্ছি যে!”

“এখন চুপ্ কর। কালীপুজোর দেরি আছে আরো এক হপ্তা, তখন পাঁঠাবলি দিস্।”

হুঁকোর মাথায় কলকি চড়িয়ে কলাপাতের নল বসিয়ে একটু দূর থেকে হাত বাড়ালো দুকড়ি, “বাবাঠাকুর, আজ্ঞা হোক।”

ভবনাথ হাত বাড়িয়ে হুঁকো নিলেন। গুরগুর করে শব্দ হচ্ছে। আবছা অন্ধকারে কালচে দেখাচ্ছে গঙ্গার খোলা জলে দুলন্ত কলমির দাম। তারা ফুটে উঠেছে একটি দুটি। হুঁকোর নীলচে ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে হেমন্তের জোলো বাতাসে। একটা বজরা ভেসে যাচ্ছে সুতানুটি কলকাতার দিকে। বজরার জানলায় লন্ঠন জ্বলছে। লালচে আলোয় কে একজন সাহেবি পোশাকের মানুষ মাথা নিচু করে বসে আছেন। দুই পণ্ডিত চেয়ে দেখলেন। কম আলোয় এত দূর থেকে ঠিক ঠাহর হল না। বজরার গুণটানা মাঝি একটু বসল এসে ঘাটের পৈঠেতে।

“কে যায় হে মাঝির পো?”

“বারুইপুরের কাছারি সাহেব আজ্ঞা।”

আবার উঠে হাঁটা দিয়েছে মাঝি। বজরা ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে ঘর ফিরতি ক্লান্ত রাজহাঁসের মতো। দেখতে দেখতে ডাইনে রাজপুর জগদ্দলের ঘাট পেরিয়ে গেল। জানালার আলো এখনও দেখা যায় মিট্মিটে আকাশপিদিমের মত, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আলো নেই আর একটুও। আকাশের অগুণতি তারা ফুটে উঠেছে। রাজপুর শ্মশানে

চিতা জ্বলে উঠলো কারো। আকাশে আগুনের ফুলকি উড়ছে। উড়ছে অনেক জোনাকিও। গঙ্গার ওপারে মানিকপুর। কয়েকঘর লোকের বাস সেখানে। তাদের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বলে উঠল। গেরস্তঘরের শাঁখে ফুঁ পড়ল।

দ্বারকানাথের দিকে হুঁকো বাড়িয়ে দিলেন ভবনাথ। দ্বারকানাথের দড়ি উড়ছে ফুরফুরে বাতাসে। কলকের টানে টানে উল্‌সে ওঠা আগুনে আনমনা চোখ দুটি দেখা যায়, গলার স্বর চাপা, গম্ভীর।

"বঙ্কিম চাটুয্যে মশাই কলকেতা চল্‌লেন। এই অবেলায়, কে জানে কী কারণ? কোম্পানির বড়োকুটুমদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো ভালো নয় একেবারেই। বেশিদিন এখানে তাঁকে পাবো বলে মনে হয় না ঠাকুদ্দা।"

"ঠিকই আন্দাজ করেছো।"

অন্ধকারে চেহারা দেখা যায়না, যেন আর একটা জমাট অন্ধকার এসে বসল গা ঘেঁষে। মাথায় খাটো, গলার আওয়াজ রুক্ষ আর জোরালো। ভবনাথ নড়ে চড়ে বসলেন।

"কে গো, ঈশ্বরচন্দ্রমশাই নাকি? স্বাগতম্!"

"প্রণাম নাও ঠাকুর্দা, বেঁচে আছো দেখছি।"

"বুড়ো আরও বিশ বচ্ছর বাঁচবে। তারপর কী বলছিলি?"

"বলছি ঠিকই ধরেছ। বঙ্কিম চাকরিতে ইস্তফা দিল। ভালো করে বল্‌লে কোম্পানি চাকরি ছাড়তে বাধ্য করল।"

"সে কী !"

"মর্যাদাবোধ খুব ওর। রসবোধের ও তুলনা নেই। লেখার হাতও ভাল। চাটুয্যের পো'কে চিনি অনেকদিন। ভারী মিশুকে। আমার তালতলার চটির মাথা কেমন বেঁকে বেঁকে যায়। বঙ্কিম আমায় বল্‌লে বিদ্যেসাগর মশায়ের চটি তো উর্দ্ধমুখী হয়ে স্বর্গবাসী হতে চাইছে!

"তুই কী বললি?"

আমি বললাম, "চট্টোপাধ্যায় বুড়ো হলেই বঙ্কিম হয়।"

দুই পণ্ডিত হা হা করে হাসছেন। ঈশ্বরচন্দ্র মুচকি হাসছেন।

"রসিক বটে! তা কোম্পানি তো হাতে মাথা কাটছে সবার! সাদা শকুনের দল তো রাখলে না কিছু!"

"দেরি আমার এ জন্যেই। ঝগড়া করে এলাম সাহেবগুলোর সঙ্গে। চব্বিশ পরগনা অন্ধকার হয়ে গেল হে!"

"একে কি এঁটে উঠতে পারবে সায়েবরা? মোকদ্দমা করবে না চাটুয্যে?"

"ওকে ওর কথা ভাবতে দাও। বঙ্কিমের ধাত আলাদা। শান্ দেয়া ইস্পাত।" ঈশ্বরচন্দ্র ভবনাথের দিকে তাকালেন, "ঠাকুদ্দা আমার চণ্ডীমঙ্গল?"

ভবনাথ অন্ধকারে তলপি বাড়িয়ে দিলেন। ঈশ্বর দু'হাতে যত্ন করে ধরে মাথায় ঠেকিয়ে পাশে রেখে গুছিয়ে বসলেন। ভবনাথ নরম হাতে ছুঁলেন ঈশ্বরকে।

"এত দেরি করে এলি যে, কলকেতা ফিরবি কী করে?"

"কাল ফিরব। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে ঢের। দ্বারকা দু'কড়িকে পাঠাও তো, পালকিতে আলো এনেছি, নিয়ে আসুক।"

"পালকি কোথায়?"

"রাজপুরের ঘাটে। পালকি চড়তে দেখলে বুড়োটা গাল দেয় বলে এ অবধি আনতে ভরসা পাইনি। দোখনো বুড়োর ঝাঁঝ খুব!"

পরাণকে পণ্ডিতমশাইদের পাশে বসিয়ে দুকড়ি গেল আলো আনতে। রাত হলেই পরাণের জারিজুরি খতম, ঢুলে পড়েছে ঘুমে। ঈশ্বর ওকে দ্বারকার কাছ থেকে নিজের কোলের কাছটিতে নিয়ে বসালেন। ভবনাথ দ্বারকার সাথে চোখাচোখি করে মুচকি হাসলেন।

"বিদ্যেসাগর, পোলাটি কিন্তু চণ্ডালের।"

"আরে আমরা তিনমূর্তিই বুঝি বড্ডো বামুন? জাতপাত মানো না বলে তোমাদের চতুষ্পাঠীতেও তো পোড়ো পাঠাতে চায়না লোকে। ডোমের হাতে হুঁকো খাও।"

"বেশ করি জাত মানি না। মানুষে মানুষে ভেদ থাকা উচিৎ শুধু জ্ঞান আর অজ্ঞানে, বোধ আর নির্বোধে।। জাত পাত চুলোয় যাক ।"

পরাণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বর পণ্ডিত। ঘুমিয়ে কাদা পরাণ।

"আমার নতুন বই করছি এদের সবার জন্যে। বাংলায় হরফ, বানান, চলতি কথা লিখতে শেখা এসব ব্যাপার আর কি। নাম দিয়েছি 'বর্ণপরিচয়'। বামুনের তবিলের তালপাত নয়, কাগজে ছাপা বই হবে। সব জাতের ছেলে মেয়েরা পড়বে।"

"তালপাতের মতো টিঁকবে তো?"

"টিকবে টিকবে। তা ছাড়া দুচারখানি না ছিঁড়লে আমার বিক্রি বাড়বে কী করে?"

"ব্যাটা বামুন ব্যাপারী! হ্যাঁরে ঈশ্বর, তোর দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য হবে?"

"ওরে শালা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী! দুবোনের ভাব না হলে লেখাপড়া এগোবে? তোর ইচ্ছে হয় চালকলা খেয়ে বামনাই করগে যা।"

দু'কড়ি ফিরে এলো আলো নিয়ে। পিছু পিছু যমদূতের মতো পালকি বেহারাদের সর্দার ধরণী সাঁতরা, হাতে সড়কি মাথায় পাগ। তার লাল চোখ, গম্ভীর আওয়াজ।

"বেহারাদের রেতে থাকবার ব্যবস্থা করে এলাম আজ্ঞা। আমি এলাম আপনাকে পাহারা দিতে। জায়গা তো ভালো নয়।"

"কোন দরকার নেই। তুই যা। রাত্তিরে বাইরে যেতে বারণ করিস, বড়ো শেয়ালের ভয় আছে এদিককার জঙ্গলে। দু'কড়ি চক্‌মকি আন।"

হেমন্তের রাত বাড়ছে। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। ঘাটের পৈঠের গায়ে ভরা জোয়ারের ঢেউ ভাঙছে কুল্ কুল্ ছল্ ছল্। বিন্দু বিন্দু হিম জমা হচ্ছে গাছের পাতায় পাতায়।

ঘাটের ফাঁকা চত্বরে তিন পণ্ডিত বাতি ঘিরে গুছিয়ে বসেছেন। দু'কড়ি নতুন করে কল্‌কে সাজাচ্ছে। ন্যাংটো শিশু পরাণ ঘুমিয়ে পড়েছে ঈশ্বরের চাদরের ওপর, ভবনাথের কোলে তার মাথা। কাঁধের ঝোলা থেকে নতুন লেখা কাগজের তাড়া বের করছেন ঈশ্বর। মুখপাতে খয়েরের রঙে বড়ো করে লেখা।- 'বর্ণপরিচয়'।

দ্বারকা আস্তে আস্তে ঠেলা দিচ্ছেন পরাণের গায়ে, "ওঠ্ বাবা ওঠ্। পড়তে হবে!" বড়ো বড়ো চোখ করে উঠে বসেছে পরাণ। কাঁচা ঘুম ভেঙে চোখ কচলাচ্ছে কচি দুহাতে। কাঁপা কাঁপা প্রদীপের আলোয় মন্দির কাঁপছে, ছায়া কাঁপছে। ঈশ্বর পণ্ডিত বলছেন-

"বল্ তো পরাণ, আমার সঙ্গে সঙ্গে বল্--

কাক ডাকিতেছে।
গরু চরিতেছে।
পাখি উড়িতেছে।
জল পড়িতেছে।
পাতা নড়িতেছে।”

ছবিঃশিবশংকর ভট্টাচার্য

দলমা মশায়

অমর মিত্র

ছোটোকু থাকে ন'পাহাড়ি। ন'পাহাড়ি কোথায়, না অনেকদূর। বাসে কলকাতা থেকে সাত ঘন্টা তো হবেই। তার আগে পার হতে হবে দামোদর নদ। পার হয়ে যেতে হবে জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে ধু ধু মাঠ, তার ভিতরে একটুখানি জল, সেখানে বক বসে আছে চুপটি করে মাছের আশায়। একটু দূরে নেড়া পাহাড়ের কোলে বসে আছে মস্ত দুই পাখি। তারা মানিকজোড়। একসঙ্গেই থাকে। একসঙ্গে ওড়ে মস্ত ডানা মেলে। তা পেরিয়ে আবার জঙ্গল, বাস চলেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। জঙ্গল শেষ হলে দেখা যাবে দূরে নীল পাহাড়। ওই হল ন'পাহাড়ি। ন'টি টিলা পাহাড়ে ঘেরা ন'পাহাড়িতেই থাকে ছোটোকু। সে খুব ছোটো যে তা নয়, আবার খুব বড়ো যে তাও বলতে পারি না। তার বাবা পাথর ভাঙে

নয় পাহাড়ের এক পাহাড় ঘোড়া- মুরগা পাহাড়ের মাথায় বসে। সকালে যায়, বিকেলে ফেরে। যত পাথর ভাঙবে, তত মজুরি পাবে। তারপর বাবা পাহাড় থেকে নেমে এসে নিচের কুন্ডাবাবুর অফিস থেকে মজুরি নেবে কুন্ডাবাবুর লোক পাথরের মাপ বলে দিলে। কুন্ডাবাবু ওই পাহাড়টা ইজারা নিয়েছে। গোটা পাহাড় ভেঙে লরিতে করে করে সে শহরে পাঠিয়ে দেবে। তাতে শহরের রাস্তা হবে, বড়ো বড়ো ইমারত হবে। ন'পাহাড়ির এক পাহাড় ভ্যানিশ হয়ে যাবে একটু একটু করে। কুন্ডাবাবু নাকি ন'পাহাড়ির সব পাহাড় লিজে দখল নিয়েছে। সব পাহাড় ভাঙবে। ভেঙে শহরে পাঠাবে।

ছোটোকুর বাবা তাই বলে রাত্তিরে ছোটোকুকে বুকে নিয়ে। ছোটোকুরা খুব গরিব। ছোটোকুর বয়স আট। সে দশ- এগার হয়ে গেলেই বাগালি করতে যাবে। বাগালি করা মানে গরুবাছুর চরানো। তাদের সেই মাঠে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে ঘাস আছে। ছোটোকুর কাজ হবে সারাদিন গরু চরানো। আর বাঁশি বাজানো। তার ইস্কুলে যাওয়া হবে না। ইস্কুলে এখন খাবার দেয় দুপুরে। কিন্তু ছোটোকু ইস্কুলে যায় না। তার বাবা তাকে তিন হাজার টাকায় সম্বচ্ছরের জন্য দিয়েছে কুন্ডা বাড়ি। সে গরু চরায় আর বাঁশি বাজায়। কুন্ডাদের গোটা দশ গাই আছে, বলদ আছে অমনি। সবাইকে নিয়ে ছোটোকু বেরোয় সক্কালে। ফেরে রোদ পড়তে বিকেলে। রাতে কুন্ডাদের দালানে ঘুমায়। তাদের বাড়িতে পেটেভাতে থাকে তো। সন্ধে থেকে সে ঝিমোয়। কিন্তু ঘুমোতে ভয় হয়। ঘুমোলে এরা ডেকে তুলে খেতে দেয় না তার মায়ের মতো। সে ঘুমোলে রাতের ভাত জোটে না। ভাত তো দিনে ওই একবার। দুপুরে মুড়ি আর কুসুমবীজ ভাজা কিংবা ছোলা সেদ্ধ, ছোলা ভিজোন, সঙ্গে লঙ্কা আর পিঁয়াজ। তাই খেয়ে পেট ভরায়। শীতে তার সুবিধে হয় খুব। সে তো কাঁচা খেতে পারে। ক্ষেত থেকে মুলো, কড়াইশুটি, টোম্যাটো, বাঁধা কপি, এমনকি কাঁচা ফুলকপিও তুলে খেয়ে নেয়। কচি পালং ও। একটু নুন লঙ্কা আর কাঁচা শব্জি। খিদে মেটাতে তার এই অভ্যেসটার কথা তার মা জানে। শুনে মা চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিল। বাবা শুনে বলেছিল, তাতে যদি খিদে মেটে, ভাল, আর ভাবনা থাকে না।

এই দুপুরে, এই শীত চলে যাওয়ার সময়, ফাল্গুন মাসে শাল, পিয়াল, হরিতকি, আমলকি, চালতে, ডেওয়া, বুনো আতার বন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে পাতা ঝরে ঝরে। কচি পাতাও গজাচ্ছে একটু একটু করে। বনের ভিতরে অনেকদূর দেখা যায়। বনের ভিতরে জীবজন্তুর চলার পথ ফাঁকা হয়ে গেছে। আর কোনো কিছু প্রাণী, সে মেঠো খরগোস হোক, শজারু হোক বা হরিণ হুড়াল শিয়াল হোক, এখন পারাপার করলেই শুকনো পাতায় শব্দ হবে, মড়মড় করে পাতা ভেঙে যাবে। সে ঠিকদুপুরে বাঁশিতে সুর তুলেছে জঙ্গলের ধারে বুড়ো এক অশ্বত্থতলায় বসে। তার বাবা ভিখিরিচরণ জঙ্গল ভাল চেনে। বাবা বলেছে, যবে এই বনের জন্ম হলো, এই আশুত গাছে তার শুরু। তারপর শাল হলো, সেগুন হলো, হরিতকি হলো, পিয়াল হলো, নিম, বয়রা, আতা--- কত কী। এই আশুত গাছের নাকি বয়সের গাছও নেই, পাথরও নেই। কত এর শিকড়বাকড়, ঝুরি নেমেছে কতখানি জায়গা জুড়ে। কোনটা আসল গাছ তা চেনা দায়। এর ছায়া অনেকখানি ছড়িয়ে। এখানে বসে সে

তার মুড়ি আর আর কাঁচা মুলো, কড়াইশুঁটি একটু খেয়ে বনের ভিতরের ঝর্ণা থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেছে। সামনে লাল মোরামের পথ, তারপর খালি মাঠে সবুজ ঘাস, তারপর আগুন জ্বলছে পলাশে পলাশে, শিমুলে, মাদারে। বনের ভিতরও ফুল ফুটেছে কত। শালফুল ঝরে বনের ভিতরটা ছেয়ে গেছে। আর আছে সোনাঝুরির ফুল, সোনালি হলুদ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল। আর আছে কত রকম ফুলের গন্ধ।

গরুগুলো সব কচি ঘাসের জমিতে খেয়ে বেড়াচ্ছে নিজেদের অন্ন, সবুজ ঘাস। এই জঙ্গলের কে না চেনে তাকে? গাছ- গাছালি, থেকে জীবজন্তু সব। তখন তার কানে এল পাতা মাড়ানোর শব্দ। জঙ্গলের শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে যেন আসছে। কে? তার বাঁশি থেমে গেল। কে গো? কে আসে? হাতি নয় তো! হাতির পাল আছে এই বনে। সেই দলমা পাহাড় থেকে তারা এসেছে বহু পথ ঘুরে খাবারের সন্ধানে। তারা তাকে চেনে। তার বাঁশি শুনে এক সকালে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওই লাল রাস্তায়। বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে হাতির দল যাচ্ছিল কোথায় যেন। তার বাঁশিতে সবাই চুপ। গরুগুলো হাতি দেখে ঘাসের জমির ভিতরে চুপ। ভয়ে তারা কাঁপছিল, ছুটে যে পালাবে সে জোরও ছিল না। ছোটোকুর বাঁশি শেষ হলে হাতিরা আবার রওনা দিয়েছিল তাদের পথে। কিছু করে নি। তাদের ভিতরে একটা, সে এক মস্ত হাতি, বিহারীনাথ পাহাড়ের মতো প্রায়, ধূসর তার রং, টলে টলে পাহাড় হাঁটছে যেন, তাতে মাটি কাঁপছে। সেই মস্ত হাতি ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছিল তার দিকে। একবার তো দাঁড়িয়েছিল, যেন ফিরে আসবে। কিন্তু আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে বনের ভিতরে ঢুকেও গেল। তার কথাটি ছোটোকুর মনে পড়ে গেল আচমকা। সে নাকি তাদের মোহিত করে দিয়েছিল বাঁশির সুরে। বাবা সেই কথা বলেছিল শুনে। সে অবাক হয়েছিল। তাই! হ্যাঁ তাই! তারপর সে টের পেয়েছে খরগোসগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বনের ভিতরে চুপ করে থাকে বাঁশি যখন বাজে। বাঁশি যখন বাজে, বনের মাটিতে ঝরে থাকা পাতা মাড়িয়ে চলে যাওয়ার কোনো শব্দ হয় না। বাঁশি যখন বাজে হলুদ হয়ে যাওয়া পাতাগুলো আর একটু আয়ু পায়, ঝরে যায় না। আর সে জানে, একদিন সে বাঁশি শেষ করে দেখেছিল নেড়া শাল গাছটি কচি পাতায় ভরে উঠেছে।

আজ বাঁশি শুরু করতেই বনের ভিতরে শব্দ হতে লাগল পাতা মাড়ানোর। গাছ ভেঙে পড়ল একটা। কী হলো? এমন তো হয় না। কিন্তু সে বাঁশি থামায় না। বাঁশির সুর ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। কে এল, বাঘ? বুনো কোনো জানোয়ার, যে তাকে চেনে না, বাঁশি শোনে নি কোনোদিন। তার কিন্তু ভয় হয় না। তারপর দেখল, পাহাড়, সেই পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে বন থেকে বেরিয়ে। একা! একা কেন, তাহলে অন্য হাতিরা গেল কোথায়? হাতি তো দল ছাড়ে না। শুঁড় তুলে একবার ডেকে উঠল, তারপর বসে পড়ল মাটিতে। জঙ্গলের ধারে অশ্বত্থের ছায়ার ওপারে যেখানে বনের ছায়া পড়েছে আবার রোদ ঝিলমিল করছে। হাতিটা বসে থাকল। চুপ করে মাথা নামিয়ে। বাঁশির শব্দ শুনতে লাগল। আবার বনের পাতার মর্মর থেমে গেল। সে বাজাতে লাগল। রোদ পড়ে যাচ্ছে, বাতাস ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। একসময় সে বাঁশি থামায়, থামিয়ে দেখল হাতিটি শুঁড় সমেত মাথাটা উপরে তুলল

একবার, তারপর উঠল, ধীরে ধীরে বনের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একবার ডেকে উঠল কাকে যেন। ও কি পথ হারিয়েছে? ইস, কতবড়ো হাতি। এর আগে ছোটোকু দেখেছে হাতির পালের সামনে চলত এ। মাকে বলতে মা বলেছিল, "কিছু করবিনে বাপ, বনের জীব হিংসে করে না, তারে ক্ষেপালি সে ক্ষেপে। বন হলো তাদের। বন থাকলি তারা বন ছেড়ে কেনে লুকালয়ে আসবে?"

ছোটোকুর কী মনে হল আচমকা বাঁশিতে সুর তুলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি একা যে, একা যে, একা কেন?"

ছোটোকু এমন পারে। তার বাঁশিতে সে জীবজন্তুর ভাষা বলতে পারে? কী করে পারে, তা সে জানে না। এমনি এমনি পারে। সে বাঁশিতে পাখির সঙ্গে আবার মেঠো খরগোসের সঙ্গেও কথা বলতে পারে। সে গম্ভীর গলা শুনতে পায়, "আমারে তারা ছেড়ে গেল।"

"কেন গো মশায়?"

"আমি আর হাঁটব না বলেছিলাম।"

"কেন গো, তোমরা তো খুব হাঁটতে পার।"

"পারি, কতদূর পথ হেঁটে এলাম, সেই দলমা পাহাড় থেকে, কিন্তু আর পারি না।"

ছোটোকু জিজ্ঞেস করে, "কেন গো কী হল ?"

হাতি বলল, "জানি না, আগে পা ব্যথা হত না, সারারাত সারাদিন, জলঝড়ে কত হেঁটেছি গো। আমি দলমা মশায়।"

"দলমা মশায় মানে?"

"দলমার সবচেয়ে বড়ো পাহাড়টার মতো নাকি আমি," বলতে বলতে হাতি শালবনের ভিতরে একটু ফাঁকা জায়গায় আবার বসে পড়ল। বলল, "আমার খুব ইচ্ছে করছে দলমায় চলে যাই, পাহাড়ের কোলে গিয়ে শুয়ে থাকি।"

"ওমা, কেন শুয়ে থাকবে ?"

"আমার ইচ্ছে করছে," বলল হাতি।

ছোটোকু বলল, "তাই কি হয়, হাতি মানেই তো হাঁটি।"

তা শুনে দলমামশায় বলল, "হেঁটেছি অনেক পথ, এবার আর হাঁটব না, তা শুনে আমাদের দলের একজন বলল, ওর সময় হয়ে গেছে, ও চলে যাক।"

"সময় হয়েছে মানে?" ছোটোকু জিজ্ঞেস করে।

"আমি এবার দলমায় ফিরে শুয়েই থাকব গো, কিন্তু তারা তো থাকবে না শুয়ে তাই আমারে ছেড়ে গেল।" বলে সে মাথা নিচু করে মাটির গন্ধ নিতে লাগল। তারপর বলল, "তুমি যাও বাড়ি।"

"এখনো তো বেলা আছে," ছোটোকু বলে।

সে বলল, "আমার আর দলমায় ফিরা হবে না গো ছোটোকু।"

"কেন হবে না? হবে।"

“না গো, আমি দলমা যেতে গিয়ে এইটুকু হেঁটে আর পারলাম না, দলমা পাহাড় সে কতদূর, কত নদী কত বন পাহাড় কত মাঠ পার হয়ে তবে দলমা দেখা যাবে, দেখা যাওয়ার পরও তিন সূযযি।”

বুঝল ছোটোকু, তিন সুয্যি মানে তিনটে ভোর, মানে তিনদিন হাঁটতে হবে দলমা দেখতে পাওয়ার পর। বলল, “আজ ঘুমিয়ে নাও, কাল আবার হাঁটবে, তোমার কি খিদে পেয়েছে?”

“না, আমি তো তিনদিন খাই নি, আমার খিদেও পায় নি, খাওয়ার ইচ্ছে নেই।”

ছোটোকু আর দলমামশায় যখন কথা বলছিল, তখন দুটি খরগোস, একটি ময়ূর আর বড়ো একটা মেঠো ইঁদুর এসে গেছে হাতিটাকে দেখতে। হাতি বসে পড়েছে, শুয়ে পড়েছে হাতি। “কেন শুয়ে পড়ল একা?” জিজ্ঞেস করল খরগোস।

“ও আর পারবে না,” বলল ময়ূর আর ইঁদুর।

“পারবে না মানে?” ছোটোকু জিজ্ঞেস করে।

ময়ূর বলল, “ও শুয়ে শুয়ে মরে যাবে, ইস!”

“তাই!” ছোটোকুর চোখেও জল এসে গেল।

ইঁদুর বলল, “আমি তাই শুনেছি, এমনি হয়।”

তখন সেই হাতি, দলমা মশায় বলে, “না আমি দলমায় গিয়ে থাকব সেই পাহাড়ের নিচে বনের ছায়ায়, ঝর্নার পাশে।”

“তুমি তো আর পারছ না।”

“না, কিন্তু আমি যাব গো সেখানে, তুমি বাঁশি বাজাও, আমি শুনি, বাঁশি আমাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেবে।”

তাই হল। বাঁশিতে সুর তুলল ছোটোকু। আর সেই বাঁশি শুনতে লাগল দলমার হাতি। শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা তখন পড়ে এল। ছোটোকুর সময় হয়ে গেল ফেরার। তার গরুগুলি সবাই পথে এসে দাঁড়িয়েছে। খরগোস বলে, “তুমি যাও, ওতো ঘুমিয়ে পড়ল।” ছোটোকু দেখল সত্যি যেন পাহাড়। পাহাড় যত আছে ন’পাহাড়িতে, সবার চেয়ে বড়ো বুঝি।

একা ছোটোকু সেদিন মহাজনের বাড়ি থেকে ফিরে এল নিজের বাড়ি। মায়ের খুশি ধরে না। বাবা জিজ্ঞেস করল, “হঠাৎ এলি যে?”

তার কাছে সব শুনল তার বাবা ভিখিরিচরণ। শুনতে শুনতে বলল, “হাতিরা অমন করে মরে।”

“কেমন করে?”

“একা একটা জায়গায় চলে যায়, তারপর একা একা মরে যায় আকাশের নিচে শুয়ে।”

ইস! ছোটোকুর চোখে জল এসে গেল। তার বাবা বলল, “মরতেই ও শুয়ে পড়েছে, আর উঠবে না, তুই বরং ওকে বাঁশি শুনাস, বাঁশি শুনতে শুনতে ও চোখ বুঁজুক।”

"তুমি যাবে দেখতে?"

"না, একা না হলে মরতে পারে না হাতি, একা হতেই তো দল ছেড়ে দলমা পাহাড়ের দিকে যাবে বলেছিল, ওখেনে ভিড় করা ঠিক না।"

তাই হল। পরদিন সে আবার গেল বনের ধারে। হাতির ঘুম কি ভেঙেছে। নাকি ঘুমিয়ে আছে দলমা পাহাড়? বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে গিয়ে দ্যাখে বনের ভিতরটা শূন্য। নেই নেই। কোথায় গেল সে? ময়ূর উড়ে এসে বলল, সে মাঝরাতে একা একা দলমার দিকে হেঁটে গেছে।

"তাই?"

"সত্যি, তোমার বাঁশি শুনতে শুনতে।" বলল খরগোস।

"কই বাঁশি? আমি তো আর বাঁশি বাজাই নি। বাড়ি গিয়েছিলাম অনেকদিন বাদে, খুব ঘুমোলাম।"

খরগোস এসে বলল, "তাহলে ঘুমোতে ঘুমোতে বাঁশি বাজিয়েছ তুমি।"

"তাই হয় নাকি?"

"হয়েছে, আমরা তো সারারাত বাঁশি শুনেছি গো, আর সেই বাঁশি শুনতে শুনতে সে দলমার দিকে হাঁটল।" বলল ময়ূর।

"ঘুমের ভিতর কি বাঁশি বাজে?"

"বাজল তো," বলে খরগোস বলল, "শাল গাছেরে জিজ্ঞেস করো, পিয়াল, কাঠ বাদাম গাছ বলবে বাঁশি শুনেছে কিনা।"

ছোটোকু বসল অশ্বত্থের গোড়ায়। চুপ করে থাকে বহু সময়। তার বাঁশি শুনতে শুনতে সে দলমার দিকে হেঁটেছে। দলমা যেতে তিন সূযযি। আহা বুড়ো হাতি হেঁটে চলেছে এখনো। সে জিজ্ঞেস করল আবার, "সত্যি বলছ, এই বাঁশি?"

খরগোস বলল, "হ্যাঁ এই বাঁশি।"

"এমনি সুর?"

"হ্যাঁ এমনি সুর, দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল, মাঝ আকাশে তখন চাঁদ।"

ছোটোকু বলল, "বাঁশি তাইলে নিজে বেজেছে। বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল। কী কঠিন রোদ! এই রোদে বুড়ো হাতি যাচ্ছে কোথায়, কোনদিকে সেই দলমা পাহাড়? সে বাঁশি বাজাতে লাগল। বাঁশি বাজবে সমস্ত দুপুর। বাঁশি শুনতে শুনতে দলমার হাতি দলমার দিকে হেঁটে চলবে। যতক্ষণ না পৌঁছবে, ততক্ষণ মরবে না। যতদিন না পৌঁছবে, ততদিন না। হে দলমা পাহাড়, তুমিও পিছিয়ে যাও, ও যেন না পৌঁছতে পারে।

ছবি শিবশংকর ভট্টাচার্য

প্যাঁচে পয়জারে পঞ্চানন

জয়দীপ চক্রবর্তী

পঞ্চানন পাল মানুষটা এমনিতে খারাপ নয়। নিজের গাঁয়ে সে বেশ পরোপকারী হিসেবেই পরিচিত। তাছাড়া সে পাঁচজনের কথায় বড় একটা থাকে না। কারো সাথে ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষিও নেই তার। পঞ্চাননের পূর্বপুরুষেরা বেশ বিত্তবান ছিলেন একসময়। শুধু এ গ্রাম নয়, আশ পাশের দশ বিশটা গ্রামে সুনাম ছিল তাঁদের। গ্রামের পুরোন লোকেরা এখনও তাকে ডেকে মাঝে মাঝেই দুঃখ করে বলেন, "ওহ, হাত ছিল বটে পঞ্চা তোর বাপ পিতামহের। অমন বনেদি চোর সারা দেশে ঢুঁড়ে বেড়ালেও হবে না আর। কী শিল্প রে! পাশে বসে পকেট সাফ করে দেবে হাসতে হাসতে। মানুষ টেরটিও পাবে না। পুলিশকে চিঠি দিয়ে চুরি করতেন তাঁরা গেরস্তের বাড়িতে। ছা পোষা মানুষেরা সম্ভ্রম করত তাঁদের। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমো করত সন্ধেকালে। আর বলতে নেই, কী মন ছিল রে বাপু তাঁদের। একবার বিশ্বাস পাড়ার নিশি বিশ্বাসের বাড়িতে চুরি হল লক্ষ্মীপুজোর রাতে। অত মানুষজনের মধ্যে মা লক্ষ্মীর গলার বিছে হারটা গায়েব হয়ে গেল। কেউ টেরটি পেল না। পরদিন পুলিশে না গিয়ে নিশি বিশ্বাস সটান চলে এল তোর বাপের কাছে। রাগ নয়, অভিযোগ নয়, নরম গলায় বললে, 'বিশু, মায়ের গলার বিছে হারটা মেয়ের বিয়েতে দেব কথা দিয়েছি বেয়াইবাড়িতে। সামনের মাঘে বিয়ে ঠিক হয়েছে মেয়ের। মায়ের গলায় দিয়ে গয়নাটা পয়মন্ত করে নেব ভেবেছিলুম। ওটা খোয়া গেলে বিয়েটাই যে ভেঙে যাবে বাবা। ও গয়না তো আর দুবার বানাবার সামর্থ্য নেই আমার।' চোখে জল এসে গেল তাঁর। বিশু পাল গম্ভীর গলায় বলল শুধু, 'বাড়ি যান কত্তা, আমি আছি। দেখছি কী করা যায়। আমি থাকতে আপনার মেয়ের বিয়েতে ক্যাচাল হতে দেব না।' বললে বিশ্বাস করবে না হে, বিসর্জনের আগেই দেবীর গলায় গয়না ফিরে এল। এবারেও গয়না কখন ফেরত এল, কে আনল কেউ কিছুই জানতে পারল না। কী শিল্প ভাবো। আহা এঁরাই ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। আমরা গাঁয়ের লোকেরা এঁদের নিয়ে গর্ব করতে পারতুম।"

তা এই হাতযশের প্রভাবে টাকা পয়সা গয়নাগাটি ভালোই উপার্জন করেছিলেন তাঁরা। তার সবটা যে খরচ হয়ে গেছে তাও না। আসলে সব খরচ করা যায়ও না। এ সব গয়না বিক্কিরি টিক্কিরি করতে গেলে ঝক্কি আছে। দূরে যেতে হবে। বিশ্বস্ত স্যাকরা হওয়া চাই। তারপর দামদস্তুর নিয়ে নরমেগরমে তক্কাতক্কি করে লাভটা বুঝে নিতে হয়। এত সব বায়নাক্কা পঞ্চাননের পোষায় না। এক সময় গায়ে গতরে খেটে রাতে ভিতে অনেক পরিশ্রম করে যা আয় টায় করে গিয়েছিলেন তার বাপ ঠাকুদ্দারা তাই দিয়েই দিব্বি চলে যায়। চাষের জমি আছে। সেখানে সারা বছরের চাল হয়ে যায়। ক্ষেতের ফসলে বছর কেটে যায়। পুকুরে মাছ আছে। তবু শুধুমাত্র বংশের ধারাটাকে বজায় রাখার জন্যেই পঞ্চাননকে রাতে ভিতে বেরোতে হয় মাঝে মাঝে। মরার আগে বাবা বলে গিয়েছিলেন, "আমি চোখ বুজলে আর যাই করিস বাবা, বংশের জাত ব্যাবসাটা ছাড়িস নি।

এ অনেক সাধনার ধন, হেলায় নষ্ট করিস নি বাপ, আমাদের আগে গত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা মনে ভারী কষ্ট পাবেন। তাছাড়া অবহেলায় সব বিদ্যেই ভোঁতা হয়ে যায়। সেই শিশুকাল থেকে ভালো শিক্ষক দিয়ে যে বিদ্যে শিখিয়ে গেলুম তোকে, অনভ্যাসে তা হাত থেকে ফসকে কোথায় হারিয়ে যাবে বাবা। সবসময় মনে রাখিস, পৃথিবীর কোনো বিদ্যেই ফেলনা নয়। কখন কী কাজে লেগে যায় কেউ বলতে পারে না...”

বাবার শেষ কথাটা ফেলতে পারে নি পঞ্চানন। প্রয়োজন নেই, কিন্তু অভ্যাসটা ধরে রেখেছে সে। তাই বলে এমন নয় যে গেরস্থের সোনাদানা টাকাপয়সা চুরিচামারি করে সে। সে তো আসলে চোর নয়, সে শিল্পী। একটা বিশেষ বিদ্যে চর্চায় রেখে দিতে চায় সে শুধু। আর সে জন্যেই একটু আধটু এ গ্রাম ও গ্রাম ঘোরাঘুরি করতে হয় তাকে। আর এই ধরনের ঘোরাঘুরিতে সবাই জানে শাস্ত্রমতে রাত্তিরটাই শুভ। কেননা দিনেদুপুরে মানুষজন জেগে থাকে যখন, এ ব্যাবসাটা ঠিকঠাক জমে না। জাগ্রত মানুষ এ ক্ষেত্রে বড় বিপদের। তারা কাজের সময় স্বভাবদোষে অহেতুক বড় গোল পাকায়। আর তাদের গোল পাকানোর কথাটা মাথায় এলে সাধারণ খেটেখুটে খাওয়া গৃহস্থ মানুষগুলোর জন্যে পঞ্চাননের মনটাও ভারী দুর্বল হয়ে যায়। সারাদিন পরিশ্রমের পর কোথায় একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবে মানুষ সে উপায় নেই। বেমক্কা ঝামেলায় ফেলা তাদের।

তবু করতে হয় এ কাজ। হাতটাকে চালু রাখার তাগিদ তো আছেই, তাছাড়া ইউনিয়নে মান সম্মানেরও ব্যাপার আছে একটা। এই ইউনিয়নের ব্যাপারটা আগে ছিল না, সম্প্রতি হয়েছে। ‘তস্কর স্বার্থ সুরক্ষা সমিতি’ এখন নিয়ম করে মাসে একবার মিটিংয়ে বসছে বর্ষীয়ান চোর সত্যকাম মন্ডলের নেতৃত্বে। সত্য জেঠুর সাথে পঞ্চাননের প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক। সেই ছোটোবেলা থেকে এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত তাদের। কাজেই বয়স্ক লোকটার কথা ফেলা মুশকিল। লাস্ট মিটিং এ আলাদা করে পঞ্চাননকে ডেকে বলেছেন তিনি, “ছোট বয়েস থেকে দেখছি তোমায়। যাই বল, কাজে কম্মে উন্নতির ইচ্ছে তোমার বাপু বড়োই কম। এমন করলে তো চলে না হে। কত বড় বংশের ছেলে তুমি এ কথা ভুলে গিয়ে এর গাছের কাঁঠাল, ওর মাচার লাউ এইসব চুরি করে অযথা নিজের প্রতিভাটাকে নষ্ট করছ বসে বসে। পষ্ট বলি শোনো, সামনের মাস থেকে আমাদের ইউনিয়নভুক্ত যারা তাদের নিয়ে বেস্ট কালেক্টারস পুরস্কার চালু করছি আমি। আমার ইচ্ছে, প্রথমবারের পুরস্কারটাই যেন তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।”

এ কথায় সত্যিই বেশ চাপে পড়ে গেছে পঞ্চানন। কিছু একটা না করলেই নয় এবার। সত্যজেঠু প্রফেশনের ক্ষেত্রে নিজে সত্যের পূজারী। অন্যেরাও কেউ সততার ভান করছে জানলে বেজায় চটে যান। মিটিং এ এমন কথাও তিনি বলে দিয়েছেন, “আমি জানি আজকাল পুলিশ টুলিশের সাথে অনেকে বন্ধুত্ব পাতিয়ে কাজের ক্ষেত্রটাকে ঝুঁকিহীন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণে। আমি কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এই শঠতা বরদাস্ত করতে রাজি নই। এ লাইনে কাজ করতে হবে বুক ফুলিয়ে। নিজের সামর্থ্য ও শিক্ষার ওপর ভরসা রেখে সততার সঙ্গে। তাতে ঝুঁকি তো থাকবেই। মনে রাখবে এটাও একটা অ্যাডভেঞ্চার। এটা একটা অতি উচ্চমানের শিল্পও। আর তাই এখানে ফাঁকি চলবে না। মহাপুরুষের কথা স্মরণে রাখবে সর্বদা। তাঁরা পই পই করে বলেছেন ফাঁকির দ্বারা মহৎ কাজ কখনও হয় না।”

২

সন্ধে গড়িয়েছে খানিকক্ষণ আগে। আজ সারাদিন পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গুটি গুটি পায়ে হাফিজের চায়ের দোকানে এসে বসল পঞ্চানন। হাফিজ ছেলেটি ভারী ভালো। সারাদিন কাজেকর্মে থাকে। কারো সাথে ঝগড়াঝাঁটি নেই। ব্যবহারটিও অমায়িক। ছেলেটিকে খুব ভালো লাগে পঞ্চাননের। মনে হয় রোজগার হয়ত কম ওর, তবু দিব্বি আছে সৎ পথে। সত্যি বলতে কি এই পারিবারিক ব্যাবসাটি একেবারেই পছন্দ নয় পঞ্চাননের। গেরস্থ লোকেরা এ শিল্পের কদর দেয় না আর। তার বাপ ঠাকুদ্দাদের আমলে এলাকার মানুষ যে চোখে দেখত আজ আর সে দিন নেই। তাছাড়া পঞ্চানন নিজেও মানুষটি বড় নরম মনের। অকারণ সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করতে এক্কেবারেই প্রাণ চায় না তার। কিন্তু সত্যজেঠুকে এসব বলে লাভ নেই। তিনি

সেকালের লোক। এ কালের কথা কানেই নেবেন না। তাছাড়া তার বাবার কথারও অমান্যি হয়ে যাবে লাইন থেকে একেবারে সরে গেলে। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাফিজকে চায়ের অর্ডার দিল পঞ্চানন। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। কাজের সময় পেট খালি রাখা যাবে না, আবার হেউ ঢেউ খেয়ে ঢেঁকুর তোলাও চলবে না।

চায়ের গেলাসে হাল্কা চুমুক দিয়ে চারদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিল পঞ্চানন। না কেউ তাকে তেমন আলাদা করে নজরে রাখছে না। পঞ্চানন তার ছোট্ট ঝোলায় রাখা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলোয় আলতো করে হাত বুলিয়ে নিল। অনেকদিন হল জিনিসগুলোর ব্যবহার হয়নি ঠিকমতন। এই যন্ত্র দিয়েই তার ঠাকুরদা কাজ করেছেন। তার বাবাও। গা শির শির করে উঠল পঞ্চাননের। একটু আনমনাও হয়ে গেল সে। আর ঠিক সেই সময়েই লোকটা এসে দোকানে ঢুকল।

লোকটার চেহারায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। পরনে জিন্স আর লম্বা পাঞ্জাবি। বাঁ হাতে কমদামের ঘড়ি। মাথায় অল্প টাক হাফিজের দোকানের সি এফ এল আলোয় চক চক করছে। তার মধ্যে যেটা চোখে পড়ার মতন তা হল লোকটার হাতের আংটিগুলো। দু' হাতের দশটা আঙুলে নয় নয় করে গোটা সাতেক আংটি লোকটার। তার মধ্যে চারটে বেশ দামি। অভ্যস্ত চোখ পঞ্চাননের। কাজেই পাঞ্জাবির নীচেও জিন্সের হিপ পকেটে উঁচু হয়ে থাকা মানিব্যাগটা দিব্বি বুঝতে পারল সে। লোকটার গা থেকে একটা গন্ধ পঞ্চাননের নাকে ভেসে আসছিল। মনটাকে থিতু করে নাক টেনে গন্ধটা আর একবার যাচাই করে নিল সে। সাধারণ লোকে এ সব গন্ধ টেরও পায় না। কিন্তু পঞ্চানন পায়। এটাই শিক্ষা। ছোটবেলায় রীতিমতন গুরুগৃহে থেকে এসব বিদ্যে রপ্ত করতে হয়েছে তাকে। তাদের রাতের ব্যাবসায় এসব বিদ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গন্ধবিচার করেই পঞ্চানন বুঝতে পারল এ লোকটা খুব সুবিধের নয়। সতর্ক হল সে। সাধারণত কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক এড়িয়ে যাওয়াটাই রীতি। কিন্তু পঞ্চানন আজ অন্যরকম করে বিষয়টা ভাবতে শুরু করল। লোকটা এ অঞ্চলের নয়। আগে কখনও এ দিকে দেখাও যায় নি তাকে। তাহলে মতলবটা কী এর? লোকটার আরো একটু কাছে সরে এসে বসল পঞ্চানন। একটু খেলিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

পঞ্চাননকে তার দিকে সরে আসতে দেখে সরু চোখে তার দিকে তাকালো লোকটা। এই তাকানোটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল পঞ্চানন। লোকটার দিকে অমায়িক হেসে সে হাত বাড়াল, "আপনার কাছে দেশলাই হবে একখান? বিড়ি ধরাব..."

"না," খুব বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল লোকটা।

পঞ্চানন দমল না। এক গাল হেসে বলল, "খান না বুঝি?"

"না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে অন্য দিকে তাকালো সেই লোকটা।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে লোকটা তার সাথে কথা বলতে চাইছে না। অন্য যে কেউ হলে এ সময়ে চুপ করেই যেত হয়ত। কিন্তু পঞ্চানন দমল না। হাসিটাকে আরও মোলায়েম করে সে বলল, "এ অঞ্চলে নতুন বুঝি? চিনলাম তো ঠিক আপনাকে?"

"আপনি কি এ অঞ্চলের সব মানুষকেই চেনেন নাকি?" একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল লোকটা।

"আজ্ঞে তা চিনি বৈকি। চেনাশোনাটাই তো কাজ আমার..." লোকটার বিরক্তিকে পাত্তাই দিল না পঞ্চানন।

"আমার এক দূর সম্পর্কের সম্বন্ধীর বাড়ি এসেছিলাম। একটা বৈষয়িক কাজে। ওই তো ওইদিকে বাড়ি।" বলে এক দিকে হাত তুলল লোকটা। তার হাত দেখে কোন দিক তা বোঝা গেল না।

"তপন মন্ডলের কথা বলছেন?" হাত কচলায় পঞ্চানন, "ও গাঁয়ের খুব পয়সাওলা লোক। তবে কিনা টাকা পয়সার ব্যাপারে বড্ড উদাসীন। ফেলে ছড়িয়ে এমনভাবে রাখে..."

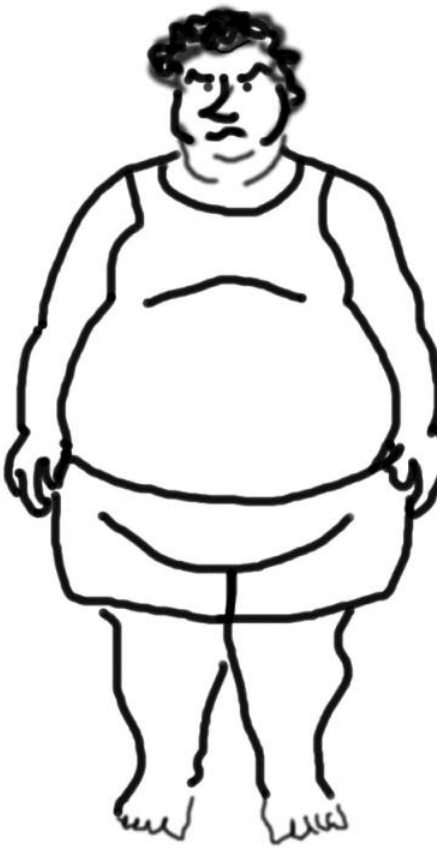

পঞ্চাননকে কথা শেষ করতে না দিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। হাফিজকে পয়সা দিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে গেল। প্যান্টের পকেট থেকে কাকে যেন ফোন করছে।

লোকটা সম্পর্কে ক্রমশই খুবই কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল পঞ্চানন। তার মন কেবলই সতর্ক করছে তাকে। কী যেন একটা ঘটাতে চলেছে লোকটা। শরীরটাকে অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়ে সে লোকটার কথা শোনার চেষ্টা করতে লাগল।

সবটা শুনতে পেল না সে। তবে শেষের কথাটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। চাপা স্বরে কাকে যেন আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলে উঠল লোকটা, "চিন্তা করবেন না। কালু ওস্তাদ কথার খেলাপ করে না। একবার যখন বলেছি তখন অরফ্যানেজটা থাকবেই না আর। দুদিনের মধ্যেই আগুন জ্বলে যাবে ওখানে। শর্ট

সার্কিট—" বলেই বিচ্ছিরি রকম হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল লোকটা, "ভেতরে লোক ফিট করার চেষ্টা করছি আমি। হয়ে গেছে প্রায়। তবে খরচ খরচা একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে এই আর কি.."

হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল পঞ্চাননের। লোকটা বলে কী ! তলে তলে এত বড়ো ষড়যন্ত্র চলছে ! তাদের পাশের পাড়ায় জনচারেক রিটায়ার্ড লোক মিলে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছিল বছর সাত আট আগে। রাস্তার অনাথ বা গরিবগুর্বো ছেলেমেয়েদের থাকাখাওয়া পড়াশোনা শেখার বন্দোবস্ত হয়েছে এখন সেখানে। বছর দুই হল জায়গাটার ওপরে কিছু লোকের নজর পড়েছে বলে শুনেছিল সে। এ জমিটা বেচে খালপাড়ে উঠে যাবার জন্যে চাপ আসছিল খুব। ওই আশ্রমের প্রধান রসিক মাস্টারমশাই বলছিলেন একদিন চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে, "জীবনের সর্বস্ব দিয়ে একটা স্বপ্নকে সত্যি করতে নেমেছি ক'জনে মিলে। আমাদের পাবারই বা কী আছে আর হারানোরই বা কী আছে বলো? তা আমায় এসে কিনা শহরের এক বাবু লোভ দেখাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন। এ জায়গাটা তাদের হাতে ছেড়ে দিলে এখানে নাকি শপিং মল হবে। ভাবো একবার..."

শত প্রলোভনেও নিজেদের কাজ থেকে, স্বপ্ন থেকে লোকগুলো সরে আসেনি একটুও। পঞ্চানন মনেমনে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে মানুষগুলোকে। এ কালে কজন মানুষ আর অমন স্বপ্ন দেখতে পারে ! স্বপ্ন দেখা তো ক্রমশ উঠেই যাচ্ছে জীবন থেকে। মনে মনে খুব প্রার্থনা করত সে, এরকম মানুষজন যে ক'জন আছেন এখনও তাঁদের স্বপ্নগুলো যেন দুম করে মরে না গিয়ে বেঁচেবর্তে থাকে যেন অনেকদিন। এ লোকটা কি রসিক মাস্টারমশাইদের স্বপ্ন চুরি করতে চায় নাকি ! অন্ধকারে দাঁড়িয়েই ঘন ঘন দু দিকে মাথা নাড়ায় পঞ্চানন, "উঁহু, এ কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না।"

মনে মনে কর্তব্য স্থির করে ফেলে সে। ওই মোবাইলটা হাতানো দরকার। জানা দরকার আড়ালে থেকে কে পুড়িয়ে দিতে চাইছে অন্যের জন্যে নিজেদের সব বিলিয়ে দেওয়া মানুষগুলোর স্বপ্নটাকে। কাজটা পঞ্চাননের কাছে কিছুই নয়। তবু সময় নিল সে। লোকটার ডেরাটাও দেখে রাখা ভালো। লোকটার সাথে অন্তত তিন চার কিলোমিটার হাঁটতে হল সে রাতে পঞ্চাননকে। তবে তাদের প্রফেশনে এ হাঁটাটা বলতে গেলে কিছুই নয়। তারপর লোকটার বাড়ির পিছনে কচু গাছের জঙ্গলে অপেক্ষা করে থাকতে হল আরো প্রায় ঘন্টাদুয়েক। সে সময় পায়ের ওপর দিয়ে সর সর করে কী যেন একটা চলে গেল একবার। সাপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া ও অঞ্চলের মশাগুলোও বড্ড বড় এবং বেপরোয়া। পঞ্চাননের অবশ্য এ সবে তেমন কষ্ট হল না। এ লাইনে এসব নস্যি। নার্সারি ক্লাশেই এসব প্রতিকূলতা জয় করার কৃৎকৌশল শিখে ফেলে তারা।

মাঝরাত পার হয়ে সবে একটু যখন রাতটা ভোরের দিকে ঢলেছে, ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতিগুলো সন্তর্পণে বের করে ফেলল পঞ্চানন। কাজ শুরু করে ভারী আহ্লাদ হল তার। হাতটা দিব্বি আছে এখনও। মাখনের মতন সিঁধ কেটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। লোকটা একা ঘুমুচ্ছিল। নাক ডাকছে গুড় গুড় করে। পেট দুলছে। ঘরে অন্ধকার। যদিও পঞ্চাননের তাতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। অসুবিধে সত্যি বলতে কি হলও না তার। লোকটার মাথার বালিশের পাশ থেকে খুব যত্ন করে মোবাইল ফোন আর মোটা মানিব্যাগটা তুলে নিল সে। তারপর বিছানার ওপরে ঘুমন্ত মানুষটার হাতের আঙুল থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে দামি আংটিগুলোকেও খুলে ফেলে নিজের ঝুলিতে ভরে প্রায় বাতাসেরই মতন নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালো। আকাশে নক্ষত্রেরা তখনও মিট মিট করছে, তবে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

বড় করে শ্বাস ফেলে পঞ্চানন। মনটা অনেকখানি হালকা লাগছে এখন। কচুবাগানের দিক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে সে। অনেকটা পথ যেতে হবে। থানার নতুন বড়োবাবুর কোয়াটার এখান থেকে অনেক দূর। পঞ্চানন হাঁটা শুরু করল। বড়বাবুর বয়েস বেশি না, তবে মানুষটা সাচ্চা এবং সৎ। নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায় এমন মানুষ থানায় বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু এ লোকটি এক্কেবারে অন্যরকম। তথ্য- প্রমাণ হাতে পেয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা তিনি নেবেনই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই পঞ্চাননের।

৩

লোকগুলো ধরা পড়ে গেছে। থানার বড়োবাবু থেকে কাগজের রিপোর্টার সক্কলে ধন্য ধন্য করেছে খুব পঞ্চাননকে। পঞ্চাননের কাছে ওই লোকটার মানিব্যাগ থেকে পাওয়া টাকা আর তার আংটিগুলো ছিল। তার ইচ্ছে ছিল ওগুলো অনাথ আশ্রমের কাজেই ব্যবহার হোক, কিন্তু রসিক মাস্টারমশাইরা সে টাকা বা আংটি নিতে রাজি হন নি। সেগুলো এখন থানায়। বড়োবাবুরই জিম্মাতে। পঞ্চানন মনে মনে ঠিক করেছে গায়েগতরে খেটে কিছু টাকা আশ্রমকে দেবে পরে- পশ্চাতে।

সত্যজেঠু খুব বকাঝকা করেছেন পঞ্চাননকে। আগামী ছ'মাস তস্কর সমিতির সভা থেকে বহিষ্কার করেছেন তাকে সমিতির সংবিধান- বহির্ভূত কাজের শাস্তিস্বরূপ। সকলের সামনেই বিচ্ছিরি অপমান করে তাকে শুনিয়েছেন সে তার বাপ ঠাকুদ্দার নাম নিজে মুখে আনারই নাকি যোগ্য নয়। পঞ্চাননের দশা দেখে স্বর্গে বসে তাঁরা নাকি লজ্জায় আর একবার মরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তস্কর সমিতি থেকে শাস্তি পাওয়ায় পঞ্চাননের দুঃখু নেই। সে বরং ও ধার একেবারেই মাড়াতে রাজি নয় আর। কিন্তু সত্যজেঠুর শেষের কথাটায় বড় চিন্তায় পড়ে গেছে সে। রাতে নিজের ঘরে একা একা বিছানায় শুয়ে ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। ঠাকুদ্দাকে দেখে নি সে। কিন্তু বাবা তাকে বড় স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে বড্ড শোক পেয়েছিল সে। সেই তিনি তার জন্যে আরও একবার মরতে বসেছেন এ কথাটা শোনা থেকে মনটা বড় অস্থির হয়ে আছে তার। তাঁর পুনর্বার মৃত্যুসম্ভাবনায় চোখে জল এসে গেল তার। আর ঠিক তখনই ছায়া ছায়া শরীর নিয়ে কে যেন পাশটিতে বসে পঞ্চাননের মাথায় হাত রাখল। সাধারণ মানুষের চেয়ে পঞ্চাননের দৃষ্টি অনেক সূক্ষ্ম। লোকটাকে চিনতে কোন অসুবিধা হল না তার। নিজের কাজে লজ্জিত পঞ্চানন শুয়েশুয়েই বাবার সামনে মাথা হেঁট করে ফেলল।

বিশু পাল কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ন না হয়ে তার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলে চললেন, "লজ্জা পাবার কিছু নেই রে পঞ্চা, ঠিকই করেছিস তুই। আমরা তোর কাজে খুশিই হয়েছি..."

"কিন্তু সত্য জ্যাঠা যে- "

"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও পালটে ফেলতে হয়," পঞ্চাননকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেন বিশু পাল, "সত্য নিজেকে পাল্টাতে পারে নি। ও টিকতেও পারবে না হয়ত বেশিদিন। তুই পেরেছিস বাপ- "

"কিন্তু তোমার শেষ ইচ্ছাটা—"

"অর্জিত শিক্ষার প্রয়োগের কথা বলছিস পঞ্চা ? "

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যে কথা দিয়েছিলুম আপনাকে।"

"কথা তো রেখেইছিস রে বাপ, " বিশু পালের ছায়া ছায়া মুখটা হঠাৎ হাসি হাসি হয়ে উঠল, "সেই বিদ্যের বলেই না এতগুলো শিশুকে এই অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচালি! তবে? বিদ্যেটা ছাড়িস না কিন্তু বাপু। চাইলে পরে ও দিয়েও লোকের ভালো-- "

গলার আওয়াজটা ফিকে হয়ে এল আস্তে আস্তে। পঞ্চানন মাথা নীচু করে হাত বাড়াল সামনের দিকে। আরেকবার যদি বাবার পা দুটো ছোঁয়া যায়। কিন্তু তার হাত দুটো বাতাসে ভেসে গেল। বিশু পাল চলে গেছেন। পঞ্চাননের আর মনকেমন করে উঠল না বাবার জন্যে, বরং মনের মধ্যে যেন আনন্দের একটা অচেনা ফুরফুরে হাওয়া বইতে শুরু করল আজ...

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

গজুমামার সঙ্গে পাহাড়ে

তাপস মৌলিক

গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি গেছি দিল্লীতে। সেবার এমন গরম পড়েছে যে স্নানের সময় কেউ যদি ভুল করে গায়ে তেল মেখে ফেলে তবেই হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাজা হয়ে যাবে। গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে এক সকালে গজুমামা বলল, "ভাগনে?"

"মামা!"

"গরমে লোকে কোথায় যায়?"

"পাহাড়ে মামা।"

"হুমম, আর পাহাড়ে যখন রোদ্দুর উঠবে?"

"জঙ্গলে ঢুকে যাব মামা।"

"তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে তোর?"

"আধঘণ্টা মামা।"

"চল, লেট'স গো।"

গজুমামার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মজাই আলাদা। মামা হেঁজিপেঁজি লোক নয়। এককালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ করত, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ডিনার। হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্ট কোথাকার যেন জজ ছিল। ইচ্ছে করলে যাকে- তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারত, দলকে দল ধরে জেলে পুরে দিতে পারত, নেহাত মনটা ভাল তাই করত না। বছর দুই আগে হঠাৎ মামা চাকরি ছেড়ে দিল। বলল,

“দুত্তোর, সারাদিন খালি খুনে- ডাকাত আর চোরছ্যাঁচড়দের গুষ্টির পিণ্ডি চটকানো, ওসব বেশিদিন করলে অম্বল হয়।” এখন মামা বাড়িতেই থাকে, লম্বা লম্বা সাদাকালো দাড়ি আর গোলগাল একটা ভুঁড়ি রেখেছে, সারাদিন পড়াশোনা করে আর মোটা মোটা জ্ঞানের বই লেখে।

তৈরি হয়ে জুতো পরছি, মামা বলল, “পাহাড় সমগ্র আর জঙ্গল অমনিবাসটা নিয়েছিস তো?”

“হ্যাঁ মামা।”

ও দুটো কিন্তু কোনও বই নয়, দুটো ঝোলার নাম। পাহাড়ে যেতে যেসব টুকিটাকি লাগে সেসব একটা ঝোলায়, আরেকটায় জঙ্গলে ঘোরার দরকারি জিনিসপত্তর, হুট বললেই যাতে বেরিয়ে পড়া যায় তাই গোছানোই থাকে।

দাদু- দিদা বেড়াতে গেছেন মাসির কাছে বেনারস। বাড়িতে শুধু বুড়োদিদা, মানে গজুমামার ঠাকুমা, আর মামাবাড়ির সবাইকে সারাবছর দেখেশুনে রাখার লোক ভুতোদাদু। বুড়োদিদার বয়েস একশর ওপর। হলে হবে কি, দিব্যি আছেন, শুধু কানে একটু খাটো, চোখে একটু ঝাপসা দেখেন, আর শীতকালে বাতের ব্যথায় একটু কাবু হয়ে পড়েন।

গজুমামা বলল, “ঠাকমা, আমরা একটু পাহাড় থেকে ঘুরে আসছি।”

বুড়োদিদা বললেন, “এই রোদের মধ্যে বাজারে যাবি? তা যা, ঘুরে আয়। লেবুর শরবত করে রাখছি, এসে খাবি।”

“উফ্, ঠাকমা, পাহাড়ে, পাহাড়ে, বাজারে না। শীতের খোঁজে।”

“নাপিতের খোঁজে? যা বাবা, দাড়িটা কেটেই আয়। কী বনমানুষের মত চুলদাড়ি রেখেছিস, কতদিন বলছি কেটে আয়, কেটে আয়, ওতে উকুনে বাসা করবে, ছারপোকা হবে। অবশ্য তোর সোনাভাইয়েরও দাড়ি ছিল, তোর চেয়েও লম্বা লম্বা, বললেও কাটত না। কতবার বলেছি কাটো কাটো, আমাকে পাত্তাই দিত না। যা বাবা, কেটে আয়। দুপুরে ইলিশমাছের মাথা আর ছোলা দিয়ে কচুর শাক করেছি, তোর সোনাভাই খুব ভালবাসত।”

একতলায় নামতে নামতে মামা বলল, “না, দুপুরে খাব না। ভুতোকাকাকে বলে যাচ্ছি।”

সোনাভাই হলেন গজুমামার ঠাকুদ্দা, আমার বুড়োদাদু। বুড়োদিদার কথায় কথায় খালি সোনাভাই আর সোনাভাই। তেনার এমন দাড়ি ছিল, তেনার অমন খড়ম ছিল, সোনার ফ্রেমের চশমা ছিল। ওদিকে আবার বলেন সোনাভাই নাকি তাঁকে পাত্তাই দিতেন না। দেবেন কেন? তিনি যা জাঁদরেল কবিরাজ ছিলেন! গজুমামার কাছে শুনেছি, ইংরেজরা তাঁর কাছে ছাড়া চিকিৎসাই করাত না। লর্ড হার্ডিঞ্জ তো ভারতে এসে এমন পেটের ব্যামোয় ভুগতে শুরু করলেন যে দুদিন পর পর দিল্লী আসতেন সিধু কোবরেজের কাছে। শেষমেশ খরচা আর সময় বাঁচাতে রাজধানীটাই কলকাতা থেকে দিল্লীতে উঠিয়ে আনলেন। শুধু কি কবিরাজি? সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন - হেন জিনিস নেই যাতে সোনাভাই পণ্ডিত না ছিলেন। তারপর দেশ যখন স্বাধীন হল, সোনাভাই হঠাৎ একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। অনেকদিন পর, গজুমামা যখন ছোট, একবার নাকি বাড়িতে এসেছিলেন। তখন তিনি জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। দিন সাতেক ছিলেন, তারপর আবার নিখোঁজ হয়ে যান।

ট্রেন ধরে বিকেলে হরিদ্বার পৌঁছে হর কি পৌরির কাছে একটা হোটেলে উঠলাম। সন্ধেবেলা গঙ্গারতি দেখে রাতে দাদা- বৌদির হোটেলে জম্পেশ খেয়ে এসে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোলাম। পরদিন ভোরবেলা গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছি, গজুমামা উদাত্ত গলায় আবৃত্তি আরম্ভ করল, “হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে
মলয় বাতাস বইছে ধীরে
নরম রোদে পাচ্ছে খিদে

জলখাবারে কী খাবি রে?”

ভাবছি কী খাওয়া যায়, কচুরি না আলুর পরোটা, হঠাৎ একজন মাঝবয়সী মোটামতন লোক, ধুতি আর ফতুয়া পরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটা, গলায় তুলসীর মালা, গজুমামার সামনে এসে বলল, “পেন্নাম হই বাবা, এখানে আপনার দর্শন পাব ভাবতেই পারিনি বাবা, আমার কী ভাগ্য!”

এই বলে গজুমামার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এল। গজুমামা তিন লাফে পিছিয়ে গিয়ে বলল, “ওকি ওকি, চোপ রও। আমি কোনও বাবা- টাবা নই। পায়ে হাত দেবে না খবরদার। একদম জেলে পুরে দেব।”

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা, “একটু চরণের ধুলো দিন বাবা। হেঁয়ালি করছেন কেন। আপনাকে আমি ঠিক চিনেছি। সেবারে সেই বদ্রীনাথে দর্শন পেয়েছিলেম। সেই দাড়ি, সেই কন্দর্পকান্তি চেহারা, ও আমার ভুল হবার নয়। আমার দশ বছরের ছেলের পোলিও এক ওষুধে ঠিক করে দিলেন। আপনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বাবা।”

গজুমামা আমার জামার কলার খামচে এক টান মেরে বলল, “ভাগনে, পালা।”

সরু একটা গলির ভেতর একটা দোকানে একগাদা কচুরি সাঁটিয়ে দুজনে চারটে করে অমৃতি নিয়েছি, খেতে খেতে মামা বলল, “ভাগনে, কী বুঝলি?”

বললাম, “মামা, এখানে মোটেই ঠাণ্ডা নেই, জঙ্গলও নেই। বদ্রীনাথ চলো।”

ঝোলাঝুলি নিয়ে ঘামতে ঘামতে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম। যা রোদ্দুর!

মামা বলল, “বুঝলি ভাগনে, সুখশান্তিতে যেমন, তেমনি দুঃখকষ্টেও কাব্যের জন্ম হয়। একটা কবিতা মাথায় এসেছে-

হরদুয়ারে কী রৌদ্র বাবারে
মালুমই হল না এসেছি পাহাড়ে
আরও উত্তরে
বদ্রী চলো রে
গজু হেথা নাহি থাকিবারে পারে। কেমন হল ভাগনে?”

“দারুণ, মামা।”

এদিকে মামার খোলা গলার আবৃত্তি শুনে এক ড্রাইভার আমাদের সামনে এসে খুব নিরীহভাবে বলল, “সাব, উপর যানা হ্যায়?”

শুনেই গজুমামা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, “উপর যানা হ্যায় মতলব? এয়ারকি পায়া হ্যায়? ধমকি দেতা হ্যায়? জানতা হ্যায় আমি কে হ্যায়? ফাঁসি মে চড়া দেগা, তুম হি উপর চলা যাওগে।”

“উতনা উপর নেহি সাব। আরে রাম রাম। কসুর মাপ কিজিয়ে। গাড়ি চাহিয়ে সাব? কেদার বদরী যানা হ্যায়? রুদ্দরপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ?”

“ও আচ্ছা। তো ইয়ে বাত হ্যায়! কিতনা চাহিয়ে?”

“যো রেট হ্যায় ওহি দিজিয়েগা সাব। জ্যায়াদা নেহি লেঙ্গে। ফিকর মত কিজিয়ে।”

“তো চলো। অভি চলো। ইধর ম্যায় একমুহূর্ত নেহি রুকতা হ্যায়।”

টাটা সুমোয় চড়ে বিকেলে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছে ছোট একটা হোটেলে উঠলাম। মন্দাকিনী আর অলকানন্দার সঙ্গম দেখলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম সেই জায়গাটায় যেখানে জিম করবেট রুদ্রপ্রয়াগের সেই কুখ্যাত চিতাটা মেরেছিলেন। রাস্তার ধারে সে গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে যেটায় চড়ে করবেট গুলি চালিয়েছিলেন। সেটা দেখে গজুমামার কবিত্ব ফের মাথাচাড়া দিল।

“কত ইতিহাস আজও এই গাছে
পাতায় পাতায় লেখা হয়ে আছে

এর ওপর চড়ে
সেই চিতাটিরে
জিম করবেট গুলি করিয়াছে। - ভাগনে, কেমন দিলাম?"

"ওফ, দুরন্ত, মামা।"

পরদিন কাকভোরে রওনা দিয়ে ন'টা নাগাদ যোশীমঠ পৌঁছলাম। রাস্তার ধারে একটা খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ভাবছি কী দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা যায়। সেখানে দেখি জনাপনেরো সাধুসন্ন্যাসীর একটা জটলা। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে বসে খাচ্ছে। বোধহয় বদ্রীনাথ থেকে ফিরছে সব। দোকানের একটা উনুনে বিশাল গামলায় টগবগ টগবগ করে দুধ ফুটছে। আর বেঞ্চে বসে এক জটাজূটধারী দশাসই সাধুবাবা, টকটকে লাল ধুতিচাদর পরা, গায়ে কম্বল, হাতে কমণ্ডলু, একটা বিশাল এনামেলের বাটিভর্তি দুধ খাচ্ছেন। ইনি বোধহয় এই দলের ক্যাপ্টেন। সাধুবাবা এক চুমুক দুধ খান আর 'আহ্' বলে তৃপ্তির এক আওয়াজ করেন, সেই 'আহ্'-এর এত জোর যে দোকানি শুনে বারবার চমকে চমকে উঠছে। আমি অবাক হয়ে এসব দেখছি। এমন সময় সাধুবাবা হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কীসের সন্ধানে ফিরিছ বৎস?"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "না না, আমি না, ও . . ।" বলে একটু দূরে মামার দিকে দেখিয়ে দিলাম। মামা তখন পাশের মিষ্টির দোকানে প্যাঁড়া কিনবে না জিলিপি তা ঠিক করতে পারছে না। এদিকে সন্ন্যাসীদের দলের একজন ছোট্টখাট্টো বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "উটি তোমার কে হন বাছা? আত্মীয়? আহা, একদম সিধু কোবরেজের মত চেহারা। সেই চোখ, সেই নাক, সেই পাকা আমের মত গায়ের রং। তা তোমরা যাবে কোথায় বাছা? বদ্রীনারায়ণ?"

মামা তখন প্যাঁড়ার ঠোঙা নিয়ে এদিকেই আসছে। হঠাৎ সেই ক্যাপ্টেন সাধুবাবা মামার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গমগমে গলায় আবৃত্তি শুরু করলেন,

"বৃথা তারে খোঁজ ফিরে বদ্রীনাথে এ পর্বতে
সে বসি মগন ধ্যানে কঠোর কঠিন ব্রতে।
পূবে চলি তপোবন, তথা হইতে দক্ষিণে
দুর্গম কুমারী গিরিপথে, ঘনঘোর বনে।"

এইসময় রাস্তায় দাঁড়ানো একটা মিনিবাস হঠাৎ প্যাঁক প্যাঁক করে খুব হর্ন দিতে শুরু করল, আর সাধুবাবাদের দলটাও 'ব্যোম ব্যোম ভোলে ব্যোম, জয় বদ্রীবাবা কি জয়, কেদারবাবা কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে হুড়মুড় করে সেই বাসে উঠে পড়ল। বাসটা নিচের দিকে চলে যেতেই জায়গাটা চুপচাপ হয়ে গেল। আর একের পর এক প্যাঁড়া খেতে খেতে মামা বলল, "ভাগনে, কী বুঝলি?"

বললাম, "মামা, বদ্রীনাথ গিয়ে লাভ নেই বুঝলাম। কিন্তু, তপোবন মানে তো মুনিঋষিদের আশ্রম। একালেও কি তপোবন- টন আছে নাকি এদিকে?"

"হুমম, পূবে তপোবন, সেখান থেকে দক্ষিণে।"

আমাদের ড্রাইভার রঘুজী চা খেতে খেতে আমাদের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, "সাব, তপোবন ইধর এক হ্যায় না! ইয়ে রাস্তা বাঁয়ে সিধা বদ্রী চলা গিয়া, ঔর ডাইনে যানে সে তপোবন। বস্, ছোটি সি এক গাঁও হ্যায়। জ্যায়াদা দূর নেহি।"

"ডাইনে? তার মানে তো পূবদিকই হচ্ছে। উধর গাড়ি যাতা হ্যায়?"

"জরুর যাতা হ্যায়, সাব। কলকাত্তা সে হর সাল কুছ পার্টি আতা হ্যায় তপোবন, উধর সে ট্রেকিং চালু করতে হ্যায়, কুয়াঁরি পাস যানে কে লিয়ে।"

"কুয়াঁরি পাস? মানে, কুমারী গিরিপথ? বলে কী রে ভাগনে! আচ্ছা, উও কুয়াঁরি পাস যানে কা রাস্তা মে জঙ্গল হ্যায় কেয়া?"

"সাব, জঙ্গল তো ইধর চারো তরফই হ্যায়। উও রাস্তা পে তো ভয়ানক জঙ্গল হ্যায়। ভালু হ্যায়, শের হ্যায়, ঔর কেয়া কেয়া হ্যায় পতা নেহি সাব।"

"ঠিক হ্যায়, চলো। তপোবন চলো। ভাগনে, প্যাক আপ, কুইক।"

"মামা, ব্রেকফাস্ট? খিদে পায়নি তোমার?", আলুর পরোটা মিস হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বললাম। কাজ হল। তপোবনে কোথায় কী পাওয়া যাবে কে জানে! তাই পেট পুরে আলুর পরোটা খেয়ে গাড়িতে উঠলাম আমরা।

যোশীমঠ থেকেই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। পাহাড় সমগ্রটা খুলে দু'জনে উইন্ডচিটার চড়িয়ে মাফলার জড়িয়ে নিয়েছি। পরিষ্কার ঝকঝকে দিন, নীল আকাশ, চারদিকে সবুজ পাহাড়। একঘণ্টায় তপোবন পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট জায়গা। ছোট একটা বাড়ির দোতলায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠলাম। গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হল। গজুমামা সুখলাল বলে একটি লোককে পাকড়াও করল যে কুয়াঁরি পাসের রাস্তা চেনে, আমাদের গাইড হয়ে যাবে। এখান থেকে কুয়াঁরি পাসের পায়ে চলা রাস্তা দক্ষিণ দিকেই গেছে বটে। সুখলাল বলল যেতে দু'তিনদিন লাগবে। মামার থেকে পয়সা নিয়ে সে পথের রেশন কিনতে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে শুরু হল আমাদের ট্রেকিং। একটা পাকদণ্ডী পথ তরতর করে পাহাড় বেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খাড়া উঠে গেছে। সে কী চড়াই! আর কী গভীর জঙ্গল রে বাবা। গা ছমছম করে। বললাম, "মামা, সাধুবাবা ঠিকই বলেছিল। এ যে দেখি ঘনঘোর বন।"

মামা বলল, "হুমম্, জঙ্গল অমনিবাসটা হাতের কাছে আছে তো?"

"হ্যাঁ মামা, সে তো আমার পিঠেই আছে। কিন্তু রঘুজী যে বলছিল এই বনে বাঘ আছে?"

মামা দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্ষুব্ধস্বরে বলল, "বাঘ বড়ো না আমি বড়ো?"

"তুমি, মামা।"

"তাহলে চল। ঘাবড়াস না।"

আমি কি আর ঘাবড়েছি? শুধু একটু ভয় ভয় করছে। এদিকে সুখলাল তরতর করে চড়াই উঠে যাচ্ছে। আর আমি ঘেমেনেয়ে হাঁপিয়ে একাকার। মামাও হাঁপাচ্ছে, কিন্তু স্বীকার করবে না। একঘণ্টা চড়াই ভাঙার পর হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছি, মামা বলল, "কী রে, হাঁপ ধরছে?"

"না মামা, এখানে অক্সিজেনটা একটু কম মনে হচ্ছে।"

"জল খা। জল খেয়ে দুবার হাই তুলে নে। জলের একটা অণুতে দুটো হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে। হাইয়ের সাথে হাইড্রোজেন দুটো বেরিয়ে যাবে, অক্সিজেন পেয়ে যাবি।"

বোঝো! কী সব ফান্ডা! যাই হোক, একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের চড়াই ওঠা শুরু হল। যত এগোচ্ছি জঙ্গল আরও ঘন হয়ে চারপাশ থেকে চেপে ধরছে। পায়ে চলা রাস্তাটাও মাঝে মাঝে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু পরে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। পাতার চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যের আলো মাটি অবধি পৌঁছতে পারছে না। গাছে গাছে বাঁদরের দল হুটোপাটি করছে, পাখিরা গান গাইছে। দুপুর নাগাদ একটা ছোট্ট ফাঁকা মতো জায়গা দেখে বসলাম আমরা। চারপাশে গভীর জঙ্গল। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু মামাকে তখন কবিতায় পেয়েছে।

"আহা কত গাছ মাথার ওপরে
আকাশ ঢেকেছে সবুজ চাদরে
সব চুপচাপ
শুধু হুপ হাপ
করি গাছে গাছে খেলিছে বাঁদরে।"

সুখলাল পিঠের বোঝা নামিয়ে প্যাক করা রুটি আলুরদম বার করেছে। এমন সময়, মামার কবিতা শুনেই হোক কিম্বা আলুরদমের গন্ধে, একটা বিশাল কালো ভাল্লুক দেখি গাছের আড়াল থেকে হেলতে দুলতে বেরিয়ে এল। আমি চিৎকার করে বললাম, "মামা, ভাল্লুক।"

মামা বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। তোর একটা সবুজ রঙের ভাল্লুক ছিল না?"

"হ্যাঁ, সে তো ছোটবেলায়। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।"

"এটা পুষবি? এটা অবশ্য কালো, তবে নাদুসনুদুস আছে।"

এসব কথাবার্তায় ভাল্লুক বাবাজী কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ থমকে গিয়ে উল্টোদিকে ঘুরে ফের বনের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। মামা বলল, "কী, কেমন দিলাম?"

বলতে যাচ্ছিলাম, "মামা, দারুণ", কিন্তু তখন আমার চোখ পড়েছে পাশের একটা গাছের একটা নিচুমতন ডালে। সেখানে একটা চকরাবকরা চিতা আমাদের দিকে চেয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে, শুধু লাফ দেওয়ার অপেক্ষা। আবার চিৎকার করলাম, "মামা, চিতাবাঘ।"

"হুঁ, দেখেছি তো। ঘাবড়াস না। জঙ্গল অমনিবাস থেকে বন্দুকের লাইসেন্সটা বার কর।"

তাড়াতাড়ি ব্যাগ ঘেঁটে লাইসেন্সটা বার করলাম, "করেছি, মামা।"

"করেছিস? এবার লাইসেন্সটা চিতাটার দিকে তুলে দেখা।"

ওমা, কী কাণ্ড! লাইসেন্সটা চিতাটার দিকে দেখাতেই সেটা কেমন জবুথবু হয়ে গিয়ে ঝুপ করে গাছের ডাল থেকে খসে পড়ল। তারপর সে নড়েও না চড়েও না। মামা উঠে পড়ে বলল, "এই রে, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সুখলাল, জলদি পানি লে আও। আরে, সুখলাল কাঁহা গিয়া?"

কিন্তু, ত্রিসীমানায় সুখলালের আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। মামা বলল, "ব্যাটা ভয়ে পালিয়েছে। ডরপোক। যাক্ গে। ভাগনে, একটা জলের বোতল নিয়ে আয়। চিতাটার মাথায় আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জল ঢালতে হবে।"

মাথায় জল দিতেই চিতাটা ধড়ফড় করে উঠে বসে, মামার দিকে তাকিয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, তিড়িং করে এক লাফ মেরে চোঁচা ছুট দিল। তাকে আর দেখাই গেল না। মামা বলল, "চল ভাগনে, এবার রুটি আলুরদমটার সদগতি করা যাক। খিদেটা ভালোই চাগাড় দিয়েছে।"

খেয়েদেয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মামা বলল, "চল, এগোনো যাক।"

"কিন্তু সুখলাল তো ভাগলবা। অত মাল বইবে কে? রাস্তাই বা চিনব কী করে?"

"আরে দক্ষিণদিকে তাক করে এগোলেই হবে। এতে এত হাতিঘোড়া আছেটা কী? আর ওসব চাল ডাল হাঁড়ি ডেকচি স্টোভ কেরোসিন এখানেই পড়ে থাক, ফেরার সময় দেখা যাবে। শুধু বিস্কুটের প্যাকেটগুলো নিয়ে নে। বিস্কুট খেয়েই থাকব, তাছাড়া গাছের ফলমূল আছে। পারবি না ভাগনে?"

"হ্যাঁ মামা, পারব।"

"তবে ওঠ, চল। ভয় কী? মামা- ভাগনে যায় যেখানে, আপদ বালাই নাই সেখানে।"

উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে মামা বিকট হেঁড়ে গলায় গান ধরল,

"হাতি মেরা সাথী
ভালু মেরা নাতি
খাই দাই গান গাই দিবা কিবা রাতি।"

আবার চলা। আবার চড়াই। কোন দিকে যাচ্ছি মামাই জানে। অনেকটা চড়াই উঠে কিছুটা আবার নামলাম। ফের উঠলাম, ফের নামলাম। এমনি কতবার যে উঠলাম আর নামলাম সে হিসেব রাখতে কম্পিউটার লাগবে। জঙ্গল তো জঙ্গলই, আরও যেন ঘন হচ্ছে ধীরে ধীরে। বিকেল হয়ে এসেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদটা কেমন হলদেটে হয়ে গেছে। মামা আগে আগে যাচ্ছে, একটু পেছনে আমি। এমন সময় গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক বাঘ, একেবারে

আমার সামনে। ঘড়ড়াম করে মাটিকাঁপানো এক হুঙ্কার ছাড়ল সে। আমি তো গেছি! চিৎকার করে বললাম, "মামা, বাঘ। খেয়ে ফেলল।"

মামা সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিগুণ চিৎকার করে বলল, "অ্যাই, খবরদার। আমার ভাগনের গায়ে হাত দিবিনা বলে দিচ্ছি। ভাল হবে না। ৫০৬ নম্বর ধারায় মামলা করে দেব।"

বাঘটা মামার কথায় পাত্তা না দিয়ে আরও দু'পা এগিয়ে ফের ঘ্রাউম করে হুঙ্কার ছাড়ল। কী বলব, বাঘটা আমার এত কাছে যে হাঁ করে হুঙ্কার দেবার সময় ওর মুখের ভেতর সবকটা দাঁত, মায় আলজিভটা অবধি দেখতে পেলাম। এবারে আর রক্ষে নেই। ভূতের সামনে পড়লে লোকে রামনাম জপে জানি, বাঘের সামনে কী জপ করে তাই ভাবছি, এমন সময় আমার পেছন দিক থেকে কে যেন খুব রাশভারী গলায় বলে উঠল, "অ্যাই বাঘা, কী হচ্ছে কী? দেখছিস না বাচ্চা ছেলে, ভয় পাচ্ছে?"

ওমা, অবাক হয়ে দেখলাম, বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে গলা দিয়ে একটা আদুরে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ল্যাজ নাড়তে লাগল। পেছন থেকে সেই মোটা গলা আবার বলল, "ভয় নেই বৎস, ও কিছু করবে না। পোষা বাঘ। ও আমার পর্ণকুটিরের প্রহরী।"

এতক্ষণ বাঘটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না, পেছন ফিরে আরও অবাক হয়ে গেলাম। দেখি শ্বেতশুভ্র ধুতিচাদর পরা দিব্যকান্তি দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসী ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তার মুখে ধবধবে সাদা দাড়ি, মাথায় জটা, হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি। পেছন থেকে অস্তগামী সূর্যের নরম রোদ তার গায়ে পড়ে স্বর্ণচ্ছটার মত ঠিকরে উঠছে। আমায় দেখে তিনিও মনে হল আশ্চর্য হয়েছেন। কাছে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আরে! গজু না?"

আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "না না, আমি না, ও . . ।" বলে মামার দিকে দেখিয়ে দিলাম। মামা ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ 'সোনাভাই, তুমি!' বলে এগিয়ে এসে সেই সন্ন্যাসীর পায়ে গড় করে প্রণাম করে ফেলল। তারপর উঠে বলল, "ও নয়, আমিই গজু। ও আমার ভাগনে গুলু। ওরে ভাগনে, হাঁ করে দেখছিস কী? প্রণাম কর, প্রণাম কর। ইনি তোর বুড়োদাদু, আমার ঠাকুদ্দা, আমাদের সোনাভাই, স্বনামধন্য সিদ্ধেশ্বর কবিরাজ। সোনাভাই, তোমার ভুল নয়, আমাকে যখন তুমি দেখেছ তখন আমার এই গুলুর মতই বয়স।"

সন্ন্যাসী বললেন, "হুমম্, তোমার বাল্যবয়সের মতই দেখতে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

নরাণাং মাতুলক্রমঃ? কিন্তু, আমি তো দেখছি নরাণাং ঠাকুরদাক্রমঃ। পাশাপাশি গজুমামা আর সোনাভাইকে দেখেই বুঝেছি কী আশ্চর্য মিল তাঁদের চেহারায়। সোনাভাই অবশ্য আরও ফর্সা আর লম্বা, মামার মত ভুঁড়িও নেই তাঁর। বয়স অনেক বেশি হলেও মামার থেকে ফিট দেখাচ্ছে তাঁকে। এক হাত আমার কাঁধে, আরেক হাত মামার কাঁধে রেখে তিনি বললেন, "এসো, আমার কুটিরে এসো।"

সন্ধে হয়ে গেছে। ডালপালা আর লতাপাতা দিয়ে বানানো ছোট্ট একটা কুটিরের মাঝখানে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। আগুন ঘিরে বসেছি সোনাভাই, গজুমামা আর আমি। দরজার বাইরে বাঘা শুয়ে আছে। সোনাভাই কিছু মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে একটা বাঁশের চুবড়িতে রেখেছেন। বিটনুন মাখিয়ে আমি আর গজুমামা একটা একটা করে সেই আলু খাচ্ছি। ওফ্, অমৃত!

"এই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আমার খোঁজে যে তোমরা এতদূর এসেছ এতে আমি খুবই প্রসন্ন হয়েছি," বললেন সোনাভাই।

"হিংস্র না কচু! সব ভিতুর ডিম," বলে সেই চিতা আর ভাল্লুকের কাণ্ডটা সোনাভাইকে বললাম।

সোনাভাই হা হা করে হেসে উঠলেন, "ওর কারণ অন্য। আমি যখন এই বনে ভ্রমণ করি বাঘা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। তাই হিংস্র পশুরা আমার কাছে ঘেঁষে না। আমার সঙ্গে শ্রীমান গজুর সাদৃশ্য থাকায় ওই ভল্লুক ও চিতাটি বিভ্রান্ত হয়েছিল। তাই পলায়ন করেছে।"

"আচ্ছা সোনাভাই, দেশ স্বাধীন হবার পর তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে কেন?" আমার মাথায় প্রশ্নটা অনেকদিন থেকেই জমা ছিল, সুযোগ পেয়ে করে ফেললাম।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সোনাভাই হেসে বললেন, "বৎস গুলু, তোমার কৌতূহল আছে। ভাল, খুব ভাল। ইংরেজরা আমার কবিরাজি চিকিৎসার খুবই ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময় তারা আমায় ইংলন্ডে নিয়ে যেতে চাইল। দেখলাম, দেশে থাকতে হলে আত্মগোপন করতে হয়, তাই সন্ন্যাস নিলাম। আমার এই দেশ ছেড়ে আমি কোথায় যাব? কেন যাব?"

"তুমি কি বদ্রীনাথে ছিলে? সেখানে তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা করতে?" গজুমামা বলল।

"হ্যাঁ, বদ্রীনাথে মাঝে মাঝে যাই আমি। সেখানে মানুষের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। আমার অধীত কবিরাজি বিদ্যাটিরও অনুশীলন হয়। অন্য সময়ে এটিই আমার সাধনার স্থান।"

"তোমার বয়স কত সোনাভাই তাহলে? দেড়'শ?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"হা হা, না বৎস। অত নয়। স্বাধীনতার সময় আমার বয়স ছিল ষাট। এখন তোমাদের হিসাবে প্রায় এক'শ পঁচিশ হবে। তবে আমি ধ্যানযোগে বয়স নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। গত পঁয়ষট্টি বৎসরে আমার বয়স বড়োজোর কুড়ি বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে আমি এখন আশি।"

"ধ্যান করলে কি বয়স বাড়ে না?" আমি বললাম।

"তোমার যখন এতই কৌতূহল তখন বলি," স্মিত হেসে বললেন সোনাভাই, "আচ্ছা, বলো তো, আলোর চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন এমন কী আছে বিশ্বে?"

"ইজি, চিন্তা। মনে মনে চিন্তা করে আমি একমুহূর্তে দিল্লী বা কলকাতা চলে যেতে পারি।"

"বাঃ, ঠিক। আর, জানো কি যে আলোর বেগে যদি কেউ ছুটে চলে তবে তার বয়স বাড়ে না?"

"হ্যাঁ, জানি তো। আলোর অর্ধেক বেগে ছুটলেও দশ বছরে আট বছর আট মাস মত বাড়বে।"

"বাঃ, জানো দেখছি। তাহলে বলি শোন, আমি ধ্যানযোগে সময়ভ্রমণ আয়ত্ত করেছি।"

"মানে?" আমি আর গজুমামা একসঙ্গে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ বৎস, ধ্যানযোগে আমি অতীতে ফিরে যেতে পারি, কোনও বিশেষ জায়গায়, দর্শক হিসেবে। আজ সকালেই সময়ভ্রমণে গেছিলাম সিন্ধু সভ্যতায়, সিন্ধু নদের তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কাল রাত্রে গেছিলাম মিশরীয় সভ্যতা দেখতে। এরকম কখনও মায়া, কখনও ইনকা সভ্যতা, কখনও ব্যাবিলন, কখনও গ্রিস- আমি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি। মানবসভ্যতার ইতিহাস এখন আমার মাথার ভেতর। ধ্যানযোগে এত ঘুরে বেড়াই বলেই আমার বয়স কম বাড়ে।"

আমি আর জগুমামা তো অবাক, একদম চুপ। একটু থেমে থেকে সোনাভাই হঠাৎ বললেন, "শ্রীমান জগু, তোমার হস্তলিপি কীরকম?"

"হাতের লেখা? অতি বাজে, অখাদ্য। একেবারে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং।"

"সে বললে তো চলবে না বাবা। হস্তলিপি অনুশীলন কর। আমি যা দেখেছি, মানবসভ্যতার সেই সম্পূর্ণ ইতিহাস আমায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিখে যেতে হবে। আমি বলব, তুমি লিখবে। ব্যাসদেব যেমন গণেশকে দিয়ে মহাভারত লিখিয়েছিলেন।"

"মহাভারত! ওরে বাবা, সে তো বিশাল ব্যাপার। ওতে নাকি একলক্ষ শ্লোক আছে।"

"ব্যাসদেব ভারতের ইতিহাসের মাত্র তিন- চার'শ বছরের একটি খণ্ডচিত্র দেখেছিলেন। আমি পুরো মানবসভ্যতার ইতিহাস লিখতে চাই। ওতে বিশ লক্ষ শ্লোক থাকবে।"

"বিশ লক্ষ? কিন্তু আমায় কি এখানে বসে লিখতে হবে? না তুমি বাড়ি ফিরে যাবে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ সোনাভাই, ফিরে চলো, আমাদের সঙ্গে। বুড়োদিদা সারাক্ষণ তোমার কথা বলে। তোমার জন্য ইলিশমাছের মাথা আর ছোলা দিয়ে কচুর শাক রান্না করে রেখেছে।"

সোনাভাই হঠাৎ একটু থমকে গেলেন, বললেন, "বুড়োদিদা? তোমার বুড়োদিদা এখনও বেঁচে আছেন? কী আশ্চর্য, সময়ভ্রমণে একবারও আমার নিজের বাড়ি ঘুরে আসার কথা মনে হয় নি।"

"হ্যাঁ, বেঁচে আছে বইকি। দিব্যি আছে। বুড়োদিদাও তো সবসময় তোমার ধ্যান করছে, তার বয়সই বা বাড়বে কী করে? শুধু কানে শোনে না, চোখে একটু ঝাপসা দেখে আর শীতকালে বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পায়।"

"আহা, বাতজ বেদনার জন্য ভল্লুকের চর্বির তেল খুব ভালো ওষুধ। আমি নিয়ে যাব 'খন।"

"তার মানে তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ? দারুণ। হিপ হিপ হুররে।"

সোনাভাই একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "না বৎস, আমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। সময় ভ্রমণে আমি মাত্র কুড়ি হাজার বছর অবধি পেছোতে পেরেছি। আরও পেছোতে হবে। আমায় দেখতে হবে আফ্রিকায় কীভাবে প্রথম মানবসভ্যতার বিকাশ হল, কীভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপে। আরও পিছিয়ে জানতে হবে মানুষ কীভাবে শিকার করতে শিখল, আগুন জ্বালাতে শিখল, চাষবাস শিখল, চাকা আবিষ্কার করল। আরও বছর দশেক লাগবে, তারপর ফিরব। আমি বলে যাব, গজু লিখবে।"

"কিন্তু সোনাভাই, অত লেখার কী দরকার? টেপ করে রাখলেই তো হবে।"

সোনাভাই আমার চুলে বিলি কেটে দিয়ে বললেন, "না গুলুসোনা, লিখতে হবে। তাছাড়া তোমার বুড়োদিদা তো বললে কানে শোনেন না, টেপ করে রাখলে তাঁকে শোনাবে কী করে?"

আগুনটা প্রায় নিভে এসেছিল। বাইরে এইসময় একটা জোরালো হাওয়া উঠল, গাছপালায় সরসর করে একটা আওয়াজ, পাখিরা হঠাৎ জেগে উঠে একবার কিচিরমিচির করে উঠল। সোনাভাই বললেন, "ওই দ্যাখো, কথায় কথায় রাত প্রায় শেষ। একটু শুয়ে বিশ্রাম করে নাও। ভোর হলে ডেকে দেব। তোমরা কুমারী গিরিপথের রাস্তা ফেলে বেশ খানিকটা সরে এসেছ। বাঘা তোমাদের রাস্তা অবধি এগিয়ে দেবে। ফিরে যাও। তারপর আমিও আবার আমার ধ্যানে বসব।"

যোশীমঠ থেকে গাড়িতে নিচে নামতে নামতে গজুমামা গম্ভীরভাবে বলল, "ভাগনে, ভালো করে হাতের লেখা প্র্যাকটিস কর।"

"আমি? কেন? লিখবে তো তুমি!"

"আরে সোনাভাইয়ের দশ বছর মানে আমাদের তিরিশ বছরের বেশি। তদ্দিনে আমি বুড়ো হয়ে যাব, অত দিস্তা দিস্তা লেখা আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া সোনাভাইয়ের তোকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। দেখবি শেষ অবধি তোকেই বলবে লিখতে।"

বলে কি! বিশ লক্ষ শ্লোক আমায় বসে বসে লিখতে হবে? শুনে তো আমার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ব্যথা শুরু হয়ে গেল। নাঃ, আঙুলগুলোকে এখন থেকে রেস্ট দিতে হবে। এই লেখা থামালাম।

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

দুর্বারগড়ের রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন এবার পাঁচ বছরে পা দেবে। হইচই পড়ে যাবে সারা রাজ্যে। রাজপুত্রকে দেখতে যেমন রূপবান, তেমনি তার গায়ের রং! একমাথা কোঁকড়া কালো চুল। চোখ- মুখ থেকে বুদ্ধি ঠিকরে পড়ছে। সৌভাগ্যপ্রসন্নর মত অমন ফুটফুটে রাজপুত্র কে কবে দেখেছে?

রাজপ্রাসাদ থেকে এ খবর কেমন করে যেন পৌঁছে গেল মেঘলোকে। নীল আকাশ রাজপ্রাসাদের কার্নিশে নেমে এল শাঁইশাঁই করে। একটা আকাশ- জোড়া সাতরঙের রামধনু উঠল। নীল আকাশ তাকালোই না তার দিকে। হাঁসফাঁস করতে- করতে এসে কপালের ঘাম মুছে বলল, "আমি এই সুখবরটা রাজ্যবাসীর কাছে বয়ে নিয়ে যাব। আমাকে অনুমতি দিন রাজামশাই!"

বাতাস শোঁ শোঁ করে ছুটে এল দিগন্ত থেকে। এক পলকে পেরিয়ে এল মস্ত রাজসরোবর। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদে। রাজামশাইয়ের কাছে এসে বলল, "মহারাজ, আমি এই আনন্দের খবর ছড়িয়ে দিতে চাই গোটা রাজ্যে। আমাকে আদেশ করুন।"

রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাঁকনকুশি নদী। সে তার ছোট- ছোট ছলাৎ-ছল ঢেউ তুলে রাজসিংহাসনের পায়ের কাছে এসে বলল, "আমি এ খবর সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র দাবিদার। মহারাজ, আমাকে রাজিনামা দিন!" এদের কথা শুনে মহারাজ সংগ্রামপ্রসন্ন গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সিংহাসনে।

রাজউদ্যান থেকে কিচির মিচির করতে- করতে উড়ে এল একঝাঁক কথা- বলা পাখি। তারা এসে বলল, " আমরা কি এমন সুসংবাদ পৌঁছে দিতে পারি না মানুষের কাছে? আমরা গান গেয়ে- গেয়ে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্নর পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা জানিয়ে আসি পুরবাসীকে। রাজামশাই, আপনি সায় দিলেই আমরা উড়াল দিই এক্ষুনি।" তখন পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠল রাজপ্রাসাদ।

রাজামশাই সংগ্রামপ্রসন্ন সকলকে বললেন, "এমন আনন্দের খবর সকলেই পৌঁছে দাও চারদিকে। তোমাদের সকলকেই অনুমতি দিলাম!"

খবর ছড়িয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়ে গোটা রাজ্যে।শুরু হয়ে গেল রাজ্যজুড়ে হইহই।এত হট্টগোলের কারণ কী ? রাজবংশের নিয়ম হল,রাজপুত্রের বয়স পাঁচ পূর্ণ হওয়ার দিনই বিদ্যারম্ভের দিন।একদিন এই রাজপুত্রই তো এ রাজ্যের রাজা হবে। তার বিদ্যারম্ভের দিন আনন্দ না করলে কি মানায় ?

আজ রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্নর বিদ্যারম্ভ হবে। রাজ্য-বিরাজ্য থেকে এসেছেন একশো একজন নামী পুরোহিত।দূত পাঠিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করে এসেছেন রাজামশাই নিজে।এ ছাড়া রাজসভার প্রধান পুরোহিত তো আছেনই।

সকাল থেকেই গোটা রাজ্যের আকাশে-বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে কত না শ্লোক,কত না ব্যাকরণ,কত না কবিতা।বেদগান শুরু হয়েছে সিংহদরজার সামনে ম্যারাপ বেঁধে। কী তার সুরের মাধুর্য ! কী তার সুরের মূর্চ্ছনা !

স্বর্গের নদীর নাম মন্দাকিনী। রাজামশাই সংগ্রামপ্রসন্ন পাঁচজন লোক পাঠিয়ে

ছিলেন এক বছর আগে।তার মধ্যে তিনজন ফিরে এসেছে গত কাল।আর দুজন প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারেনি।অত দূরের পথ বলে কথা! পায়ে হেঁটে মন্দাকিনী কী চাট্টিখানি দূর ? তিনজন লোক দেবব্রাহ্মণের কাছেও গিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে নতুন কাপড় চেয়ে নিয়েছে। তারপর সেই কাপড়ে থলে বানিয়ে মন্দাকিনীর পাড় থেকে তুলে এনেছে নানা রঙের মিহি বালুকণা। সেসব রঙ রামধনুর গায়েও চোখে পড়ে না। বালুকণা কেন? রাজপুত্রের হাতেখড়ি হবে যে! বালুকণার উপরই তো হাতেখড়ি হওয়ার নিয়ম। সময় হতেই রুপোর রেকাবিতে করে সোনায়-মোড়া চকখড়ি নিয়ে এলেন প্রধান রাজপুরোহিত। তিনি মন্থর গতিতে রুপোর চারকোণা বড়ো পাত্রে ঢাললেন মন্দাকিনীর বহুবর্ণ বালুকণা। রানিমার পাশে এসে বসল বিদ্যার্থীব্রতের বেশে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন। চামর দোলাতে লাগল অসংখ্য দাসদাসী। দু' হাতে ফুলবৃষ্টি করতে লাগল রাজ্যবাসী। রাজপুত্রের হাত ধরে প্রধান পণ্ডিতমশাই লেখালেন 'অ'। মহানন্দে শাঁখ বাজাল পুরনারীরা। রাজামশাইয়ের মুখে উপচে পড়ল আনন্দ।

এমন ধুমধাম দুর্বারগড়ের মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি। সকলে মহাভোজ খেয়ে ফিরে গেল যে-যার বাড়িতে। একশো একজন মহাপুরোহিত বিদায় নিলেন রাজামশাইয়ের কাছ থেকে। তাঁদের প্রত্যেককে পাত্র উপচে-পড়া মোহর দান করলেন রাজামশাই। পরদিন থেকে শুরু হয়ে গেল রাজপুত্রের বিদ্যালাভ।

।২।

দেখতে-দেখতে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন কত কী যে শিখে ফেলল! পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত। রাজপুত্রের পড়া হয়ে গেল বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুবর কথা। নিজের আঙুল কেটে একলব্যর দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কাহিনিও পড়ে শেষ করল রাজপুত্র। পড়া হয়ে গেল মহাভারতের অভিমন্যুর কথাও। রামচন্দ্রের যমজ পুত্র কুশ আর লব-এর বড় হয়ে ওঠার গল্পও মুখে-মুখে পড়ল রাজপুত্র।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাজপুত্রের বুদ্ধির খবর। এক–এক বিষয়ের জন্য রাজপুত্রকে পড়াতে এলেন এক-একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। যখন সাত-আট বছর বয়েস হল রাজপুত্রের, তখন বিদ্যালাভের সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল তরবারি চালনা শিক্ষা, অস্ত্রনিক্ষেপ আর ধনুর্বিদ্যা।

যখন রাজপুত্র আর-একটু বড় হল, দশ বছরে পা দিল, তখন রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন একা-একাই ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারল তেপান্তরে। হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। ঢেউয়ের ঝুঁটি জাপটে ধরে সাঁতরে পার হয়ে যেতে লাগল উত্তাল নদী।

একদিন হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল তছনছ করে ফিরে আসছিল রাজপুত্র। এমন সময় রাজপুত্র হাতির পিঠে থেকে নেমে এল খালি গা একটা শ্যামলা ছেলেকে দেখে। তার সামনে গিয়ে রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিল। নিজের নামও বলল তাকে। এও বলল, দুর্বারগড়ের রাজার একমাত্র ছেলে সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কী?" ছেলেটি বলল, "আমার নাম বৃক্ষক কাঠুরে।" রাজপুত্র এত বই পড়েছে, কিন্তু 'বৃক্ষক' নামটা কখনও শোনেনি। অবাক গলায় বলল, "বৃক্ষক মানে কী?"

বৃক্ষক ঠোঁট উলটে বলল, "মানে? নাঃ। মানেটা কোন কাজেই লাগবে না তো, তাই জানি না।"

রাজপুত্র হেসে উঠল। বলল, "কাঠুরে আবার কারও পদবি হয় নাকি?"
বৃক্ষক বলল, "হয় না কেন? খুব হয়। আমরা কাঠুরে তো, তাই! আমার বাবার নাম মহাবৃক্ষক কাঠুরে।"

দু'-একটা কথার পর রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্নর ভাব হয়ে গেল বৃক্ষকের সঙ্গে। বৃক্ষক এক গরিব কাঠুরের ছেলে। বাবা সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে শুকনো কাঠ কাটে। দিনশেষে সেগুলো বিক্রি করতে নিয়ে যায় অনেক দূরের বাজারে। আর বৃক্ষক সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কখনও মন হলে গাছের তলায় পড়ে থাকা বীজ কুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে দেয়। ঝড়ে পাখির বাসা ভেঙে গেলে সে মগডালে উঠে ফের বাসা বানিয়ে দিয়ে নেমে আসে। আবার কখনও মন হলে, বাসা থেকে পড়ে যাওয়া পাখির বাচ্চাকে তুলে রেখে আসে তার বাসায়। মায়ের পালকের নীচে। পাকা ফল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে, সেগুলোও কুড়িয়ে পাখির বাসায় রেখে আসে। পাখির খিদে পেলে খাবে, তাই! মা-পাখিরাও সকলেই বৃক্ষককে চেনে।

বৃক্ষকের মুখে থেকে তার সারাদিনের গল্প শুনে মোহিত হয়ে গেল রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন। মনে-মনে বলল, "বাঃ, কী সুন্দর।"

বৃক্ষক বলল, "তুমি অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

রাজপুত্র বলল, "তুমি কী সুন্দর! তোমাকে সময়ের মাপ করতে হয় না। অত সময় মেপে আমার চলতে ভাল লাগে না। এই বিদ্যাভ্যাস, এই অসিচালনা, এই তীরনিক্ষেপ তো এই ফের ঘোড়ায় চড়া, ফের রাজ্যপরিচালনার কৌশল শেখা।"

বৃক্ষক অবাক গলায় বলল, "ও মা! তুমি যে রাজপুত্র! ও'সবই তো তোমায় শিখতে হবে। ও কি না শিখলে চলে নাকি? তোমাকে বড় হয়ে রাজা হতে হবে না?"

"বৃক্ষক, ওসব কথা ছাড়ো। তুমি আমার বন্ধু হবে কি? আমি তোমার কাছে রোজ এসে পাখির বাসা বানানো শিখব। নতুন-নতুন গাছ লাগাব জঙ্গলে। বাসা থেকে পড়ে যাওয়া পাখির বাচ্চাকে তুলে রেখে আসব বাসায়! মা-পাখির কাছে। আচ্ছা বৃক্ষক, আমি যে গাছে চড়তে পারি না? তুমি আমাকে গাছে চড়া শিখিয়ে দেবে তো?"

"গাছে চড়া এমন কিছু কঠিন না। তুমি হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে আসতে পারো, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা শেখো, আর এই সামান্য গাছে চড়তে পারবে না? ও আমি তোমাকে ঠিক শিখিয়ে দেব।"

"আমাকে গাছে চড়া শিখিয়ে দিও তা হলে।আমিও তোমার সঙ্গে উঠে যাব গাছের মগডালে পাখির বাসায় পাখির ডিম দেখতে।"

বৃক্ষক বলল, "তা যেও না হয়! তবে সৌভাগ্য, তোমাকে শিখিয়ে রাখি, পাখির ডিমে কিন্তু হাত দিতে নেই। তা হলে ডিম ফুটে বাচ্ছা হয় না। আমার ঠাকুরমা বলেছিল কথাটা। তবে আরও একটা কথা বলি, রাজামশাই তোমাকে আসতে দেবেন কেন?"

"আমি রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে তোমার কথা সব বলব। বাবা নিশ্চয়ই আমাকে তোমার কাছে আসতে দিতে রাজি হবেন।"

বৃক্ষকের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, "দূর, তুমি যে কী বলো! আমার কথা আবার বলার মতো কথা হল নাকি যে, তুমি রাজপ্রাসাদে গিয়ে আমার কথা বলবে? শুনলে রাজপ্রাসাদের সকলে হেসে উঠবে যে! "

"উঠুক! আমি ফের তোমার কাছে কাল আসব। তুমি এখানেই থেকো কিন্তু! "

"তা কী হয়? কখন কোন দিকে চলে যাব, তার ঠিক আছে নাকি? তোমার মত অত সময় মেপে আমাকে চলতে হয় না সৌভাগ্য। তার চেয়ে এক কাজ করো। আমি তোমাকে এই বাঁশিটা দিচ্ছি। জঙ্গলে এসে তুমি এটা বাজিও। আমি ঠিক শুনতে পাব।"

বলে বৃক্ষক একটা বুনো ফলের আঁটি দিল রাজপুত্রকে। তার ভিতরের শাঁস বের করে আম আঁটির ভেঁপুর মতো বাঁশি বানিয়েছে বৃক্ষক।

তারপর কী মনে হতে রাজপুত্রের হাত থেকে বাঁশিটা নিয়ে বৃক্ষক বলল, "দাঁড়াও, তুমি তো আবার এসব বাজাতে জানো না। রাজপুত্ররা যেমন অনেক কিছু

পারে, আবার তেমনি অনেক কিছু পারেও না।এসো সৌভাগ্য, তোমাকে বাঁশি বাজানো শিখিয়ে দিই।"

বলে দু'আঙুলের ফাঁকে কেমন করে ধরতে হবে বাঁশিটা তা দেখিয়ে দিল। তারপর গলার শিরা ফুলিয়ে জোরে ফুঁ দিল বৃক্ষক। একটা মিহি সুরেলা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সারা জঙ্গলে।

গাছ-পাতা খেতে-খেতে রাজপুত্রের হাতিটা কত দূরে চলে গেছে। দু'জনে খুঁজে আনল হাতিটাকে। তারপর রাজপুত্র চড়ে বসল হাতির পিঠে। গাছের ঘন ডালপালা নাড়িয়ে এক সময় জঙ্গলের সবুজে আড়াল হয়ে গেল রাজপুত্র আর তার হাতি।

।৩।

প্রতিদিন সূর্য ওঠার সময় যুদ্ধবিদ্যা শিখতে যেতে হয় রাজপুত্র সৌভাগ্যকে। তখন সবে দিনের শুরু। অস্ত্রগুরু বলেছেন, "সকালবেলা যখন মনে একাগ্রতা থাকে বেশি। মন যখন চঞ্চল হয় না। তখনই অস্ত্রবিদ্যা শেখার সঠিক সময়।"

পরদিন সকালবেলা যুদ্ধবিদ্যা শিখে ফিরে এল রাজপুত্র। এবার বিদ্যাভ্যাসের সময়। রাজপুত্র গিয়ে বসল তার আসনে। আজ পুরাণের পাঠ। পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত এসে বসলেন কুশের আসনে। অমন সময় পণ্ডিতমশাই দেখলেন, রাজপুত্রের পাশে আসনের উপর একটা আশ্চর্য ফলের আঁটি পড়ে আছে। রাজপুত্র ফলের আঁটির বাঁশিটি কিংখাবের ভিতরে রেখেছিল। তারপর মনে নেই। কখন পড়ে গেছে খেয়ালই হয়নি।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত আঙুল তুলে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সৌভাগ্যপ্রসন্ন, ও জিনিসটা কী?"

রাজপুত্র লজ্জায় নতমুখ। নিচু স্বরে বলল, "এটা বাঁশি। বৃক্ষক কাঠুরে এটা আমাকে দিয়েছে। "

পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "বৃক্ষক কাঠুরে কোথায় থাকে?"

রাজপুত্র বলল, "সে জঙ্গলে থাকে। বৃক্ষক বলেছে, আমি জঙ্গলে গিয়ে এই বাঁশিটা বাজালেই সে আমার কাছে তক্ষুনি চলে আসবে।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন পণ্ডিতমশাই। সেদিনের মতো পড়া বন্ধ হয়ে গেল। পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত দৌবারিকের হাতে খবর পাঠালেন, তিনি এখনই রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজামশাইয়ের অনুমতি মিলল। পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত গিয়ে হাজির হলেন রাজদরবারে। বৃক্ষক এবং তার বাঁশির কথা বললেন রাজামশাইকে।

সব শুনে রাজা সংগ্রামপ্রসন্নর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ক্ষণেকের জন্যে তিনি সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্নকে ডেকে পাঠালেন দরবারে।

রাজামশাইয়ের ডাক আসার আগে রাজপুত্রের মুখ থেকে রানিমা সব শুনেছেন। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। রাজামশাই যা রাগী মানুষ! কী না কী করে বসেন। রানিমাও রাজপুত্রের সঙ্গে গেলেন রাজদরবারে। রাজপুত্র মুখ নিচু করে দাঁড়াল রাজামশাইয়ের সামনে।

রাজামশাই জিজ্ঞেস করলেন, "বৃক্ষক কে সৌভাগ্য?"

রাজপুত্র ধীর গলায় বলল, "বৃক্ষক কাঠুরে। আমার বন্ধু। "

"তার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?"

"জঙ্গলে। আমি হাতির পিঠে চড়ে যখন ফিরে আসছিলাম রাজপ্রাসাদে। তখনই তো তার সঙ্গে দেখা হল।"

"সে তোমাকে কী বলল?তোমার বন্ধু হতে চাইল?"

তখন রাজপুত্র বৃক্ষকের সব কথা বলল রাজামশাইকে। তার পাখিকে ভালোবাসার কথা, গাছ লাগানোর কথা, পাখির ডিমের কথা, সব। রাজামশাই মন দিয়ে সব শুনলেন।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মাথা নাড়তে লাগলেন। তিনি কি রাজপুত্রকে এতদিনে এই শিক্ষা দিয়েছেন?এ কাজ রাজপুত্রের ঠিক হয়নি। রাজামশাই গম্ভীর গলায় বললেন, "সৌভাগ্যপ্রসন্ন, কাল তুমি বৃক্ষককে আমার রাজদরবারে নিয়ে এসো। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

সকলে অবাক হয়ে গেল রাজামশাইয়ের আচরণ দেখে। রানিমা হাঁফ ছাড়লেন। কিন্তু এ কী হল? রাজামশাই একটুও রাগলেন না তো! রাজপুত্রকে বকলেনও না?কাঠুরের ছেলেকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে কারাগারেও ভরার আদেশ দিলেন না। কাঠুরের ছেলেকে তিনি কিনা রাজপ্রসাদে ডেকে পাঠালেন? পণ্ডিতমশাই মাথা নাড়তে-নাড়তে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্ন চলল বৃক্ষককে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসতে। সঙ্গে আর-একটি ঘোড়ায় রাজসেনাপতি। রাজপুত্র জঙ্গলে গিয়ে কোথাও দেখতে পেল না বৃক্ষককে। তখন সেই বৃক্ষকের দেওয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল রাজপুত্র। বাঁশি বেজে উঠল সুরেলা শব্দে। আর অমনি একটা পাখির ছানাকে কোলে করে নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হল বৃক্ষক।

বৃক্ষক রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল, "সৌভাগ্য, আজ যে তুমি ঘোড়ায় চড়ে এলে? তোমার হাতি কোথা? তোমার সঙ্গে সেনাপতিও এসেছে দেখছি!"

রাজপুত্র হেসে বলল, "রাজামশাইয়ের আদেশ নিয়ে সেনাপতি এসেছেন। তোমাকে এক্ষুনি রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। আমি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও! অত ব্যস্ত হোয়ো না তো! রাজামশাই ডেকেছেন তো কী হয়েছে? দেখছ না, এই ছোট্ট পাখির ছানাটার পা মচকেছে?একটা চিল ঠুকরে দিয়েছিল সকালবেলা। আগে ওর পা'টা জল মালিশ করে ওর মায়ের কাছে বাসায় রেখে আসি। তারপর যাব না হয়! রাজামশাইকে খবর পাঠিয়ে দাও, তার আগে আমার সময় হবে না।"

ঘোড়ার পিঠে চড়ে দাঁড়িয়ে থাকল রাজপুত্র আর সেনাপতি। বৃক্ষক পাখির ছানাটাকে বাসায় মা-পাখির কাছে রেখে ফিরে এল খানিক পরে। বৃক্ষকের কাণ্ড দেখে সেনাপতি গলাটা গম্ভীর করে বললেন, "তোমার এ আচরণ ঠিক হল না হে বৃক্ষক!"

বৃক্ষক কিছুই বলল না। মিটিমিটি হাসল শুধু। তারপর রাজপুত্রের ঘোড়ায় চড়ে বসল। পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রাজসেনাপতি। ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় দিগন্ত আবছা হয়ে উঠল।

।৪।

বৃক্ষক এর আগে কখনও কোনও রাজপ্রাসাদে যায়নি। সিংহদরজা পেরিয়ে যখন ঘোড়া এসে ঢুকল রাজপ্রাসাদে, তখন রাজপ্রাসাদের সমস্ত পণ্ডিতমশাই,

রাজপুরোহিত, মন্ত্রী- দ্বাররক্ষী- সৈন্য- প্রহরী- দাসদাসী বৃক্ষককে দেখতে ভিড় করল। সকলে ভাবল, এক্ষুনি মশানে মাথা কাটার আদেশ অপেক্ষা করছে বৃক্ষকের জন্য।

ঘোড়ার পিঠ থেকে রাজপুত্র সৌভাগ্যপ্রসন্নর সঙ্গে লাফ কেটে নামল বৃক্ষক। একটা হাফ- প্যান্ট আর একটা ছেঁড়া জামা পরে আছে সে। কত পরি- আঁকা তোরণ পেরোল সে, কত পদ্মফুল আর সাপ- আঁকা বড়- বড় দরজা পেরোল, কত শ্বেত পাথরের সিঁড়ি পেরোল। তারপর রাজপুত্রের পিছনে- পিছনে বৃক্ষক এসে পৌঁছল রাজদরবারে। সামনে তাকিয়ে বৃক্ষক দেখল, সোনার রাজসিংহাসনে যিনি বসে আছেন, সোনার মতো তাঁর গায়ের রং। তাঁর মাথার মণি- মাণিক্য খচিত মুকুট। পরনে রত্ন- বসানো পোশাক। হাতে হিরের নকশা- করা রাজদণ্ড। পায়ে রুপোর কারুকাজ- করা নাগরা জুতো। এসব সে কোনও দিন চোখে দেখেনি। বৃক্ষক মনে- মনে ভাবল, ইনিই কি তবে দুর্বারগড়ের মহারাজা? রাজপুত্র একবারও তো বলে দিল না যে, "বৃক্ষক, ইনিই রাজামশাই! "

কী ভেবে বৃক্ষক নমস্কার করল রাজামশাইকে। রাজামশাই একটা আসনে বসার ইঙ্গিত করলেন বৃক্ষককে। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রানিমা এসে দাঁড়িয়েছেন রাজপুত্রের পাশে। অমন রূপবতী মহিলাকে দেখে যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটল না বৃক্ষকের। চোখের পলক পড়ল না। বৃক্ষক মনে- মনে ভাবল, ইনিই কি তবে রানিমা?কী ভেবে সে রানিমাকেও নমস্কার করল।

রাজামশাই বৃক্ষককে প্রশ্ন করলেন, "সারাদিন তুমি কী কাজ করো? তোমার দিন কাটে কীভাবে?"

অকপটে বৃক্ষক বলল তার জঙ্গলের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠার গল্প। গাছ লাগানোর কথা, পাখির বাসা বানিয়ে দেওয়ার কথা, পাখির ডিম কুড়িয়ে বাসায় রেখে আসার কথা, পা- ভাঙা পাখির বাচ্চাকে সারিয়ে তোলার কথা। সকলে অবাক হয়ে শুনছিল বৃক্ষকের কথা।

এমন সময় সব শুনে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতমশাই এগিয়ে গেলেন রাজামশাইয়ের সিংহাসনের কাছে। ধীর গলায় বললেন, "রাজামশাই, আপনি অনুমতি দিলে আমি বৃক্ষককে দু- একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

রাজামশাই মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন। ঝলমল করে উঠল মুকুটের শত- সহস্র মণি- মুক্তো।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত বৃক্ষককে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বলতে পারো, কতগুলো যজ্ঞ শেষ হলে তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যায়?"

বৃক্ষক দু'দিকে মাথা নাড়ল, সে জানে না।

ব্যঙ্গের হাসি চিকচিক করে উঠল পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে। তিনি উত্তর বলে দিলেন, "নিরানব্বইটি।" ফের তিনি বৃক্ষককে প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীতে যে নদীর নাম গঙ্গা, পাতালে যে নদীর নাম বৈতরণী, স্বর্গে সে নদীর নাম কী?"

এবারও বৃক্ষক মাথা নেড়ে বলল, সে জানে না।

এবার জোরে অট্টহাসি হাসলেন পণ্ডিত। বললেন, "অলকানন্দা। তুমি তো কিছুই জানো না! রাজপুত্র তোমার বন্ধু হবে কেমন করে?"

মহারাজা সংগ্রামপ্রসন্ন পণ্ডিতের দিকে হাত তুলে তাঁকে থামতে নির্দেশ দিলেন। সকলে ভাবল, এবার মূর্খ বৃক্ষকের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত।

এমন সময় মহারাজা বললেন, "না পণ্ডিতমশাই, এই শাস্ত্রকথা যেমন জ্ঞান, তেমনি বৃক্ষক যা জানে তাও তো অনেকে জানে না। ভুলে গেলে চলবে

না, সেগুলোও জ্ঞান হিসেবে কিন্তু কম মূল্যবান নয়! আজ থেকে রাজপুত্র প্রকৃতির এই সব মূল্যবান পাঠ শিখবে বৃক্ষকের কাছ থেকে। আজ থেকে বৃক্ষক রাজপুত্রের বন্ধু! ”

রাজা সংগ্রামপ্রসন্নর নির্দেশে রাজপুত্র ফের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বৃক্ষক কাঠুরেকে পৌঁছে দিতে চলল জঙ্গলে। তা না হলে অতখানি পথ বৃক্ষক একা যাবে কেমন করে?

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

হাতি শিকারি হালুম মামা

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

কেটলিপিসি চায়ের জল চাপিয়ে বললেন, "যার নাম হালুম, সে কী করে হাতি শিকারি হয় এ বাপু আমার মাথায় ঢুকছে না। হাতিকে তো জন্মে কোনওদিন হালুম ডাকতে শুনিনি!"

হেঁসেলের ঠিক বাইরে হালুমমামা তার বন্দুকখানা পরিষ্কার করছিলেন। কেটলিপিসির কথায় ভয়ানক রেগে গিয়ে বললেন, "তা সবকিছুই যদি এত সহজে তোমার মাথায় ঢুকত তবে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে!"

কেটলিপিসি গজগজ করতে- করতে চায়ে গুচ্ছখানেক চিনি গুলতে লাগলেন। এসব আমাদের বাড়িতে নিত্যিদিনের ঘটনা। তবে হালুমমামা আমাদের ঠিক কীরকম মামা সেটা আজও বুঝলাম না। একদিন মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, হালুমমামা তোমার কেমন ভাই?"

মা ভারী মন দিয়ে কী একটা সেলাই করছিলেন। সূচের এক ফোঁড় দিয়ে বললেন, "ওই তো ওইরকম।"

"কী রকম?"

"জ্বালাসনে বাপু। তোর ঠাকুমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর!"

তাই করলাম। ঠাকুমার বয়স হয়েছে। আমাদেরই আজকাল ঠিক ঠাহর করতে পারেন না তো হালুমমামা। সে যাই হোক আমার প্রশ্ন শুনে ঠাকুমা তিন দিন তিন রাত্তির খুব ভাবলেন। তারপর ফোকলা দাঁতে বললেন, "দেখো দাদুভাই, হালুম তো সে অনেকদিন ধরেই এ বাড়িতে আসা যাওয়া করছে। তবে সে যে ছোটোবউমার কেমন ধারা ভাই, সে আমার মনে নেই। ছোটোবউমার ভাই কিনা আদৌ তাও জানি না! মেজবউমার দাদাও হতে পারে আবার বড়ো বউমার ভাইপোও হতে পারে! বয়স হয়েছে তো, তাই কে যে কার কে হয় মনে রাখতে পারি না আজকাল। এই দেখো না, আমি যে আমার কে হই সেটাও বিলকুল ভুলে গেছি!"

আমি অবাক হলাম। "এ আবার কী কথা? তুমি আবার তোমার কে হবে?"

" কে জানে। চোখে ভাল দেখিনা, কানে ভাল শুনি না। বাড়ি ভর্তি লোক গিজগিজ করছে। কার সঙ্গে কার যে কী সমপক্ক সব গুলিয়ে যায়। তাই বলছিলুম আর কী।"

ঠাকুমার কাছে যে প্রশ্নের জবাব পাব না টের পাচ্ছি। তবে একটা কথা ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন। বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। তাদের মধ্যে কে যে আপনার লোক, কে যে পর, কে যে প্রতিবেশী আর কে যে নেহাতই সময় নষ্ট করা লোক বোঝা দায়।

সোনাজেঠু বলেন "এখন আর কী লোক দেখছিস রে নেবু, এর পঞ্চাশ বছর আগে আরও লোক ছিল এ বাড়িতে। তাদের মধ্যে কিছু লোকজনকে যেই না বলা হত 'এদ্দুর থেকে এয়েচ কদিন একটু জিরিয়ে যাও', ওমনি তারা ভালমানুষি হেসে 'সে আর বলতে' বলেই দিন দশেক

থেকে যেত। যদিও বেশিরভাগ লোককেই এসব বলতে হত না। তারা 'আমরা হলাম গিয়ে কলকাতার মুখুজ্জেদের জ্ঞাতি, আমাদের কী আর থাকার জায়গার অভাব আছে গো। নেহাত তোমরা কষ্ট পাবে বলেই মাসখানেক থাকতে রাজি হয়েছি' এইসব বলে- টলে দিব্যি একমাসের বদলে তিন মাস থেকে যেত।"

তা মেলা লোকজন যখন তাদের ফাইফরমাশও যে হাজার রকমের হবে সে আর বলতে। কেউ গলা সাধে তাই প্রতি ঘণ্টায় গরম জল চাই, কারও খোকা- খুকুর জন্য গরম দুধ চাই। তাছাড়া এসব বাদ দিয়েও চিনি ছাড়া চা, দুধ ছাড়া চা, লেবু চা সমেত হ্যানত্যান হাজার জিনিসের আবদার লেগেই থাকতো। শুধু সেটুকু সামলাতেই বাড়ির লোকেরা একদম হিমশিম খেত।

তাই বুদ্ধি করে কেউ একজন কেটলিপিসিকে নিয়ে এল। কেটলি অন্তপ্রাণ কেটলিপিসি সারাদিন চা তৈরি, জল গরম, দুধ গরম, এসব করতে শুরু করল। বাড়ির লোকও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউই কেটলি ছাড়া পিসিকে আর পিসি ছাড়া কেটলিকে দেখেনি।

অতদিন আগে তো আর গ্যাসে রান্না হত না। উনুনের প্রয়োজন হত। আর সেই উনুন জ্বালতে দরকার হত মণ- মণ ঘুঁটে। অতএব কেটলি পিসির যোগ্য সঙ্গত দিতে বিহার মুলুকের কোন এক তালুক থেকে আমদানি করা হল ঘুঁটেলালকে। হালুমমামার সঙ্গে কেটলিপিসির যতটা শত্রুতা ঘুঁটেলালের সঙ্গে ঠিক ততটাই ভাব। দুজনেই একসঙ্গে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কিনা!

ঘুঁটেলালের মতলব কিন্তু অন্য। বড়ো- বড়ো শের ভালু মেরে নাম কেনার তার ভারী লোভ। মাঝে- মধ্যেই সে হালুমমামার পিছনে ঘুরঘুর করে। এদিকে সেই কথা আবার কেটলিপিসির কানে গেলেই বিপদ। শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানোর অপরাধে ঘুঁটেলালকে তিনি আস্ত রাখবেন না। ঘুঁটেলাল তখন বুদ্ধি করে ব্রিটিশদের ওই 'ডিভাইড- রুল' গোছের ফন্দি করল। সে কেটলিপিসিকে কানে- কানে বলতো, "কুছু চিন্তা করিবেন না কেটলি বহিন, আমি ওই শিকারিকে একদম ভাগিয়ে দিব।" একইভাবে হালুম মামার গাত্রমর্দন করার সময় মামার সাধের বন্দুকের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে বলতো, "কুছু চিন্তা করিবেন না হালুমবাবু, আমি ওই কেটলিকে একদম ভাগিয়ে দিব।" ঘুঁটেলালের খুব ইচ্ছে হালুমমামা তাকে শিকারে সঙ্গী করে নিক। যদিও হালুমমামা তাকে এই বিষয়ে এখনও কোনও আশ্বাস দেয়নি।

"আচ্ছা হালুম তো কারও নাম...নিদেনপক্ষে ভাল নাম তো হতেই পারে না, তাই না?" এই প্রশ্নও অন্তত পাঁচশবার করেছি বাড়ির বড়োদের। বাড়ির বড়োরা কেমন হয়, সেতো আমার মত ছোটোরা বিলক্ষণ জানে। দিনরাত্তির আপিস কাছারি, মামলা মোকদ্দমা এইসব হাবিজাবি

নিয়ে মেতে আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর তারা দেবে কেন? বড়োকিদিদি বলল, "ওর নাম নির্ঘাত গিরিগোবর্ধন!"

"কেন কেন?"ছোটোরা উৎসুক হয়ে জানতে চাইল।

"দেখিসনা কেমন একটা ঢাউস তোরঙ্গ নিয়ে ঘোরে!"

"ইল্লি আরকী!" আমার দাদা বলল। "ওর নাম সর্বদমন। আমি নভেলে পড়েছি। শিকারিদের ওইরকমই নাম হয়।" বলা বাহুল্য কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না মোটেও। সে তখন, "তোমরা আর কী জানবে, তোমরা তো কেউ নভেল- টভেল পড় না!" এই বলে খুব দেমাক দেখিয়ে দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেল। শেষে ঘুঁটেলাল গোঁফে তা দিয়ে বলল, "হামি জানি হালুমবাবুর আসলি নাম কী আছে?"

"কী?"

"উসকা নাম জরুর ডুগডুগিরাম আছে!"

"ডুগডুগিরাম একটা নাম হল?"

ঘুঁটেলাল বলল, "হালুমবাবু যখন বাতচিত করে ওর মাথাটা ডুগডুগির মত এদিক- ওদিক হিলতে থাকে!" সকলে ওর দিকে কটমট করে চাইতেই, "বহত কামকাজ বাকি আছে" বলে সুরুত করে কেটে পড়ল।

যাই হোক, আমি যে হালুমমামার অস্তিত্ব নিয়ে অস্বস্তিতে আছি সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় কেটলিপিসি ঠারে- ঠারে বললেন, "গণ্ডাখানেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে কী কিছু হয়? গরিবের কথা বাসি হলে ফলে! জিনিসপত্র সোনাদানা নিয়ে যখন একদিন চম্পট দেবে তখন বুঝবে সে তোমার কেমন মামা ছিল!" অনেকদিন ধরেই কেটলিপিসির বিশ্বাস যে হালুমমামা ভয়ংকর কোনও এক ডাকাত দলের সর্দার। শুধু নাম পালটে আমাদের বাড়িতে রয়েছে।

সোনাজেঠি ধমক দিলেন। "তুই থাম দেখিনি কেটলি। যে মানুষের বুকের উপর আস্ত হিমালয় চাপিয়ে দিলেও ঘুম ভাঙেনা সে করবে চুরি! তাহলেই হয়েছে আর কী! হালুম গায়ে সর্ষের তেল মেখে হাতে সিঁদ কাঠি নিয়ে চুরি করতে যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখে আমি হেসেই মরে যাব!"

"অসম্ভব!" বিকট একটা চিৎকার শোনা গেল। হালুমমামা এতক্ষণ থামের আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। এবার সেই সবুজ রঙের ঢাউস তোরঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। " ওকি হালুম তোমার হাতে তোরঙ্গ কেন?" সোনাজেঠি জানতে চাইলেন।

"কেন আবার? আমি চলে যাচ্ছি তাই।"

" বলা নেই কওয়া নেই চলে যাচ্ছি বললেই হল?"

"না সোনাদিদি এ বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না। এত্ত অপমান! " "কিন্তু আজ যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি হচ্ছে?"

"তাতে আমার কী? চিংড়ি তো দূরঅস্ত আমি এবাড়ির জলগ্রহণ করবো না!"

"সেটি হচ্ছে না। বামুনের বাড়ি থেকে ভর দুপুরে তুমি না খেয়ে ট্যাঙট্যাঙ করে চলে যাবে সে আমি হতে দেব না। গেরস্তের কল্যাণ অকল্যাণ বলে কিছু নেই নাকি? শাশুড়িমা জানতে পারলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না!"

তারপর সে মেলা বাগবিতণ্ডা শুরু হল। হালুমমামা যাবেনই আর সোনাজেঠিও তাকে যেতে দেবেন না। শেষে ঠাকুমা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বললেন, "বড়োবউমা বাক্স নিয়ে হালুম আবার কই যায়?"

" বাড়ি ছেড়ে চললুম!" হালুমমামা গম্ভীর মুখ করে বললেন।

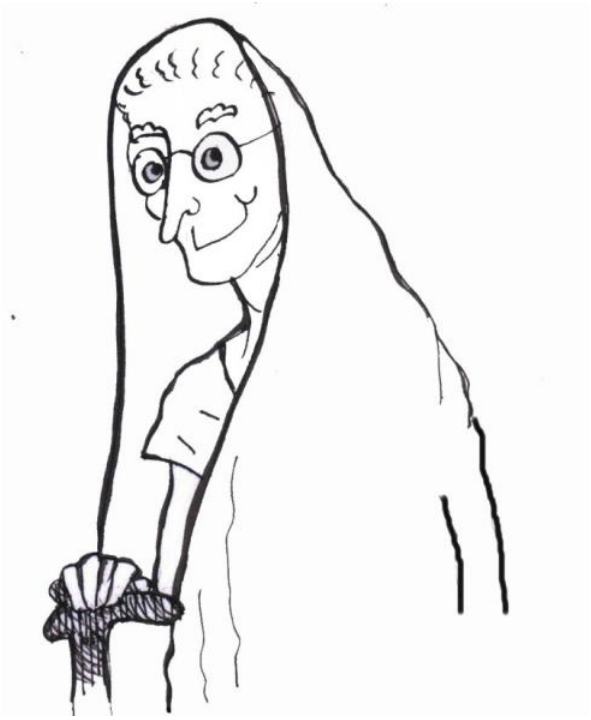

ঠাকুমা শুনতে পেলেন না। আহ্লাদী মুখ করে বললেন, "তা বেশ। তবে আজ তো চিংড়ির মালাইকারি হচ্ছে। মেজবউমা রান্না করবে। এদিকে অশৈলী কান্ড দেখ নারকেল খানাই বাজার থেকে আনতে ভুলে গেছে। সেতো চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে এঁটো হাতে বসে আছে। খোকারা কেউ বাড়িতে নেই।বাবা হালুম তুমিই ভরসা এখন। বাজার থেকে একজোড়া ভাল দেখে নারকেল নিয়ে এস দেখি। জানই তো মেজবউমার আবার পিটপিটে বাতিক। বেশিক্ষণ এঁটোকাঁটা ঘেঁটে এলেই বাড়িশুদ্ধ সক্কলকে এই অবেলায় নাইয়ে ছাড়বে!"

হালুমমামা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর বাকিরা প্রমাদ গুনল। সত্যিই তো। মেজজেঠির সব ভাল কিন্তু বড়ো শুচিবাইগ্রস্ত। মেজজেঠু একবার মুখে হাত না দিয়েই খুকখুক করে কেশেছিলেন বলে পৌষমাসের ঠান্ডায় তাকে জোর করে চান করিয়েছিলেন। ঠান্ডা লেগে তারপর তো মেজজেঠুর একেবারে যায়- যায় অবস্থা! সে অবশ্য অন্য গল্প। পরে একদিন বলব।

হালুমমামা কোনও কথা না বলে সাধের তোরঙ্গ যথাস্থানে রেখে নারকেল আনতে গেলেন। সে নারকেলের গুণেই হোক বা মেজজেঠির রান্নার গুণ, চিংড়ির মালাইকারি অনবদ্য হয়েছিল। সবাই সেটা চেটেপুটে আয়েশ করে খাচ্ছে এমন সময় হালুমমামা এসে সকলের হাতে একখানা করে ছোট্ট চিরকুট গুঁজে দিলেন। ঠাকুমাও বাদ পড়ল না। কিন্তু মুশকিল হল সকলে খেয়ে উঠে আঁচিয়ে মুখশুদ্ধি খেয়ে সেই চিরকুট খুলে কিছুই বুঝতে পারল না। কারণ মামার হাতের লেখা এককথায় জঘন্য।

বড়োজেঠু ওকালতি করেন। চশমা এঁটে বললেন, "কাল একবার সদর থেকে জজসাহেবকে দিয়ে পড়িয়ে আনব!" বাবা বললেন, "আমার মনে হয় বড়োদা, হালুম কোনও বিদেশি ভাষায় এটা লিখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা ফার্সি অথবা হিব্রু ভাষা!"

"তোমার মুন্ডু!" মেজজেঠু খাপ্পা হয়ে উঠলেন, "সারা জীবন চোর- ডাকাত ধরে আমার জীবন কেটে গেল আর এটা বুঝতে পারব না! আমি নসিবপুরের ভানু দারোগা বলছি এটা কোনও গুপ্তধনের সংকেত!"

"তোমরা কেউ কিচ্ছুটি জান না," আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই তুবড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বেশিদিন ইশকুলে যাচ্ছে না কিন্তু ভারি চৌখস ছেলে। এরমধ্যেই বানান করে সহজপাঠ পড়ে গড়গড়িয়ে।

"এতে শুধু লেখা আছে আজ সন্ধে ছয় ঘটিকায়, ঠাকুর দালানে!"

"কই ? তাই নাকী? ওমা সেকী? কী কান্ড! হ্যাঁ এই তো ছয় লেখা, বুঝতে পারিনি তো?" এইবলে সকলে সেই চিরকুটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই টুক করে পরদা তুলে মুখ বাড়িয়ে হালুমমামা বললেন, "ভুলে যেওনা কিন্তু আজ সন্ধে ছয় ঘটিকা শার্প!"

বলেই সাঁ করে চলে গেল। চিরকুটে কী লেখা আছে জানতে পেরে সকলে নিশ্চিন্তি হয়ে ভাতঘুম ঘুমোতে গেল। শুধু কেটলিপিসি মুখ ভেংচে বলল, "বলবেই যদি এত লেখাপড়ার কী দরকার ছিল!"

২

আমরা ছোটোরা ভেবেছিলাম বড়োরা কেউ আসবে না। হালুমমামা এ বাড়িতে যতই নিত্যি আসাযাওয়া করুক তার কার্যকলাপে সায় দেওয়ার লোক যে এবাড়িতে কেউ নেই সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। ও হরি! কোথায় কী? সেগুড়ে বালি ঢেলে সকলেই সন্ধে ছটার সময় ঠাকুরদালানে এসে উপস্থিত হল। এমনকি কেটলি হাতে পিসিও বেলভার মুখ করে গুটিগুটি পায়ে সকলের পিছনে ছোট্ট কাঠের চৌকিতে বসলেন। ঠাকুরদালানের যে উঁচু বেদী যেখানে প্রতি বছর মা অন্নপূর্ণা আসেন আমাদের বাড়ি ওখানেই হালুমমামা বেজায় ছোটাছুটি করছিল। হাতে একটা ছোট্ট ডায়েরি। বার- বার সেটা খুলে দেখছে আর সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলছে, "আর একটু সবুর কর এখুনি শুরু হবে!"

ঠাকুমা বললেন, "ও হালুম, তুই কী কোনও পালা- টালা বেঁধেছিস?"

হালুমমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "উফ, একটা সিরিয়াস আলোচনা করতে চলেছি এর মধ্যে আবার পালা কোত্থেকে এল?"

বাবা বললেন, "তা যা বলতে চাও বলে দাও দিকিনি চট করে। আর কত সবুর করব?"

"এই তো ছোড়দাদা এখুনি শুরু করছি।"

সোনাজেঠির গা থেকে ভুরভুর করে জর্দাপানের গন্ধ আসছিল।তিনি ফিসফিস করে মার কানে- কানে বললেন, "বলি ও ছোটোবউ হালুম বলবেটা কী?"

মা বললেন, "জানিনে বাপু। সে যে কী বলে কী করে ঈশ্বরই জানেন।"

দুই জেঠু হাঁক পাড়লেন। "আর তো দেরি করা চলবে না হালুম। আমাদের তো কাজকম্ম আছে নাকি?"

হালুমমামা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ এইবার শুরু করছি। বন্ধুগণ, আপনাদের সকলকে হালুমশিকারির তরফ থেকে ধন্যবাদ। আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমাকে দিয়েছেন। আপনারা সকলেই জানেন ময়নাগড়ের জঙ্গলে..."

এতটা বলার পর ঠাকুমা বললেন, "এদ্দিনে হালুম একটা কাজের কথা বলেছে। গয়না গড়ানো সব সময়ই মঙ্গলের। গয়না হল মেয়েদের সম্পদ। আমার তিন বউমার তো সেদিকে কোনও মনই নেই। ছোটোবউমা তো এত বিদ্যে দিগগজ সারাদিন বই মুখে বসেই আছে,

মেজবউমা সারাদিন হেঁশেল আঁকড়ে পড়ে আছে আর বড়োবউমা? তার কথা আর কী বলব? দুখানা জর্দা পান পেলেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঠ্যাঙঠ্যাঙি নাচবে!"

ব্যাস, এই কথা যেই না বলা মা সমেত দুই জেঠীমা ভেউভেউ, ফ্যাচফ্যাচ, হাউমাউ করে কেঁদে কেটে একশা হয়ে ঘোষণা করলেন তারা তিনজনেই বাপের বাড়ি চলে যাবেন!

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন, "আ মোলো যা ওরা আবার কাঁদে কেন গা? ভর সন্ধেবেলা যত অলুক্ষুণে কাণ্ড! বড়োখোকার বাবা তো শেষদিন পজ্জন্ত আমায় বলে গিয়েছেন সেজবউ তুমি এবার একটা সোনার সাতনড়ি হার তৈরি করেই নাও!"

"আহ মা, গয়নার কথা হচ্ছে না এখানে। ঘুঁটেলাল মাকে ঘরে দিয়ে আয় তো।" সোনাজেঠু বললেন।

"দোষেরটা কী করলাম। নিজের কানে পষ্ট শুনলাম হালুম বলছে গয়না গড়িয়ে রাখা মঙ্গল!"

"চলিয়ে- চলিয়ে মাঈজি," ঘুঁটেলাল ঠাকুমাকে ঘরে দিয়ে এল।

"উফ, বাপরে বাপ," হালুমমামা বললেন, "একটা সিরিয়াস কথা কেউ মন দিয়ে শুনছেই না। এর মধ্যে কোত্থেকে সাতনড়ি হার এল আমার মাথায় ঢুকছে না।"

কেটলিপিসি নিমঠোনা দিলেন, "সব যদি তোমার মাথায় ঢুকতো তুমি দেশের রাষ্ট্রপতি হতে কিনা!"

"বড়দা, আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।"

সোনাজেঠু সকলকে হাত দেখিয়ে থামালেন। "শান্ত হও সবাই। হালুম যা বলতে চাইছে ওকে বলতে দেওয়া হোক। তারপর তোমরা একে- একে নিজের বক্তব্য প্রকাশ কর।"

সোনাজেঠুর কথায় কাজ হল। সকলের সমবেত ফিসফিস, গুজগুজ বন্ধ হল। হালুমমামা আবার বলতে শুরু করলেন। "বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই জানেন এই নসীবপুরকে ঘিরে রয়েছে ময়নাগড়ের গভীর জঙ্গল। আর এই জঙ্গলেই শুরু হয়েছে এক হাতির উপদ্রব। সেই পাগল হাতির জ্বালায় লোকে জঙ্গলে যেতে পারছে না, শিশুরা জঙ্গলের পথ দিয়ে ইশকুলে যেতে পারছে না, মহিলারা শুকনো কাঠ কুড়ুতে যেতে পারছেন না। কিন্তু দিনের পর দিন তো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাই সরকার বাহাদুরের অনেক অনুরোধে এই হালুম শিকারি সেই হাতিকে জব্দ করার দায়িত্ব নিয়েছে। যে কারণে..."

"এক মিনিট। আমার এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আছে।" সোনাজেঠু নিজেই এবার হালুমমামাকে থামালেন। আগেই বলেছি জেঠু ওকালতি করেন। তাই উকিলের মত করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হালুম, আমার প্রথম প্রশ্ন হল হাতিটা যে পাগল হয়েছে তুমি জানলে কী করে?" আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সরকার বাহাদুর কী সত্যিই তোমায় এরকম কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন? নাকি তুমি নিজেই..."

"সরকার বাহাদুরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!" কেটলিপিসি ক্রূর হাসি হেসে বললেন। "দেখো গে যাও নিজেই যেচে পড়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন!"

"অপমানিত হওয়ার একটা সীমা আছে বড়দা। ওরে কে আছিস আমার তোরঙ্গখানা নিয়ে আয়। আটটা ছাপান্নর গাড়িটা মনে হয় পেয়ে যাব!"

"আহা চটো কেন হালুম? এই কেটলি তুই চুপ করে থাক।"

"কেন চুপ করব শুনি?" কেটলি পিসি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর! হাতি মারবে? হুঁ! ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে কদিন ধরে। সেই ধাড়ি ইঁদুর একখান মেরে দেখাক আগে তারপর হাতি মারতে যাবে!"

উফ, তারপর সে এক ভয়ানক দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। কেটলিপিসি ভার্সাস হালুমমামা। কেটলিপিসি কিছুতেই মানতে রাজি নন যে হালুমমামাকে হাতি শিকারের দায়িত্ব সরকার বাহাদুর দিয়েছেন। এদিকে হালুমমামার দাবি সরকার বাহাদুরের লেখা সিলমোহর দেওয়া চিঠি নাকি তার কাছে আছে। নেহাত সেটা বেজায় জরুরী চিঠি বলে তিনি কাউকে দেখাতে পারবেন না।

সোনাজেঠু আবার আসরে নামলেন।"অর্ডার, অর্ডার!আমারই ভুল। হালুমকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আগে হালুম সবটা বলবে আমরা শুনবো তারপর যা কথা বার্তা হওয়ার হবে। আর ইউ! কেটলি! স্পিকটি নট!"

সভা আবার শান্ত হল। কেটলিপিসি মুখ বেঁকিয়ে কেটলি কোলে বসলেন। হালুমমামা গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন, "প্রশ্নগুলো তুলে আপনি ভালই করেছেন বড়দা। এতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। শুনুন আপনারা, হাতিটি যে সুস্থ নয় সেটা আমাকে ময়নাগড় এবং খোদ আপনাদের নসীবপুরের মানুষজনই বলেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কেউ একথা জানেন না কেন? তার একটাই কারণ। আপনারা কেউ শিকারি নন। আমার চোখ কান সব সময় খোলা। আমি সাপের মত দ্রুত যাই, আমি বাঘের মত সতর্ক, আমার দৃষ্টি বাজের মত, আমার গতি হরিণের মত, আমার মস্তিষ্ক..."

"হনুমানের মত!" কেটলিপিসি ফুট কাটল, আমি পষ্ট শুনলাম। কিন্তু ঠিক তখনই পাশের বাড়ির এক খোকা ভ্যা করে কেঁদে উঠল বলে হালুমমামা কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না। তিনি ভয়ানক আবেগতাড়িত হয়ে বলেই চললেন, "এক হাতির কাছে মানবতা আজ বিপন্ন, এই অসহায় পরিস্থিতিতে..."

"কী বলতে চাও পস্টাপস্টি বল দেকিনি বাপু...হেঁসেল এক হাঁটু হয়ে আছে...কাজ কম্ম কিছু নেই নাকি? তখন থেকে উষ্টুম ধুস্টুম বকেই চলেছে!" মেজজেঠি খেঁকিয়ে উঠলেন। বাড়িতে এতগুলো লোকের মাঝে এই মেজজেঠিকেই হালুমমামা একটু সমঝে চলেন। তিনি আমতা-আমতা করে বললেন, "বলব বৈকি মেজদিদি।একটু গৌড়চন্দ্রিকা...যাকগে! মোদ্দা কথা হল- "

বলে একবার আড়চোখে কেটলিপিসির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেউ বিশ্বাস করুক ছাই করুক না করুক তাবড় শিকারিরা হার মেনে নেওয়ার পর সরকার বাহাদুর আমার সঙ্গে অনেক গোপন পরামর্শ করে এই গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পণ করেছেন।"

এতক্ষণে সকলে হালুম মামার এত লম্ফঝম্পের কারণ বুঝতে পারল। বাবা বললেন, "সে তো খুবই গর্বের বিষয় হালুম। তুমি যে সফল হবে সেই কামনাই করি। কিন্তু তার জন্য এভাবে সকলকে ঠাকুরদালানে ডেকে..."

হালুমমামা ভারি মোলায়েম করে হাসলেন। "সকলকে ডাকার কারণ আছে বৈকি ছোড়দাদা। সরকার বাহাদুর আমার সঙ্গে আরও তিনজনকে জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেহেতু আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাই আপনাদের মধ্যে থেকেই সেই তিনজনকে আমি বেছে নেব! আশা করি এই ব্যাপারে আপনারা আমাকে নিরাশ করবেন না।"

সোনাজেঠি বললেন, "এ আবার কী কথা? আমরা শিকারের কী বুঝি?"

"সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব, সেটা কোনও সমস্যা নয়।"

লক্ষ করলাম হালুম মামার সঙ্গে শিকারে যেতে হবে শুনে বড়োরা বেশ নেতিয়ে গেল। তবে আমরা ছোটোরা বেজায় উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হল ঘুঁটেলাল। সে প্রায় হালুমমামার পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে কাকুতিমিনতি করতে লাগল। "হালুমবাবু আপনি হামাকে লিয়ে চলেন।আমি ওই পাগলা হাতিকে একদম ভাগিয়ে দিবে!"

"তিষ্ঠ!" হালুমমামা অভয়মুদ্রা দেখালেন। "লিয়ে চলেন বললেই তো আর নিয়ে যাওয়া যায়না ঘুঁটে! আমি জানি অনেকেই যেতে চান তাই..."

মা বললেন, "না বাপু আমরা বউরা কেউ যেতে চাই না...কিগো তোমরা কেউ যাবে নাকি?"

বাবা বললেন, "আমি শিক্ষক মানুষ, ছাত্র পড়াই। এসব শিকার, গুলি, বন্দুক, না- না এসব আমার দ্বারা হবে না। শুনেছি বড়দা ছোটোবেলায় খুব ডানপিটে ছিল!"

"আহা সে তো ছোটোবেলায়। এখন কি আর সেই বয়স আছে। প্রেসার, সুগার...বাত! ওরে বাবা আমি ওসবে নেই! তবে আমাদের ভানু তো দারোগা! ও যদি সাহস করে..."

মেজজেঠু এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিলেন। নিজের নাম শুনেই স্যালুট করার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সব শুনেটুনে বললেন, "সে যাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু হাতি নেহাতই নিরীহ প্রাণী! দাঁত আছে কিন্তু সেটা দিয়ে কামড়ায় না, নখ নেই, বড়ো- বড়ো চোখ নেই...হ্যাঁ বাঘ- টাঘ শিকার করলে একবার ভেবে দেখতাম বটে!"

হালুমমামা ঘুঁটেলালের সঙ্গে কিসব কথা বলছিলেন। তাই কেউ যে যেতে চায়না সেটা তার কানে গেল না। উল্টে তিনি হাসিমুখে বললেন, "আমি জানতাম। আপনাদের এত উৎসাহ দেখে হালুম শিকারী আপ্লুত। আরে আপনারা হলেন গিয়ে বীরের বংশ! তবে কী, তিনজনই তো মাত্র যেতে পারবে তাই আমি ঠিক করেছি একটা লটারি করব। যার নাম উঠবে সেই যাবে।"

এই উপায়ে মোটামুটি সকলেই নিমরাজি হল। যদিও ঘুঁটেলাল খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। তাকে পাত্তা না দিয়েই লটারি শুরু হয়ে গেল। প্রথম যার নাম উঠল সে হল আমি স্বয়ং। আমি তো যারপরনাই খুশি। কিন্তু মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। বাবা তখন কানে- কানে ফিসফিস করে বললেন, "কেঁদো না। নাম উঠেছে বলেই কি যেতে হবে নাকি?"

দ্বিতীয় নাম উঠল ঘুঁটেলালের। সে তো পেল্লায় একটা লাফ দিয়ে, "জয় বজরংবলি! বলিয়েছিলাম না হালুমবাবু হামার নাম আসবেই!" বলে রামা হো রামা হো গাইতে গাইতে চলে গেল।

আর একটাই নাম বাকি, সকলেই ভয়ানক দুশ্চিন্তা করছে...তৃতীয় নামটা দেখে হালুমমামা নিজেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে নামটা দেখে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করল আর কেটলি পিসির হাত থেকে কেটলিটা ঠক করে পড়ে গেল!

৩

হালুমমামা, আমি, ঘুঁটেলাল এবং....কেটলিপিসি এরা যাবে হাতি শিকারে। ঠাকুরদালানে বজ্রপাত হলেও বুঝি এতটা কেউ মুখ গোমড়া করতো না।

"এত চিন্তার কী আছে? মামা তো যাচ্ছে সঙ্গে," আমি বললাম।

"হাঁ, শিকারিবাবু একদম হামাদেরকে টিরেনিং দিয়ে দিবে।"

"রাখো তো তোমার টিরেনিং!" সোনাজেঠু বললেন, "নেবু একটা বাচ্চা ছেলে। ও কী শিকার করবে? আর তুই যে এত লাফাচ্ছিস জীবনে তো একটা মশাও মারিসনি...তার ওপর কেটলি! উফ দারুণ দল তৈরি হয়েছে বটে। একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর!"

অবশ্য কে যে রাম আর কে যে সুগ্রীব সেটা ঠিক বোঝা গেল না। মোট কথা আমাদের শিকারে যাওয়ায় কারও মত নেই। কেটলিপিসি এতক্ষণ চুপটি করে বসে ছিলেন। এবার কেটলিখানা কোলে করে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললেন, "আমি যাব! কিন্তু আমার কতগুলো শর্ত আছে।"

"বটে? কী শর্ত শুনি? সরকারি কাজে যাচ্ছ এই না ঢের তার ওপর আবার শর্ত?" হালুমমামা বললেন।

"প্রথমত শিকারে গেলেও আমি এই কেটলিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না বললে চলবে না। আর দ্বিতীয়ত শিকার সম্পন্ন হলে ওই সরকার বাহাদুরের চিঠিখানা আমায় একটি বার দেখাতে হবে!"

"ইইহ! খুব মজা, না! প্রথমত কেটলি নিয়ে কেউ শিকারে যায় না। আর দ্বিতীয়ত ও চিঠি আমি দেখাতে পারব না। আগেও বলেছি।"

"সে তোমার ব্যাপার। ভেবে দেখো। রাজি থাকলে জানিও।" কেটলিপিসি চলে গেলেন।

জানা গেল হালুমমামা নাকি আগে থেকেই পাঁজি দেখে রেখেছেন। আসছে হপ্তায় মঙ্গলবার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু তাতে কী? কেউ তো ছাই রাজিই হচ্ছে না। নিরুপায় দেখে হালুমমামা ঠাকুমার শরণাপন্ন হলেন। ঠাকুমাকে যখন অনেক কষ্টে সমস্ত ঘটনা বোঝাতে হালুমমামা সক্ষম হলেন দেখা গেল ঠাকুমা মামারই পক্ষে! তার কারণ অবশ্য অন্য। ঠাকুমা বললেন, "বড়োখোকা, বড়োবউমা এবং বাকিরা মন দিয়ে শোনো। শিকারের আমি কিছু বুঝিনা। কিন্তু মা অন্নপূর্ণার যেখেনে পুজো হয় সেখেনে যখন একবার এই কথা উঠেছে তখন দাদুভাই, ঘুঁটে এবং কেটলি হালুমের সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবে।"

মেজজেঠু বললেন, "কিন্তু মা ওখানে তো তখন প্রতিমা ছিল না!"

"তাতে কী রে হতভাগা?" ঠাকুমা রেগে গেলেন। "চারশ বছরের পুরোনো পুজো। তোদের পূর্বপুরুষরা এখনো এই ঠাকুরদালানের আশেপাশে ঘোরেন সেটা জানিস? লেখাপড়া শিখে খুব বিদ্যান হয়েছ না তোমরা? প্রতিমা নেই তো কী হয়েছে? আমি এখনো বেঁচে আছি বুঝেছ তোমরা। আমি বলছি ওরা যাবে, আলবাত যাবে!"

ব্যাস! আর কী? আমি আর ঘুঁটেলাল ধেইধেই করে নাচতে লাগলাম। ঠাকুমার কথা মানে সুপ্রীম কোর্টেরও উপরে...তাই সকলের মুখে কুলুপ পড়ে গেল। স্থির হল আমরা চারজন আগামী মঙ্গলবার সকালে ময়নাগড়ের জঙ্গলে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি। কেটলিপিসির শর্তগুলো হালুমমামা তখনকার মত মেনে নিয়েছিল!

ঠাকুমা সম্মতি দিয়ে দেওয়ার পর থেকেই হালুম মামা আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে দিলেন। আমি যদিও ভেবেছিলাম শিকারের প্রশিক্ষণ সাংঘাতিক রকমের কিছু একটা হবে, কিন্তু দেখা গেল সে'রকম কিছু নয়। হালুমমামা এমন সব গপ্পো ফাঁদলেন যেগুলো শুনে মনে হল হাতি, বাঘ, সিংহ কোনও কিছু শিকার করাটাই কোনও ব্যাপার নয়। শেষের দিকে আমার ভীষণ ঘুম পেতো আর বড়ো- বড়ো হাই উঠত। কেটলিপিসিরও খুব একটা উৎসাহ দেখলাম না। একমাত্র ঘুঁটেলাল মন দিয়ে হালুমমামার সমস্ত কথা শুনত আর মাঝে মাঝেই বলত, "উফ শিকারিবাবু একদম জবরদস্ত টিরেনিং দিচ্ছে আমাদের!"

আমি যেটা বুঝলাম এই টিরেনিংয়ের মূল কথা হচ্ছে, হাতিকে ধরা বা তার দিকে গুলি চালানো ইত্যাদি সব রোমাঞ্চকর কাজ হালুমমামা নিজেই করবেন আর আমরা শুধু চোখ- কান খোলা রেখে তাঁকে অনুসরণ করবো।

প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হল। আমরা সকলের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। মায়ের কান্না ছলছল চোখ, ভাইবোনদের অভিনন্দন আর বাবা জেঠাদের চিন্তিত মুখ আস্তে আস্তে আবছা হয়ে এল। একটু- একটু মন খারাপ লাগছিল। ভেবেছিলাম ময়নাগড়ের গভীর জঙ্গলে যখন যাব...

****

গভীর জঙ্গল? কোথায় কী? আমি আর কেটলিপিসি মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলাম। ঘুঁটেলালও একটু দমে গেল। ময়নাগড়ের জঙ্গলে গভীরের 'গ' ও নেই। কতগুলো ঝুপসি কাঁটাঝোপ, লম্বা- লম্বা কয়েকটা জারুল গাছ আর ইতিউতি কয়েকটা শাল আর পলাশ গাছ। কেটলিপিসি আমার কানে- কানে বলল, "কীরকমের ধাপ্পাবাজ মালুম হল এবার? খুব তো নেত্য করছিলে!"

ঘুঁটেলাল বলল, "শিকারিবাবু ই কাইসা জঙ্গল আছে? এখানে হাঁতি কাইসে থাকবে?"

হালুমমামা চোখ গোলগোল করে বললেন, "আহ, শিকারে এসে এত কথা কেউ বলে না। জঙ্গল দিয়ে কি আমি জল ধুয়ে খাব? তোমরা যে যার পোজিশন নিয়ে নাও। ঘুঁটে তুই একদম আমার পিছনে থাক।"

"পিছে থাকবো তো হাঁতি কাইসে মারবো?"

"ধুত্তোর! বলছি না কথা বলতে নেই শিকারে...এতদিন ধরে কী প্রশিক্ষণ..." হালুমমামার কথা শেষ হল না। জঙ্গলের উত্তর দিক থেকে সত্যি একটা হাতির ডাক শোনা গেল। হালুমমামা বিজ্ঞের মত হেসে ঘুঁটেলালকে বললেন, "শুনলি তো? এবার বোঝা গেল এখানে হাঁতি কাইসে থাকবে?"

ঘুঁটেলালের এত বীরত্ব উধাও। সে ফ্যাকাশে মুখে বলল, "আপ সহি বোলা হালুমবাবু। আমি পিছেই থাকি!"

আমি আর কেটলিপিসি গাছের পিছনে পজিশন নিলাম। সামনে বন্দুক বাগিয়ে হালুমমামা আর পিছনে ঘুঁটেলাল। হাতির ডাকটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মিথ্যে বলব না, এবার একটু ভয়- ভয় করছিল। শুনেছি পাগলা হাতি নাকি পা দিয়ে পিষে...মায়ের কান্না- কান্না মুখটা মনে পড়ল। চোখ বুজে ফেললাম।

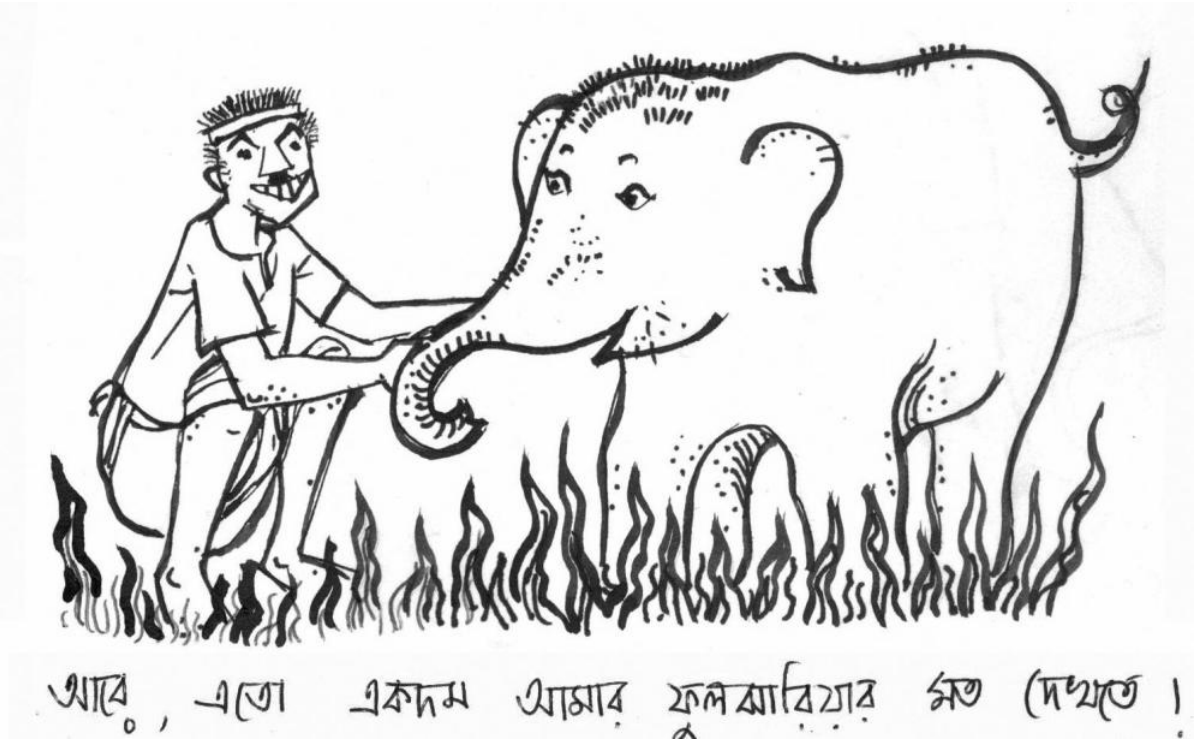

হঠাৎ শুনলাম ঘুঁটেলাল হোহো করে হাসছে। চোখ খুলে দেখি ওদের সামনেই একটা হাতি! একটা বাচ্চা হাতি! বেড়ালপানা মুখ করে খুদে- খুদে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। "আরে এতো একদম ছোটা হাতি আছে। একদম আমার ফুলঝারিয়ার মত দেখতে!" ফুলঝারিয়া ঘুঁটেলালের সাত বছরের মেয়ের নাম। হালুমমামা থতমত খেয়ে বন্দুক নামিয়ে ফেললেন। তারপর হাতিটাকে কাক তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললেন, "এই যাহ! হ্যাট হ্যাট...হুস!"

হাতিটা তাতে মোটেও দমে গেলনা। গুটগুট করে এগিয়ে এসে হালুমমামার বিশাল ভুঁড়িতে মাথা ঘষতে লাগল।

"কী জ্বালা!" হালুমমামা বললেন। আমি আর কেটলিপিসি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি। কেটলিপিসির মুখে মিটিমিটি হাসি।

"এই তাহলে তোমার সেই ভয়ংকর পাগলা হাতি হালুমদাদা?"

"ইয়ে মানে...এর কথা তো...সরকার বাহাদুর যে বললেন..." হালুমমামা ভয়ানক অপ্রস্তুত!

"রাখো তো তোমার সরকার বাহাদুর। আহারে বাছার মনে হয় খিদে পেয়েছে।"

কেটলিপিসির কেটলিতে দুধ ছিল। সেটা সেই হাতির মুখে ধরতেই সে ব্যাটা চুকচুক করে সবটা খেয়ে নিল। কেটলিপিসি তাচ্ছিল্য করে হালুমমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইবার বোঝা গেল কেটলি নিয়েও শিকারে আসা যায়!"

"কিন্তু এই হাতিটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়?" আমি জানতে চাইলাম।

"হামার মনে হচ্ছে নেবুবাবু ই হাঁতি জরুর মা সে আলাদা হয়ে ইস জঙ্গলমে গুম হয়ে গ্যাছে!"

"ঠিক বলেছিস রে ঘুঁটে। একে আমরা এখন বাড়ি নিয়ে যাই। পরে দাদাবাবুরা ঠিক করবেন কী করা হবে।"

"নিয়ে যাবে মানে? এর দেখাশোনা কে করবে শুনি?" হালুমমামা জানতে চাইলেন।

"আমি করবো। আমি ওর নাম দিলাম মিউমিউ!"

"হাতির নাম মিউমিউ?" মামা বিস্মিত।

"হাতি শিকারির নাম যদি হালুম হয় তাহলে হাতির নাম মিউমিউ হলে ক্ষতি কী?"

মিউমিউ দিব্যি হ্যাংলার মত শুঁড় দিয়ে পিসির শাড়ি জড়িয়ে আমাদের বাড়ি চলে এল। তারপর তাকে নিয়ে বাড়ির লোকের সেকি আদিখ্যেতা! আমাদের পুরোনো গ্যারেজে তার স্থান হল। মিউমিউ দিব্যি সেখানে মানিয়ে নিল। হালুমমামা বোকা- বোকা হেসে বললেন, "আসলে আমার নাম শুনেই হাতির দল ভেগেছে...এ ব্যাটা কোনওভাবে দলছুট হয়েছে আর কী!" তবে সে কথাকে কেউ বিশেষ আমল দিল না।

বাবা আর জেঠুরা কিন্তু বললেন মিউমিউকে নিতে নাকি বনদপ্তর থেকে লোক আসবে। সেই খবর শুনেই আমরা সকলেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। ঠাকুমা বললেন, "আমার নাতি আমার বাড়িতেই থাকবে!"

সকলে যত বলে "ঠাকুমা, নাতি নয় হাতি" তত তিনি বলেন, "মোটেও না। এটা নাতি, আপাদমস্তক আস্ত একটা নাতি।"

আমি ভারি মনখারাপ করে বসে রইলুম। আজ বিকেলে মিউমিউ চলে যাবে। কখন দেখি বেজার মুখে হালুমমামাও আমার পাশে এসে বসেছেন।

"কিরে মন খারাপ লাগছে?"

"হ্যাঁতো।" গলার কাছে কান্না দলা পাকিয়ে এসেছে। "মিউমিউ এখানে থাকলে কী হয়? ওকে তো আমরা কত্ত ভালবাসি?"

"নেবু, তুই বলছিলি না শিকারে যাওয়ার সময় তোর মার জন্য মন কেমন করছিল? ভাব তো ও ওর মাকে ছেড়ে কতদিন রয়েছে! বনদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে এলাম রে। যে দল থেকে

মিউমিউ হারিয়ে গিয়েছিল তার খোঁজ মিলেছে ময়নাগড় থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। মিউমিউকে হারিয়ে ওর মার নাকি পাগল- পাগল দশা। ও ফিরেই যাক কী বলিস নেবু?"

এই কথার পর কী আর মিউমিউকে আটকে রাখা যায়? সকলকে কাঁদিয়ে হাসি- হাসি মুখে বনদপ্তরের গাড়িতে মিউমিউ চলে গেল। কেটলিপিসি যাওয়ার আগে ওর গলা জড়িয়ে খুব

আদর করলেন। আর মিউমিউ আরও একবার হালুমমামার ভুঁড়িতে মাথা ঘষে দিল। মিউমিউ চলে যাওয়ার পর হালুমমামা বললেন, "ব্যাটার এলেম আছে দেখছি। আমার মত শিকারিকেও মায়ার বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গেল!"

কেটলিপিসি চোখের জলটল মুছে গটগট করে এগিয়ে এসে বললেন, "ছেঁদো কথা রাখ তো। চিঠি দেখাও!"

"চিঠি?" মামা আকাশ থেকে পড়লেন। "কার চিঠি?"

"কেন সরকার বাহাদুরের? শর্ত ছিল তো?"

"ও চিঠি নেই।"

"নেই মানে?"

"তোরঙ্গ গুছোতে গিয়ে দেখি হারিয়ে গ্যাছে!"

"বটে? আমি বিশ্বাস করিনা।"

"না করলে ভারি বয়েই গেল।" হালুম মামা চলে গেলেন।

কিন্তু পিসি হাল ছাড়বার পাত্রী নন। একদিন দুপুরে মামা যখন বাড়িতে নেই তিনি সেই বিখ্যাত সবুজ তোরঙ্গ থেকে একটা ছেঁড়া, ময়লা, ভুসকুট্টি চিঠি বের করে আনলেন। তারপর আমাকে চুপিচুপি ডেকে বললেন, "এই দেখো সেই চিঠি, এইবার টপ করে পড়ে ফেলি!"

"কিন্তু বাবা যে বলেন অন্যের চিঠি না বলে পড়তে নেই?"

"অন্যের চিঠি কোথায়? আমার তো শর্ত ছিল। এতে কোনও অন্যায় নেই!"

ভেবে দেখলাম ঠিকই তো। পিসি তো আগেই শর্ত দিয়েছিল। তাছাড়া নিজেরও যে ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছিল সেটা আর বললাম না! আমি আর পিসি চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে এক নিশ্বাসে সেটা পড়লাম।

দেখলাম তাতে লেখা আছে, *"শ্রীযুক্ত হালুমবাবু, দীর্ঘদিন আপনার কোনও সংবাদ পাইতেছি না। আপনার কাছ থেকে আমি তিনশতটাকা আটাশ পয়সা পাইতাম সেটা যে আপনি বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন সেটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আপনাকে জানাইয়া রাখি এই তিনশতটাকা এখন সুদে আসলে ফুলিয়া ফাঁপিয়া বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে টাকা ফেরত না পাইলে মামলা করিতে বাধ্য হইবো! ইতি আপনার দাসানুদাস শ্রী বাহাদুর সরকার!"*

চিঠি চুরির কথাটা হালুমমামা জানেন না। তবে মিউমিউ চলে যাওয়ার পর মামা আর কোনওদিন শিকারে যাননি।

ছবিঃ মৌসুমী

বুঝতে ভীষণ ভুল

অনন্যা দাশ

পল আর পরিকে দেখাশোনা করতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার কিন্তু তখন ভারি টাকার দরকার। যে কোর্সগুলো করতে চাই সেগুলোর ফি খুব বেশি। বাবা বেশ কয়েকদিন হল রিটায়ার করেছেন, দিদির বিয়ে আসন্ন তাই বাড়িতে টাকার কথা বলতেই লজ্জা লাগে! এমন সময় একদিন সুলেখা ফোন করে বলল, "এই বেবি- সিটিং করে পয়সা রোজগার করবি?"

সুলেখা আমার বেশ প্রিয় বন্ধু তাই সে আমার অবস্থাটা জানে। আমি শুধু পয়সা রোজগার কথাটুকু শুনলাম আর বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ!"

"আগেই বলে দিচ্ছি কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়, বরং ভীষণ শক্ত! পরে গন্ডগোল হলে আমাকে দোষ দিবি না একদম!"

"না, না, পাগল! তোকে দোষ দেব কেন? গন্ডগোল যদি হয় তো আমার নিজের জন্যেই হবে। যাই হোক কী কাজ করতে হবে?"

"দিশাদি আর পবিত্রদাকে জরুরি কাজে ব্যাঙ্গালোর যেতে হচ্ছে। ওদের সাত বছরের যমজ বিচ্ছু দুটো ছেলেমেয়ে আছে তাদের দেখাশোনা করার জন্যে লোক খুঁজছে ওরা। ভাল টাকা দেবে তাই তোর কথা মনে হল।"

"ও সে আর এমন কী শক্ত কাজ!"

"হুঁ, ওই আনন্দেই থাক! দিশাদি পবিত্রদা দুজনেই ডাক্তার। তাই বেবিসিটারের অভাব হয়নি ওদের কিন্তু কেউ দুয়েকদিনের বেশি টেঁকে না! আমাকে বলেছিল ওরা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আমি ওর মধ্যে নেই। তারপর তোর কথা মনে পড়ল। ওরা কিছুদিন হল নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছে, পাড়াপড়শি কাউকে তেমন চেনে না।"

আমি একটু কৌতূহল দেখালাম, "কী হয়েছিল অন্য বেবিসিটারদের সঙ্গে? বাচ্চারা একটু দুষ্টুমি তো করেই!"

"ও বাবা, এরা একটু দুষ্টুমির ক্লাস পাস করে এখন অ্যাডভান্সড দুষ্টুমিতে পি এইচ ডি করছে! লাস্ট যে ছিল সে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মাথায় গায়ে কেঁচো, মাকড়সা ইত্যাদি সুন্দর জিনিস ঘোরাফেরা করছে! চিৎকার করে ভয়ে হার্টফেল হয়ে যাওয়ার যোগাড় তার! তার আগেরজনের খাবার চুমকি পুঁতি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল ওরা! তিনি খেয়ে ফেলে হুলুস্থুল কান্ড! স্কুল থেকে ওদের নামে রোজ নালিশ আসে! দিশাদি আর পবিত্রদা একেবারে হয়রান, নাজেহাল! কিন্তু তোর তো টাকার দরকার তাই কয়েকটা দিন যদি সহ্য করতে পারিস তাহলে ভাল উপায় হবে। রাজি থাকলে আজ বিকেলে ওদের বাড়ি যাস। আমি ওদের ফোন করে বলে রাখব।"বলে ওদের ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে সুলেখা ফোন ছেড়ে দিল।

সেদিন বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম পল আর পরির বাড়িতে। তখন প্রায় রাত আটটা বাজে। দিশাদি বললেন উনি সবে ওদের নিজের বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে ফিরেছেন। দুজনেই তখন ঘুমিয়ে কাদা। কী মিষ্টি দেখতে, একেবারে যেন দেবশিশু!

দিশাদি আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, "ওদের চেহারা দেখে ভুলো না! একেবারে হাড় বিচ্ছু দুজনেই! আমাদের পরশুই একটা কনফারেন্সে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে তাই কাউকে খুঁজছি। অচেনা কাউকে বাড়িতে ঢোকাতে ভয় লাগে কিন্তু তুমি তো সুলেখার বন্ধু! আমার মা- বাবার কাছে রেখে যেতে পারতাম কিন্তু বাবা আবার কাল শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন আর মার একার পক্ষে এদের দুজনকে সামলানো অসম্ভব!"

টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে কথা বলার কোন প্রয়োজন হল না কারণ ওনারা একটা বিশাল অংকের কথা জানিয়ে দিলেন। আমি তো এক কথায় রাজি।

"আমি ওদের রুটিনটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। যদিও ওরা যা দুষ্টু, স্কুলে যাওয়া ছাড়া কিছুই রুটিন ধরে করে না। তবে একটা কথা, খাওয়া দাওয়ার কোন ঝামেলা নেই। যা দিই তাই খেয়ে নেয়। আসলে শয়তানিতে এত মন যে ওই সব নিয়ে ভাববার সময় নেই! কবে যে মানুষ হবে আর স্কুল থেকে ওই কমপ্লেনগুলো আসা বন্ধ হবে!"

দিশাদি তাঁর কথামত আমাকে ওদের রুটিনটা টেক্সট করে দিয়েছিলেন। ওনাদের রাতের ফ্লাইট বলে আমি বাড়ি থেকে খেয়ে দেয়ে একটা সুটকেস নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় হল পল আর পরির, কিন্তু তখন তারা ফর্মে নেই, ঘুমে তাদের চোখ ঢুলুঢুলু! তাও আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল তারা, মনে মনে যেন ভাবছে, "ও এর সঙ্গে আমাদের তিনটে দিন থাকতে হবে! কী বিপদ!"

দিশাদিরা এয়ারপোর্টে রওনা দেওয়ার আগেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল! ওরা বেরিয়ে পড়তেই আমিও দরজা জানালা সব বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাল থেকে ভাগ্যে কী আছে কে জানে ভেবে।

আমার ঘুম এমনিতেই পাতলা আর ভোরের দিকে আরো পাতলা হয়ে যায় তাই পরদিন ভোরে খুট করে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল আরে কোথায় আমি? তারপর মনে পড়তেই তড়াক করে উঠে পড়লাম। কীসের শব্দ হল? দিশাদি বলেছেন কাজের লোক তো সাড়ে আটটা নটার আগে আসে না আর এখন বাজে সাড়ে ছটা! চট করে বিছানা ছেড়ে একটা শাল গায়ে দিয়ে খুদেদের ঘরে গেলাম! ওমা

বিছানায় কেউ নেই! সর্বনাশ! আমি দৌড়ে সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখি হ্যাঁ কাছেই একটা চেয়ার রাখা আর দরজা খোলা! ও তার মানে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দেই আমার ঘুমটা ভেঙেছে। আমার চাকরি গেল, পুলিশ কেস হবে, এই সব হাজারটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। জুতো পায়ে গলিয়ে আমিও দরজা দিয়ে বেরলাম। হঠাৎ দেখি ওরা দুজন একটা কুকুরছানাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাগান পেরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির গেটের দিকে যাচ্ছে। আমি সেদিকে যেতে গিয়ে দেখলাম একটা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে এক বয়স্ক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, "তুমি বুঝি পল আর পরির দেখাশোনা করতে এসেছ?"

"হ্যাঁ!"

"খুব ভাল ছেলে মেয়ে ওরা, আমার পায়ে চোট লেগেছে তাই আমি ভুলোকে হাঁটাতে নিয়ে যেতে পারি না বলে ওরা রোজ ভোরবেলায় এসে ওকে নিয়ে যায়!"

"ও তাই নাকি! আচ্ছা আমি একটু আসছি হ্যাঁ, ওরা কোথায় গেল দেখতে হবে। আপনার সঙ্গে আমি পরে কথা বলব!" বলে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেটের দিকে ছুটলাম। আমার ভয় হচ্ছিল এত ভোরে দারোয়ান যদি না থাকে আর খুদেগুলো গেটের বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে! আশ্চর্য ওরা নাকি রোজ এটা করে অথচ দিশাদি আর পবিত্রদা জানেনই না! ওনারা মনে হয় ক্লান্ত থাকেন তাই ঘুম ভাঙে না!

গেটের কাছে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না! এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ছেলেটার পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম কিন্তু সে একটু অন্য রকম সেটা তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। পল আর পরি কুকুরটাকে নিয়ে ওর কাছে গেছে আর তিনজনে মহা আহ্লাদে কুকুরটাকে চটকাচ্ছে! কুকুরটা মানে ভুলোও অবশ্য সেই আদরে খুব মজা পাচ্ছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে!

আমাকে দেখে ছেলেটির মা এগিয়ে এসে বললেন, "টুবলু ছোটদের স্পেশাল স্কুলে যায়। ওদের গাড়ি আবার এই কাকভোরেই আসে। আগে টুবলু কিছুতেই যেতে চাইত না কিন্তু এখন পল আর পরি ভুলোকে নিয়ে রোজ আসে বলে ওর কী উৎসাহ স্কুলে যাওয়ার জন্যে! ওদের বকবেন না প্লিজ!" বলতে বলতে মহিলার চোখে জল এসে গেল।

তিনজনে মিলে খুব হুটোপুটি খেলা চলল। তারপর টুবলুর গাড়ি এসে যেতে সে স্কুলে চলে গেল। পরি আর পল খুব ঘটা করে বাই বাই করল, "কাল আবার আসব" বলল। তারপরই পিছন ফিরে আমাকে দেখল। এতক্ষণ ওরা খেলায় এত ব্যস্ত ছিল যে আমাকে দেখেইনি!

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, "চলো এবার তো ভুলোকে ফেরত দিয়ে তৈরি হতে হবে! তোমাদের পুল কার এসে পড়বে আর কিছুক্ষণ পরেই!"

পুঁচকে দুটো আর কিছু না বলে আমার সঙ্গে চলল। ভুলোকে তার মনিবের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটে ফেরা হল। দুজনে যে আমার সঙ্গে খুব একটা কথা বলছে তা না, তবে নিজেদের মধ্যে বকবক লেগেই আছে! ওরা স্কুলের জন্যে তৈরি হয়ে যেতে আমি বললাম, "দেখো, আজ যদি তোমরা স্কুলে একদম দুষ্টুমি না করো তাহলে কিন্তু ফিরে এলে আমরা সবাই ভুলোকে নিয়ে পার্কে যাব আর আমি তোমাদের খুব সুন্দর একটা গল্প বলব কেমন? করবে না তো দুষ্টুমি?"

পল একটু ভেবে বলল, "সায়ন রোজ পরির টিফিন খেয়ে নেয় যে!"

"ও, তারপর?"পল এক গাল হেসে বলল, "তারপর আমি ওর ব্যাগটা নিয়ে উলটে দিলাম! সব বই খাতা পেন্সিল বক্স মাটিতে গড়াগড়ি! টিচার রেগে কাঁই!"

পরি সেটা শুনে হি হি হি করে হাসল।

আমি বললাম, “ঠিক আছে চলো, আজ আমি তোমাদের স্কুলে যাচ্ছি। টিচারকে বলব যে সায়ন পরির লাঞ্চ খেয়ে নেয়!”

স্কুলে গিয়ে টিচারের সঙ্গে কথা বলে আমি তো হাঁ! ওরা যে এমনি এমনি দুষ্টুমি করে তা না, কে কার টিফিন খেয়ে নেয় বা কে দুর্বল কাউকে মারে তাদের জন্যে বদলা নেয়!

টিচার হেসে বললেন, “ক্লাসের সুপার হিরো সাজতে গিয়েই ওদের ওই দশা! আমাদের তো কমপ্লেন শুনতে হয় অন্য মা- বাবাদের কাছে তাই আমরাও ওদের মা- বাবাকে জানাতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমি জানি ওরা মনের দিক থেকে খুব ভাল! ওদের মা- বাবা তো দেখা করতে আসার সময়ই পান না, এলেই আমি সব বলতাম ওনাদের। শুধু ওরা যদি কাজটা নিজেরা না করে আমাকে এসে বলে তাহলেই ঝামেলা মিটে যায়!”

আমি মনে মনে ভাবছিলাম ও হরি এরা তো সত্যই দেবশিশু, এদের শয়তানের আসনে কে বসাল? ওদের খাবারে চুমকি পুঁতি দেওয়ার ব্যাপারটাও আমার কাছে স্পষ্ট, ওরা খাবারটাকে সুন্দর দেখতে করতে চাইছিল! সেটা যাকে দিয়েছিল তার বোঝা উচিত ছিল! আমার খাবারেও দিয়েছিল। আমি সেগুলোকে সরিয়ে দিব্যি খাবারটা খেয়ে নিলাম দেখে ওদের কী আনন্দ!

স্কুল থেকে ফিরে পার্কে যাওয়ার পথে আমি জিগ্যেস করলাম, “আগে যে দিদি ছিল তার মাথায় কেঁচো ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?”

পরি রেগে গিয়ে বলল, “বা রে ও তো লুলু মুলুকে ফেলে দিল! লুলু মুলু হারিয়ে গেল!”

অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেল যে লুলু মুলু আসলে দুটো শুঁয়োপোকা। পল ওদের বাড়িতে এনে রেখে পাতা খাওয়াচ্ছিল প্রজাপতি করবে বলে। যিনি ছিলেন তিনি পোকামাকড় মোটেই পছন্দ করতেন না তাই

শুঁয়োপোকা দেখে দুর করে ফেলে দিয়েছেন তাতেই ওদের অত রাগ! ওরা কিন্তু নালিশ করে না! যা করার নিজেরাই করে!

আমি ওদের বললাম, "লুলু মুলু হয়তো এতদিনে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেছে কিন্তু ওদের ভাইবোন পুলু টুলুকে পাওয়া যাবে! আমি জানি ওরা কোন গাছে থাকে! আজ ফেরার পথে ওদের বাড়ি নিয়ে যাব কেমন?"

তিনটে দিন কী ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না! রোজ সকালে উঠে ভুলোকে নিয়ে গেটের কাছে যাওয়া। টুবলু স্কুলে চলে গেলে ফিরে এসে ওদের স্কুলে পাঠানো তারপর স্কুল থেকে ফিরে পার্কে গিয়ে গল্প শোনা। দিশাদি আর পবিত্রদা ফোনে সব শুনে তো থ!

তিনদিন পর ওদের মা বাবা ফিরতে আমি সুটকেস নিয়ে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হতে ওরা কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না! বেশি কথা বলছে না কেবল আমার হাত ধরে টানাটানি! শেষে পরি শুধু বলল, "তুমি পলের পুলুটুলুর প্রজাপতি হওয়া দেখবে না? আর আমার ছোলা গাছগুলো বেরোল কিনা?" ওদের কথার আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি সেদিন, তাই আমাকে থেকে যেতে হয়েছে!

ছবিঃ অর্ণব

বেনোর কীর্তি

কিশোর ঘোষাল

টুকাই স্কুল থেকে ফিরে জামা জুতো ছেড়েই পিঠের ব্যাগটা ধপাস করে রাখল বসার ঘরের সোফায়। তারপর এক ছুট্টে চলে গেল তার ঘরের দিকে। যেতে যেতে বলল, "মঞ্জুমাসি, খেতে দাও ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

ঘরে গিয়ে আগেই পিসিটা অন করে, স্কুলের জামা প্যান্ট ছেড়ে, চটপট পরে নিল ঘরে পরার টি শার্ট আর বারমুডা। বাথরুমে ঢুকে দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ করে গেয়ে উঠল, "দেখেছি রাত্রি জেগে, এক টুকরো মেঘে, লেগেছে চাঁদের জোসনা, পথে টানা রিকশা, ছেলে চায় ভিকষা, তা দেখে উতল হোস না।" সরস্বতীপুজোয় মাইকে গানটা শুনে টুকাইয়ের খুব ভাল লেগেছিল। বাথরুমে ঢুকলে এই গানটাই সে এখন গায়। তোয়ালেতে মুখ হাত মুছে টুকাই বেরিয়ে এল। দেখল মঞ্জুমাসি একটা প্লেটে দুটো লুচি আর একটু আলু চচ্চড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ রোজ

লুচি পরোটা তার একদম ভালো লাগে না। একটু নাকি সুরে, টেনে টেনে বলল, "ওঁ মোঁওঞ্জুমাঁআসীঈ, রোঁওজ রোঁওজ লুউউচি ভাঁআলোও লাঁআগে না। আঁআআর কিছু নেই?" মঞ্জুমাসি বলল,

"কী করব বলো, তোমার মা পই পই করে বলে গেছেন, স্কুল থেকে ফিরলে তোমাকে লুচি তরকারি দিতে।"

খুব ব্যাজার মুখে টুকাই, চেয়ারে বসে প্লেটটা হাতে নিল। পিসিতে গেমস চালু করতে করতে, লুচি ছিঁড়ে তরকারি সমেত এক টুকরো মুখে নিল। ঠিক তখনই ঘরে এসে চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসল বেনো। বেনোর হাতে একটা বাটিতে বেশ অনেকটা মুড়ি আর এক ডাব্বা আলু চচ্চড়ি।

বেনো মঞ্জুমাসির নাতি। মেয়ের ছেলে। বছরখানেক আগে ওর মা মারা গেছে, আর মাসদুয়েক হল বেনোকে তাড়িয়ে দিয়ে বেনোর বাবা আবার বিয়ে করেছে। সেই থেকে বেনো টুকাইদের বাড়িতেই থাকে। কোথায় আর যায় বেচারা? টুকাইএর মা মঞ্জুমাসিকে জিগ্যেস করেছিল, "বেনোর নাম বেনো কেন"?

টুকাই বলেছিল,"ব্যাটসম্যান রিচি বেনোর নাম শোন নি? সেখান থেকেই বেনো, এ আবার না বোঝার কী আছে?"

কিন্তু মঞ্জুমাসি একগাল হেসে বলেছিল, "ঐ যে গো, দিদিমণি, বছর আষ্টেক আগে খুব বানবন্যে হল নি, সেই বারই ও জন্মেছিল বলে, ওর বাপ নাম রেখেছিল বেনো।"

বেনোর সঙ্গে টুকাইয়ের চোখাচোখি হতেই, টুকাই বেনোর হাত থেকে মুড়ির বাটিটা ছোঁ মেরে তুলে নিল, আর লুচির প্লেটটা দিয়ে দিল বেনোর হাতে। বেনো হতভম্ব হয়ে বসে রইল লুচির প্লেট হাতে। ওদিকে আলুচচ্চড়ি মাখা মুড়ি একমুঠো গালে পুরে টুকাই চোখ বন্ধ করে চিবুতে লাগল আরামে।

মঞ্জুমাসি টুকাইয়ের জন্যে আরো লুচি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "হেই মা, ও কী করলে গো, দা'বাবু। তোমার মা জানতি পারলে আমাকে আর বেনোকে দুজনকেই তাড়িয়ে দেবে যে গো। তুমি মুড়ি খাচ্চো কী গো দা"বাবু? ও আবার কেউ খায় নাকি?"

"বেনো খাচ্ছিল তো। ও বুঝি মানুষ নয়, মঞ্জুমাসি?"

"শোন কতা ছেলের। ও হচ্ছে মা- মরা বাপে- তাড়ানো অভাগা। ওর সঙ্গে তোমার তুলনা, বাবু? তুমি হীরের টুকরো, সোনা ছেলে। লক্কি বাবা আমার, তোমার জন্যে আরো লুচি ভেজে আনচি। ও মুড়ি তুমি খেও নি।"

"ঠিক আছে, তুমি দুটো লুচি দাও, কিন্তু এই মুড়ি আমি খাবো। আর প্লেটের দুটো বেনো খেয়ে নিক।"

"না, না, দা'বাবু, তোমার মা জানতি পারলে রক্ষে থাকবে নি।"

"মঞ্জুমাসি, আমি তো লুচি খাচ্ছিই, আর না খেয়েও থাকছি না। সব কথা মা জানতে না পারলেই তো হল।"

"না, বাবু, তোমার মা আপিস থেকে ফিরে যখন জিগ্যেস করবে, আমার কিন্তু বুক কাঁপবে।"

টুকাই মুড়ির বাটি খালি করে, শেষ মুঠি মুড়ি মুখে ঢেলে বলল, "মঞ্জুমাসি খাবার দাও, আমার খিদে পেয়েছে।"

তার এই কথায় মঞ্জুমাসি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে মঞ্জুমাসি বলল, "আনছি বাবু, আনছি। আচ্ছা পাগল ছেলে। মুড়িতে কি স্বাদ পাও কে জানে।"

গতকাল একটা নতুন গেম শুরু করেছিল টুকাই। সেটার লেভেল থ্রি অব্দি খেলে সেভ করে রেখেছিল, আজ লেভেল ফোর থেকে শুরু করবে। টুকাই গেম খেলার সময়, বেনো চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসে গেম খেলা দেখে। এই খেলায় টুকাই হচ্ছে কিলারম্যান। কঠিন চোয়াল দারুণ শক্তপোক্ত চেহারা। তার বিরুদ্ধে আছে বিকট দেখতে সব প্রাণী। কেউ গুলি ছোঁড়ে, বোমা মারে। কেউ আগুনের গোলা ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেউ হুল ফুটিয়ে দেয়। সে সব গায়ে লাগলেই কিলারম্যানের স্বাস্থ্যহানি হয়। এমনিতে তার তিনটে জীবন, প্রত্যেক জীবন মানে একশ ভাগ। স্বাস্থ্য হানি থেকে বাঁচার উপায় নানান ওষুধ, নানান খাবার। তাছাড়া প্রত্যেকটা প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারলে নানান পয়েন্ট জমা হয়। পঞ্চাশ হাজার পয়েন্ট জমলেই, একটা জীবন বোনাস মেলে, তখন পিড়িং করে একটা শব্দ হয়।

এই গেম খেলতে খেলতে ডুবে যায় দুজনেই। টুকাই তো নিজেই কিলারম্যান, তার কথা আলাদা, কিন্তু বেনো মেঝেয় বসা থেকে হাঁটু গেড়ে উঠে পড়ে, উত্তেজিত স্বরে বলে, "টুকাইদাদা, ওই যে বাঁদিক থেকে শুঁড় নিয়ে আসছে। টুকাইদাদা, ওই যে ওপর থেকে আগুনের গোলা ফেলার তাল করছে রাক্ষসটা। মেরে দাও। মেরে দাও।" টুকাইও ঘাড় ঘুরিয়ে গুলি চালায় তার বন্দুক থেকে, ঢিচিকাঁউ, ঢিচিকাঁউ। অদ্ভুত জীবগুলি মরে গেলেই পর্দায় ফুটে ওঠে পাঁচশ, তিনশ, দুশ পয়েন্ট। সে পয়েন্ট জমা হয় টুকাইয়ের ভাণ্ডারে।

স্কুল থেকে ফেরার সময় টুকাইয়ের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় পশ্চিমের রোদ এসে পড়ে। সে রোদ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। পশ্চিমের আকাশ টুকাইয়ের গুলির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে একসময় ফ্যাকাশে অন্ধকার নেমে আসে। বারান্দায় দাঁড়ালে যে বিশাল বকুল গাছটা দেখা যায়। তার ঝাঁকড়া মাথায় ফিরে আসে যত রাজ্যের পাখির দল। তাদের কিচিরমিচির ঘোষণা করে দিনশেষের বার্তা। দিনের উষ্ণ হাওয়া, তাপ হারিয়ে শীতল হতে থাকে। বিকেলের হাওয়া টুকাইয়ের বারান্দার পর্দায় বার বার ঠেলা দেয়। টুকাই সাড়া দেয় না। তাদের এই আবাসনের সবুজ মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় ফড়িং। ঘাসের আড়ালে কেঁচোরা মাটির ভেতর থেকে গুটলি তুলে ভরিয়ে দেয় মাঠ। মাঠ ডাকে, সবুজ ঘাস ডাকে, ফড়িংয়ের ঝাঁক ডাকে, বিকেলের দমকা হাওয়া ডাকে, "টুকাই খেলতে আসবে না?" ঘরে ঘরে টুকাইরা ডুবে থাকে কম্পিউটারের সামনে। তাদের কানে সেই ডাক পৌঁছোয় না।

লেভেল ফোর থেকে লেভেল সিক্স পর্যন্ত যখন পৌঁছোল, টুকাইয়ের অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়। টুকাই মানে কিলারম্যান। তিনটের মধ্যে দুটো জীবন খতম হয়ে গেছে। বাকি যেটা চলছে তার তিরিশভাগ শেষ হয়ে সত্তরভাগ নিয়ে ধুঁকছে কিলারম্যান। লেভেল যতো বাড়ছে, অদ্ভুত জীবদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, বাড়ছে তাদের গতি, বাড়ছে তাদের নানান ফিচলেমি। চারদিক থেকে তাদের আক্রমণে দিশাহারা হয়ে উঠছে কিলারম্যান। আঘাতে আঘাতে জেরবার হয়ে কমে আসছে জীবনীশক্তি। ওপর থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়েছে রাক্ষসটা, সঙ্গে উৎকট হাসি। আগুন ধরে গেছে কিলারম্যানের জামায়। জল চাই জল, কিলারম্যান চিৎকার করছে, হন্যে হয়ে দৌড়চ্ছে কোথায় জল, কোথায় জল...

"চিৎকার করছে কে রে, বেনো"?

"রাক্ষসটা নয়তো, টুকাই দাদা?"

"ধ্যাৎ, কম্পিউটারে নয়, বাইরে কোথাও। গলাটা চেনা, চেনা, মঞ্জুমাসীর মতো।"

গেমসের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল দুজনের।

"মঞ্জুমাসীই তো, কি হয়েছে?"

দুজনে এবার খেলা ছেড়ে দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, ওদিক থেকেই আসছে আওয়াজটা। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, মঞ্জুমাসীর শাড়ির আঁচলে আগুন ধরে গেছে। রুটি সেঁকছিল, পাশে তাওয়ার ওপর ভাজা রুটি রয়েছে অনেকগুলো।

ঘরের ভেতর এভাবে আগুন জ্বলতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল টুকাই। গেমসের এমন অবস্থায় কি করতে হয় টুকাই জানে। বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে হয়, রাক্ষসটাকে, আর জলের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হয় আগুন নেভানোর জন্যে। একদিকে তার হাতে বন্দুক নেই, অন্যদিকে রাক্ষসটা কে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মঞ্জুমাসীর আঁচলে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে, সেটা বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। আতংকে মঞ্জুমাসি চিৎকার করছে, ঘুরে ঘুরে যতো আঁচল টেনে সামলাতে যাচ্ছে, হাতে মুখে ছেঁকা লাগছে বার বার। অসহায় টুকাইও চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ বেনো দৌড়ে গেল বাথরুমে। কল খুলে এক মগ জল ভরল আর একটা বালতি ভরতে দিয়ে এল। ভরা মগ জল নিয়ে সে ছুঁড়ে দিল মঞ্জুমাসীর শাড়িতে। আগুন নিভল না ঠিকই, কিন্তু স্তিমিত হয়ে এল অনেকটা। এবার ভরে ওঠা আধবালতি জল রান্না ঘরে নিয়ে এল, মগে করে মঞ্জুমাসীর পুরো শাড়িটাই ভিজিয়ে দিল। নিভে গেল আগুন। বেনোকে কোলে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল মঞ্জুমাসী।

তাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকেরা এসে দরজায় বেল দিচ্ছিল, ধাক্কা দিচ্ছিল। টুকাই গিয়ে দরজা খুলে দিতে সকলে হুড়মুড় করে ঢুকে জিগ্যেস করল, "কী হয়েছে রে, টুকাই, কী হয়েছে?"

"মঞ্জুমাসীর গায়ে আগুন লেগেছিল।"

"সে কী রে, কি করে? কোথায়?"

"এখন নিভে গেছে। বেনো আগুন নিভিয়ে দিয়েছে।"

রান্নাঘর থেকে ভেজা শাড়িতে মঞ্জুমাসী বেরিয়ে এল। এত লোকের সামনে খুব লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, "রুটি সেঁকছিলাম, কি করে যে আঁচলটা ধরে গেল। খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। বেনো এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিল।"

"যাক বড়ো কিছু হয় নি, ঠাকুরের আশীর্বাদে। যাও মা, যাও, ভেজা কাপড় চোপড় পালটে এসো।" বললেন পাশের ফ্ল্যাটের ঠাকুমা।

আধ ঘন্টার মধ্যে এলেন টুকাইয়ের মা, তার কিছুক্ষণ পরে এলেন বাবা। মা বাবা আসার পরেও অনেকক্ষণ অনেক কথাবার্তা হল। সকলেই বেনোর উপস্থিত বুদ্ধির খুব আলোচনা করল, প্রশংসা করল। তারপর অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা চলে গেল একে একে। এতক্ষণ বেনো বসার ঘরের মেঝেয় সোফার আড়ালে এক কোণায় বসেছিল। তার মুখে চোখে এখনো আতংক। তাকে নিয়েই নানান লোকের নানান কথা শুনে সে আরো গুটিয়ে যাচ্ছিল।

গত একবছরে বেনোর জীবনটাই বদলে গেছে। গ্রামের সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে যাওয়া। মাঠে মাঠে খেলে বেড়ানো, দৌড়ে বেড়ানো, পাড়ার যে কোন হুজুগে ছুট্টে গিয়ে হাজির হওয়া সব

বন্ধ। ছিল খোলা আকাশ, সূর্যের আলোয় মাখা স্বাভাবিক জীবন। আর এই সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার মায়ের স্নেহের শাসন। সময় মতো খাওয়ার ডাক। ঠিকঠাক জামা প্যান্টের হদিশ। মা ছিল প্রখর দুপুরের ছায়া হয়ে, বর্ষার আশ্রয় হয়ে, শীতের উষ্ণতা হয়ে। তার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে সব। মা- মরা ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকদিন বেড়েছে বাবার অবহেলা, আর সামান্য দোষ ত্রুটিতে প্রচণ্ড মার। স্নেহ ভালোবাসার বালাই এতটুকু ছিল না, বাবার বিরক্তি আর ঘৃণা তাকে কুঁকড়ে দিয়েছে রোজ, বাবাকে ভয় পেতে পেতে সে প্রায় বোবা হয়ে উঠেছে দিন- কে- দিন।

মাসদুয়েক আগে দিদিমা যখন তাকে এই কলকাতা শহরে ফ্ল্যাটের বদ্ধ জীবনের মধ্যে এনে ফেলল, সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটাই হারিয়ে ফেলল। এই পরিবারের আদবকায়দা, এই ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র, তার প্রায় সমবয়সি টুকাইদাদা, তার স্কুল, তার কম্পিউটার, বই খাতা, টুকাইদাদার অফিসে যাওয়া মা, বাবা। মনে হয় যেন বহুদূরের, ভিন্ন গ্রহের এক জগৎ। যে জগৎটার মধ্যে তার প্রবেশ নিষেধ। তার প্রতি দিদিমার ভালোবাসা কিংবা মায়ার কোন কমতি নেই ঠিকই। কিন্তু এই পরিবারের মধ্যে তার দিদিমার জায়গাটাও যে বেশ নড়বড়ে, সেটা না বোঝার মতো বোকাও নয় বেনো। এ বাড়িতে টুকাইদাদাই যা একটু অন্যরকম, অতটা ভয় লাগে না, কিন্তু আর সকলকে তার খুব ভয়। সেই কারণে সকলের থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে সে এখন ঘরের অন্ধকার কোণেই স্বস্তি পায়। এতক্ষণ তাকে নিয়ে সকলের আলোচনায় তার কী করা উচিৎ বুঝতে না পেরে, সে আরো আড়ালে সরে থাকার কথা ভাবছিল।

বাইরের সবাই চলে যাবার পর টুকাইয়ের মা ও বাবা সোফায় বসে চা খাচ্ছিলেন, টুকাইয়ের মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, "বেনো কোথায়, মঞ্জু? ওকে দেখছি না?"

"ঐ তো, সোফার পেছনে বসে আছে," মঞ্জুমাসী বলল। মা ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলেন, "ওখানে কেন? অ্যাই বেনো, বেরিয়ে আয় সামনে।"

বেনো মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে সামনে

এসে উল্টোদিকের সোফার পিঠ ধরে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে মা জিগ্যেস করলেন, "সময়মতো জল ঢালার ব্যাপারটা তোর মাথায় কীভাবে এলো রে, বেনো"?

বেনো ঠাণ্ডা মার্বেলের মেঝেয় পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষছিল। মাথা নিচু করে রইল, কোন উত্তর দিল না। "তোর বয়েসে এমন মাথা ঠাণ্ডা কাজ, ভাবা যায় না, কী করে করলি? ভয় পাচ্ছিস কেন, বেনো, বল না"

"বল না, বেনো। কথার উত্তর দে," মঞ্জুমাসী পাশে দাঁড়িয়ে বেনোর কাঁধে হাত রেখে বলল। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে, আবার মাথা নিচু করে বেনো খুব আস্তে আস্তে বলল,"গাঁয়ে থাকতে মণ্ডলকাকার ঘরে আগুন লেগেছিল, সেখানে দেখেছিলাম। মণ্ডল কাকিমার কাপড়েও আগুন লেগে গিয়েছিল। সবাই বালতি করে জল ঢালতে, আগুন নিভে গিয়েছিল।"

"ভেরি গুড। একদম বাস্তব থেকে শেখা!" টুকাইয়ের বাবা বললেন। টুকাইয়ের মা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বেনোর দিকে, তারপর বললেন, "স্কুলে যাবি? লেখাপড়া করতে ইচ্ছে হয়"? মায়ের কথায় বেনো মুখ তুলে টুকাইয়ের মায়ের মুখের দিকে তাকালো। ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তার দুই চোখে চিকমিক করে উঠল আনন্দ।

"বেশ। কোন ক্লাসে পড়তিস তুই?"

"ফাইভে পড়ছিলাম।"

"ঠিক আছে, কালকে কথা বলে দেখি। এ বছরে হয়তো হবে না, পরের বছর ক্লাস শুরুর সময় তোকে ভর্তি করে দেবো। ততদিন টুকাইদাদার পুরোন বইগুলো নিয়ে বাড়িতেই লেখাপড়া চালু করে দে। ঠিক আছে?" টুকাইয়ের মা উঠে এসে বেনোর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ভাগ্যে বেনো ছিল মঞ্জুদির কাছে, তা না হলে কী কাণ্ডটা যে হতো আজকে!"

বেনোর মুখে এখন লাজুক হাসি। বহুদিন পর বেনো হাসল। হাসতে পেরে তার ভীষণ ভালো লাগল। এই পরিবারের সকলকে, বিশেষ করে টুকাইদাদাকে আর টুকাইদাদার মাকেও সে খুব ভালোবেসে ফেলল।

ছবিঃ শ্রীময়

অদিতি ভট্টাচার্য্য

অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক দরাদরির পর অবশেষে বরুণ একটা পছন্দমত দোকান ঘর পেল। খুব একটা ছোটোও নয়, একটা স্টেশনারি দোকান খোলার পক্ষে মন্দ নয়। সবে তো শুরু করেছে, কেমন বিক্রিবাটা হয় দেখে পরে ভাবা যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে পজিশন খুব ভালো, একেবারে চৌমাথার ওপরে। নীচের তলায় দুটো দোকানঘর। একটা বরুণ ভাড়া নিয়েছে, অন্যটা বন্ধই পড়ে আছে। ওপরে দোতলায় বাড়ির মালিক থাকতেন, তিনি মারা গেছেন বছরপাঁচেক হল। এক মেয়ের দূরে বিয়ে হয়েছে। এখানে আসেও না। কাজেই দোতলাটাও বন্ধই থাকে। ওদের এক আত্মীয় থাকে কাছাকাছি, তার সূত্রেই দোকান ঘরটার হদিশ পেয়েছিল বরুণ। মাসে মাসে ভাড়াও সেই এসে নিয়ে যাবে।

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে বরুণ অনেক কষ্ট করে। তারপরেই একটা দোকানে কাজ শুরু করে। কিন্তু তাতে পোষাত না। খাটনিই সার, পয়সাকড়ি তেমন দিত না। তাই সেটা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা ছোটোখাটো দোকান খোলার কথা ভাবছিল। তাই এই দোকান ঘরটার খোঁজ যখন পেল আর দেখল ভাড়াটাও আয়ত্তের মধ্যে তখন আর দেরি করে নি। ভাড়াটা বরং ওর কমই লেগেছিল, ওরা নাকি চেনাশোনা ভালো লোক ছাড়া দেবে না।

পয়লা বৈশাখের কিছুদিন আগের ঘটনা এটা। তাড়াতাড়ি মালপত্র জোগাড় করে দিব্যি দোকান সাজিয়ে পয়লা বৈশাখের দিন পুজো করিয়ে দোকান খুলে ফেলল বরুণ। দোকানের নাম দিয়ে সাইন বোর্ডও টাঙাল। 'টুকিটাকি'। চা, বিস্কুট, পাঁউরুটি, লজেন্স, টফি, ডাল, মশলা টশলা,

সাবান, শ্যাম্পু, ট্যালকম পাউডার, ক্রিম – অনেক কিছুই পাওয়া যায়। ইচ্ছে আছে দোকান ভালো চললে একটা ফ্রিজ কিনে নেবে, তাহলে দুধ, দইটইগুলো রাখতে পারবে।

দোকান চালু হল, বিক্রিও মন্দ হচ্ছে না। বরুণ খুশিই। সেদিন দুপুরবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তাও আকাশের মুখ ভার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। ঝড়ে গাছ পড়ে লাইটের তার ছিঁড়ে গেছে, ফলে পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে। জেনারেটারও দেয় নি, তার ছিঁড়ে গেছে তারও। বরুণ মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। মোমবাতির টিমটিমে আলোয় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে বরুণের।

ভাবল আজ আর কেউ আসবে না, দোকান বন্ধ করে চলে গেলেই হয়, এমন সময় লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বেশ বয়স্ক এক ভদ্রলোক এলেন। দেখে মনে হয় শরীর খুব খারাপ। শো কেসের সামনে এসে চকোলেটের শিশির দিকে দেখালেন।

"চকোলেট? কোনটা দেব?"

ভদ্রলোক আবার ইশারায় দেখালেন।

"ডেয়ারি মিল্ক? একটা? এই নিন।"

ভদ্রলোক নিলেন। নিয়ে এক মনে সেটাকে উলটেপালটে দেখতে লাগলেন, তারপর যেন চলে যাওয়ার উপক্রম করলেন।

"টাকাটা?" বরুণ বলল।

ভদ্রলোক সে কথার উত্তর না দিয়ে আঙুল দিয়ে সামনে কাকে যেন দেখিয়ে লাঠি ঠকঠক করে চলে গেলেন। আলো নেই, আকাশে মেঘ, চারদিক এক্কেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যে যে ভদ্রলোক কোনদিকে গেলেন কিছুই বোঝা গেল না। বরুণ তো হতভম্ব! যেদিকে ভদ্রলোক ইশারা করেছিলেন বরুণ দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সেদিকে দেখল। দূরে একটা টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে যেন মনে হল। তার মানে কেউ আসছে। হ্যাঁ ওই তো, এ তো ভবেশকাকু মনে হচ্ছে। কাছেই থাকেন, প্রায়ই বরুণের দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে আসেন।

"কী কাকু, এই অন্ধকারে? আমি তো দোকান বন্ধ করে চলেই যাব ভাবছিলাম," বলল বরুণ।

"আর বলিস না। বাড়িতে বিস্কুট ফুরিয়ে গেছে। তাই আসতেই হল। দে তো ওই নোনতা বিস্কুটটার দুটো প্যাকেট, চটপট দে।"

বরুণ ভাবছে কী করে চকোলেটের কথাটা বলবে। ওই ভদ্রলোকের চকোলেটের দাম ইনি কেন দেবেন? কিন্তু কিছু বলতে হল না। ভবেশ টাকা দিতে দিতে বললেন, "নে টাকাটা ধর। একটা ডেয়ারি মিল্কের দামও ধরিস তো। এ পাড়ায় ছেলেদের একটা দল আছে। একেবারে বিচ্ছু সবক'টা! আমার ছোটো ছেলেটাও তার মধ্যে আছে। এর ঘাড় দিয়ে ওর ঘাড় দিয়ে খালি চকোলেট আর চিপস খাওয়া। পরে আমাকেই দাম দিতে হয়। কাঁহাতক আর লোকের কাছ থেকে নেওয়া যায়!"

"এক টাকা ফেরত হবে, খুচরো নেই একদম আমার কাছে।"

“পরে নেব। এখন যাই, জোরে বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে,” ভবেশ বিস্কুটের প্যাকেটদুটো নিয়ে পা চালিয়ে চলে গেলেন বরুণকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

বরুণ ভাবল, ও তার মানে ওই বয়স্ক ভদ্রলোক ভবেশকাকুর ছেলের জন্যেই নিয়েছিলেন চকোলেটটা। নিশ্চয়ই প্রায়ই চায়, তাই ভবেশকাকুই দাম দিয়ে দিলেন। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার, নাহলে আটকে পড়তে হবে। আর কেউ আসবে না এই দুর্যোগে।

মাসের প্রথম। দোকানে বেশ ভিড়। সবার হাতেই মোটামুটি লম্বা ফর্দ। বরুণ একা হাতে সব সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। একজনের জিনিস ব্যাগে পুরতে পুরতে খেয়াল করল ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার এসেছেন, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বরুণের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেদিনের মতো ইশারায় চকোলেট চাইলেন। বরুণ একটা বার করে দিল। একটু পরেই দেখল ভদ্রলোকও নেই, চকোলেটটাও নেই! কী সর্বনাশ! ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কোথায় পালাল? টাকা কে দেবে? এদিকে অনেক খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে, তারা তাড়া দিচ্ছে। বরুণ চকোলেটের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে তাদের দিকে মন দিল। দোষ তো তারই, কেন খেয়াল রাখে নি।

বিক্রি আজ ভালোই হয়েছে। এরকম চললে ব্যাবসাটা দাঁড়িয়ে যাবে। দোকান বন্ধ করার আগে বরুণ হিসেব নিয়ে বসল। কী আশ্চর্য! হিসেব তো সব ঠিকই আছে! কী করে হল? ওই বয়স্ক ভদ্রলোক তো টাকা দেন নি! তাহলে কী ওই বউদি দুটো চকোলেটের দাম দিয়ে গেলেন? ওই যে একটা ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এক বউদি এসেছিলেন, মেয়েটা খালি দুটো চকোলেট, দুটো চকোলেট করছিল আর বৌদি একটা নেবার জন্যে বলছিলেন, তাহলে ওইখানেই গোলমাল হয়েছে। কাল বউদি আবার আসবেন মেয়ের শ্যাম্পু নিতে তখন বলতে হবে। আর এবার ওই বুড়ো এলে খেয়ালও রাখতে হবে, বরুণ ভাবল।

পরের দিন বিকেলে ওই ভদ্রমহিলা এলে বরুণ বলল। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, “একটা চকোলেট নিয়েছি আর একটারই দাম দিয়েছি। কাল আসলে খুব ভিড় ছিল তো, তাই তোমার মনে নেই।”

বরুণ তো অবাক। কী গণ্ডগোল হচ্ছে! একা সবদিকে ঠিকঠাক খেয়াল রাখতে পারছে না, নাকি? তবে বুড়ো আবার এলে কড়া নজর রাখতে হবে। বরুণ তক্কে তক্কে আছে। কিন্তু বুড়োর পাত্তা নেই।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। বরুণের দোকান রমরমিয়ে চলছে। বরুণ দাম বেশি নেয় না তাই সবাই আসে। ইতিমধ্যে একটা ফ্রিজও কিনে ফেলেছে বরুণ, আগের থেকে জিনিসও অনেক বেশি রাখে। পাশের দোকান ঘরটাও ভাড়া নেওয়া যায় কী না খোঁজ নেবে ভাবছে। একটা ঘরে খুব অসুবিধে হচ্ছে, জিনিসপত্র ধরছে না। দোকান না বাড়ালেই নয়।

সেদিন বিকেলে দোকান একদম ফাঁকা। বরুণ বসে বসে কী কী জিনিস ফুরিয়েছে দোকানে তার একটা লিস্ট তৈরি করছিল, সাপ্লায়ারকে বলতে হবে। এমন সময় লাঠি ঠকঠক আওয়াজ। আবার ওই বুড়ো ভদ্রলোক হাজির। আবার ওইরকম ইশারায় চকোলেট চাওয়া। বরুণ দিল বার করে চকোলেট একটা কিন্তু এবার আর ভদ্রলোকের ওপর থেকে নজর সরাল না। আজ অবশ্য ভদ্রলোকের যাওয়ার কোনো তাড়াই নেই যেন। চকোলেটটা নিয়ে দোকানের সামনে যে

কাঠের বেঞ্চটা পাতা আছে বসলেন। তারপর ধীরেসুস্থে সেটা মোড়ক থেকে বার করে খেতে লাগলেন। ওনার খাওয়ার ধরণ দেখে বরুণের মজা লাগল, ঠিক যেন বাচ্চাদের মতো।

"দাদু বুঝি খুব চকোলেট খেতে ভালোবাস?" না জিজ্ঞেস করে পারল না বরুণ।

ভদ্রলোক হাসলেন। কী ছিল সেই হাসিতে কে জানে! শিশুর সারল্য তো ছিলই, আরও অনেক কিছু ছিল, বরুণের মন ভালো হয়ে গেল। কেমন যেন মায়াও হল। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ রুগ্ন, চেহারায় অবহেলা, অযত্নের ছাপও স্পষ্ট। মুখটাও দুঃখী দুঃখী। একা থাকেন মনে হয়, দেখাশোনার কেউ নেই।

"দাদু তুমি একা থাকো না? কোথায় থাকো? কাছেই?" বরুণ আবার জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লেন।

"তোমার মুদিখানার জিনিসপত্রের দরকার হলে বোলো, আমি তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে যেও তো," বলল বরুণ।

ঠিক এই সময়েই জনাদুই খদ্দের এলেন। একজন শশব্যস্তে একটা ফর্দ বরুণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো দাও তো, আমার তাড়া আছে।"

বরুণ ফর্দটাতে চোখ বুলিয়ে জিনিসগুলো আনার জন্যে গেছে এমন সময় আরেকজন চেঁচিয়ে বললেন, "এই বরুণ টাকাটা তোলো নি কেন? আরেকটু হলেই নোটটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল!"

টাকা! বরুণ অবাক হয়ে দেখল সামনের শোকেসের ওপর একটা দশ টাকার নোট পড়ে রয়েছে। ও উঁকি মারল। না বুড়ো ভদ্রলোক আর নেই, কখন চলে গেছেন! বরুণের খুব খারাপ লাগল। আগেও নিশ্চয়ই ভদ্রলোক এরকম চুপচাপ টাকা রেখে চলে গেছেন। ও তুলেও রেখেছে কিন্তু পরে আর মনে করতে পারে নি, ভেবেছে উনি দাম দেন নি। ছি ছি, বিনা কারণে একজন বুড়ো মানুষকে সন্দেহ করা।

দিন যায়, বছর গড়ায়। সব কিছু যথানিয়মে চলছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভবেশ এসেছেন জিনিসপত্র কিনতে। দামটাম মিটিয়ে যাওয়ার আগে বললেন, "এখন অনেকদিন হয়ে গেছে তাই আর বলতে কোনো অসুবিধে নেই। আমরা কিন্তু বেশ চিন্তাতেই ছিলাম তোর দোকানটা আদৌ টিঁকবে কী না তাই নিয়ে, জানিস তো?"

"মানে? চলবে না ভেবেছিলে?" বরুণ জিজ্ঞেস করল।

"চলবে কী না বোঝার জন্যেও তো ক'মাস অপেক্ষা করতে হয়। ক'মাস কেন ক'দিন টেঁকাই মুশকিল। আগেও এই দোকানঘর ভাড়া হয়েছে অনেকবার কিন্তু কেউ টিঁকতে পারে নি। নানা রকম উপদ্রব হত। জিনিসপত্র উধাও হত। সবাই বলত ভূত আছে এখানে। একমাত্র দেখলাম তুইই বছর পার করে দিলি।"

"ঘুরে বেড়াতে দেখত? কাকে? চোর টোর নয়তো?"

"না না চোর টোর নয়। অন্য কেউ দেখতে পেত না, শুধু দোকানদারই দেখতে পেত। এই বাড়ি যে ভদ্রলোকের ছিল তাঁকে। বুড়োমানুষ।"

“বুড়োমানুষ?” বরুণের গাটা কেমন ছমছম করে উঠল।

“হ্যাঁ। এই বাড়িটা ওনারই করা। প্রথম এই দোকান ঘরদুটো যাদের ভাড়া দিয়েছিলেন

তারা মহা পাজি ছিল। বুড়ো মানুষ, একা থাকতেন, শরীরও ভালো ছিল না, তার সুযোগ নিয়ে ভাড়া দিত না। পাড়ার লোকও নানান কারণে ওদের ওপর খাপ্পা ছিল। তারা চলে যেতে উনি আর দোকান ভাড়া দেন নি। শেষ দিকে শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছিল, চেহারা একদম ভেঙে গেছিল, লাঠি নিয়ে হাঁটতেন। হাই সুগার ছিল, অথচ মিষ্টির ওপরেই যত লোভ! আগে পাড়ার ছেলেদের কম চকোলেট খাইয়েছেন! নিজেও খেতেন ওদের সঙ্গে। একা ঘরের মধ্যেই মারা গেছিলেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বার করে। দোষ আমাদেরও ছিল। পাড়ায় এরকম অসুস্থ একজন বুড়ো মানুষ একা থাকতেন, কিন্তু আমরা কেউই কোনো খোঁজখবর রাখতাম না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত সবাই। এখন ভাবলে খারাপ লাগে। যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। এসব বললাম বলে তুই আবার ভয় পাস না যেন। তোর দোকানটা চলছে দেখে আমরাও সবাই খুব নিশ্চিন্ত। পাড়ার মধ্যে একেবারে মোড়ের মাথায় এরকম একটা বাড়ির ভূতুড়ে বদনাম থাকলে ভালো লাগে? এতদিনে সেটা ঘুচল মনে হচ্ছে।”

ভবেশ চলে গেলেন।

বরুণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে ভাবল, কই উনি তো ওর কোনো ক্ষতি করেন নি। কত ধার দেনা করে এই দোকান খুলেছিল, এত ভালো চলছে দোকান যে সে সব ও শোধ করে দিতে পেরেছে। না, এ দোকান ওর পয়া, এ দোকান ও ছাড়বে না।

বরুণের 'টুকিটাকি' এখন দুটো ঘর জুড়ে রমরমিয়ে চলা একটা বড়ো দোকান। একা সামলাতে পারে না, তাই দুটো ছেলে রেখেছে। বুড়ো ভদ্রলোককে বরুণ আর কোনোদিনও দেখে নি। প্রতি রাতে দোকান বন্ধ করার পর ও চকোলেটের একটা ছোটো বার দোকানের বাইরে রেখে দেয়। পরের দিন সকালে এসে কখনো দেখে সেটা নেই, কখনো দেখে যে রকমকে সেরকম পড়ে আছে। পড়ে থাকলে বরুণ সেটা কোনো গরীব বাচ্চাকে দিয়ে দেয়।

ছবিঃ শিমুল সরকার

পুষ্পেন মণ্ডল

বড়ো স্কুল লাগোয়া মাঠে গিয়ে যখন ওরা নামল তখন সূর্য অনেকটা মাথার উপরে। চারপাশে ভিড় আস্তে আস্তে জমছে। দূরে গাছেদের সারি। বেশ মনোরম পরিবেশ। সপ্তাদুয়েক আগে রবিবারের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে মিলন স্যার বলেছিলেন, "আগামী রবিবার হরিপুরে খেলা আছে। তোমরা সবাই যাবে। সকাল ছটায় এখান থেকেই বাস ছাড়বে। আবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ি পৌঁছাবে। সবাই বাড়ি থেকে পারমিশন চিঠি নিয়ে ঠিক সময়ে হাজির থাকবে।"

এরকম এক দিনের আউটিং-এ রাতুল আগেও দু'বার গেছে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া, খেলা আর হইহুল্লোড়। পিকনিকের মত। বন্ধুদের সাথে খুব মজা হয়। ও তো শুনেই এক পায়ে খাড়া। তাছাড়া সতের বছরের টিমে ওর মত অলরাউন্ডার দ্বিতীয় নেই। তাই মিলন স্যার স্পেশালি ওর বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সেদিন ভোরবেলা উঠে রেডি হয়ে ঠিক সময়ে এসে বাসে উঠে পড়ল। শিবম আর মৈনাক আসতে একটু দেরি করেছে। তাই বাস ছাড়তে আধঘণ্টা দেরি হল। জানালার ধারে বসেছিল রাতুল। পাশ দিয়ে একটা লম্বা কালো গাড়ি হুস করে চলে গেল। মনে হল লাল জামা পরা সেই লোকটা বসে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কদিন থেকেই লোকটাকে চোখে পড়ছে।

হরিপুর জায়গাটা শহরের দক্ষিণে। বেশ অনেকক্ষণ বাসে করে যেতে হয়। এদিকে অনেকটা গ্রাম্য পরিবেশ। টিফিন খেয়ে খেলা শুরু হল। ওয়ান ডে শর্ট টুর্নামেন্ট। দশ ওভার করে। একদিক থেকে ওরা ফাইনালে উঠল, আর একদিক থেকে নন্দনপুর। শেষে টসে জিতে নন্দনপুর প্রথমে ব্যাট শুরু করল।

দ্বিতীয় ওভারে দুটো চার একটা ছয় মারার পরে ক্যাপ্টেন রাতুলকে ডেকে বল করতে বলল। ভাগ্য ভালো ছিল। সেই ওভারেই দু নং আর চার নং বলে দুটো উইকেট তুলে নিল। ম্যাচটা আবার ওদের হাতে। আবার আট নং ওভারে একটা উইকেট পেল।

কিন্তু অপর পক্ষ ভালোই রান খাড়া করেছে। ওদের ব্যাটসম্যানরা সবাই ভাল। ব্যাট করার সময়ে ওপেনিং জুড়িতে ওদের সেরা দুজন ব্যাটসম্যান রাতুল আর ধীমান নামল। দ্বিতীয় ওভারেই ধীমান আউট। রাতুলকেই পুরো রানটা এবার মাথা ঠাণ্ডা করে তাড়া করতে হবে। বোলিংটা খুব টাইট করছে। ওদের আরও চারটে ব্যাটসম্যান কিছুটা বাদেই আউট হয়ে গেল।

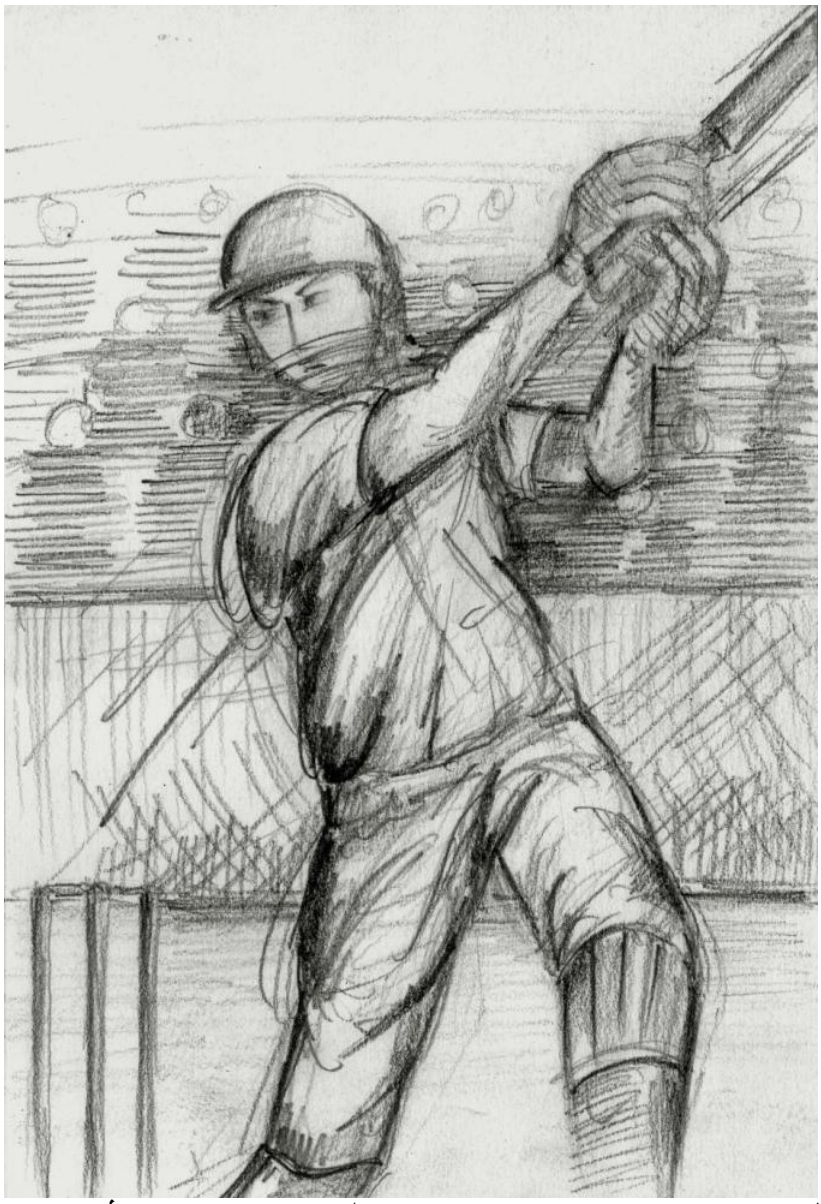

এইবার দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু হল। শেষ ওভারে দশ রান করতেই হবে। প্রথম দুটো বল নো রান হল। আর চারটে বল বাকি। তিন নং বলটা ফুলটস। রাতুল সোজা হুক করল। মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছয়। প্রবল হাততালি। আর তিন বলে চার রান। চার নং বলটা স্লো দিল। ঠুকে এক রান। পরের বলে অভীক ঠুকে দৌড়ে এক রান করে রান আউট হল। আবার রাতুল ব্যাটে। বাকি এক বলে দু রান। কী করবে? ও চোখদুটো বন্ধ করল একবার। মায়ের হাসি মুখটা মনে পড়ল। নাঃ পারতেই হবে। একটা চার অন্তত মারতেই হবে। মাঝারি পেসের বল উড়ে এলো। রাতুল বলটাকে ভালো করে দেখে সজোরে ঘুরিয়ে দিল ব্যাটটা।

'ঠকাস' করে একটা আওয়াজ, আর বল সোজা উড়ে গেল গ্যালারিতে। হইহই করে একটা চিৎকার। স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে রাতুল দেখল চার রানে জিতে গেছে ওরা।

গ্যালারিতে যেখানে বলটা গিয়ে পড়েছিল সেদিকটা একবার ফিরে দেখল রাতুল। আর তক্ষুনি বুকটা একটু ছাঁৎ করে উঠল তার। সেখানে সেই যেন লাল জামা পরা লোকটা বসে আছে। এইখানেও পিছু পিছু এসেছে? ঠিক দেখেছে তো রাতুল? ফের একবার তাকিয়ে দেখল সে। লোকজন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। তার মধ্যেই লোকটা হারিয়ে গেল ভিড়ে। অত আনন্দের মধ্যেও মনের মধ্যে কেমন খচখচ করছিল তার।

তারপর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, নাচানাচি, খাওয়া-দাওয়া, হইহুল্লোড় মিটতে দেরিই হয়ে গেল অনেকটা। বাড়িতে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিল সে। সব মিটে টিটে বাস যখন হরিপুর থেকে ছাড়ল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ঘটনাটা ঘটল প্রায় চল্লিশ মিনিট যাওয়ার পর। হঠাৎ একটা কান ফাটানো দুম করে আওয়াজ। সঙ্গেসঙ্গেই ড্রাইভার বাসটা সাইড করিয়ে দিয়ে জানাল টায়ার ফেটেছে।

মিলন স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ লাগবে স্টেপনি বদলাতে?"

"স্টেপনি বদলাতে বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু স্টেপনিটাও তো পাংকচার।"

"সে কী! এত গুলো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে এতটা রাস্তা কীভাবে যাব?"

"স্যার, এখন রাস্তা একটাই। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। আমরা ভ্যান ডেকে একটা চাকা নিয়ে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও থেকে সারিয়ে নিয়ে আসছি। একটু সময় লাগবে কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।"

"এখন পৌনে আটটা বাজে। এদের তো খিদেও পেয়ে গেছে। কখন বাড়ি পৌঁছাবে? বাড়ির লোক চিন্তা করবে। এই অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকব?" মিলন স্যারের তো চিন্তায় তখন পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা সাইকেল রিক্সা জোগাড় করে ড্রাইভার আর হেল্পার চলে গেল। ছেলেরা বাস থেকে নেমে দলে দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। স্যার বলে দিলেন যেন কেউ বেশি দূরে না যায়। রাতুল দেখল, দু দিকেই ধু ধু অন্ধকার চাষের জমি। বড়ো বড়ো গাছ আছে রাস্তার ধারে কিছুটা ছাড়া ছাড়া। জনবসতি একেবারেই নেই। উপরে কুচকুচে কালো পরিষ্কার আকাশ। তার মধ্যে মিটমিট করে জ্বলছে তারারা। কলকাতার শহরে এত সুন্দর আকাশ দেখা যায় না। সেখানে যত আকাশচুম্বী সারি সারি বাড়ি। কত আলো! তার মধ্যে আকাশের তারাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুদের ফেলে একা বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে রাতুল, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা লোকটা। গায়ে সেই লালের উপর সাদা ফুলের ছাপ দেওয়া জামা। বরাবর ও এই জামাটাই পরে। তার মানে সে আজকে সারাদিন রাতুলকে অনুসরণ করছে। কী চায় লোকটা? গত মাসখানেক ধরে রাতুল বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছে ওকে। কখনও কফি শপে, কখনও ভোরবেলা লেকের ধারে, কখনও স্কুলের বাইরে। ওকেও যে রাতুল লক্ষ করেছে সেটা কি ও জানে?

"তোমার সাথে একটু কথা ছিল।" লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল।

"আমার সাথে কী কথা? কে আপনি?"

"আমার নাম মহেন্দ্র সিংহ। কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন বলব?"

"আপনি আমার পিছু নিয়েছেন?"

"বাধ্য হয়ে। তোমার সাথে একা কথা বলাটা খুব জরুরি। কোথাও তো তোমাকে একা পাচ্ছি না। তাই পিছু নিতে হয়েছে। আজকে বাসের টায়ারটা ফাটার জন্য আমিই দায়ী। একটা চান্স নিলাম। যদি তোমার সাথে সামনাসামনি হওয়া যায়।"

"আপনি টায়ার ফাটিয়েছেন? তাহলে তো খুবই বদমায়েশ লোক আপনি! "

"হ্যাঁ, তা বলতে পার। এককালে অনেক বদমায়েশি বুদ্ধি মাথায় খেলত। এখন আর অতটা নেই।"

"আপনি স্বীকার করছেন আপনি বাজে লোক। ইচ্ছা করে এতগুলো ছেলেকে বিপদে ফেললেন। আবার বুক ফুলিয়ে বলছেন। যাক, কী বলার জন্য এসেছেন সেটা তাড়াতাড়ি বলুন।"

"তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।"

"মানে? কী বলছেন? আমি কোথায় যাব আপনার সাথে? আর কেনই বা যাব?"

"না গেলেও তো উপায় নেই। ভালোয় ভালোয় লক্ষ্মী ছেলের মত আমার সাথে গেলে আর অহেতুক জোর করতে হয় না। তাতে তোমারও মঙ্গল আর আমারও।"

"কী ব্যাপার খুলে বলুন তো। আমি যদি না যেতে চাই, আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে যাবেন। তাও একা। কী ভেবেছেন বলুন তো আমাকে। আমি ক্যারাটেতে ব্রাউন বেল্ট, সেটা জানেন তো?"

"সে আর জানব না? দেড় মাস ধরে তোমার পিছনেই তো নাগাড়ে ঘুরছি। শরৎ বোস রোডে যেখানে তুমি ক্যারাটে শিখতে যাও সেখানে গত প্রতি রবিবারে মোট পাঁচবার ঢু মেরেছি। সেদিন হাওয়ায় উঠে রোশনকে যে ঘুরিয়ে তাইকুন্ডুর আপার কাটটা মারলে, সেটা দেখে আমিও দূর থেকে হাততালি দিয়েছি।"

"তাই নাকি! তা আমাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন?"

"একটা ভল্টের লক খোলা যাচ্ছে না। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

"কী! আমি কি তালা ভাঙার মেকানিক? না চোর?"

"না, এর কোনটাই নয়।"

"তাহলে?"

"তুমি হলে চাবি।"

"মানে?"

"হরিমোহন হালদারের নাম শুনেছ?"

"না। ইনি কে?"

"তোমার ঠাকুরদার বড়োভাই। যিনি জার্মানিতে থাকতেন।"

"এরকম কারো নাম তো আমি শুনিনি।"

"তিনি বার্লিনে গিয়েছিলেন কবিরাজি চিকিৎসা করার জন্য। তোমার ঠাকুরদার বাবা তখন তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। সেখানে ডেভিড অরেলস্টাইনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরে একসাথে গবেষণার কাজ শুরু করেন। অরেলস্টাইন ছিলেন পোটসডামের একজন অভিজাত ধনী এবং শখের বিজ্ঞানী। তিনি তোমার দাদামশাইকে তাঁর পৈত্রিক ক্যাসেলের কিছুটার অংশীদারিত্ব দিয়েছিলেন। তোমার দাদামশাই মারা যাবার আগে উইল করে সেই সম্পত্তি তোমার বাবার নামে করে দিয়ে যান। সেখানেই তাঁদের ল্যাবরেটরি ছিল। ডেভিড অরেলস্টাইন মৃত্যুর আগে তাঁদের যাবতীয় গবেষণার তথ্য একটি ভল্টে রেখে গেছেন। এই ভল্ট বা সিন্দুকটি বিশেষ ভাবে তৈরি। এটা খোলার জন্য তাঁর এবং হালদার মশাইয়ের উত্তর পুরুষকে উপস্থিত থাকতে হবে। দুজনেরই জীবন্ত ডি. এন. এ. স্ক্যান লাগবে। তিনি নিজে বিয়ে করেন নি। সে জন্য এখন তাঁর ডি. এন. এ. তোমার বাবা বা তুমিই দিতে পার। সিন্ধুকটি যদি ভাঙার চেষ্টা করা হয় তাহলে পুরোটাই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। কিছুই পাওয়া যাবে না।"

"কী এমন বিশেষ তথ্য তার মধ্যে আছে, যে এত সাংঘাতিক পাসওয়ার্ড?" রাতুল জানতে চাইল।

"এ ব্যাপারে বিস্তারিত আমি কিছুই জানি না। তবে বিষয়টি খুবই মূল্যবান এবং গোপনীয়। এই কাজটি করার জন্য তুমি অনেক টাকাও পাবে। তোমার বাবার সাথে আমরা অনেকবার কথা বলেছিলাম। তিনি কিছুতেই জার্মানি যেতে রাজি নন। কিন্তু ডেভিড অরেলস্টাইনের ভাইপো জেমস সেই সিন্দুক খোলার জন্য নাছোড়বান্দা। প্রয়োজনে তোমাদের পরিবারের কারো প্রাণ নিতেও পিছপা হবে না।"

"তার মানে আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?"

"হুমকি বললে কম বলা হবে। জেমসের দুটি পারিবারিক কেমিক্যাল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েক শো কোটি টাকা ব্যাঙ্কের কাছে দেনা। তাঁর ক্যাসেলটাও হয়ত নিলাম হবে। ওঁর ধারনা সিন্ধুকের মধ্যে গুপ্তধন আছে। যাতে ওঁর ভাগ্য খুলে যাবে। তাই যে কোন মূল্যে তিনি কাজটা হাসিল করবেন। এখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। আমি ব্যর্থ হলে অন্য কেউ আসবে, খুনোখুনি করবে। তুমি ভেবে দেখ কোন পথে যাবে?"

রাতুল আর ভাবতে পারছে না। পৃথিবীতে বাবা-মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তাদের যদি কিছু হয় তাহলে সে কী করে বাঁচবে? ইদানীং রাতের দিকে মাঝে মাঝে

ফোন আসে। বাবা উত্তেজিত হয়ে কথা বলে। এখন মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারেই হয়ত কথা হত। সে বলল, "এখন আমাকে কী করতে হবে?"

"আমার সাথে সোজা এয়ারপোর্ট যেতে হবে। আজকে রাতের ফ্লাইটে তোমার টিকিট কাটা আছে। ফ্লাইট টেক অফ করার পর তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া হবে। দুপুরে যখন তোমার বাবা-মা অফিসে ছিলেন, তখন তোমার পোশাক, প্রয়োজনীয় জিনিস ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পাসপোর্টেও আর্জেন্ট ভিসা করানো হয়ে গেছে।"

"সব কাজ সেরে রেখেছেন? এখন আমি যদি না যেতে চাই।"

"বোকার মত কথা কেন বলছ? আমরা সব আটঘাট বেঁধে তবেই নেমেছি। তোমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক উল্টো দিকে গাঙ্গুলিরা দু সপ্তাহ ধরে রাজস্থানে বেড়াতে গেছেন। সেই ফ্ল্যাটে দুজন স্নাইপার বন্দুক নিয়ে বসে আছে। তুমি এখানে না বলবে, আর সেখানে গুলি চলবে। এই মুহূর্তে তোমার মা রান্নাঘরের জানালার সামনে রান্না করছেন।"

রাতুল আর কিছু ভাবতে পারছে না। এর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই চারপাশটা পাল্টে গেল হুহু করে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা দামী লম্বা গাড়ি এগিয়ে এলো। তাতে বসতেই দু ঘণ্টার মধ্যে দমদম এয়ারপোর্ট। তার দুঘণ্টা পরে জেট এয়ারবার্লিনে চেপে বসল সে। বিশাল বড়ো এয়ারবাস। আবুধাবি হয়ে সাড়ে তের ঘণ্টার মাথায় নামল "ফ্লুগাফেন বার্লিন টেগেল" ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। মনটা বার বার খারাপ হয়ে যাচ্ছে মায়ের কথা ভেবে। আসার সময়ে বাবা-মায়ের সাথে একবার কথাও হল না। মাকে না বলে সে কোথাও যায় না। আর এ তো একদম বিদেশ! সে কি কাজটা ঠিক করল? সেই লাল জামা পরা মহেন্দ্র সিংহ শেষ পর্যন্ত প্লেনে ওঠেনি। ওর সাথে এসেছে অন্য এক লোক। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা বডিবিল্ডারের মত চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা। ছোট কালো ঘন চুল। হয়ত আফ্রিকান বা মুলাটো হবে। নাম বলল ডিফান।

এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে একটা বড়ো গাড়িতে উঠল তারা। এখানে সবে সকাল হচ্ছে। ঠাণ্ডাটা বেশি। রাতুল জ্যাকেট আর মাফলার বের করে পরে নিলো। ভাবল, গতকাল এই সময়ে কোচিং ক্লাব থেকে হরিপুরের জন্য বাসে উঠছিল।

বাইরের পরিবেশ একদম আলাদা। ঝকঝকে রাস্তা ঘাট। তার পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া লন, বাহারি গাছ, লাইট সবই সুন্দর করে সাজানো। দু'পাশে বড়ো বড়ো লম্বা লম্বা বিল্ডিং। কখনও ফ্লাইওভার আবার কখনও টানেলে রাস্তা ঢুকে যাচ্ছে।

রাতুল বাড়িতে ফোন করার কথা বলতে ডিফান মোবাইলে ধরিয়ে দিল। মা তো ফোনটা পেয়েই কেঁদেকেটে একসা। "তুই আমাদেরকে না বলে জার্মানি চলে গেছিস?" রাতুল বুঝিয়ে বলল, "এরা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক, এদের কথা না শুনলে আমাদের কাউকে ছাড়বে না। তাছাড়া, দু-তিনদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। একদম চিন্তা করো না।" মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডিফান ফোনটা কেড়ে নিল। মাকে তো বলল যে চিন্তা কোরো না, কিন্তু ও নিজেও বুঝতে পারছে না ঘটনা কোন দিকে গড়াবে।

হাই রোডের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে মিনিট চল্লিশ যাবার পর গাড়িটা ডান দিকে সবুজে মোড়া একটা সরু রাস্তায় ঢুকে গেল। চারপাশে মোটা মোটা গাছের সারি। রাস্তার মোড়ে একটা বোর্ডের লেখায় চোখ পড়ল, "পোটসডাম"। একটা প্রাসাদের মত বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল। তার সামনে লেখা "অরেলস্টাইন ক্যাসেল"।

মধ্যযুগীয় তামাটে গ্রানাইট পাথরের তৈরি ইউরোপিয়ান স্থাপত্য। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিশাল বড়ো কাঠের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল রাতুল। তিনতলা সমান উঁচু একতলার ছাদ, খুব লম্বা লম্বা দরজা জানালা লাগানো দু-তিনটে করিডোর পেরিয়ে ওকে একটা বড়ো ঘরে নিয়ে গেল। এত বড়ো ঘর যে ওদের কলকাতার গোটা বাড়িটাই এর মধ্যে ঢুকে যাবে। এক পাশে একটা বড়ো পাথরের পালঙ্ক। তার পাশে বড়ো বইয়ের র‍্যাক, টেবিল, চেয়ার। টেবিলের উপর দুটো ছবির ফ্রেম রাখা আছে। রাতুল কাছে গিয়ে দেখল, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে তোলা বহু পুরানো ছবি। একটাতে দাদুর বাবা মা আর তাঁদের দুই ছেলে। ছোট ছেলেটি রাতুলের দাদু আর বড়োটি নিশ্চয়ই হরিমোহন হালদার। তাঁকে ও কোন দিন দেখেনি। ঠাকুমার কাছে শুনেছিল দাদুর বড়োদা ডাক্তারি পড়াশোনা শেষ করে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কয়েক বছর পর ফিরে অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে কবিরাজি চিকিৎসা শুরু করেন। তারপর জার্মানি পাড়ি দেন। কোটপ্যান্ট পরা পাশের ছবিটি মনে হয় তাঁর নিজের। ঝোলা গোঁফ, চাপ দাড়ি, চওড়া কপাল, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ান চুল। দেখলেই বোঝা যায় বংশের সাথে মিল আছে। এই ছবিটা অল্প বয়েসেই তোলা।

"ইওর ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি।" আচমকা আওয়াজে পিছন ফিরে দেখল একজন বয়স্ক শ্যামলা মহিলা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। পরনে পরিচারিকার ইউনিফর্ম। "প্লিজ কাম।"

তাঁর পিছন পিছন গিয়ে একটা লম্বা হল ঘরে ঢুকল। এত লম্বা আর বড়ো খাবার টেবিল সে কখনও দেখেনি। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক এক সাথে বসতে পারবে। অবশ্য এখানের বেশির ভাগ জিনিসই সে জীবনে প্রথম দেখছে। এত বড়ো টেবিলে সে একা খেতে বসল। অঢেল খাবার। সে সামান্য খেয়ে উঠে পড়ল। এত বড়ো বাড়ি কি ফাঁকাই পড়ে থাকে? দেয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো ইউরোপিয়ান পেন্টিং। কত রকমের ঝাড়বাতি। সেই মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, "ক্যাসেলের এই অংশটি মিঃ হালদারের। সেই সূত্রে তুমিই এখন মালিক। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারো। জেমস অরেলস্টাইন এখন ইউ. কে. তে আছেন। হয়ত কালকে সকালে এসে তোমার সাথে দেখা করবেন। আমার নাম মরিয়ম। যদি কিছু দরকার লাগে আমাকে বোল।"

"আচ্ছা ওনার ল্যাবরেটরিটা কি দেখা যাবে?"

"না, সেখানে কারোর যাওয়ার পারমিশন নেই। এই ক্যাসেলের নিচে একটা গোপন ঘরের মধ্যে ল্যাবরেটরি। তাছাড়া. . . . " কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন মরিয়ম। রাতুল লক্ষ করল করিডোরের ওপাশ থেকে ডিফান এদিকে তাকিয়ে আছে। মহিলাটি তাকে দেখেই সরে গেলেন।

এরপর সারা দিনটা ঘুরে বেড়িয়ে কাটল তার। প্রাসাদে ঢোকার আর একটি মুখ আছে। সেদিকটা মনে হয় জেমসের। ভিতরে একতলা দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলি ঘর। বেশিরভাগই অবশ্য তালা বন্ধ। একটা ঘরের ভিতরে বহু পুরানো অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি

ইউরোপিয়ান সমরসজ্জায় বিভিন্ন ব্যক্তির বড়ো বড়ো অয়েল পেন্টিং। বাইরে চারপাশে সুন্দর করে সাজানো বাগান। সবুজ আর রঙিন গাছগুলি সবই প্রায় অচেনা। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে চিনার গাছ দেখেছিল। তার সাথে দু'একটার মিল আছে। পিছনদিকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর! লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে নদীর দিক থেকে। আর একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ। মাঝে মাঝে শুধু অচেনা পাখির ডাক।

একটা বড়ো সাদা পাতাওয়ালা গাছের নীচে অনেকক্ষণ বসে রইল সে চুপ করে। বাড়ির কথা মনে পড়ছে। এত সুন্দর জায়গাতে এসেও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে এরা নিয়ে তো এলো। এর পর যদি ফেরার টিকিট না দেয়? ঐ মহিলা বললেন রাতুলই এখন প্রাসাদের এক অংশের মালিক। তাহলে চিন্তা কী? বাবা-মাকে এখানে আনিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু বাবা-মা কি আসবে? মনে হয় না। তাছাড়া তার নিজের পড়াশোনা আছে। এখানের স্কুলে কি ওকে ভর্তি নেবে? আচ্ছা কী এমন জিনিস ঐ সিন্দুকের মধ্যে আছে যে এত গোপনীয়তা? ও লক্ষ করেছে, ডিফান সব সময়ে দূর থেকে ওকে চোখে চোখে রাখছে। হয়ত জেমস ওকে সে রকমই নির্দেশ দিয়েছে।

দুপুরে খাওয়ার পরে সেই বড়ো পালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এক তো অচেনা জায়গা, অচেনা বিছানা, তার উপর মনের ভেতরে একটা আতঙ্ক। ঘুম যেন এসেও আসছে না। স্বপ্নের মধ্যে দাদুকে দেখতে পেল। সেই সাদাকালো ছবিটা থেকে বেরিয়ে এসে বলছেন, "পালা, পালা্ পালা-- "

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল রাতুলের। অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশে। সন্ধ্যা, না রাত? হালকা পাওয়ারের মৃদু আলো জ্বলছে চারিদিকে। বাইরে করিডোরে বা বড়ো খাবার ঘরে কোথাও কেউ নেই। মূল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। ডিফানকেও দেখতে পেল না। এত বড়ো ক্যাসেলে ও কি এখন একা? ওকে এখানে বন্দি করে রেখে সবাই চলে গেছে! একটা ভয় জাঁকিয়ে বসছে মনের মধ্যে। বড়ো হলঘরে দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো নাইটদের কালো ইস্পাতের বর্মগুলি যেন ওকেই লক্ষ করছে। সূর্য ডুবে যেতে ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে গেছে। রাতুল আবার এসে ঢুকল বড়ো ঘরে। ভাবল, উলটোপালটা চিন্তা করে ভয় না বাড়িয়ে যদি কোন বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। দরজা বন্ধ করে বইয়ের র‍্যাকটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

****

সব মিলিয়ে মনে হয় কয়েক হাজার বই রয়েছে। সবই প্রায় ইংরাজি, জার্মান, না হলে ফরাসী ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা রসায়নের উপরে লেখা। এসব বই ওর মাথায় ঢুকবে না। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নীচে কোণের দিকে কয়েকটা বাংলা বইয়ের সন্ধান পেল। রবীন্দ্র রচনাবলী, বঙ্কিম রচনাবলী ছাড়াও বেশ কিছু বাংলা পুরানো উপন্যাস ও আয়ুর্বেদের উপর বই আছে। এখানে আসার সময়ে দাদু নিশ্চয়ই এই বইগুলি সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সামনের বইগুলি নামাতে একদম ভিতরের দিকে পাওয়া গেল হাতে লেখা একটা ডায়েরি। সেই ডায়েরিটা টেবিলের উপর তুলে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বসল। পাতা উলটে

দেখল নিয়মিত প্রতিদিনের লেখাজোখা নেই। কখনও কোন বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটলে সেই দিন ডায়েরি লিখেছেন, অনেকদিন ছাড়া ছাড়া। বাংলায় লেখা ছাড়াও ইংরাজি আর ডাচ ভাষায় অনেক কিছু লেখা আছে। দেখে মনে হয় সেগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য বা ফরমুলা।

রাতুল লেখাগুলো পড়তে আরম্ভ করল—

১৫ই মে, ১৯৫৪, বার্লিন।

দেশ থেকে আসার পরে অনেক ঝড়ঝাপটার পর জার্মানির বার্লিন শহরের উইসেন্সিতে আমার নিজের ডিসপেনসারি চালু করতে পেরেছি। তবে স্বীকার করতেই হবে যে আয়ুর্বেদের উপর বিশ্বাস জার্মানদের অন্য দেশের লোকেদের তুলনায় বেশি। দেখা যাক কী লেখা আছে আমার ভাগ্যে।

২রা আগস্ট, ১৯৫৫।

আজকে আমার ডিসপেনসারিতে এক রোগি এসেছিলেন। নাম ডেভিড অরেলস্টাইন। দেখলেই বোঝা যায় অভিজাত রাজবংশ। বললেন তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি পারস্যসম্রাট দ্বিতীয় ফেডরিকের আমলে বেবলসবার্গের নাইট অর্থাৎ জমিদার ছিলেন। পোটসডামে এখনও তাঁদের পৈত্রিক ক্যাসেল আছে। তাঁর মতে এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির থেকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য। ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। ভালোই হল, এরকম একজন জাঁদরেল মক্কেল থাকলে জার্মানিতে পসার জমতে বেশি দিন সময় লাগবে না।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৫

যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেলাম। ডেভিড অরেলস্টাইনের যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা হল বদহজম থেকে পেটে ব্যথা। আমার কাছে আসার আগে ও অনেক ডাক্তারবদ্দি করেছিল। কিন্তু তেমন ফল পায়নি। আমি ওকে বিশেষ কিছু শিকড়বাকড় আর শুকনো ফলের মিশ্রণচূর্ণ জলে ভিজিয়ে প্রতিদিন সকালে খেতে বলেছিলাম। তাতে নাকি ম্যাজিকের মত ফল হয়েছে। ওর পঁচিশ বছরের পেটের সমস্যা ভ্যানিশ! এখন ওর আবদার হল, আমি যেন অনুগ্রহ করে ওর পোটসডামের ক্যাসেলে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকি। রোজগারপাতির চিন্তা বলাই বাহুল্য, করতে হবে না। ইউরোপের যত ধনী ব্যক্তি আছেন সবাইকে ও চিঠি দিয়ে ওর নিজের অভিজ্ঞতা জানাবে। পেশেন্ট আগে থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে পোটসডামেই দেখা করতে আসবে। অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে আমি এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। বলেছি ভেবে দেখব।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৫৬।

এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মোটা বরফের চাদরে রাস্তাঘাট সব ঢেকে গেছে। রাতের দিকে তাপমাত্রা হিমাংকের নীচে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার পেশেন্ট সংখ্যা

ভালোই বেড়েছে। এদিকে ডেভিড অরেলস্টাইন নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েছে আমাকে পোটসডামে নিয়ে যাবে বলে। মাঝে এক সপ্তাহ গিয়ে থেকেও এলাম "অরেলস্টাইন ক্যাসেলে"। বার্লিন সেন্ট্রাল থেকে প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে হাভেল নদীর তীরে মনোরম পরিবেশ। মধ্যযুগীয় বিশাল অট্টালিকা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল ডেভিডের আর একটা পরিচয় আছে, ও হল শখের অ্যালকেমিস্ট। ইউরোপের মধ্যযুগে এই অ্যালকেমির চল হয়েছিল। যদিও এর উৎপত্তি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে। ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রেও এর উল্লেখ আছে। তা এত বছর পরেও এদের অস্তিত্ব আছে জেনে অবাক হচ্ছি।

<u>২২শে জুন, ১৯৫৬।</u>

শেষ পর্যন্ত ডেভিড আমাকে পোটসডামে এনেই ছাড়ল। আমার থেকে ও বয়েসে অনেক বড়ো হলেও সম্পর্কটা এখন বন্ধুর মত। আসলে ওর নিজের বলে কেউ নেই। এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে। সে এক জুয়াখোর। এত বড়ো প্রাসাদ পুরোটাই ফাঁকা। পিছনের বাগানে অনেকটা জায়গায় বিভিন্ন ঔষধি গাছের চাষ করেছি। এখানে আসার সাথে সাথেই ডেভিড এদেশীয় সমস্ত সংবাদপত্রে আমার নামে বড়ো করে বিজ্ঞাপন ছেপেছে। আর তাতে ফল হয়েছে দারুণ। সকাল বিকাল ফোনের জালায় অস্থির। আমার দক্ষিণা দশগুণ করে দিয়েছি। তাতে এখানের লোকের অবশ্য কোন হেলদোল নেই।

<u>১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২।</u>

ফেব্রুয়ারি মাসের আবহাওয়াটা এখানে সব থেকে মনোরম থাকে। হাভেল নদীর তীরে অসাধারণ পরিবেশে চেস্টনাট, চেরি, বিচ আরও কত রকমের সবুজ গাছের ছায়ায় বসে মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে পড়ে। আমাদের গ্রামের সরু মাটির রাস্তা, বাঁশবন, শীতলাতলা, চড়কতলা, যেখানে আমি, ভাই আর বন্ধুদের সাথে মজা করতাম। কবে ফিরব দেশে কে জানে? এখন তো কাজের চাপে নিজের জন্যও সময় পাইনা। পেশেন্ট দেখা ছাড়াও আমাকে ডেভিডের সাথে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এই ক্যাসেলের নিচে একটা গুপ্ত ঘরের মধ্যে ওর ল্যাবরেটরি। এ যেন আগুন নিয়ে খেলা। ডেভিড এই মাসেই উইল করে আমাকে এই ক্যাসেলের এক অংশের অধিকার আইনত দিয়ে দিয়েছে। যাতে আমি আর কোনদিন এই জাল কেটে বেরোতে না পারি।

<u>২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৫।</u>

রোগি দেখা শিকেয় উঠেছে। এখন শুধু সারাদিন ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ চলছে। এই ডাইয়েরিটাও অনেকদিন পরে খুঁজে পেলাম। অ্যালকেমি মানে হচ্ছে অপ-রসায়ন। বিজ্ঞান আর অপ-বিজ্ঞানের মিশ্রণ। হাজার রকম রাসায়নিক পদার্থের সাথে লাগে মৌলিক ধাতু, শিকড়বাকড়, জড়িবুটি, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর হাড় ও রক্ত, মন্ত্রতন্ত্র, প্রেতাত্মা, ব্ল্যাক ম্যাজিক আর বহু রকমের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। একাদশ

শতকের বিখ্যাত ইউরোপিয়ান অ্যালকেমিস্ট সেন্ট এম্সেলেমের একটা গবেষণাপত্রের অনুকরণে আমরা বয়েস কমানোর পদ্ধতি আবিষ্কারের কাছাকাছি এসে গেছি। আর মাত্র কয়েকটা ধাপ বাকি। আমার সঙ্গে আনা সংস্কৃত ভাষায় "কাকাসন্ধি কল্পতন্ত্র" আর "গোরক্ষ সংহিতা" বই দুটি অনেক কাজে লাগল। এখন মনে হচ্ছে আমাকে এখানে নিয়ে আসার পিছনে আসলে ডেভিডের এই গবেষণার উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল।

১লা জানুয়ারি, ১৯৬৭।

সারা পৃথিবী যখন বর্ষবরণের উৎসবে মেতে উঠেছে, তখন আমার মৃত্যুঘণ্টা আমি শুনতে পাচ্ছি। আসলে একটা বহু প্রাচীন প্রবাদবাক্য আমি অগ্রাহ্য করেছিলাম, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। যাক এখন তো আর কিছু করার নেই। মাকড়শা এখন তার জাল গুটাচ্ছে। ডেভিড ওর বয়স কমানোর জন্য আমাকে বলির পাঁঠা করতে চলেছে। সেন্ট এম্সেলেমের থিওরি অনুযায়ী একটি বিশেষ অমাবস্যার রাতে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত খাঁটি ভারতীয় প্রাণের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য বয়স নিজের সাথে জুড়ে নেওয়া যায়। ডেভিড সেটাই করতে চলেছে। ডেভিডের বর্তমান বয়েস ষাট, আয়ু বাকি আছে আনুমানিক কুড়ি বছর। আর আমার এখন চল্লিশ, আরও আনুমানিক চল্লিশ বছর বাঁচব। এই পদ্ধতিতে ডেভিড আরও প্রায় ষাট বছর ধরে তার বয়েস একই জায়গায় ধরে রাখতে পারবে। আবার যখন দরকার হবে তখন কোন অল্পবয়সি ভারতীয় ছেলেকে জোগাড় করতে পারলে, পুনরায় বয়েস কমে যাবে। শুধু বৈশিষ্ট্যগুলি আমার সাথে মিলতে হবে। যেমন, কোঁকড়ান কালো চুল, চওড়া কপাল, কানের লতিটা জোড়া আর থুতনিতে তিল।

এই পর্যন্ত পড়ে রাতুলের গা হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। কারণ এই সবক'টা বৈশিষ্ট্য তারও রয়েছে। সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না। বাঁচার কোন রাস্তা নেই। সিন্ধুক, গুপ্তধন সবটাই গল্প। আসল সত্যিটা অনেক বেশি ভয়ানক। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তার।

কখন ক্লান্ত চোখে ঘুম এসে গেছে সে নিজেই টের পায় নি। টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দরজায় দুম দুম আওয়াজ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল সে। দরজা খুলে দেখল ডিফান ডাকতে এসেছেন।

"গুড ইভনিং, ইয়োর ডিনার ইজ রেডি। প্লিজ কাম।"

টেবিলে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন একজন অভিজাত চেহারার বয়স্ক জার্মান। "হ্যালো, মাস্টার রাতুল। আমি জেমস অরেলস্টাইন। খুবই দুঃখিত সকালে তোমাকে রিসিভ করতে পারিনি। একটা বিশেষ কাজে বাইরে ছিলাম। ওয়েলকাম টু জার্মানি, ওয়েলকাম টু ইয়োর হোম।"

রাতুল হেসে বলল, "ধন্যবাদ মিঃ অরেলস্টাইন।"

খাবার খেতে খেতে কথা হল। জেমস বললেন, "আমরা খাওয়া শেষ করে ল্যাবরেটরিতে যাব। আধঘণ্টার কাজ। তারপর ডিফান তোমাকে কালকে সকালে এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দেবে। এই তোমার টিকিট। অবশ্য তুমি যদি মনে করো তাহলে কিছুদিনের জন্য বা পাকাপাকি ভাবে এখানে থেকে যেতে পারো।"

রাতুল ঠোঁটের কোণে হাসিটা বজায় রেখে বলল, "আগে আপনার কাজটা তো হোক। যার জন্য এত দূর থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে আসলেন।" মুখে বলল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সাহসটা ঠিক দানা বাঁধছে না। একটা দুশ্চিন্তার ঝড় সব কিছু ওলটপালট করে দিচ্ছিল তার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেমস বললেন, "হ্যাঁ সেটা তো হবেই।"

ল্যাবরেটরিতে ঢোকার রাস্তাটা ভারি অদ্ভুত। রাতুল যে ঘরটায় ছিল তার ঠিক পাশের তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমে সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলার একটা ঘরে যাওয়া হল। সেই ঘরের পাথরের খাটের পাশে একটা হাতল ঘোরাতে খাটটা সরে গেল। একটা গোল ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালে। পিছন পিছন ডিফানও এলো। অন্ধকার ঘরে নেমে প্রথমে সব কটা মশালে আলো জ্বালল। রাতুল দেখল এ ঘরে মেঝের মাঝখানে একটা বড়ো চৌবাচ্চা। তাতে কী একটা ঘন লালচে তরল পদার্থ ভর্তি। চারিদিকে রাসায়নিক জার, ফানেল, টিউব, বার্নার, ফ্লাস্ক। আর দেয়ালে একটা কাচের বাক্সে মানুষের কঙ্কাল সাজানো আছে।

"সিন্দুকটা কোথায়?" রাতুল প্রশ্ন করল।

"কীসের সিন্দুক?"

"যেটা খোলার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে আসা হল।"

"তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তোমার গ্রান্ডফাদারের একটা অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য।"

"মিথ্যা কথা, মিঃ ডেভিড অরেলস্টাইন, আমাকে ভুল বুঝিয়ে এখানে আনা হয়েছে।" রাতুল চোখে চোখ রেখে বলল কথাটা। ভাবল এখন আর ভয় করে লাভ নেই। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

"ডেভিড অরেলস্টাইন! তিনি তো মারা গেছেন পঁচিশ বছর আগে। আমি তাঁর ভাইপো জেমস।"

"না মিঃ অরেলস্টাইন। আপনি মারা যাননি। তবে জেমস আর তার পরিবারকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু আমার দাদুর চিকিৎসায় জেমস ভালো হয়ে যায়। আর আপনি আমার দাদুকে হত্যা করে তাঁর আয়ুটা নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে ছিলেন। এখন সেটাই আবার আমার সাথে করতে যাচ্ছেন?"

"এসব তুমি জানলে কী করে? আর এখন জেনেই বা লাভ কী? মরতে তো তোমাকে হবেই। তোমার দাদুর মত। হা হা হা। ঐ দেখ দেয়ালে তার কঙ্কাল ঝোলান আছে। ডিফান ধর ওকে। ওই টেবিলের উপর হাত পা বেঁধে শুইয়ে দে।"

ডিফান এগিয়ে আসতেই রাতুল একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। পিছনে চৌবাচ্চাটা এক পলক দেখে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে চার হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে পা'টা ঘুরিয়ে মোক্ষম একটা লাথি মারল তার বুকের মাঝখানে।

মাসলম্যান ডিফান ভাবতেই পারেনি বাচ্চা ছেলেটা এরকম অতর্কিত আক্রমণ করবে। সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষিপ্র চিতার মত উঠে

লাফ দিল রাতুলকে লক্ষ করে। রাতুল চোখের পলকে ডানদিকে সরে গেল। ডিফান সোজা গিয়ে পড়ল সেই চৌবাচ্চায় রাখা তরল পদার্থের মধ্যে। একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তার সারা গায়ে জড়িয়ে গেছে সেই চটচটে আঠালো পদার্থটা। সে উঠে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু গায়ের মাংসগুলো খসে পড়ছে চাকলা হয়ে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা হাড়। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল রাতুল।

"তোকেও আমি ইঁদুরের মত পারতে পারি।" বলে অরেলস্টাইন মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করলেন রাতুলের দিকে।

কিন্তু তারপরেই মাথা নেড়ে নিজের মনেই বললেন, "কিন্তু না, আরও কিছুদিন তোকে বেঁচে থাকতে হবে।"

বলতেবলতে দেয়ালের গায়ে একটা হাতল ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। পিছনে একটা চোরা কুঠুরির দরজা খুলে গেল। ডেভিড অরেলস্টাইন ঢুকে গেলেন তার মধ্যে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর উপরের ভেন্টিলেটর দিয়ে একটা সাদা গ্যাস ঢুকতে লাগল। মশালগুলি নিভে যাচ্ছে এক এক করে। রাতুল বুঝল ঘরের মধ্যে অক্সিজেন কমছে। দ্রুত সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল উপরে। নিচে ঘন অন্ধকার। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে খুব। উপরে বের হবার ঢাকনাটাও বন্ধ। বুঝতে পারছে না কী করে খুলবে? দুম দুম করে ধাক্কা দিল বেশ কয়েকবার। জ্ঞান লোপ পাচ্ছে আস্তে আস্তে। শেষে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়ল নিথর হয়ে।

****

জ্ঞান ফিরতে দেখল ও সেই বড়ো ঘরে পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে। হাসি মুখে এগিয়ে এসে কোট প্যান্ট পরা মহেন্দ্র সিংহ বাংলায় বললেন, "হ্যালো, রাতুল। কেমন আছ?"

"আপনি!!" বলে চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখল ডাক্তার, নার্স, বেশ কয়েক জন জার্মান পুলিশ, মরিয়ম আর একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছেন।

"জানি আমাকে তুমি এক্সপেক্ট করনি। নতুন করে পরিচয় দিই, আমি হলাম ইন্টারপোলের অফিসার। ডেভিড অরেলস্টাইনকে ধরার জন্য আমরা অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছিলাম। তিনি জেমসের নাম ভাঙিয়ে ক্রাইম করে যাচ্ছিলেন। ইনি হচ্ছেন এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারী এবং মাফিয়া ডন। এখন অবশ্য জেল-এ। ওকে ধরার জন্য তোমাকে আমরা টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন আসল জেমস অরেলস্টাইন মানে ওনার ভাইপো। উনি আর মরিয়ম আমাদের সাথে সহযোগিতা না করলে অবশ্য এটা হত না। চিন্তা করতে পার, ডেভিডের বয়স এখন প্রায় একশ দশ? দেখলে তো বোঝাই যায় না! এই করেই সে বার বার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে।"

জেমস এগিয়ে এসে বললেন, "আমি তোমার গ্রান্ডফাদারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ডেভিড কাল রাতে ক্যাসেলে ঢুকতেই পুলিশ গোপনে ক্যাসেল পুরো ঘিরে ফেলেছিল। আর তুমি জ্ঞান হারানোর পরেই আমরা

ল্যাবরেটরির সিঁড়িতে পৌঁছেছি। তবে তোমার সাহসের তারিফ করতেই হবে। তোমাকে তোমার ক্যাসেলে পাকাপাকিভাবে থাকার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

রাতুল উঠে বসে হেসে উত্তর দিল, "না, আমি বাড়ি যাব। কলকাতা।"

ছবিঃ শিমুল

শিশুকুমার সাধুখাঁর বাড়ির একতলার ঐ বড় বড় জানালাওয়ালা, হাওয়া বাতাস খেলার জন্য সারারাত জানালা খুলে রাখা একটা ফ্ল্যাট। সে যে কী বিচ্ছিরি একটা চড়ুইপাখির খোপের মত ঘর!

তবে ওরা এখন ভাগ্যিস আর সে বাড়ির ভাড়াটে নয়, আর থাকেও না গোলাপবালা সরকার লেনের চৌহদ্দির মধ্যে। ওরা এখন থাকে অনেক দূরে, অন্য শহরে। ও পাড়ার চোরেদের কেউ চিনে ফেলবে, এমন কোন সম্ভাবনাই তো নেই এখন আর!

তাই বানিয়ে বললেই বা কি।

নিশুতি রাতে যারা বাড়িতে আসে, তারাই চোর।

সেবার এসেছিল, নলিনীপিশিদের বাড়িতে।

ওরা সেদিন ঘুমুচ্ছিল।

রোজ রাতে যেমন ঘুমোয় আর কি। নলিনীপিশির বর নিতিনপিশে হাঁ করে চিৎ হয়ে, নাক ডেকে। নলিনীপিশির মেয়ে পুঁটি বাবা আর মায়ের মাঝখানে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে। আর নলিনীপিশি উপুড় হয়ে, উশখুশ করতে করতে!

সকালে উঠতে হয় নলিনীপিশিকে, পুঁটির স্কুল থাকে বলে। উঠে ঘুমচোখে হাতড়াতে হাতড়াতে রান্নাঘরে গিয়ে, এক বার্নারে ফ্রাইং প্যান অন্য বার্নারে চায়ের জলের পাত্র বসিয়ে, ঘুমচোখে, জলের পাত্রে ডিম ভেঙে দিয়ে আর ফ্রাইং প্যানে জল ঢেলে গুবলেট পাকিয়ে, তারপর পুঁটিকে টেনেটুনে ঘুম থেকে তুলে, স্নানে পাঠিয়ে, স্নান থেকে বের করে আধরান্না হওয়া খাবার খাইয়ে, দুদিকে দুটো ঝুঁটি বেঁধে, ইস্কুলের জামা পরিয়ে, স্কুলবাসের দিকে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে, ওকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসে ধপাস করে আবার শুয়ে পড়ার আগেই, হঠাৎ, দেখে ফেলল, জানালার পাশে পিশের অফিসের ফোলিয়ো ব্যাগ কেমন যেন কেতরে রয়েছে!

দেখেই তো খটকা লেগেছে। তারপর ফোলিয়ো ব্যাগ তুলে দেখে কিসসু নেই ভেতরে। শুধু রাশি রাশি কাগজপত্র। অনেক কাজের জিনিশ থাকে ব্যাগে।

বুকটা ধ্বক করে উঠল।

তারপর দেখল, পাশেই জানালাটা খোলা, যেমন থাকে রোজ রাত্তিরে। কেননা ঘরে হাওয়া না খেললে ঘুমোতে পারেই না পিশে, পিশিও না।

তারপর ব্যাগের অবস্থান আর গ্রিল লাগানো জানালার অবস্থান দেখে আন্দাজ করল ডিটেক্টিভের মত, দু মিনিটে, আমাদের নলিনীপিশি। বাইরে! জানালা দিয়ে হাতটুকু ঢুকিয়ে ব্যাগশুদ্ধু বার করে নিতে পারেনি রাতের অতিথি। তাই জিনিশগুলো একে একে বার করে নিয়েছে।

বেরিয়ে এল দ্রুতপায়ে। দেখল, ঠিক ওই জানালার বাইরে ছোট্ট যে প্যাসেজটা, সেইখানে লাইন দিয়ে সাজানো রয়েছে ব্যাগ থেকে একে একে বার করে আনা সবরকম জিনিশ। কাগজ, ফাইল, ডায়েরি, চশমার খাপ, এমনকি পেনড্রাইভ দাঁতনকাঠি মশলার কৌটো পর্যন্ত। ব্যাগটা বড়, আটকে গেছে গ্রিলে। শুধু জিনিশগুলো চালান হয়েছে বাইরের প্যাসেজে। আর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। যদি থাকে টাকাকড়ি।

কিন্তু নাঃ। চোরের কম্মো এটা, কিন্তু চোর বাবাজি সফল হননি। কেননা পিশে টাকাপয়সা ওই ফোলিও ব্যাগে রাখেনা।

তবে গেল কী? গেল কী?

হুলস্থুল হাঁউমাঁউ করে ডেকে তুলেছে পিশি, পিশেকে। উঠে ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই পিশের তিনকাপ চা লেগে গেছে। তারপর ভাল করে দেখে শুনে বলেছে পিশে, নাঃ ব্যাটারা যত বুদ্ধিমানই হোক। আমার বুদ্ধিকে টেক্কা দিতে পারবে না। আমি তো টাকা রাখি প্লাস্টিকে। মানে, ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ডেই বেশির ভাগ টাকা তুলি, অল্প করে তুলে, খরচ করি। তাইই। কিসসু নিতে পারেনি।

কিন্তু টর্চটা কোথায় গেল?

পিশের ব্যাগে টর্চ থাকে রাত্তিরে ফেরার সময় রাস্তার আলোটালোগুলো সবসময় জ্বলে না বলেই। সেই টর্চ আর খুঁজেই পেল না যখন, বুঝল চোরের দরকারি অন্তত একটা জিনিস ব্যাগ থেকে খোয়া গেছে।

অন্য ঘরে পিশে পড়াশুনো করে, পাশের প্যাসেজ ঘুরে চলে গেছে সেই দিকে। ওঃ মা! সেই ঘরে এতক্ষণ যাবার কথা তো মনেই হয়নি! এখন হঠাৎ কী মনে হওয়াতে ওইদিকে গিয়ে দেখে, সর্বনাশ, জানালার গ্রিলে একটা লম্বামত কঞ্চি ঠেশ দিয়ে রাখা কেন?

তারপর একে একে উদ্ধার হল, কী কী চুরি গেছে। গ্রিলের ছোট ফুটোয় হাত ঢোকেনা, কঞ্চি ঢোকে। কঞ্চি ঢুকিয়ে দিয়ে ডগায় ফাঁশিয়ে , একে একে জিনিশগুলো খুব কায়দা করে, তুলে নিয়ে তারপর গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বার করে নিয়েছেন চোর বাবাজি। এভাবেই, কম্পিউটারের পাশে রাখা ঘড়িটা হাওয়া! টাকার পেটমোটা ব্যাগটা পড়ে আছে জানালার বাইরে, তবে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড খোয়া যায়নি, গেছে দুশো তিরিশটাকা আর কিছু খুচরো!

তাহলেও, দুঃখ কম নাকি! ওই ঘড়িটা বিয়েতে পেয়েছিল পিশে। আর একটু হলে মোবাইল ফোনটাও যেত, ওটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তুলে আনতে গিয়ে পারেনি, জানালার একেবারে কোণায় সিঁটিয়ে পড়ে আছে মোবাইলটা। যাক ।

২

এরপর থেকে আর নলিনীপিশি ঘুমোতেই পারত না। রোজ ঘুম থেকে উঠে পড়ত মাঝরাত্তিরে, মনে হত বাড়ির আশেপাশে কারা যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন মাঝরাতে উঠে জানালায় দেখেছিল কে যেন টর্চ মারছে। চোখে আলো লাগল। সে রাত তো ঘুমোতেই পারল না , পিশেকে ডেকে তুলে হাউমাউ করে বলল, এ বাড়িতে, এ পাড়াতে আর থাকব না। চোরের আড্ডা।

জানালায় ইতিমধ্যেই ভাল করে ছোট ছোট ফুটো ওয়ালা জাল লাগিয়ে নিয়েছিল নলিনীপিশি। কাজেই চোর বাবাজি হাত ঢুকিয়ে ম্যানেজ করতে পারবেন না। কঞ্চি ঢোকালেও, জিনিশ টেনে বার করতে পারবে না।

কিন্তু ওই যে, গরমের সময়ে রাত্তিরে জানালা না খুলে শুলে ঘুম আসে না পিশির। জানালা বন্ধ রাখলে ঘরটা যেন একেবারে একটা গুদোমঘর হয়ে যায়।

সব শুদ্ধু, একটা চোরের জন্যই শেষ মেশ ওই পাড়া ছাড়তে হল নলিনীপিশিকে।

৩

এর অনেক বছর পর, একটা নতুন পাড়ায় দোতলায় দিব্যি আরামে ছিল নলিনীপিশি আর পিশে। এতদিনে অনেকটা বড় হয়ে গেছে পুঁটিও। এখন কলেজে পড়ে। পিশের অফিস পিশির অফিস, দুটোই দিব্যি চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুঁটি দেখল, কী যেন একটা হয়েছে। বাবা মা

দুজনেই ফিসফিসিয়ে কথা বলে শুধু। খুব যেন অশান্তিতে আছে। মাঝে মাঝে কম্পিউটার খুলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কাজ করে বসে বাবা। মা, বাবাকে বোঝায়, এত খেটো না ব্যাপারটা নিয়ে।

আর তা ছাড়া, তুমি ত আর সারা পৃথিবীর সব অন্যায় থামাতে পারবে না, এই একটা চুরি ধরলেই কি আর তোমার দেশ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে?

কী ব্যাপার, একদিন জিগ্যেস করেই বসল পুঁটি। জানল বাবার অফিসে একটা ভীষণ গোপন অডিটের কাজ হচ্ছে। কাজটা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে, কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরেও খবরের কাগজ আর টিভির নিউজের লোকেরা জানতে পারে এটার কথা, তাহলে আর রক্ষে নেই। সব জায়গায় খবরটা ছয়লাপ হয়ে যাবে। এটা একটা বিশাল মাপের স্ক্যাম।

স্ক্যাম মানে কি,পুঁটি বিলক্ষণ জানে। যাকে বলে পুকুর চুরি। একটা চোর যখন মানিব্যাগ, ঘড়ি বা মোবাইল ফোন চুরি করে, আমরা চীৎকার করি। কিন্তু আমাদের দেশে বড় বড় চোরেদের দল আছে, তাদের দেখলে চোর বলে চেনা যায় না। মানুষের জন্য সরকার থেকে অনেক টাকা বরাদ্দ করে, কিন্তু মানুষের কাজে লাগার বদলে , তার থেকে অনেকটা ওই চোরেদের পকেটে গিয়ে ঢুকে পড়ে। কেউ জানতে পারে না। বা জানলেও বলতে পারে না।

এখন পিশে যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, সেই ডিপার্টমেন্টে ইন্টারনাল অডিট নামে একটা বিভাগে পোস্টিং পেয়েছে। সে দলটার কাজই এই। অফিসের ভেতরে কেউ কোন টাকা নয়ছয় করছে কিনা, কেউ গোপনে পুকুর চুরি করছে কিনা, সেটা জানাই কাজ।

আর, পিশেমশাই হঠাৎ, বেশ বড় বড় চোরেদের একটা বিশাল চুরি ধরে ফেলেছে। এই রিপোর্ট বানাতেই এখন হিমসিম পিশে। সাহায্য করছে পিশিও ।

পুঁটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে থাকে। আগে, অনেক বছর আগে, নিজের মাকে না ঘুমিয়ে চোরের চিন্তায় রাত কাটাতে দেখেছে, তবে এবারের মত নয়।

বড়ো বড়ো চোরেদের হাতে কঞ্চি থাকে না। তারা রাত বিরেতে এসে টর্চের আলোও ফেলেনা। শুধু , সবার অজান্তে সব গরিব মানুষের টাকা চলে যায় তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

রিপোর্টটা বেরোনর পর পিশেকে ডিপার্টমেন্ট বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছিল। আর, জেলে গেছিল বেশ কিছু ধুরন্ধর চোর।

গ্রাফিক্সঃ ইন্দ্রশেখর

ছোটুর খাওয়া দাওয়া

চিত্ত ঘোষাল

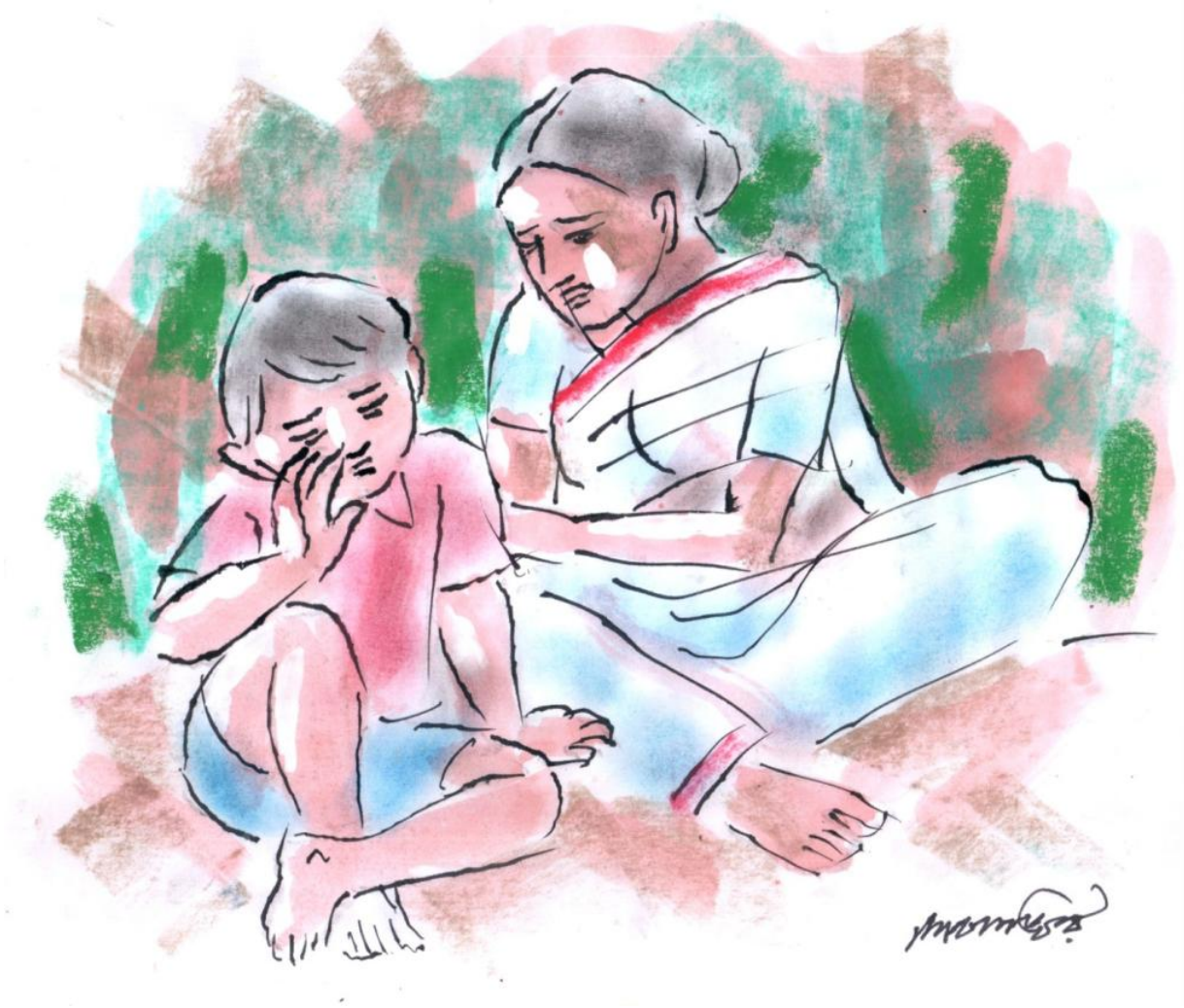

ছোটু খেতে ভালোবাসে। একটু বেশিবেশিই ভালোবাসে। জন্মাবার পরই নাদুসনুদুস সুনামটি সে পেয়েছিল। নাদুসনুদুস কথাটায় কোনো দোষ নেই, বরং বেশ একটা আদর- আদর ভাব আছে। কিন্তু এখন ঠাম্মা ছাড়া আর কেউ তার সম্পর্কে ওই কথাটা বলে না। বাড়ির অন্যরা কিছুই বলে না। ইস্কুলের বন্ধুরা যা মুখে আসে তা- ই বলে। মোটু, গজকচ্ছপ, হোঁদলকুতকুত – এই রকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কত কী।

একদিন ইস্কুলে এইসব শুনে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল ছোটুর। বাড়ি ফিরে ছ'খানা পরোটা আর আট পিস আলুর দম দিয়ে টিফিন করেও যখন মনের কষ্ট কাটল না, তখন ঠাম্মার পাশে বসে খুব কাঁদল ছোটু।

তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে ঠাম্মা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দাদুভাই? কাঁদছ কেন? মা বকেছে?"

"না.....।" ছোটু তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে ইস্কুলের সব কথা বলল ঠাম্মাকে।

শুনে ঠাম্মা রেগে আগুন, "কী! আমার নাতিটা একটু নাদুস- নুদুস তাই কারও সহ্য হয় না। সব বাপ- মায়ের কুশিক্ষের ফল। আসুক আজকে খোকা, এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।"

খোকা মানে ছোটুর বাবা। সে অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতে ঠাম্মা তাকে ডেকে পাঠাল।

"কী ব্যাপার মা? এত জরুরি তলব?" বাবা বলল।

ঠাম্মা ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে ইয়াব্বড়ো করে ছোটুর দুঃখের কথা বলে বলল, "শোন খোকা, এর বিহিত তোকে করতেই হবে। ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারকে বলে বাঁদরগুলোকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা কর।"

"কিন্তু মা, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে হেডমাস্টারমশাইকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? তা ছাড়া অত বাচ্চাকে উনি ঠেকাবেন কী করে?"

"তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ঠাম্মা, "এটা কি বাপের মতো কথা হল খোকা?"

ঠাম্মার কথায় বাবার বোধহয় একটু অপমান হল। বলে, "এত এত খেয়ে আর পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে তোমার নাতির চেহারাখানা যা হয়েছে..."

বাবাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঠাম্মা, "ছিঃ! ছি ছি ছি ছি ছি ছিঃ ছিঃ! ওইটুকু তো খায়। তা নিয়েও বাপ হয়ে তুই খোঁটা দিস। যা, তোর মুখদর্শন করতে চাই না আমি।"

বাবা তখনকার মতো পালিয়ে বাঁচল।

দিন কয়েক পরে ছোটু একদিন ঠাম্মাকে চুপিচুপি বলল, "ঠাম্মা, আমার না পা- টনটন হাঁটু- কটকট করে।"

"কী সর্বনাশ," ঠাম্মার চোখ কপালে, "রোজ করে?"

"হ্যাঁ, রোজ করে।"

"হায় হায়! এ তো ভয়ানক কথা। হাঁটু কটকট করবে আমার, তোর কেন করবে? খোকা, ও খোকা..."

ঠাম্মার চিৎকারে বাবা ছুটে এল।

"ডাকছ কেন মা? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বড়ো কোনো বিপদ হয়েছে," বাবা বলল।

"হয়নি! ছোটুর পা টনটন করে, হাঁটু কটকট করে..... বিপদ না?"

"ঠিক আছে," বাবা বলল, "কাল পাড়ার শম্ভু ডাক্তারকে দেখিয়ে আনব।"

ঠাম্মা রেগেমেগে ধমক দিল, "কী বুদ্ধি! শম্ভু ডাক্তার জ্বরজারি পেটখারাপ সারাতে পারে, এসব কঠিন ব্যামোর চিকিৎসা তার কম্ম নয়। ছোটুকে বড়ো ডাক্তার দেখাতে হবে।"

বাবা ঠাম্মাকে যেমন ভক্তি করে, ভয়ও করে। বলল, "বেশ, তুমি যখন বলছ ব্যথা-বেদনার বড়ো ডাক্তার দামোদর খাঁড়ার কাছে নিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, তা- ই যাবি।"

দামোদর খাঁড়া ভীষণ বড়ো ডাক্তার। পাঁচশো টাকা ফি। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেয় না কোনো রুগিকে। ছোটুকে নিয়ে তার বাবা গেল চেম্বারে। সাত দিন আগে নাম লেখাতে হয়েছিল। ছত্তিরিশ নম্বরে ছোটুর ডাক এল।

ছোটুকে নিয়ে বাবা ডাক্তারের ঘরে ঢুকতে ডাক্তার বলল, "রুগি কে?"

"এ।" বাবা ছোটুকে দেখিয়ে বলল।

"আপনি?"

"আমি এর বাবা।"

ডাক্তার কটমট করে ছোটুর দিকে তাকিয়ে থেকে বাবাকে বলল, "বলে যান কী কী কষ্ট।"

বাবা অনেক কথা বলার চেষ্টা করছিল, ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বাস্ বাস্, আর বলতে হবে না। যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে।" বলে ডাক্তার খাঁড়া ঘচঘচ করে প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগল। লিখতে লিখতেই বাঁ হাতখানা বাবার দিকে বাড়িয়ে বলল, "দিন। পাঁচশো।"

বাবা তার হাতে পাঁচশো টাকার একখানা নোট দিল। ড্রয়ার খুলে ডাক্তার নোটখানা রেখে ঘটাং করে ড্রয়ার বন্ধ করে প্রেসক্রিপশন বাবার হাতে দিল। তখন সে তাকিয়ে ছিল ছোটুর দিকে। ছোটুর মনে হল মুখখানা যেন এখন একটু হাসি- হাসি। ছোট্ট করে যেন তাকে একটা ভেংচিও কাটল ডাক্তার। ছোটু অবাক হবে না ভয় পাবে বুঝতে পারছিল না।

এদিকে বাবা প্রেসক্রিপশন নিয়ে পড়ে দেখে তাতে একটা ছড়া লেখা।

বেশি খেলে মোটা হয়
মোটা হলে ব্যথা হয়।
ব্যথা চাও সারাতে?
খাওয়া হবে কমাতে।

"এ কী! এ তো একটা পদ্য!" অবাক বাবার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"পদ্যে প্রেসক্রিপশন লেখা যাবে না এমন কোনো আইন আছে নাকি? জানেন আপনাদের ভালোর জন্যে যদি আমাকে ডাক্তার না হতে হত তাহলে আমি কত বড়ো কবি হতাম?"

ছোটুর মনে হল ডাক্তারের গলায় একটু দুঃখ, একটু রাগ।

বাবা ভয়ে ভয়ে বলল, "তা নয়। মানে, আগে তো কখনও এমন দেখিনি তাই..."

"ঠিক আছে। প্রায় এক মিনিট সময় বাজে নষ্ট হল। আসুন।" ডাক্তার বলল।

বাড়ি ফিরে বাবা ঠাম্মাকে সব বলল। শুনে ঠাম্মার সে কী রাগ কী রাগ।

"ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার! ওইটুকু শিশুকে বলে খাওয়া কমাতে! বাড়বৃদ্ধি হবে কী করে? ডাক্তারি করে কেন, ছড়া লিখলেই পারে। খোকা, তুই বিশু ঠাকুরপোর কাছে ছোটুকে একবার নিয়ে যা। ওর পরামর্শ নে।"

পাড়ার বিশুদাদু ঠাকুরদার ছেলেবেলার বন্ধু। খুব বুদ্ধি তার মাথায়। তার বুদ্ধির এক- আধ টুকরো পাবার জন্যে অনেকে যায় তার কাছে। বাবাও ছোটুকে নিয়ে গেল। তাদের দেখে বিশুদাদু বলল, "এই যে হরার ব্যাটা খোকাবাবু, কী সমিস্যে তোমার? আমার কাছে তো সমিস্যে ছাড়া কেউ আসে না।"

লজ্জা পেয়ে একটু ঘাড় চুলকোল বাবা, তারপর ছোটুর ব্যথা- বেদনা, ডাক্তার দেখানোর সব ঘটনা বলল বিশুদাদুকে। বিশুদাদু শুনল মন দিয়ে। তারপর ছোটুকে কাছে ডেকে পেটে একটা ঠুসো মেরে বলল, "পেট তো নয় যেন জয়ঢাক। তা মোটকু মিয়া, খ্যাঁটন কমানো যাবে কি?"

ঠুসোটায় পেটে বেশ লেগেছিল ছোটুর, সে ঠুসোর জায়গাটা খামচে ধরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

"বোঝা গেল, বিশুদাদু বলল, গিলিংশাই যেমন চলছে চলবে।" তারপর কপালে আঙুলের টোকা মারতে মারতে চোখ বুজে মিনিটখানেক ভাবল। চোখ খুলে দাঁত- নেই হাসি হেসে বলল, "খাওয়া কমানো না যাক বাড়ানো তো যাবে। মোটকু মিয়া, চল্ আমার সঙ্গে। তুমি বাড়ি যাও হে ছোটুর পিতা মহাশয়।"

ছোটুর খাওয়া বাড়িয়ে ওর কী উপকার হবে? বুঝতে পারে না বাবা। তবু বিশুদাদুর মুখের ওপর তো কথা বলা চলে না। সে ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরে। ওদিকে ছোটুর কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বিশুদাদু বলে, "যা আজ খাওয়াব তোকে রোজ খাবি। যত বেশি খাবি তত

ভালো হবে তোর। প্রথম প্রথম খাওয়ার সময় তোর সঙ্গে আমি থাকব। পরে একলা একলা। বাড়িতে ইস্কুলে যেমন খাস খাবি। কোনো কিচ্ছু কমাতে হবে না। কিন্তু একটা কথা, তোকে আজ আমি যা খাওয়াব তার কথা কাউকে বলতে পারবি না এখন। মাকে না, বাবাকে না, ঠাম্মাকে না, বন্ধুদের না, কাউকে না। যখন আমি অনুমতি দেব তখন বলবি। প্রমিস?"

ছোটুর মুখে হাসি ফুটেছে, সে বিশুদাদুর বাড়ানো হাতে হাত রেখে বলল, "প্রমিস।"

তিন মাস পরের ঘটনা। ছোটু খাচ্ছে- দাচ্ছে আগের মতোই। কিন্তু বুকের থেকে তিন ইঞ্চি এগিয়ে থাকা ভুঁড়ি এখন পিছিয়ে গিয়ে বুকের সমান। আগের চাইতে ছোটু এখন অনেক ছটফটে, চনমনে। ঠাম্মা ছাড়া সবাই খুশি।

ইস্কুলের বন্ধুদেরও এটা চোখে পড়ছিল। একদিন ক্লাসের বন্ধু বিভু বলল, "কী ব্যাপার বল্ তো ছোটু, কোথায় গেল তোর সেই থলথলিয়া ভুঁড়ি? কী করে সিলিম হচ্ছিস? খাওয়া- দাওয়া কমিয়ে দিয়েছিস নাকি?"

"দূর পাগলা, কমাব কেন, বাড়িয়েছি।" ছোটু বলল দুষ্টু- দুষ্টূ হেসে।

"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"ইয়ার্কি না, সত্যি বলছি। টিফিনে দেখিস না? কমিয়েছি?"

"না তো। তবে?"

"বাড়িয়েছি।" জোর দিয়ে বলল ছোটু।

এর মধ্যে আরও দু'চারজন বন্ধু জুটে গিয়েছিল। তাদের একজন বলল, "খাওয়া বাড়িয়ে কেউ সিলিম হয়? আমরা বুদ্ধু নাকি যে যা বলবি তা- ই বিশ্বাস করে নেব?"

"বেশ ছুটির পরে কাল তোদের দেখাব। নিজের চোখে দেখবি খাওয়া কত বাড়িয়েছি।"

পরদিন বিশুদাদুর অনুমতি নিয়ে ইস্কুলে গেল ছোটু। ছুটির পরে বন্ধুদের নিয়ে গেল দত্তদিঘির পাড়ে। স্কুলব্যাগ নামিয়ে রেখে বন্ধুদের বলল, "তোরা এইখানে দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ আমার খাওয়া।" বলে দিঘির পাড় ধরে দৌড়তে শুরু করল ছোটু।এক পাক খেয়ে এসে দশটা ডিগবাজি খেল। আবার এক পাক। আবার দশটা ডিগবাজি। এমনি করে ছোটু পাক খায় আর ডিগবাজি খায়। বন্ধুরা অবাক হয়ে ওকে দেখতে থাকে। ঘেমেনেয়ে একসময় থামল ছোটু। হাঁপাতে হাঁপাতে বন্ধুদের বলল, "কেমন দেখলি আমার খাওয়া?"

"খাওয়া! কোথায় খাওয়া?" সাদিক বলল।

"বা রে," ছোটু বলল, "দিঘিটাকে দশ পাক খেলাম, প্রত্যেক পাকের শেষে দশটা করে ডিগবাজি খেলাম। মোট খেলাম দশটা পাক আর একশোটা ডিগবাজি। কম খেলাম? তোরাই বল্। এগুলো খেতে শুরু করার পর থেকেই, বুঝলি কিনা, আমি একেবারে ফিটস্য ফিট। অন্য খাওয়াও সব আগের মতোই চলছে। এই ধর্- না বাড়ি গিয়ে সাঁটাব কমসে কম এক ডজন লুচি, ছোলার ডাল দিয়ে। এখন মানবি তো তোরা খাওয়া বাড়িয়েও রোগা হওয়া যায়?"

বন্ধুরা মাথা চুলকোতে লাগল। আর ফুলকো ফুলকো লুচির স্বপ্ন দেখতে দেখতে ছোটু ছুটল বাড়ির দিকে।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

অলকানন্দা রায়

ভাদ্র মাসের গুমোট গরম। মাঝেমধ্যে জোর বৃষ্টিও হচ্ছে। মাঠগুলোতে ধানগাছগুলো লকলকিয়ে উঠেছে। ধানের ক্ষেতেও তখন জল। আমাদের জোয়ার- ভাঁটার দেশ বলে জল খুব একটা জমে থাকে না। কিন্তু বাগানে বা নীচু জায়গায় জোয়ারের সময় জল এসে গর্তগুলো বুজিয়ে দেয়। আর এই গর্তেই সাপেদের আস্তানা। মানুষ যে পরিবেশে থাকে, তার জন্য সেই পরিবেশই উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বরিশাল জেলা নদীর দেশ আর এই নদীর ধার ঘেঁষেই বসতি এবং খালগুলো শিরা উপশিরার মত গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। প্রতি বাড়িতে দুটো-তিনটে করে পুকুর। জোয়ার- ভাঁটার দেশ বলে মাটি খুব উর্বর। বাগানে সাপ, বেজি, গোসাপ সব ঘুরে বেড়ায়। মাঝে- মধ্যে গৃহস্থ বাড়িতে এদের আগমন হয়। সব থেকে বেশি আসে সাপ। বর্ষাকালে সাপের খুব উপদ্রব হয়।

আমাদের বাড়িতে হাঁস পোষা হত। কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দেয়া হত ওদের ঘরে, তবু কী করে যে সাপ ঢুকত কে জানে। ফলে প্রায়ই হাঁস মরে যেত। সন্ধ্যের পরে বেরোলে টর্চ নিয়ে, না হয় হ্যারিকেন নিয়ে বেরোতে হত। গ্রামের সব বাড়ি প্রায় কাঁচা। খড়ের বা শনের চাল। সাপেরা সেই চালেও থাকত। কারুর চোখে পড়লে চিৎকার চেঁচামেচি, তারপর লাঠি দিয়ে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় থাকত না। আমাদের বাড়ির উঠান বড়ো, বর্ষার সময়ে ইঁট পেতে দেওয়া হত এঘর থেকে ওঘরে যাবার জন্য। অনেক সময়ই কেউ যাচ্ছে, তা দেখে সাপ। সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক, “ওরে! সাপ এখানে! লাঠি আন!” কত সাপ যে এভাবে মরেছে!

একবার আমার ছোড়দা একটা সাপকে লাঠি দিয়ে এমন জোর মেরেছিল যে মাথাটা ছিঁড়ে গিয়ে কোথায় যে পড়ল, কেউ আর খুঁজে পায়নি। গ্রামের বাড়িতে প্রচলিত বিশ্বাস আছে, সাপ আহত হলে ফিরে এসে কামড়ায়। ছোড়দার কান্ড দেখে রাঙাদাদা বললেন, “ভাইডি, কামডা ত ভাল কর নাই! যাই হোক, এবার আমরা মা মনসার নামে চাঁদ সওদাগর থিয়েটার করমু।”বেশ কিছুদিন পরে সাপের মাথাটা পাওয়া গেছিল রেনুদের চালের উপরে।

যা বলছিলাম; ভাদ্রমাসের ঘটনা। আমার দিদির তখন বিয়ে হয়ে গেছে। ভাদ্রমাসের প্রথম দিকে সে আমাদের বাড়ি এসেছিল। শেষদিকে তাওইমশাই তাকে নিতে এসেছেন। দিদি তখন সন্তানসম্ভবা। গরমের জন্য মেঝেতে বিছানা করা হয়েছে পাটি পেতে। দু’পাশে মা

ও দিদি, মাঝখানে আমি শুয়েছি। দিদি চলে যাবে, তার উপরে তাওইমশাই এসেছেন। পিঠেপায়েস হয়েছে সেদিন। মা, জেঠিমা মিলে আবার সেগুলো রান্নাঘরে গুছিয়ে রেখেছেন।

তখন কত রাত হবে কে জানে, মা'র ঘুম ভেঙে গেল রান্নাঘরের দিক থেকে একটা শব্দ শুনে। মা মশারি খুলে বেরিয়ে আস্তে করে জ্বালানো হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে গেছেন। ভাবছেন বিড়াল, না কি বনবিড়াল আবার ঢুকল?

বড়োঘরের পর একটা শোবার ঘর, তারপর রান্নাঘর। মা গিয়ে দেখেন, সবই তো ঠিক আছে! আবার ঘরে ঢুকে মুখ ধুয়ে হ্যারিকেনটা রেখে পান খেতে বসেছেন। পানের নেশা ছিল মা'র। পানটা সবে গালে দিয়েছেন, দেখেন পায়ের দিকের মশারিটা খুব নড়াচড়া করছে। মা নিজের মনেই বলছেন, ''ছোডোমাইয়াটার শোয়া বড় খারাপ, কোথায় শুয়েছে আর কোথায় গেছে...মশারিটারে এবার ছেড়বে- ''

কথাগুলো বলে আমাকে ঠিক করে শোয়াবেন বলে মশারিটা তুলেছেন যেই, অমনি "ওরে বাবা রে, মস্ত বড়ো সাপ যে মশারির মধ্যে!!" বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন। দিদি তখন আধাঘুমে। মা'র চিৎকার শুনে সে- ও উঠে পড়েছে। মা বললেন, ''ওরে টাইনগা বাইর কর।"

দিদি আমার হাত ধরে টেনে বের করছে আর আমি ঘুমের ঘোরে ভাবছি বুঝি ডাকাত এসে দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠেছি, ''বাঁচাও বাঁচাও" বলে। সঙ্গেসঙ্গে বাড়ির এঘরের সব লোক উঠে পড়েছে। কেউ হাতে টর্চ,কেউ লাঠি নিয়ে হাজির।

তারপর তো মশারি পুরো খুলে দেওয়া হল। আলো জ্বালানো হল। "খোঁজ,খোঁজ- কোথায় গেল ?"

বড়দাও তখন বাড়িতে। বড়দা, বউদি, কবিরাজদাদারা উত্তরের ভিটের ঘরে শুতো। সব ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। নাঃ, কোথাও নেই।

"পলাইয়া গেছে!"

মা বললেন যে যখন মশারি খুলছিলেন, তখন তাকে দেখেছেন উত্তর দিকের ঘরে তড়িৎগতিতে ছুটছে। ঘন্টা দুই খোঁজাখুঁজি হল। সবাই বলল, ''তোমরা এবার ঘুমোও। ও নাই ঘরে।"

আমরা তো ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। শ্রীকান্তমামু, আমাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের বোনপো, বড়দার চেয়েও বয়সে বড়- আমাদের জমির কাজ করতেন। খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ও সাহসী ছিলেন। লোকজন চলে যাবার পর শ্রীকান্তমামু তামাক সেজে খাচ্ছেন, বড়দাও একটা জলচৌকিতে বসে আছেন। দুজনেই আলোচনা করছেন সাপটা গেল কোথায়? বেশ বড়ো সাপ। দুজনেই খুব সন্দিহান। বড়দা বললেন, ''চল ছিরু,তুই আর আমি আর একবার দেখি।"

''চলেন মামা," বলে দুজনে আবার ঘরে এসে খুঁজতে শুরু করলেন। বড়দার হাতে চার ব্যাটারির টর্চ, মামুর হাতে লাঠি। বড়োঘর শেষ করে পাশের শোবার ঘরে গেলেন। ঘরটা বেশ লম্বা ধরণের। একদিকে খাট পাতা। আলনা রয়েছে। বড়োঘর থেকে খাবার ঘরে যাবার দরজার ডানদিকে একটা বিরাট সাইজের মাটির জালা, দেশে বলে মটকি, বসানো ছিল মেঝেতে। সেটায় চাল রাখা হত। তখন সেটা খালি। বড়দা আস্তে আস্তে টর্চের আলো ফেলছেন। হঠাৎ করে মটকির মধ্যে আলো ফেলতেই দেখেন যে সমস্ত শরীর গুটিয়ে মাথাটা

উঁচু করে বসে আছে সাপবাবাজি। একে তো এখন মারা যাবে না। তাহলে কী করা যায়? মটকির গা বেয়ে উঠতে পারা সম্ভব নয়। পালাবার সময় তাড়াহুড়ায় ভেতরে পড়ে গেছে নিশ্চয়।

পরামর্শ হচ্ছে, জেগে বসে থাকবে নাকি? বড়দা তখন মামুকে বললেন "যা রান্নাঘরে, রাত্তিরের খাওয়া সব কাঁসার থালা আছে। পাঁচ ছ'খানা নিয়ে আয়। ইঁট আন দুটো, পোলো আন আর ঝাঁকি জাল।" পোলো হল বাঁশের তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম। আমরা যে নেটের জাল দিয়ে খাবার ঢাকি, ঐরকম দেখতে অনেকটা, তবে ফাঁকগুলো একটু বড়ো বড়ো। উপরের জায়গাটা ফাঁকা। ওখান থেকে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরা হয়।

এরপর সেই মটকির উপর থালা চাপানো হল, তার উপরে দুটো ইট। তারপর পোলো চাপা, এর উপর জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল।

"ব্যস,এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও। সকাল হোক,তারপর ব্যবস্থা," বলে বড়দারা ঘুমোতে গেল। আমিওঘুমিয়ে পড়লাম। দিদি আর মা নতুন বিছানা পেতে শুলো, ঘুমোতে পেরেছে কি না জানি না।

সকালবেলা হইহট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল। ওরে বাবা, বাড়িতে যেন বাজার বসে গেছে। বাড়ির লোক ছাড়াও এবাড়ি ও বাড়ি থেকে লোক এসে গেছে। সবার কী কৌতুহল! গ্রামের বাড়িতে এই একটা ব্যাপার, কোথাও কিছু হলে মুহূর্তের মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পরে, "শোনছ নি,ওই বাড়ি একটা সাপ ঢুইক্যা গ্যাছে।"

আর সব থেকে মজার কথা ,সবাই পরামর্শ দেয়। গ্রামের সাপের উপদ্রব যেমন, লোকে তাদের মারেও তেমন। অত ভয় পায় না। আমাদের বাড়িতে আমার ছোড়দা ও রাঙাদাদা সাপ মারায় ওস্তাদ। তাদের সামনে সাপ পড়লে আর নিস্তার নেই।

আমি তো বিছানা ছেড়ে উঠেই ঘাটে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে একছুটে চলে এসেছি। যে ঘরে সাপ তার সামনের বেড়া বা পার্টিশন খোলা হচ্ছে। সামনেই খোলা লম্বা বারান্দা। খোলার পরে ঘরে বেশ আলো এসে গেছে। অনেকের হাতে লাঠি। রাঙাদাদার হাতে তার তৈরি সাপ ধরার ফাঁদ। শক্ত বাঁশের লাঠিতে বেড় দিয়ে ফাঁস বানানো হয়। মাছ ধরার ছিপে যেমন সুতো বেঁধে বড়শি বাঁধা হয়, তেমন করে পাতলা বেতের ফিতের মতন বাঁধা হয়। লাঠিটার মাথায় থাকে ফাঁস। সেই ফাঁসের বেতের প্রান্তটি থাকে ঝুলে, লম্বা মতন; যাতে সাপের মাথাটা ওই ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে বেতের প্রান্ত ধরে টান দেবে আর সাপের গলায় ফাঁস বসে যাবে। সাপকে তখন টেনে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর বাঁশের লাঠির পিটুনি।

এ সাপটিরও শেষ অবধি সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

****

আর একবার একটা বিরাট সাপ ধরা পড়েছিল আমাদের মন্দিরের পাশে। ছোটবেলা বাড়িতে সন্ধে দেখানোর কাজটা ছিল আমার। ঘরে লক্ষ্মীঠাকুর, মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু আর একপাশে ছিলেন কালাচাঁদ। বেশ বড়োসড়ো একটা মূর্তি। শুনেছি আমাদের দাদুর বাবা কবে অসুস্থ হয়ে স্বপ্নে কালাচাঁদকে পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি বাড়িতে অধিষ্ঠিত। তাঁর পুজোর খুব একটা উপাচার নেই। বাতাসা বা সন্দেশ, তবে সঙ্গে থাকে একটি গাঁজার প্যাকেট। একদিন সকালে আমার সামনে একজন লোক এসে জেঠিমাকে বলল, "জেঠিমা,

কাঁলাচাদের মানত করছিলাম পোলার অসুখের জন্য। পোলা ভালো হইছে, হেই জন্য পূজা লইয়া আইছি।”

তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। জেঠিমা পুজো করছিল। আমি সেখানে ছিলাম, দেখলাম, জেঠিমা একটা থালায় বাতাসা সাজিয়ে দিলেন। কালাচাঁদের ঘটটা একটা হাঁড়ি দিয়ে ঢাকা থাকত। জেঠিমা হাঁড়িটা একপাশ থেকে একটু ফাঁকা করে গাঁজার পুঁটুলি ঢুকিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দিলেন।

সন্ধেবেলা যথারীতি আমি সন্ধ্যা দিতে গেছি। সন্ধ্যা দেখিয়ে কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে ধূপ, প্রদীপ দেখিয়ে বেরোবো, হঠাৎ মনে হল দেখি তো কালাচাঁদকে যে গাঁজা দিয়েছে, তা কি সে খেয়ে ফেলেছে? কৌতুহল যে কী মারাত্মক হতে পারে তার নমুনা পেলাম মুহূর্তের মধ্যে। আস্তে করে হাঁড়িটা যেই তুলেছি, বাবা গো বাবা গো বলে চিৎকার করে লাফিয়ে মন্ডপের

বারান্দায় এলাম। কিলবিল করে একগাদা সাপ বেরিয়ে এসেছে। সন্ধ্যেবেলা উঠানভর্তি লোকজন, ছেলেপিলে। বাবা তো সকাল সন্ধে নারায়ণের মন্দিরে এসে প্রণাম করবেন। অন্যরাও করে। অতএব সবাই এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে, “কী হোইছে, কী দ্যাখছো মনু?”

কী বলব,ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছি। বাবা বললেন, “ও মাগো, কী হইছে,ক দেহি !”

“সাপ সাপ,অনেক সাপ !”

“কোথায় দেখলি ?”

তখন একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম সব। ছোড়দা তো শুনেই ঠাস করে এক চড়, “অ্যাঁ,গাঁজা খাইছে নাকি দেখতে গেছ? বেশ হইছে, তোরে জড়াইয়া ধরল না ক্যান?”

জেঠিমা এসে ছোড়দাকে থামালেন, “ওরে এবার ছাড়ান দে, মাইয়াডা ভয় পাইছে,তার উপর তুই আবার ওকে মারলি ক্যান? যা, ঠাকুরঘরে ঢুইক্যা এবার দ্যাখ সাপগুলান আছে না গ্যাছে। কাল তো মুই ই আবার পূজা করতে ঢুকমু।”

“হয় হয়,এবার সব পোলাপান লইয়া সরো দেহি।মোরা এবার কাজে লাগি।”

সর্পবিশেষজ্ঞ রাঙাদাদার মন্তব্য, "ও দেবা, হ্যাজাকটা ধরা। হীরালাল লাডি লইয়া আয় দেহি।"

হ্যাজাক জ্বেলে দাদারা সব ঢুকে পড়ল মন্দিরে। সব জায়গা খোঁজা হল, কোথায় কী? পেছনের দিকে একটা নালি আছে, যেখান থেকে ঠাকুরঘরের জল বেরোয়। নালির পাশটা ভাল করে দেখা হল। কোনো চিহ্নই নেই সাপের। মন্ডপটা পশ্চিমমুখী। পেছনে পূব দিক। সেদিকটা ঘুরে চলে এলো দক্ষিণদিকে।

খুঁজতে খুঁজতে দেখে দেয়ালের গা ঘেঁষে নীচে একটা গর্ত। তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে সাপ এখানেই। মাইজগাদাদা ছোড়দাকে বললেন, "ভাইডি, টর্চটা ভাল কইরগা ধর দেহি, এট্টু দেহি, ব্যাডারা যাবে কোনহানে?"

ছোড়দা টর্চটা গর্তের মুখে স্থির করে ধরে রইল। আর মাইজগাদাদা গর্তের একদম কাছে গিয়ে উবু হয়ে দেখতে লাগলেন। তারপরই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, "ওইতো দেহা যায় !! চক্ষুদুইডা চকচক করত্যাছে !"

ব্যস, রাঙাদাদা হুকুম দিলেন, "যা, বেতের আক্রা লইয়া আয় দেহি।"

বেতের আক্রা হল লম্বা সরু নাইলনের দড়ির মতন বেতের টেন্টাকল অংশ, সারা গা ভর্তি কাঁটা। ভীষণ শক্ত। এই কাঁটার মাথায় একটা ব্যাং লাগিয়ে সাপের গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাং হল সাপের প্রিয় খাদ্য। ব্যাংবাবাজি ভয়ে ছটফট করতে থাকে আর সাপবাবাজি এসে টপাস করে তাকে গিলে ফেলে। যতই গিলে নেয়, ততই কাঁটাগুলো গেঁথে যায়। কতক্ষণ আর এভাবে থাকতে পারে? কাবু হয়ে যায়; তখন আক্রার গোড়াটা ধরে সাপকে টেনে বের করে আনে।

এই সাপটি ছিল সাঙ্ঘাতিক শক্তিধর। সন্ধে থেকে সে দুটো ব্যাঙসহ আক্রা গিলে ফেলেছিল। আবার ব্যাঙের টোপ দেওয়া হল। রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলল এই কাজ। তারপর সবাই রণে ভঙ্গ দিয়ে শুয়ে পড়ল। বলে "বেয়ানে উইঠগ্যা আবার দেহা যাবে!"

আমরা ছোটরা খুব উত্তেজিত ছিলাম। পরদিন সকালসকাল উঠে পড়লাম। আর উঠেই মন্ডপের পাশে। সকালে খাওয়ার কথাও ভুলে গেছি। সর্পনিধনের সব সৈন্যসামন্তরাও হাজির।

"ঐ,ঐ দেহা যায়!"

"আরে,এ যে সাঙ্ঘাতিক কান্ড রে !"

কতরকম মন্তব্য। মা,জেঠিমা আমাদের খেতে ডেকে হয়রান। সবার কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে।

একটু বাদে ছোড়দা এসে এক দাবড়ানি, "ছোডমনু, কানু, বেলা, যা খাইয়া আয় আগে। তোগো এত দ্যাহনের কী আছে ?"

এক দৌড়ে গিয়ে নাকেমুখে দিয়ে আবার দৌড়ে এসে বসলাম। আমরাও দেখতে পাচ্ছি সাপটার মুখটা একদম গর্তের সামনে, বেতের আক্রাটি প্রায় গিলে ফেলেছে। যেটুকু বেরিয়ে আছে, সেটা হাত দিয়ে ধরবার অবস্থায় নেই। আর সাপটা তো গর্জাচ্ছে। রাঙাদাদা তো গভীর চিন্তিত।

গ্রামের বাড়িতে কে আর ঘড়ি ধরে কাজ করে? তবে তখন মনে হয়, বেলা সাতটা, আটটা হবে। আমাদের মজিদদাদা এসে হাজির। মজিদদাদার বাড়ি হোগলা গ্রামে, ছোড়দার

সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাতানো ছিল, যদিও তিনি বয়সে বড়ো ছিলেন। পরে ছোড়দার চাইতে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক হয়ে যায়। মজিদদাদা এসে দেখে গেলেন একবার। তারপর চলে গেলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। এর মধ্যে বড়োবউ মজিদদাদার জন্য ভাত বেড়ে ডাকছে, ওদিকে রাঙাদাদারা ডাকছে। মজিদদাদা, "রাঙ্গাভাই,দাঁড়াও এট্টু,ভাত দুইডা খাইয়া আয়ি" বলে শেষে ভাত খেয়ে ,তামাক খেয়ে,পান গালে দিয়ে এসে পড়লেন ময়দানে। এপাশ থেকে ওপাশ শুধু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। তারপর একটু চিন্তাভাবনা করে বললেন, "রাঙ্গাভাই, বড়ো বড়শি লইয়া আহ। দেহি চেষ্টা কইরগা।"

নদীতে বড়ো মাছ ধরার বড় বঁড়শি নিয়ে আসা হল। লুঙ্গি গুটিয়ে, হাতে বঁড়শি নিয়ে মজিদদাদা এগিয়ে গেলেন গর্তের কাছে। তারপর চোখের পলক ফেলার আগে বঁড়শিটা গেঁথে দিলেন সাপের মুখে। তারপর তার সুতো ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন। আমরা হাঁ হয়ে দেখছি, সাপটা আস্তে আস্তে সুতোর টানে বেরিয়ে আসছে। তিনটে বেতের আক্রা তার গলার মধ্যে, অবস্থা করুণ। ধীরে ধীরে পুরো সাপটা বের করে আনা হল। সে কী বিশাল লম্বা সাপ !! ব্যাং গিলে পেটটা ফোলা। তারপর খোনতা এনে গর্তটা একটু একটু করে খোঁড়া হল। কিলবিল করে বেরিয়ে এল একগাদা সাপের বাচ্চা। আমি তো এদেরই দেখেছিলাম!

"মোরে যে কইলা- ঠিক দেহি নাই? এখন দ্যাহো, দ্যাহো সক্কলে। তোমাগো কালাচাঁদের গাঁজা এরাই খাইছে..."

ছবিঃ মৌসুমী

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

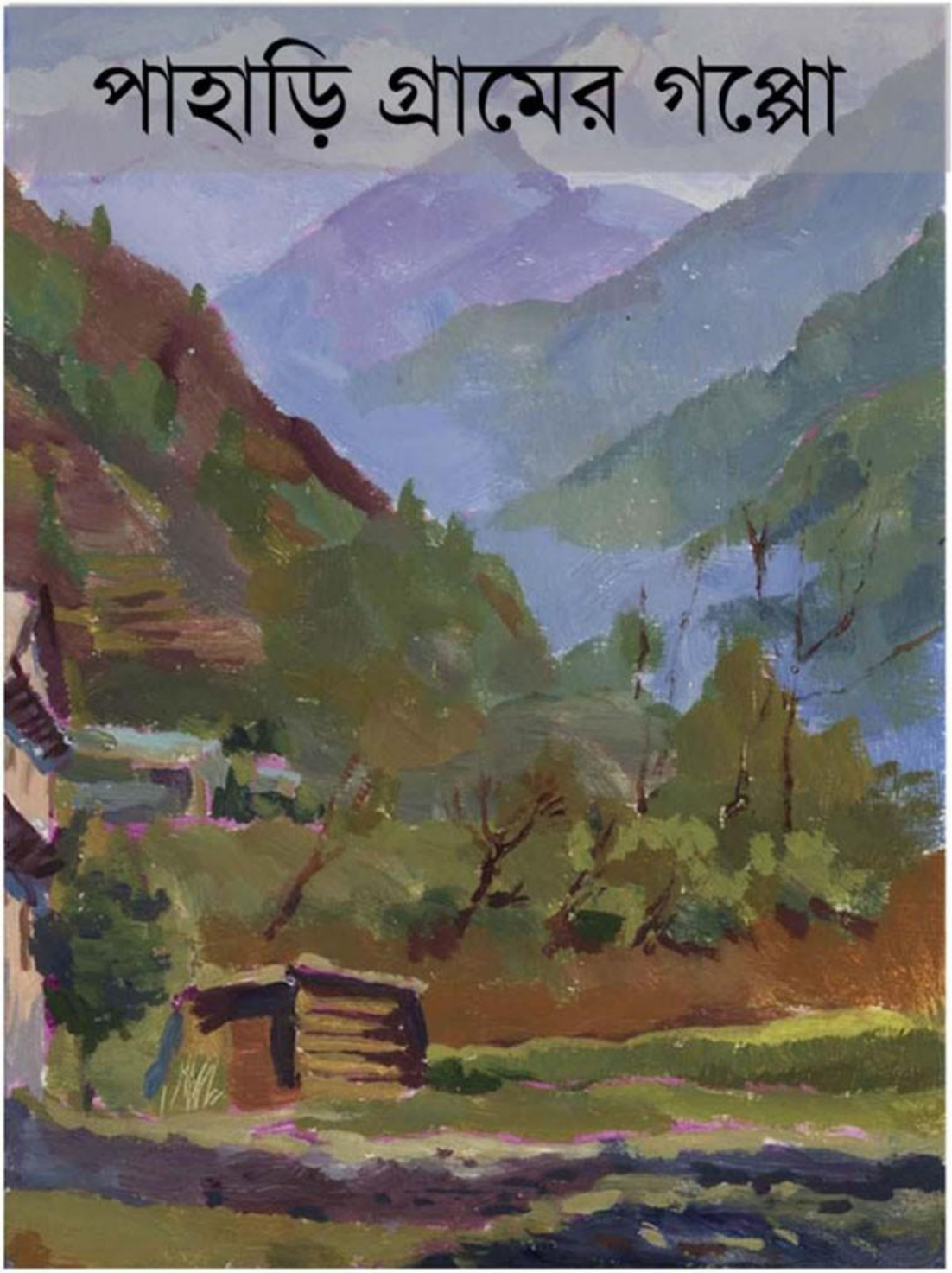

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর....."

দেবগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গের দু দুটো দেবগ্রামের সংগে তো আমিই ছোটোবেলা থেকে পরিচিত। একটা বোলপুরের কাছে বীরভূমের দেবগ্রাম আরেকটা বেথুয়াডহরির কাছে নদীয়ার দেবগ্রাম। তোমরাও কেউ কেউ নিশ্চয় জানো। এখন যে দেবগ্রামের কথা লিখছি সেটা কিন্তু উত্তরাখণ্ডের এক পাহাড়ি গ্রাম। কল্পেশ্বর মহাদেব এর মন্দিরে যেতে পথে পড়ে এই গ্রাম।

বদ্রীনাথের রাস্তায় যোশিমঠের খানিক আগে পড়ে হেলাং। সেখান থেকে বাঁহাতি রাস্তায় বেশ খানিক গেলে উরগাঁও। উরগাঁও থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গেলেই দেবগ্রাম।

পঞ্চকেদারের এক কেদার হলেন কল্পেশ্বর মহারাজ। পুরাণমতে এখানে মহাদেবের জটা অধিষ্ঠান করেন। গল্পটা সবারই জানা। মহাভারতের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা মনের গ্লানি মোছার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মহাদেব- এর তপস্যা করছেন, তাঁকে খোঁজ করছেন হিমালয়ের এদিকে সেদিকে, কিন্তু পাচ্ছেন না। পাবেন কী করে? মহাদেব যে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন যাতে তাঁকে ধরা না যায়।

এমন এক সময়ে মহাদেব মস্তো এক মহিষের ছদ্মবেশে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। মধ্যম পান্ডব ভীম তা বুঝতে পেরে পেছন থেকে জাপটে ধরলেন তাঁকে। সামনের অংশ তো হাতের নাগালের বাইরে তবু পেছনের অংশ জাপটে ধরে রইলেন। শিবঠাকুরেরও আর পালিয়ে যাওয়া হল না। মাটি ফুঁড়ে লুকিয়ে পড়ার জন্য যে ঝাঁপ দিয়েছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব, ভীমসেনের শক্তির কাছে হার মেনে অমনিই রইলেন। হিমালয়ের পাঁচ জায়গায় প্রকাশ রইল তার। জটা কল্পেশ্বরে, রুদ্রনাথে মুখমন্ডল, মধ্যভাগ মধ্যমহেশ্বরে, তুঙ্গনাথে বাহু ও কেদারনাথে পৃষ্ঠভাগ এসে পড়ল।

এও কথিত যে এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতাও পান্ডবরা। দেবগ্রাম থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে কল্পগঙ্গা পেরোলেই কল্পেশ্বরের মন্দির। বলতে গেলে গ্রামের পরেই। উরগাঁও পেরিয়ে দেবগ্রামে ঢোকার আগেই আরও এক মন্দিরের দেখা পাওয়া যায়। এর

নাম ধ্যান বদ্রী। গাড়োয়ালে মোট সাতখানা বদ্রীনারায়ণের মন্দির, যাকে একত্রে সপ্তবদ্রী

বলা হয়ে থাকে, তার একটি এইখানে। প্রাচীন এই মন্দিরটির চাতালে পাঁচখানা পাথরের তৈরি জলের উৎসমুখ। যেন কোনো প্রাণীর মুখ। সেখান থেকে জল পড়ে। পাহাড়ি ঝরনার জল।

মন্দির চত্বর নির্জন, জনমনিষ্যি নেই। হাঁকডাক, ফুল বেলপাতার ডাঁই, কোলাহল, হট্টগোল একেবারেই নেই। আমাদের সত্যিই খুব ভালো লেগে গেল বলে আমরা এখানেই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। উপলব্ধি করলাম ধ্যানবদ্রী নামটি প্রকৃতই এই মন্দিরের সঙ্গে মানানসই। ওদিকে বৃষ্টি এসে যেতে পারে বলে আমাদের এক বন্ধুর তাড়ায় উঠতেই হল। দেবগ্রাম সীমানাতে এসে ভিজে একসা হলে কেমন কথা। ফলে আমরা বিষ্ণুর শরণ ছেড়ে মহাদেবের দিকে চললাম। দুপুর দুপুর গিয়ে পৌঁছলাম দেবগ্রামে। এখন গ্রামের ঘরদোর সবই প্রায় পাকা হয়েছে। বিদ্যুতের আলো এসেছে। পায়ে চলা রাস্তা কংক্রিটের হয়েছে। আমরা যখন গ্রামে ঢুকে পড়েছি আমাদের সাথে সাথেই আটজন লোক বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা ছোটো ট্রান্সফরমার নিয়ে এলো। আগেরটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই। দেখতে ওইটুকু হলে কী হবে। বেজায় ভারী। আটটা শক্তিশালী লোক পালা করে করে একটু একটু পথ হেঁটেছে খানিক বিশ্রাম আবার হাঁটা ; আমাদেরই মতো। মানে পাঁচ কিলোমিটার। ঘেমে নেয়ে হাঁপিয়ে একসা। অকুস্থলে পৌঁছিয়ে ঘাম মুছে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল। এবারে আলো জ্বলার কোনো সমস্যা রইল না। এবারে জায়গামত আটকে দেওয়া। তা ধীরে সুস্থে করা যাবে খন।

এত প্রত্যন্ত গ্রামে রাজিন্দর নেগি-র বাড়িতেই হোটেলের মতো থাকার ব্যবস্থা, বলতে গেলে এলাহি ও রাজকীয়। কাঠের রেলিংঘেরা বারান্দায় বসে সামনের উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকলেই মন ভালো হয়ে যাবে।

দেবগ্রামে চাষের জমি বিস্তর। চাষও হয় চমৎকার। গম, রাজমা, রামদানা, আলু, বাঁধাকপি আর হ্যাঁ স্কোয়াশ। গরম গরম আটার রুটি আর স্কোয়াশের তরকারি খেয়ে আমরা যেন বাগানে বেড়াতে বেড়িয়েছি, এমন চালেই চললাম কল্পেশ্বর মন্দিরের দিকে। গ্রামের বাঁধানো পথ, চাষের জমির মাঝখান দিয়ে বাড়িঘরদোরের পাশ দিয়ে পড়ল গিয়ে হালকা জঙ্গলের পথে।

হাঁটতে হাঁটতে জলের শব্দ শুনলাম। তারপর সে নদী দেখতেও পেলাম। কল্পগঙ্গা। তার ওপরে একটা ঝোলা পুল পেরিয়ে ওপারে কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নিরিবিলি। আমরা ভিন্ন আর দর্শনার্থী নেই। একটা গুহামতন জায়গাকে মন্দিরের রূপ দেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে পাথরের অনেক মূর্তি, এবং সবগুলিই যথেষ্ট প্রাচীন। শিব—পার্বতী, গণেশ, নন্দী মহারাজ, নটরাজ, এইমতো।

মূর্তিগুলির প্রাচীনতা এবং শিল্প বিচার করলে এক একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। অবলীলায় অযত্নে পড়ে আছে একপাশে। মন্দির দেখে, শিবঠাকুরের কাছে ধূপ জ্বেলে, জল ঢেলে আমরা ফিরে এসে এক সাধুবাবার ডেরায় এসে বসলাম। সাধুবাবা খুব অমায়িক। স্বাভাবিক গপ্পগাছা চলতে চলতে উনি আবার আমাদের জন্যে চা- ও বানিয়ে ফেললেন।

আমরা বললাম, "আপনার ছবি তুলব?"

হেসে বললেন, "তা বেশ তো নাও না।" তারপর কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। এখন আর কোথায় কোথায় যাব সে কথাও জিজ্ঞেস করলেন আমাদের।

অনেকক্ষণ গপ্প করে আমাদের আবার খিদে খিদে লাগছিল। আমরা সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে ঝোলাপুল পেরিয়ে এপারে এসে পায়ে পায়ে একেবারে নদীর জলের কাছে পাথরের ওপরে গিয়ে বসলাম। খাবার দাবার সঙ্গেই ছিল। অমনি শুরু হয়ে গেলো আমাদের পিকনিক। ঠান্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আমাদের ভোজনপর্ব যা জমে উঠেছিল যে কী বলব! আমরা ক'জন, বয়ে যাওয়া নদী, তার পারের অসংখ্য ছোটো বড়ো বোল্ডার, অজস্র নুড়িপাথর এইই। নদীর উৎসের দিকে জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে গেছে। ওইদিকে খানিক এগোতে একটা চমৎকার ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড।

বিকেলের মধ্যে রাজিন্দরজির বাড়িতে ফিরে ঠিক হল রাতে রান্নাটা আমরাই করব। ওনাকে বলতেই মিসেস নেগি আমাদের একটা স্টোভ ধার দিলেন। আর আমার এক বন্ধু তক্ষুণি সেটা নিয়ে তেল ভরে প্রবল বিক্রমে পাম্প দিতে শুরু করল। তা দেখে শ্রীমতী নেগি তো হেসে খুন। অনেক কসরতের পর স্টোভটা না ধরাতে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে সত্যিই আমরা খাবার বানাতে পারব কিনা! আমরা প্রবলভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলাতে এবং নিশ্চয় স্টোভটাতে কোনো গোলমাল আছে এই সন্দেহ প্রকাশ করাতে, উনি কথা না বাড়িয়ে আলগোছে স্টোভটা বারান্দার এক কোণায় নিয়ে বাতাস আড়াল করে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শুধু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিজেদের ঘরে নেমে যাবার সময় মুচকি হেসে বলে গেলেন, "অসুবিধে হলে বোলো আমার রান্নাঘর কিন্তু খোলা আছে।"

অসুবিধে অবশ্য হয়নি। খিচুড়ি রান্না ঠিকঠাকই হয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলা পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ঠান্ডা উপেক্ষা করেও আমরা কাঠের রেলিং দেওয়া বারান্দায় অনেকক্ষণ বসেছিলাম। সামনের পাহাড় অপূর্ব আলোয় ভেসে যাচ্ছিল।

সকালে রোদ ওঠার পর লেপের তলা থেকে বেরিয়ে বাইরে রোদে পিঠ করে বসে

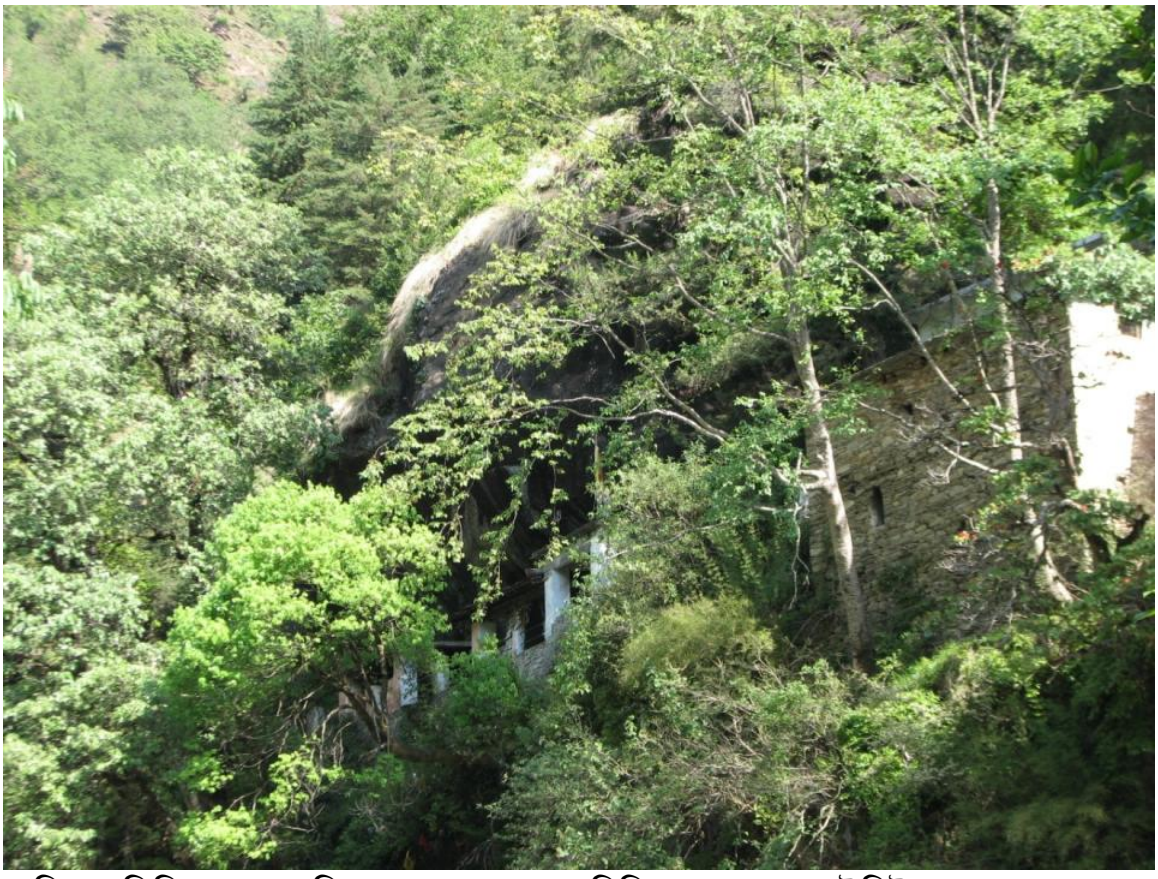

আছি। নেগিজি এসে চা দিয়ে বলে গেলেন ভাবিজি বলেছে নাস্তা উনিই বানাচ্ছেন, আমরা যেন রাতের মত আবার নিজেরাই না বানাতে বসি।

ছোটখাট উচ্চতার একজন মানুষ, বয়েস মেরেকেটে ত্রিশ বত্রিশ, হাসি হাসি মুখে নীচের রাস্তা ধরে এই বাড়ির দিকেই এগিয়ে এলেন।

"নমস্কার। জি। নমস্কার- "

পালটা আমরাও নমস্কার করলাম।

"মেরা নাম কুঁয়ার সিং নেগি। রাজিন্দরজি মেরা ভাইয়া। সাগা নেহী লেকিন ভাইয়া।" অর্থাৎ নিজের নয় তবে রাজিন্দরজি কুঁয়ার সাবের ভাইই বটে।

"আপ?"

এবারে আমাদের পালা। আমার এক বন্ধু দেবু সবিস্তারে আমাদের পরিচয় দিয়ে আমাদের আসবার উদ্দেশ্য জানাল। আমরা এবারে রুদ্রনাথ যাব শুনে সে তো খুবই উল্লসিত। গড়গড় করে পথের বিবরণ এবং সে ক'বার ওপথে গেছে তার বিশদ জানাতে থাকল। লোকটি নেহাৎই ভালোমানুষ, কিন্তু তাকে থামাতেই হল। বলা গেল যে আমাদের সঙ্গে আমাদের দুই বন্ধু আছেন তাঁরা এলাকারই বাসিন্দা, অর্থাৎ কী না গাড়োয়ালি। তাঁরা এসব পথঘাট বিলক্ষণ চেনেন। মালপত্র বয়ে দিয়ে তাঁরাই সাহায্য করছেন।

লোকটি এক মুহূর্ত হতাশ হল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চাঙ্গা হয়ে বলল, তাতে কী, তোমরা তো আবার আসবে, তখন নিশ্চয় লোকের দরকার হবে, বা নিদেন তোমাদের বন্ধুরা তো আসবে কেউ না কেউ, তাদের দরকার হতে পারে; তো আমার নাম লিখে রাখো, আর হ্যাঁ আমার মোবাইল নম্বর।

বলাকওয়া চা পান শেষ করে লোকটি পাশের রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে দেখল গতকালের আনা ট্রান্সফর্মারখানা বসানো হচ্ছে। সেও ওদের সঙ্গে হেইয়ো জোয়ান বলে জুটে গেল দিব্যি।

রুটি খেতে খেতে নেগিজির উঠোনের ফুলগাছের আশপাশে দেখি একটা কালচে ধূসর রঙের পাখি লেজ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাচানোর সময় বসে আছে তারপর লাফিয়ে এদিক সেদিক যাচ্ছে। পোকা খুঁজছে সম্ভবত। আকারে সাধারণ চড়াইয়ের মতো। লালচে বাদামি লেজ। পেটের কাছটাও লালচে। আর ছোট্ট তেকোনা ঠোঁট। নেগিজিকে ইশারায় ওর নাম জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, "চিরবিরা।"

ভাবিজি আর রাজিন্দর নেগি-র থেকে বিদায় চেয়ে আমরা গ্রামের উত্তর পশ্চিম দিকে পাহাড় ভাঙতে আরম্ভ করলাম। ওদিকেই রুদ্রনাথের পথ। দেবগ্রাম বেশ ছড়ানোছিটানো। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে। সমৃদ্ধ গ্রামই বলা চলে। আমাদের আসার খবরও দেখছি অনেকেই জানে। বাইরের লোক বলতে এই আমরা ক'জন। আর আমাদের চিনে ফেলাটাও সোজা। বেশভূষা কথাবার্তা চালচলন সবই যে এখানকার লোকের থেকে আলাদা। তবে আমাদের গাড়োয়ালি বন্ধুরা সহজেই এদের সাথে মিশে যাচ্ছে। যে দেখছে আমাদের, সকলেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। রুদ্র মহাদেবের কাছে যাচ্ছি বলে কথা। এখনও কত পথ! গ্রামের ওপরের দিকে প্রায় গ্রামের শেষ সীমানাতে গ্রাম-দেবতার পাকা গাঁথুনির মন্দির। সেখানে জল খাবার পর ফিরে দাঁড়িয়ে দেবগ্রামকে বিদায় জানালাম।

রাখী নাথ কর্মকার

জেটল্যাগের জন্য তারপরের ক'টা দিন কেমন যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই কেটে গেল ঠুমরির। তার মাঝেই ঠুমরি খালি চারিদিকে চেয়ে দেখে আর অবাক হয়-- এখানে সব কিছুই কেমন যেন ইন্ডিয়ার থেকে উলটো--- লাইটের সুইচ উলটো, গাড়ির ড্রাইভিং বাঁদিকে, রাস্তায় হাঁটা ডাইনে !...মা বলেছে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কানুন মেনে চলা হয়, আমেরিকায় তার ঠিক উলটো সবকিছু ! ঠুমরির আরো মজা লাগে যখন দেখে, ভারতে গরমে ঘেমেনেয়ে ঘরে ঢুকলে ঠান্ডিমেশিন রয়েছে শরীর ঠান্ডা করার জন্য, আর এখানে বাইরে বরফ ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য ঘরে রয়েছে হিটিং সিস্টেম !

ওদের নিউ জার্সির অ্যাপার্টমেন্টের সামনেটায় ফাঁকা জমিতে ছোট্ট একটুকরো রঙিন পার্ক, বসন্তের আগমনে পিছনে একটা গোলাপি চেরিগাছ উপচে পড়েছে ফুলে, একটা আকাশরঙা ব্লু জে পাখি ' জে জে' করে অনেকটা টিয়াপাখির মত তীক্ষ্ণস্বরে পাড়া মাতাতে থাকে সারাটা দিন।

একগুচ্ছ ভ্যাকসিনের পাট চুকিয়ে এখানকার প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে ঠুমরি। সারাটাদিন স্কুলেই কেটে যায় ওর, কিন্তু স্কুলে যেতে ওর মোটে ভালো লাগেনা।

'বন্ধু' শব্দটা নেহাতই যেন বাহুল্য এখানে। ' বুলিং' কাকে বলে ও আগে জানত না। এখন জেনে গেছে। ওর মানে হল উপদ্রব করা। কেউই ওর পাশে বসতে চায় না, লাঞ্চটাইমে পাশে বসে খেতে চায় না, ওর সঙ্গে খেলতে চায় না। ঠুমরি এখন একা, একা আর একা।

মা বুঝিয়েছে, "তুমি সকলের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করবে। দেখবে, ঠিক বন্ধু পাবে।"

কিন্তু কই তা তো হয়নি এখনো! ও সকলকেই সাহায্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু ও একদিন স্কুলে যেতে পারে নি, কেউ ওকে আগের দিনের ওয়ার্ড নোটগুলো দিল না। শেষে মিস রড্রিগাজের কাছ থেকেই ওকে চাইতে হল। সেদিন লাঞ্চটাইমে খেতে খেতে হাতে একটু ডিমের টুকরো লেগে

গিয়েছিল। অমনি পাশের বেঞ্চে বসে কার্লোস, টাইলর, মার্থা সব্বাই ' এও! এও!' করে চিৎকার করতে শুরু করে দিল!

তড়িঘড়ি লাঞ্চবক্স বন্ধ করে রেস্টরুমে হাত ধুতে ছুটেছিল ঠুমরি। সেদিন গ্রুপ প্রজেক্টের সময় মেগান ডেস্কটা নাড়াচ্ছিল, অথচ নির্লিপ্তভাবে দোষটা চাপাল ঠুমরির ঘাড়ে, আর মিস রড্রিগাজ মেগানের কথাই বিশ্বাস করে ওর রিসেসটা অফ করে দিলেন!

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে টানা প্রায় সাতদিন ছুটি পড়ে গেল স্কুলে। স্প্রিং ব্রেক। স্কুল যাওয়ার বিচ্ছিরি জীবন থেকে মুক্তি। কিন্তু বাড়িতে বসেই বা কীভাবে সময় কাটাবে ভেবে ভেবে আকাশপাতাল এক করে দিয়েছে ঠুমরি। একে তো কাছের লোকেদের কাছে না পাওয়ার কষ্ট, তার ওপর এই একলা একলা থাকা- ঠুমরির কিছুই যেন ভাল লাগে না!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে হঠাৎ রজতকাকু এসে হাজির, "আরে ঠুমরি! এতবড়ো ছুটিটা কী করে কাটাবি রে? বাড়ি না বসে থেকে চল, আমরা কোথাও ঘুরে আসি। ওয়েদারটাও এ'বছর বেশ ভালোই ঠেকছে। টেম্পারেচার পনেরো- ষোল ডিগ্রির কাছাকাছিই থাকবে। আর চুপিচুপি জানিয়ে দি-- আমার আগাম টিকিটও কাটা হয়ে গেছে! হুঁ হুঁ ! তাহলে এই শনিবারই আমরা ঘুরে আসব..দ্য মাজেস্টিক স্ট্যাচু অফ লিবার্টিইইইইইই ...

ঠুমরি যেন হাতে চাঁদ পেল! মা বাবাও প্রায় এক কথায় রাজি। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ওপর গত সপ্তাহেই স্যোশাল স্টাডিজে পড়েছে ঠুমরি। স্কুলের ফার্স্ট মার্কিং পিরিয়ডে এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ওপর প্রজেক্টও করতে হবে।

আর তর সইছিল না ঠুমরির। প্রচন্ড উৎসাহের সঙ্গে শনিবার কী পরে যাবে তা স্যুটকেসটা থেকে আজ বার করতে গিয়েই হঠাৎ স্যুটকেসের কোণায় ভাঁজ করে রাখা কালো জিনসটার পকেট থেকে টুক করে কী যেন একটা গড়িয়ে পড়ল মেঝের কার্পেটে ! আরে! এতো সেই ম্যাজিক ' আওয়ার গ্লাস' টা ! এই কদিনে এটার কথা তো ও পুরোপুরি ভুলেই গিয়েছিল!

******

শনিবারের ঝকঝকে সকালের তকতকে রোদ্দুর গায়ে মেখে, ফুরফুরে শিরশিরে হাওয়ায় উড়তে উড়তে রজতকাকুর গাড়িতে করে যখন স্টেটেন আইল্যান্ডে এসে নামল ওরা সব্বাই, তখন নীল আকাশে খুশির পলকা মেঘে হাসি হাসি ' স্মাইলি ফেসের' ছড়াছড়ি! ঠিক যেন কলকাতার শীতের সকালের পিকনিক হচ্ছে। মা সক্কালবেলা থেকেই যত্ন করে তৈরি করেছেন নানা ধরনের খাবার। আলুর পরোটা, ডিমের তরকারি, ভেজিটেবল চপ। সব পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়েছেন সঙ্গে। এছাড়াও সঙ্গে আছে ঘরের তৈরি কেক, কলা, আপেল আর মিষ্টি। তা দিয়েই গাড়িতে বসে সারা হয়ে গেল সকালের ব্রেকফাস্ট।

রজতকাকু মানুষটিকে ঠুমরির ভারি ভাল লাগে। ছোটমামার মত মজারু, আর ছোটপিসির মত যত্নশীল। কত্ত গল্প যে তার স্টকে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কলকাতাতেও বাবার সাথে একই প্রজেক্টে কাজ করতেন।বিয়ে থা করেন নি। কাকুর বাবা মারা গেছেন ছোটোবেলায়। মাও মারা গেছেন কয়েকবছর আগে। কোন পিছুটান নেই। বাবার অনেকটা আগে থেকে এ দেশে আছেন। ছুটিছাটা থাকলে তাঁকে বাড়িতে পাওয়াই যাবে না, তাই 'উড়নচন্ডী' শব্দটার সঙ্গে মিলিয়ে মা

রজতকাকুর এক মজারু নাম দিয়েছেন ‘ঘুরনচন্ডী’। ঘুরনচন্ডী মানুষটা এখানকার অনেক জায়গা ঘুরে নিয়েছেন এর মধ্যেই। আজ তাই কাকুই ওদের গাইড।

গাড়ি থেকে নেমে নরম রোদ্দুরে হাত পা সেঁকে নিয়ে, ফেরি করে ওরা চারজনে এবার এসে পৌঁছল ব্যাটারি পার্কে। এই ব্যাটারি পার্ক থেকেই ওদের লিবার্টি আইল্যান্ডের যাওয়ার টিকিট অনুমোদন করাতে হবে।পার্ক থেকেই দূরে দেখা যাচ্ছিল আপার নিউ ইয়র্ক বে আর হাডসন রিভারের সংযোগস্থলে - নীল অস্থির ঢেউএর বুকে জেগে থাকা ছোট্ট লিবার্টি আইল্যান্ডটিকে, আর সেই আইল্যান্ডের ওপর মাথা উঁচু করে নির্নিমেষে চেয়ে থাকা দেবী লিবার্টির সবুজ মূর্তিখানি।

কাকু বলতে শুরু করলেন, " জানিস ঠুমরি, ১৬২৪ সালে স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৮৫- ৯৫

সাল পর্যন্ত এই নিউ ইয়র্ক শহরটি ছিল আমেরিকার রাজধানী । বিশ্বের মানচিত্রে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক - প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এই শহরের শ্রেষ্ঠতা সন্দেহের ঊর্দ্ধে। নিউইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো শহর। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরও অবস্থিত এখানেই। আর এই সর্বজনীন শহরটির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ওই যে দূরে লিবার্টি আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সবুজ স্বাধীনতার দেবী স্ট্যাচু অফ লিবার্টি।"

কথা বলতে বলতেই কখন যেন স্ট্যাচু ক্রুজের ফেরি এসে গিয়েছিল। সেই খেয়ায় চেপে হাডসনের গম্ভীর ঢেউএর মাথায় নাচতে নাচতে ওদের ফেরি চলল আইল্যান্ডের দিকে। ডেক থেকেই ভিড় করে থাকা পর্যটকদের রোগা, মোটা চেহারার জটলার ফাঁক দিয়ে ঠুমরির চোখে পড়ছিল স্ট্যাচু অফ লিবার্টির মূর্তিটি । চারপাশে সকলে পটাপট, খটাখট ক্যামেরায়, মোবাইলে ছবি তুলে যাচ্ছে, দেবীসাক্ষাতের মুহূর্তটুকুকে বন্দি করে রাখতে চায় সবাই চিরদিনের মত! ঠুমরির চারপাশে ওরই বয়সের কয়েকটি মেয়ে, মাথায় লিবার্টির স্পাইকঅলা সবুজ মুকুট পরে

মহানন্দে লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঠিক যেমন কলকাতায় ওদের স্কুলের গো অ্যাজ ইউ লাইক কম্পিটিশনে কেউ রানি, কেউ পরী সেজে মাথায় মুকুট পরে ঘুরে বেড়াত সেইরকম। মাথার ওপর গাংচিলগুলো কী নিশ্চিন্তে ডেকের ওপর পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে!

আইল্যান্ডে নেমেও দেখে বেশ মজা হল। লোকেদের পায়ের কাছেই তিড়িং বিড়িং গঙ্গাফড়িংএর মত নেচে বেড়াচ্ছে পাখিগুলো। হাতে করে কেউ কিছু খাবার দিলে অকুতোভয়ে দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, "এখানে অকারণে কেউ এদের মারে না বা ক্ষতি করে না, তাই এরাও মানুষকে ভয় পায় না। দুষ্টুলোকের পাল্লায় পড়লে কবেই এরা প্লেটে রোস্ট হয়ে চলে আসত!"

ইশশশশশ! শুনে এত খারাপ লাগল ঠুমরির যে ও ঠিকই করে নিল, ও একেবারে পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাবে! যদিও হ্যাঁ-- স্বীকার করতেই হবে মায়ের হাতের মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চপ ওর দারুণ প্রিয় ! খাবারগুলোর কথা মনে পড়লেই ওর জিভে জল চলে আসে...কিন্তু ...নাহ, এবার লোভ সামলাতেই হবে, হবেই হবে!

"দেখ ঠুমরি, তুই এখন একশ আঠাশ বছরের পুরোন, পৃথিবীবিখ্যাত ধাতুর মূর্তি ' স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' র পেডিস্ট্যলে।"

পাথুরে পেডিস্ট্যলের খোলা চৌহদ্দিতে রজতকাকুর কথাগুলো সমুদ্রের ঝোড়ো নোনা হাওয়ার তাড়ায় ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতই ফুরফুরিয়ে উড়ে গিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছিল, "জানিস ঠুমরি, মুক্তি আর স্বাধীনতার প্রতীক স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আসলে ফ্রান্সের দেওয়া এক অনুপম উপহার যা ১৮৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার শতবর্ষ উপলক্ষে তার ঠিক দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স তুলে দিয়েছিল আমেরিকার হাতে। ১৯২৪ সালে যা আমেরিকার জাতীয় সৌধ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রোমান স্বাধীনতার দেবী লিবার্টাসের আদলে তৈরি এই দেবীর পরনে ভারী, ঢোলা পোশাক। পেডিস্ট্যল থেকে ১৫১ফুট উঁচু লিবার্টির পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে ভাঙা শিকল যা আসলে অন্যায়ের বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রতীক। শক্ত লোহার খাঁচার ওপর ছোট ছোট তামার পাতের টুকরোয় মোড়া মূর্তির বাঁ হাতে আইনের ফলক যাতে রোমান হরফে খোদাই করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাদিবস- ৪ জুলাই, ১৭৭৬। আর ডান হাতে স্বাধীনতার সোনালি জ্বলন্ত মশাল। সমুদ্রের নোনাজলের অত্যাচারে তামার সেই রং এতদিনে বদলে গিয়ে কেমন অদ্ভুত সবুজ রঙ ধরেছে! দেবীমূর্তির মাথার মুকুটের সাতটি ছটা আসলে সাতটি মহাসাগর ও মহাদেশের প্রতীক। জনশ্রুতি এই যে, ফরাসী ভাস্কর ফ্রেডেরিক অগস্ত বারথোল্ডি, যিনি স্ট্যাচুটি তৈরি করেছিলেন, তাঁর মায়ের মুখের আদলেই নাকি তৈরি হয়েছিল দেবী লিবার্টির সুন্দর মুখখানি।"

ঠুমরির কানে ছাড়াছাড়া এসে পৌঁছচ্ছিল কথাগুলো। এগুলো অবশ্য মোটামুটি সবই ওর জানা। এখানে স্কুলের স্যোশাল স্টাডিজে এগুলো পড়েছে ও।

পেডিস্ট্যল থেকে আলোআবছায়ায় ১৫৪টি পাকানো সিঁড়ি বেয়ে ওরা চারজনে যখন স্ট্যাচুর ক্রাউনে এসে পৌঁছল, এই হিমেল হাওয়াতেও দরদরিয়ে ঘামছে ওরা সবাই। ক্রাউনের ২৫টা চৌখুপ্পি জানালা থেকে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল দূরের নিউ ইয়র্ক শহরটাকে ! নীচে তখন

লিবার্টি আইল্যান্ডে এসে থামা স্ট্যাচু ক্রুজের আর একটি ফেরি থেকে পিঁপড়ের মত ছোটো ছোটো মানুষগুলো নেমে আসছিল পিলপিল করে।

ক্রাউন থেকে আবার ওরকমই পাকানো অন্য একটি সরু সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে লিবার্টির কিছু অজানা গল্প বলতে শুরু করেছিলেন রজতকাকু, "লিবার্টির আইডিয়াটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিল বল তো ঠুমরি? ফরাসি অধ্যাপক এডোয়ার্ড দ্য লেবুল্যের। ১৮৬৫ সালে এক কান্ট্রি হাউসে তাঁরই ডাকা একটি ভোজসভায় তিনি প্রথম প্রস্তাব রাখলেন, আগামী ১৮৭৬ সালে ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমেরিকার স্বাধীনতার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফ্রান্সের তরফ থেকে আমেরিকাকে কোন উপহার দেওয়া যায় কিনা।

"আইডিয়াটা মনে ধরেছিল তরুণ ফরাসি শিল্পী ফ্রেডেরিক অগস্ত বারথোল্ডির। ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সে তাঁর জন্ম।ছেলেবেলায় বাবা মারা যান। শিল্পকলার প্রতি তাঁর অদম্য আকর্ষণ দেখে মা তাঁকে প্যারিসে শিল্পকলা নিয়ে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। গ্রিস, রোমের নিওক্ল্যাসিক্যাল শিল্পরীতিতে তৈরি বীরোচিত, সমীহজাগানো অমর কীর্তিস্তম্ভের মহান আদর্শ তাঁকে মোহিত করত।

"১৮৫৬ সালে প্রথমবার যখন ইজিপ্টের ম্যাজিক দুনিয়ায় তিনি পা রাখলেন, প্রাচীন সুউচ্চ পিরামিডের অভিজাত রূপ আর বিপুলাকায় স্ফিংক্সের রহস্যময়তা অজান্তেই সম্মোহিত করে তুলেছিল বারথোল্ডিকে। স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল এমনই কিছু তৈরি করার, যা সমস্ত পৃথিবীকে হতবাক করে দেবে।

"ইতিমধ্যে ১৮৭০ সালে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করে, শুরু হয় ফ্রান্স প্রাশিয়ার যুদ্ধ ।এক অস্থির, টালমাটাল সময় চলছিল তখন, অবশেষে ১৮৭১ সালে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ও যুদ্ধ শেষে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিক গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়।

১৮৭১ সালের জুন মাসে নিউ ইয়র্ক এসে হাজির হলেন বারথোল্ডি। আপার নিউ ইয়র্ক হার্বরের কাছে ছোট্ট বেডলো' স আইল্যান্ডটি দেখেই তাঁর মনে হল এটাই সেই জায়গা, যেখানে মাথা তুলে দাঁড়াবে তাঁর লিবার্টি! লেবুল্যের ছিল প্রচুর চেনাশোনা।সেই সূত্র ধরেই ইউ এস প্রেসিডেন্ট ইউলিসেস এস গ্রান্ট ছাড়াও আরো অনেকের সঙ্গেই ইতিমধ্যে বারথোল্ডির দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

ফ্রান্সে ফিরে প্রায় চার বছর ধরে এরপর পোড়ামাটির মডেলের পর মডেল তৈরি করে চললেন তিনি। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখ, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি, কলোসাস অফ রোডস' তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। গ্রিক সূর্যের দেবতা হিলিওসের আদলে তৈরি ব্রোঞ্জের সেই মূর্তিটি ২২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। শোনা যায়, সেই মূর্তিটিরও ডান হাতটি ছিল উত্তোলিত ভঙ্গিমায়, মাথার মুকুটেও ছিল স্পাইক। লোকে তাঁর লিবার্টির মূর্তিটি সেই প্রাচীন মহিমান্বিত স্থাপত্যটির সঙ্গে তুলনা করবে তা জানতেন বারথোল্ডি। তিনি চেয়েওছিলেন, তাঁর লিবার্টি হবে 'এ যুগের কলোসাস'।

"১৮৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর পাঁচ ফুটের কাছাকাছি লিবার্টির প্রাথমিক মডেলটির প্রদর্শন করা হয় ফ্র্যাঙ্কো-আমেরিকান ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের এক বিখ্যাত হোটেলের

ব্যাঙ্কোয়েট হলে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনীয় অর্থের জোগাড় করা। সেই প্রাথমিক মডেলটি এখন প্যারিসের লাক্সামবার্গ গার্ডেন পার্কে সংরক্ষিত আছে। ১৮৭৬ সালে মশালসমেত লিবার্টির ডানহাতটি ফিলাডেলফিয়ায় এবং ১৮৭৮ সালে লিবার্টির মাথাটি প্রদর্শিত হয়েছিল প্যারিসে।

"যাই হোক, ছুতোর মিস্ত্রী, মেটাল ওয়ার্কার, প্লাস্টারার -- বারথোল্ডির তত্ত্বাবধানে বাছা বাছা দক্ষ ফরাসি শিল্পী ও কারুবিদদের প্রায় নয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশেষে তৈরি হয়েছিল সেই মূর্তি।

"এইখানে আরো একজন বিখ্যাত মানুষের কথা না বললে লিবার্টির ইতিহাস প্রায় না-বলাই রয়ে যাবে। তিনি হলেন আলেকজান্ডার গুস্তাভ আইফেল, যিনি প্যারিসের সুবিখ্যাত আইফেল টাওয়ার তৈরি করেছিলেন। ছোট ছোট পাতলা তামার পাত জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণ মূর্তিটি তৈরি করতে গিয়ে বারথোল্ডি দেখেছিলেন, শুধুমাত্র তামার পাতগুলিরই সবসুদ্ধ মোট ওজন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল প্রায় একত্রিশ টনেরও বেশি। এত ভারী মূর্তিটি কোন কঠিন, শক্তপোক্ত অবলম্বন না হলে কোনমতেই টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। বারথোল্ডি তখন লিবার্টির মেরুদন্ড অর্থাৎ লোহার খাঁচাটির নকশা করবার কঠিন দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন 'লোহার জাদুকর' আইফেলের হাতে। স্ট্যাচুর ঠিক মাঝখানটিতে ওঠানামার জন্য আইফেল তৈরি করেছিলেন একজোড়া পাকদন্ডী সিঁড়ি। মূর্তির কাঠামোর জন্যও তিনি কারটেন ওয়াল নামে এক নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

"১৮৮৪ সালের মধ্যেই বারথোল্ডির ' স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এদিকে কী হয়েছিল, বিপুলায়তন লিবার্টির মূর্তিটি স্থাপন করার জন্য ঠিক তেমনই একখানি প্রকাণ্ড, শক্তপোক্ত ভিতের প্রয়োজন ছিল, যা তৈরি করার ভার দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান স্থপতি রিচার্ড মরিস হান্টকে। কিন্তু টাকার অভাবে আমেরিকায় সেই কাজ ততদিনে বন্ধ হয়ে গেছে।

বারথোল্ডি পড়লেন অথই জলে। তবে কি তাঁর স্বপ্ন সফল হবে না? এতকিছুর পরে লিবার্টি কি নিউ ইয়র্ক হার্বারে তার নিজস্ব ঠাঁইটি পাবে না? ঠিক এমন সময়, সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন 'দ্য ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্রের মালিক জোসেফ পুলিতজার! ওঁর নামেই সাংবাদিকতা, সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এখন 'পুলিতজার প্রাইজ' দেওয়া হয়। কোটিপতিদের কঠিন সমালোচনা করে তিনি কাছে ডেকে নিলেন সাধারণ মানুষকে। কথা দিলেন, পেনি থেকে ডলার - যে যাই দান করুক, প্রত্যেকের নাম প্রকাশ করবেন তাঁর কাগজে। শ্রমিক, মজুর, বুড়ো, জোয়ান, অভিবাসী, স্কুলের ছোট পড়ুয়া- - সব্বাই সাধ্যমতন চাঁদা দিলেন। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই প্রায় এক লক্ষ ডলারেরও বেশি জমা পড়ে গেল। জোরকদমে শুরু হয়ে গেল কাজ।

"১৮৮৫ সালের জুন মাসে, ২১৪ টি ক্রেটে প্যাক করা অবস্থায় মূর্তির টুকরোগুলি ফ্রেঞ্চ যুদ্ধজাহাজে করে এসে পৌঁছল নিউ ইয়র্ক হার্বারে। ১৮৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ' ডেডিকেশন ডে' তে লিবার্টির মুখে ফ্রান্সের পতাকার আবরণ সরিয়ে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মূর্তিকে

সম্বর্ধনা জানাল সকলে।

"স্ট্যাচু অব লিবার্টি' , বা 'লিবার্টি এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড' ছিল মুক্তি, স্বাধীনতা আর

আশার প্রতীক। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা যা না বললেই নয়, লিবার্টির এই কঠিন, শীতল ধাতব অস্তিত্বের মাঝেও উষ্ণ হৃদয়, মুক্ত প্রাণের কন্ঠস্বরের উদ্দীপনা পুরে দিয়েছিল এক তরুণী। ১৮৮৩ সালে চাঁদা তোলার সময় আমেরিকান কমিটি নিউ ইয়র্কে সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে একটি নিলামের আয়োজন করেছিল। বহু বিখ্যাত লেখকের পান্ডুলিপি তাতে ছিল। তাদের মধ্যেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এক তরুণী কবি এমা ল্যাজারাসের কাজটি। রাশিয়া থেকে অত্যাচারিত উদ্বাস্তুদের আমেরিকায় পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়ার সমসাময়িক ঘটনাদ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, ' দ্য নিউ কলোসাস'।

"এই কবিতাটিতে ' স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' বা ' মাদার অফ এক্সাইলস' এর মূল অর্থ তুলে ধরা হয়েছিল 'আমেরিকা, দ্য হোম অফ ফ্রি' হিসেবে। ১৯০৩ সালে এই কবিতার ছত্র খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল লিবার্টির পেডিস্ট্যলে। মুক্তির প্রতীক ' স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' ১কোটি ২০লক্ষেরও বেশি সেইসব বহিরাগতদের স্বাগত জানিয়েছিল যারা বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৮৯২ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যৎ ও জীবনের আশায় কাছেই এলিস আইল্যান্ডের দরজা দিয়ে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল ।"

রজতকাকুর গল্প শুনতে শুনতে নিচের লিবার্টি মিউজিয়ামটাও ওদের ঘোরা হয়ে গেল । মিউজিয়ামের আনাচেকানাচে ছড়ানোছিটানো বিভিন্ন ছবি, স্ট্যাচুর নানা সাইজের প্রতিমূর্তি রজতকাকুর গল্পেরই প্রতিধ্বনি করে চলছিল। অতীতের ঘটনাবহুল গল্পের আকর্ষণীয় দুনিয়াটায়

কখন পুরোপুরি যেন হারিয়েই গিয়েছিল ঠুমরি। হঠাৎ নাকটা সুড়সুড় করে উঠতে জিনসের পকেট থেকে রুমালটা বার করতে গিয়ে কী একটা যেন হাতে ঠেকল ওর. . . সেই আওয়ার গ্লাসটা ! এখানে আসার সময় সকালবেলায় চুপিচুপি পকেটে পুরে নিয়ে এসেছিল এটাকে ঠুমরি। এটার কার্যকারিতাটা বুঝি পরখ করে দেখতে হবে না? প্লেনের মিস্টার এহসান সুলেমান শাহ যে সত্যি কথাই বলেছিলেন, তার প্রমাণ কী? এর আগে যে দুএকবার এটাকে পরখ করে দেখার কথা ভাবেনি ও তা নয়, কিন্তু বছরে মাত্র তিনবারের ত্রিসীমানাতেই ওটার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলে সুযোগটা নষ্ট করতে চায় নি ও। ঠিক করেছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছে তবেই ওটার সদ্ব্যবহার করবে। আজই সেই সুবর্ণসুযোগটা হাতে এসেছে। আজই ঠুমরি যাচাই করে নিতে চায়, এই লিকপিকে আওয়ার গ্লাসটার দৌড় কদ্দূর। মিস্টার এহসান সুলেমান শাহের টাইমট্রাভেলের কথাটা ঠিক কতটা সত্যি আর কতটা গাঁজাখুরি গপ্পো সেইটা সে যাচাই করে নেবে আজ।

এইবারে ওর পক্ষে সবচেয়ে মুশকিল কাজ হল যে, কোন সালে ও ফিরে যাবে সেটা ঠিক করা। আচ্ছা ১৮৭৫ সালে ফিরে গেলে কেমন হয়? যখন লিবার্টির প্রাথমিক মডেলটা তৈরি করেছিলেন বারথোল্ডি?

নাকি ১৮৮৪ সালে, যখন স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' র মূর্তিটা বানানো পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল? যখন 'গ্যাজেট, গঁতিয়ে এন্ড কোম্পানি' র উঠুনের এক অনুষ্ঠানে বারথোল্ডি পরিপূর্ণ স্ট্যাচুটি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, লিভাই মর্টানের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেজেন্ট করেছিলেন আমেরিকানদের প্রতি তখন গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়? ধুত্তোরি! মাথা- টাথা সব ঘেঁটে যাচ্ছে ঠুমরির। নাহ-- আগে রেস্টরুমে যেতে হবে, নিরিবিলি একান্ত জায়গা বলতে এছাড়া আর কোন জায়গার কথা মনে পড়ল না ঠুমরির ।

মাকে বলে ও কাছের রেস্টরুমে এসে ঢুকল। খুব সাবধানে জিনসের পকেট থেকে পেনসিলটর্চের মত ছোট্ট, সরু 'আওয়ার গ্লাস'টা বার করল ঠুমরি। তার একটা প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ চেম্বার পুরো বালিতে ভর্তি, আর অন্যটা পুরোপুরি খালি।

আওয়ার গ্লাসের মাঝের প্যাসেজটা অর্থাৎ ' নেক' টা যেন কোন জাদুবলে ' লক' করা আছে, - একটা ' চেম্বার' থেকে অন্য চেম্বারে বালি ঝরে পড়ার জায়গা আছে তো? হাতে নিয়ে একবার ওটাকে ওপরনীচ করল ঠুমরি। কিছুই হল না। তাহলে কি পুরোটাই মিস্টার এহসান সুলেমান শাহের মনভোলানো গল্প? কী যেন বলেছিলেন ভদ্রলোক? আওয়ার গ্লাসটি হাতে নিয়ে ঠিক যে সময়ের কথা ও চিন্তা করবে, পৌঁছে যাবে সেখানেই---

কিন্তু কোন সময়টা সেটাই তো ও এখনো ঠিক করে উঠতে পারছে না! আচ্ছা, ' ডেডিকেশন ডে' টা ট্রাই করলে কেমন হয়? নাকি...?

একটা ' খুট' করে আওয়াজে চমকে উঠে ঠুমরি দেখল, ওপরের চেম্বারটা থেকে হঠাৎই আস্তে আস্তে, তিরতির করে বালি ঝরে পড়তে শুরু করেছে নীচের চেম্বারে! মাথাটা হঠাৎ কেমন ভারি ভারি ঠেকল ওর, কেমন যেন একটা ঝিমঝিম ভাব-

- টলতে টলতে রেস্টরুমের একটা কোণায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ে এবার ওর মনে হল

চোখের সামনে সব যেন কেমন দুলতে শুরু করেছে। ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। চোখদুটো একবার ভাল করে রগড়ে নিয়ে ঠুমরি চোখ বড়ো বড়ো করার চেষ্টা করল। ও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, ঠিক যেমন আয়নায় সবাই নিজেকে দেখতে পায় ! কিন্তু এই ছোট্ট কেবিনটায়, বন্ধ দরজার এপারে কোন আয়না নেই। তাহলে ও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে কী করে? শরীরটা যেন ভীষণ হাল্কা হয়ে গেছে ঠুমরির। হাওয়ার মত হাল্কা ! কেবিনের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে দিব্যি গলে বেরিয়ে এল ঠুমরি, অথচ পিছন ফিরে উঁকি মেরে দেখল ও কিন্তু ঠিক সেভাবেই কোণায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। হাতের ফাঁকে জীবন্ত হয়ে ওঠা আওয়ার গ্লাসটা।

কীসের একটা আওয়াজ কানে আসছিল ঠুমরির, আর ভেবে সময় নষ্ট না করে আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে সেটা খুঁজতে এদিকওদিক উঁকি মারল ও। পুরো জায়গাটাই যেন ভোজবাজির মত বদলে গেছে। রেস্টরুমের বাইরে যে প্যাসেজটা দিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পেডিস্ট্যলের মিউজিয়ামে পৌঁছোন যায় সেখানটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু দূরে একটা আলোর বিন্দু দেখতে পাচ্ছে ও। সেখান দিয়েই প্রচুর মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে ।

ক্রমশ

পূর্বপ্রকাশিতের পর

মারিয়ন ক্রফোর্ড
অনুবাদঃমহাশ্বেতা

অবশেষে আমি একদিন তার বাড়িতে গেলাম। সেদিনটা ছিল ক্রিসমাসের ঠিক আগে। আমার জাহাজ তখন বন্দরে আর আমার তিন সপ্তাহ ছুটি। বাম্বল আশপাশে ছিল না। আর আমি একটু ঠাট্টা করেই জিজ্ঞেস করলাম কুকুরটা অবশেষে মারাই গেছে বুঝি?

"হ্যাঁ," প্র্যাট উত্তর দিল। অতটুকু বলাতেই তার গলার স্বরটা খুব অদ্ভুত ঠেকল আমার। কয়েক মুহূর্ত পর সে আবার বলল, "ওটাকে মেরেই ফেলেছি। আর সহ্য করতে পারছিলাম না।" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম সে ঠিক কোন জিনিসটা আর সহ্য করতে পারছিল না। তবে উত্তরটা আমি জানতাম।

"আরে, কুকুরটার একটা বাজে অভ্যেস হয়েছিল। খালি গিয়ে ওই...মানে তার পুরোন চেয়ারটায় গিয়ে বসত আর আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত।" এই বলে লিউক যেন একটু কেঁপে উঠল। "কিন্তু বিশ্বাস কর, কষ্ট পেয়ে মরেনি বেচারা বাম্বল," সে প্রবল গতিতে বলে যেতে লাগল, যেন আমায় বোঝাতে চেয়ে যে সে নিষ্ঠুর নয়, "আমি ওর জলে কিছুটা ডায়োনাইন মিশিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে ও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর তারপর আস্তে আস্তে ক্লোরোফর্ম দিয়ে...ও কিন্তু এর কিছুই টের পায়নি, স্বপ্ন দেখতে দেখতেও নয়। এরপর থেকেই সব বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে।"

সে যে ঠিক কী বলতে চাইছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম না, কারণ তার মুখের থেকে কথাগুলো যেন জোর করে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু আজ আমি সব বুঝি। ও বলতে চেয়েছিল যে কুকুরটা যাওয়ার পর থেকে আওয়াজটা আর ও অত ঘনঘন শুনতে পেত না। হয়ত ও ভেবেছিল যে আওয়াজটা আসলে বাম্বলরই চাঁদ দেখে চিৎকার, যদিও আওয়াজটা সেই ধরনের ছিল না। অবশ্য লিউক সে কথা না জানলেও এখন তা আমি জানি। তাছাড়া একটা আওয়াজেরই তো ব্যাপার। আওয়াজ তো আর কারুর কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু কল্পনাশক্তিটা লিউকের আমার চেয়ে ঢের বেশি ছিল।

হ্যাঁ, জায়গাটায় যা ঘটে চলেছিল তা ব্যাখ্যার বাইরে। কিন্তু যদি আমার সামনে এরকম কিছু হত তাহলে আমি সেটাকে ভূতের নেত্য বলতাম, কিন্তু কখনোই শুধু শুধু ধরে নিতাম না যে জিনিসটা আমাকে মারতে চাইছে। লিউক সারাদিন খালি তাইই ভাবত। আমি সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারিনা, আপনিও পারেন নি।

আসলে যে একবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে সে কখনোই হলফ করে বলতে পারবে না যে দুনিয়ায় সব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে। আগে আমরা জলোচ্ছাস কেন হয় তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না, মনে আছে? এখন আমরা বলি সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প হলেই নাকি জলোচ্ছাস হয়। আর আরও পাঁচ গন্ডা থিয়োরি লিখি। তার মধ্যে হয়তো কোনোটাই ভুল নয়। কিন্তু তা তখনই কাজ করবে যখন আমরা সত্যি সত্যি জানতে পারব এই ভূমিকম্পটা আসলে কী। একবার আমাকে এরকম একটা জলোচ্ছাসের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমি বসেছিলাম, হঠাৎ করেই আমার টেবিলের ওপর থেকে কালির দোয়াতটা সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল আমার কেবিনের ছাতে। ক্যাপ্টেন লেকির সাথেও একই জিনিস ঘটেছিল, আমার মনে হয় আপনি তা পড়েছেন, তার ওই "রিঙ্কেলস"- এ। বাহ, ভাল, ভাল। এবার যদি এরকম একটা জিনিস ডাঙায়

কোথাও, বা ধরুন এই ঘরটাতেই ঘটত, কোন ভিতুর ডিম ভূত- প্রেত, ম্যাজিক কী না কী টেনে আনত এর ব্যাখ্যা করতে। কিন্তু যেটা শুধু একটা 'বিস্ময়কর ঘটনা' বলেই ছেড়ে দেওয়া যায়, সেটাকে নিয়ে এত গণ্ডগোল কেন? এই আমার মত, মশায়।

তাছাড়া, লিউক যে তার স্ত্রীকে খুন করেছে, তারও তো কোন প্রমাণ নেই। আপনি বলেই বলছি, অন্য কেউ হলে আমি তো এরকম একটা কথা ইঙ্গিতও করতাম না। শুধু এই যে আমার লিউককে ওই খুন করার কায়দাটার কথা বলার কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কাকতালীয় ভাবেই মিসেস প্র্যাটকে বিছানায় মৃত পাওয়া যায়। আরে দুনিয়ায় কত মহিলাই তো ওভাবে মারা গেছে, শুধু কি ও একা? পাশের প্যারিশ থেকে লিউক এক ডাক্তারকেও ডেকে এনেছিল, আর সেই ডাক্তার আর সে, দুজন মিলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছিল যে মিসেস প্র্যাট হার্টের কী একটা দোষে মারা গেছেন। এরকম তো হরবখত হয়।

অবশ্য কাছেই একটা হাতাও ছিল। আমি কাউকে সে ব্যাপারে কিছু বলিনি। ওদের শোবার ঘরের আলমারিতে হাতাটাকে দেখেই তো আমি ভিরমি খেয়ে গেছিলাম। একেবারে নতুন ছিল জিনিসটা, লোহার ওপর টিনের পাতলা একটা পরত, দু- একবারের বেশি আগুনে দেওয়া হয়নি। একটুখানি গলানো সিসেও পেয়েছিলাম সেটার মধ্যে, নিচে আটকে ছিল। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আরে গ্রামের ডাক্তার জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই নিজের হাতে করে থাকে। তাছাড়া লিউকের সিসে গলানোর আরও তো হাজারখানা কারণ থাকতে পারে। সমুদ্রে মাছ ধরতে ভালবাসতো ও। হয়তো বঁড়শির ওজনের জন্য বা ঘড়ির জন্য ওর দরকার ছিল বস্তুটার।

সে যাই হোক, জিনিসটা পেয়ে আমার বড় অস্বস্তি হয়েছিল। হাতাটাকে আসলে একদম আমার সেই খুনের গল্পের মেশিনটার মত দেখতে ছিল। বুঝতেই তো পারছেন তা দেখে আমার মনের অবস্থা কীরকম দাঁড়াল। জিনিসটাকে একেবারে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এখনও হয়তো আছে কোথাও সেটা, সমুদ্রের তলায়, স্পিট- এর মাইলখানেক দূরে। কখনো ডাঙায় ভেসেও এলে ক্ষতি নেই। ততদিনে সেটা আর চেনার অবস্থায় থাকবে না।

লিউক নিশ্চয়ই ওটাকে গ্রাম থেকেই কয়েকবছর আগে কিনেছিল। গ্রামে একটা লোক এখনও সেইরকম হাতা বেচে। রান্নার কাজে লাগে বোধহয়। সে যা হোক কোন কৌতুহলী কাজের মেয়ের হাতে যদি সিসেসুদ্ধ সেটা একবার পড়ে যেত, তাহলে আর দেখতে হত না। সে হয়তো প্লাম্বারের ছেলের বউ সেই অন্য মেয়েটাকে গল্পটা শোনাত গিয়ে, সে আবার আমায় ডিনারের সময় সে গল্পটা বলতে শুনেছিল। তার হয়তো মনেও ছিল গোটা ব্যাপারটা।

বুঝতে পারছেন তো গোটা ব্যাপারটা? লিউক প্র্যাট অনেকদিন আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে আর এখন তার সেই বউ- এর পাশের কবরেই রয়েছে সে। কবরের ফলক অনুসারে সে একজন ভাল লোক, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ ও খাটিয়ে লোক। আমি আর পুরোন কথা বলে মৃত মানুষটার স্মৃতিটাকে নোংরা করতে চাইনা। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে –তিন জনের কেউই আর বেঁচে নেই। আর এমনিতেও লিউকের মৃত্যুর সময় যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছিল।

কেমন ঝামেলা? ওর মৃতদেহটাকে সমুদ্রের ধারে পাওয়া গেছিল এক সকালে। আর যথারীতি করোনারকে দিয়ে একটা তদন্ত করানো হয়েছিল গোটা ব্যাপারটাকে নিয়ে। ওর গলার চারধারে অদ্ভুত কয়েকটা দাগ পাওয়া গেছিল। কিন্তু জিনিসপত্র কিছু চুরি বা ছিনতাই হয়নি। শেষমেস আন্দাজ করা হয়েছিল যে "রাক্ষুসে কোন মানুষ বা কুকুরের হাতে বা কামড়ে" মৃত্যু হয় প্র্যাটের। অর্ধেক জুরি ভেবেছিল যে একটা বড় কুকুর প্রথমে ওকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ওর শ্বাসনালী কামড়ে ধরেছিল, কারণ ওর ঘাড় মটকায়নি। ও যে কখন বেরিয়েছিল, কোথায় যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল তা কেউ জানতো না। সমুদ্রের ধারে দেওয়ালের গায়ে যেখানে জোয়ারের জলের দাগ, ঠিক সেখানে পড়েছিল। হাতের নিচে ছিল তার স্ত্রীর পুরোন একটা টুপির বাক্স, ঢাকনা খোলা। বাক্সটাতে ও একটা খুলি নিয়ে যাচ্ছিল—আরে ডাক্তাররা এসব করে থাকে কখনও- সখনও। খোলা বাক্স থেকে গড়িয়ে গিয়ে খুলিটা ওর মাথার কাছে পড়ে ছিল। আশ্চর্য রকমের সুন্দরও ছিল সেটা। ছোট্ট, চমৎকার আকৃতির, ও খুব সাদা, আর তাতে মুক্তোর মত নিখুঁত দাঁত। দাঁত বলতে খালি ওপরের সারিটার কথাই বলছি। নিচের চোয়ালটার কোন চিহ্ন ছিল না। অন্তত প্রথম যখন দেখি তখন ছিল না।

হ্যাঁ, এখানে এসে জিনিসটা দেখেছিলাম আমি। জিনিসটা না, খুব সাদা আর চকচকে ছিল, যেন পালিশ করা। ওটাকে কাচের শোকেসে করে সাজিয়ে রাখবার মত করে রেখে দিয়েছিল কেউ। জিনিসটা কোত্থেকে এসেছিল, বা সেটা নিয়ে কীই বা করা হবে, তা কেউ জানত না। তাই বোধহয় ওরা সেটাকে আবার সেই বাক্সে ভরে রেখে বাড়ির সবচেয়ে ভাল শোবার ঘরের আলমারির একটা তাকে তুলে রেখেছিল বস্তুটাকে। আমি বাড়িতে থাকতে এলে আমাকে ওরা সেটাকে দেখিয়েও দিয়েছিল। খালি একটা জিনিসেরই কেউ কোন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। খুলিটা বালির ঢাল বেয়ে নিচে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার বদলে লিউকের মাথার কাছে উঠল কী করে? তখন আমার ব্যাপারটা সেরকম অদ্ভুত লাগেনি, মশায়। কিন্তু পরে অনেক ভেবেছি এই নিয়ে। ঢালটা বড়ই খাড়া। কালকে আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে না হয় দেখিয়ে দেব, যদি আপনি চান। পরে সেখানে পাথর দিয়ে আমি একটা স্তম্ভমতন বানিয়ে রেখেছি।

এরপর আগামী সংখ্যায়

ভূতের বাড়ি

পুতুল দ্বীপের রহস্য

ইন্দ্রশেখর

মেক্সিকো সিটির ঠিক দক্ষিণে জোচিমিকোর খালদুটোর মাঝখানে একটা ছোটো দ্বীপ আছে যেখানে কখনো কোন ট্যুরিস্ট রাতের বেলা ভুলেও পা রাখে না। ওর নাম আইলা দে লা মুনেকাস বা পুতুলের দ্বীপ।

তার কারণ সে দ্বীপের গোটাটা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অজস্র পুতুলের বিকৃত দেহ আর কাটা ছেঁড়া মাথা হাত পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেগুলোকে দেখলে মজার বদলে দিনদুপুরেই গা হিম হবার জোগাড় হয়। রাত্তিরে নাকি তারা জেগে ওঠে।

পুতুল দ্বীপের গল্পের শুরু হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে যখন ডন জুলিয়ান সান্তানা বারেরা নামে এক ভদ্রলোক নিজের ঘরসংসার ছেড়েছুড়ে একলাটি সেই দ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাবেন বলে এসে ওঠেন। সবজির চাষ করতেন মানুষটা। মন্দ যাচ্ছিল না তাঁর দিনগুলো।
তারপর এক রাত্রে , তাঁর খালের ধারের কুঁড়ের পাশে জলে ভেসে এসে ঠেকল একটা ছোট্ট মেয়ের লাশ। অস্বাভাবিক কোন কারণে মৃত্যু হয়েছিল মেয়েটার।

দেহটাকে তুলে এনে দ্বীপে গোর দিলেন সান্তানা। দুর্ভাগ্যের শুরু হল তার পরেই। সেই ঝড়বাদলের রাতেই মেয়ের পিছুপিছু সে দ্বীপের গায়ে এসে ঠেকল একটা কিম্ভূতকিমাকার পুতুল। কে যেন সান্তানার মাথার মধ্যে বসে বলে দিল ও পুতুল ওই মেয়ের। সে চাইছে তাকে নিয়েই এ দ্বীপে সে থাকবে।

মানসিক বিকার হয়ে গেল সান্তানার এর পর থেকে। প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি সেই দ্বীপে। সে মেয়ে তাঁকে দ্বীপ ছেড়ে যেতে দেয় নি এক রাত্রের জন্যও। সারাদিন শহরের পথে সবজি বিক্রি করে বেড়াতেন আর প্রেতিনী পালিতাকন্যার জন্য সবজির বদলে জুটিয়ে আনতেন ছেঁড়াখোঁড়া বিকৃতদেহ সব ফেলে দেয়া পুতুলের রাশ। তারপর রাতের বেলা মেয়ের জন্য গাছের ডালে ডালে সাজিয়ে দিতেন সেই পুতুলদের।

২০০১ সালে জীবনের শেষদিনটি অবধি তাঁকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিয়েছে তাঁর ভূত মেয়ে।

এখন সে দ্বীপে সেই পুতুলের রাশ নিয়ে কেউ একজন থাকে। তাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দিনের বেলাও সেখানে কেউ পা দিলেই তার মনে হবে , এদিকে সেদিকে গাছের গুঁড়িতে, ডালে ঝুলে থাকা অজস্র পুতুলের লাশ যেন তার সব গতিবিধি অনুসরণ করে চলেছে। কেউ একজন আড়াল থেকে নজর রাখছে তার ওপর। দিনের বেলা দল বেঁধে যে টুরিস্টরা সেখানে পা রাখবার সাহস করে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু ভেট নিয়ে যায় একটা করে পুতুল।

রাত্রে সে দ্বীপের কাছে গেলে কী হবে তা কেউ জানে না, কারণ, সেদিক থেকে গভীর রাতে সমুদ্রের হাওয়ায় ভেসে ভেসে যে খেলা আর হাসির শব্দ আসে তার ব্যাপারে খোঁজ করতে রাতের বেলা সে দ্বীপে পা রাখবে এমন সাহসী মানুষ আজও সে চত্বরে আসে নি।

দেশবিদেশের ভূত

কানাভুলো আর গেটিসবার্গের ভূত

সংহিতা

কানাভুলোর কাজ হল পথিককে পথভ্রান্ত করা। বরং বলা ভালো উদ্‌ভ্রান্ত করা। ধরা যাক

বড়ো ঘুঘুবেশের খগেন পাত্রের বড়ো ছেলের মেজ নাতির অন্নপ্রাশন। তো সেই নাতির মামাবাড়ির লোকজন আসবে ভীমকান্তপুর থেকে। তারা রাত ভোর না হতেই, অন্ধকার অন্ধকারে, বাতাসামুড়ি আর জল খেয়ে রওয়ানা দিল দুগ্‌গা বলে। আর তাদের দলের চুপচাপ নিশুতিপানা সেজ মেসোমশাই পড়ল কানাভুলোর খপ্পরে। দিন লাগতে, চিঁড়েগুড় আর জল খেয়ে জিরিয়ে নেওয়ার সময় ঝিলের ধারে সবার সাথেই গেল মেসো। তারপর সব্বাই সোজা পথে পাত্রবাড়ির দিকে গেলেও মেসো একলা সার দেওয়া তাল গাছের ছায়ায় ছায়ায় আল ধরে শর্টকাট মারার ফিকির করল। ফিকিরটাই দলের অনেকের কেমন কেমন লাগল। কিন্তু মেসো তো কারুর কথাই কানে নেয় না।

ফলে পাত্রবাড়িতে পাতা পড়া অবধি যখন মেসো পৌঁছল না তখন সব্বাইকার একটু গা ছমছম করল। কারণ, মাঠের ধারের পথের ওপরই কানাভুলো ওঁত পেতে থাকে কিনা, রাতের অন্ধকারে। আর একলা লোককে দেখলে বা দলছুট লোককে পেলে কিংবা আনমনা লোককে দলছুট করে নিয়ে টেনে যায় নিজের পছন্দের জায়গায়। মানুষটা সেখানে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে যায় আর কানাভুলো তখন মানুষটাকে মেরে ফেলে। তবে মেসো পাতে চাটনি পড়ার আগেই পৌঁছে গেল। মুচ্ছোও যায় নি। কিন্তু বলে ছিল যে পথ হারিয়ে বারবার ঘুরে পৌঁছে যাচ্ছিল একটা বটগাছের সামনে। অনেকেই প্রমাদ গুনলেন। কারণ কানাভুলোও পথ ভুলিয়ে মানুষকে একই রাস্তায় বার বার ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। শেষ- মেষ পাত্রবাবুর বড়ো ভগ্নীপতি বাড়তি রসগোল্লা নিয়ে আসার পথে মেসোকে দেখতে পেয়ে সাইকেলের কেরিয়ারে বসিয়ে নেন..... তাই আরকি। নাহলে হয়তো অনুষ্ঠান বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসত।

এদিকে পরিত্যক্ত শহরগুলোকে যতই আদর করে গোস্ট টাউন বলে ডাকা হোক না কেন সত্যিকারের গোস্ট টাউন কিন্তু পেনসিলভ্যানিয়ার গেটিসবার্গ। সেখানে নাকি আজও ভূতেরা লড়ে চলেছে। আসলে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় দুশো উনচল্লিশ বছর আগে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হওয়ার সময় মোটেও তা ছিল না। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পুব উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগর ঘেঁষা বারোটা কলোনি ১৭৭৬- এর ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল আর হপ্তাদুয়েকের মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল আরেকটা রাজ্য। মানে স্বাধীনতা যুদ্ধ মূলত আমেরিকার পুব উপকূলের উত্তরাংশেই হয়েছিল। সে এলাকারই শহর গেটিসবার্গ। তবে গেটিসবার্গের যুদ্ধগুলো অত পুরোনো ভূতেদের নয়। আরো প্রায় আশি বছর পরেকার, গৃহযুদ্ধের সময়কার। গৃহযুদ্ধের সময়েও আজকের চেহারা নেয় নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র। কিন্তু তাতেও ক্রীতদাসপ্রথা বহাল থাকবে না যাবে এই নিয়ে দুগোছা রাজ্যের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। গৃহযুদ্ধের সময়ে গেটিসবার্গে একটা সেনা হাসপাতাল বানানো হয়েছিল হের ট্যাভার্ন নামের একটা পান্থশালাতে। সেখানে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা হতো। অধিকাংশ সেনারই অঙ্গচ্ছেদ করতে হত। কিন্তু তাতেও হয়তো তাদের প্রাণরক্ষা করা যেত না। অঙ্গহানিজনিত ক্ষত থেকে প্রাণরক্ষা করার জন্য যে সমস্ত সৈনিককে আনা হত তাদের চার- পাঁচটা ঘরে রাখা হত। সে সব ঘরের জানলা দিয়েই নাকি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত ছিন্ন অঙ্গগুলো, সেগুলো পরে জড়ো করে ফেলা হবে বলে। খুব কায়দা করে ঘরগুলোতে নম্বর লাগানো হয়েছিল যাতে অশুভবাচক তের কোনো ঘরের নম্বর না হয়। তাও অঙ্গহানির চিকিৎসা চলাকালীনই যেসব ঘরে প্রাণহানি হতো সেখানে নাকি অঙ্গহীন ভূতেদের দেখা মিলত। তাছাড়া সোলজার্স অরফ্যানেজ নামের বাড়িটার মাটির তলার কুঠুরির ভূতের খবরও বেশ চাউর হয়েছে। শহরের নানান মাঠে যেখানে যেখানে সেকালের সেই যুদ্ধগুলো হয়েছিল সেখানে নাকি এখনও ভূতেদের যুদ্ধ চলতে দেখা যায়। অন্তত সম্প্রতি তেমন দাবিদাওয়াই শোনা যাচ্ছে। তাই সেখানে কমবেশি গোটা দশেক কোম্পানি ভূতভ্রমণের আয়োজন করেছে বা ব্যাবসা ফেঁদেছে।

বোম ফেলেছে জাপানি

পর্ব চার

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক- এ ইচি দুয়ে নি...ঝটপট শিখে নিই

সেই যে আগের সপ্তাহে বলে গেলুম দিন, ক্ষণ, সময়ের হিসেব কষতে হবে জাপানি ভাষায়, সে সব তো দেখছি কিচ্ছুটি মনে নেই! ভাবছ বুঝি হিসেব কষা মানেই অঙ্ক, আর অঙ্ক মানেই ভয়ানক কঠিন। কী তাইতো? আরে বাপু অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জাপানিতে মজার বিষয় হল এক থেকে দশের পর আর এগারো, বারো করে আমাদের মত গোনাগুনতি নেই। দশের পর এগারো মানে দশ যোগ এক। আবার বারো মানে দশ যোগ দুই। এভাবে চলতে থাকবে। শুধু মাঝে- মাঝে

একটু আধটু অন্যরকম হবে। সে আমি তোমাদের বলে দেব। কথা না বাড়িয়ে আগে এক থেকে দশ শিখে নেওয়া যাক তাহলে?

০- শূন্য হল জেরো বা রেই (দ্বিতীয়টা বলাই ঠিক, কারণ প্রথমটা নেহাতই ইংরিজি ভাষার জাপানি রূপান্তর)

১- ইচি

২- নি

৩- সান (ইংরিজিতে sh অর্থাৎ শ উচ্চারণ হবে)

৪- ইয়ন বা শি (প্রথমটাই বলবে।কারণ কী জানো জাপানিরা সহজে শি বলে না। মৃত্যু বা শিনু শব্দের প্রথম অক্ষর শি বলে জাপানিরা ৪ কে অশুভ সংখ্যা মনে করে। ঠিক যেমন আমরা বলি আনলাকি ১৩)

৫- গো

৬- রোকু

৭- নানা বা সিচি (দুটোই বলা যেতে পারে)

৮- হাচি

৯- কুউ (উচ্চারণ হবে কু)

১০- জুউ (উচ্চারণ হবে জু)

ব্যাস, মূল কাজ শেষ। এবার বুদ্ধি করে বলো দেখি এগারো কী হবে জাপানিতে? আগেই বলেছি এগারো মানে দশ যোগ এক। সুতরাং এগারো হবে জু- ইচি। এইভাবে বারো, তেরো, চোদ্দ কিভাবে হবে মাথা খাটিয়ে আমাদের জানাও দেখি। এইভাবে গুনতে- গুনতে ২০ তে আসতে হবে। কুড়ি মানে দশ গুণ দুই। তার মানে নি- জুউ। বুঝতেই পারছ এইভাবে একুশ হবে দশ গুণ দুই যোগ এক। অর্থাৎ নি- জুউ- ইচি।বাকিটা কিন্তু তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি খরচ করে শিখে নিতে হবে। আরে- আরে অত বুক ধড়ফড় করার কী হল? আমি যেগুলো শিখিয়ে দিচ্ছি মন দিয়ে শিখে নাও। তারপর তোমরা নিজেরাই গোণাগুণতিতে একদম পাকা হয়ে উঠবে।

৩০- সান- জুউ

৩৫- সান- জুউ- গো

৪০- ইয়ন- জুউ

৫০- গো- জুউ

৬০- রোকু- জুউ

৭০- নানা- জুউ

৮০- হাচি- জুউ

৯০- কুউ- জুউ

১০০- হিয়াকু (খুব সাবধানে উচ্চারণ করতে হবে। কারণ হায়াকু বলে একটি শব্দ আছে, যার মানে তাড়াতাড়ি। দুটো শব্দই শুনতে প্রায় এক রকম। সুতরাং একটু সামলে!)

১০১- হিয়াকু- ইচি

২০০- নি- হিয়াকু

৩০০- সান- বিয়াকু (চমকে যেওনাকো। হিয়াকু এখানে সান এর সঙ্গে সন্ধি করে বিয়াকু হচ্ছে)

৪০০- ইয়ন- হিয়াকু

৫০০- গো- হিয়াকু
৬০০- রোপ- পেয়াকু (এখানেও সেই ধড়ে মুড়ো সন্ধি কেস!)
৭০০- নানা- হিয়াকু
৮০০- হাপ- পেয়াকু (সন্ধি)
৯০০- কিউ- হিয়াকু
১০০০- সেন
২০০০- নি- সেন
৩০০০- সান- জেন (এতখনে তো সন্ধির ব্যাপারটা বুঝেই গেছো তোমরা। তবে মনে রাখবে এই জেন এর জ উচ্চারিত হবে ইংরিজির জেডএর মত)
৪০০০- ইয়ন- সেন
৫০০০- গো- সেন

৬০০০- রোকু- সেন (উচ্চারণের সময় রোকসেন বলবে)
৭০০০- নানা- সেন
৮০০০- হাসসেন
৯০০০- কিউ- সেন
১০, ০০০- ইচিমান (একটা মজার কথা বলি। রাজস্থানের জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহের নামের আগে শওয়াই শব্দ বসে কেন জানো তো? কারণ শওয়াই শব্দের অর্থ যে একশ জনের সমান বা যার শক্তি একশ জনের সমান। এরকম ব্যাপার কিন্তু জাপানিদের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে। সামুরাই যোদ্ধাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাম হত ইচিমান, হাচিমান ইত্যাদি।অর্থাৎ যার শক্তি দশ হাজারের সমান বা আট হাজারের সমান। চুপিচুপি বলি সামুরাই যোদ্ধা হাচিমানের মন্দির দেখে এসেছিলাম কামাকুরাতে। তবে সত্যি বলতে কী সে যত বড়ই বীর যোদ্ধা হোক না কেন, মুখখানা ভারী ইয়ে...মানে দেখে মনে হচ্ছিল দাঁত খিচিয়ে কামড় দিতে আসছে!)

২০, ০০০- নি- মান
১০০, ০০০- জুউ- মান
১, ০০০, ০০০- হিয়াকু- মান
২, ০০০, ০০০- নি- হিয়াকু- মান
১০, ০০০, ০০০- সেন- মান
১০০০, ০০০, ০০০- ইচি- ওকু
তবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এগুলো যখন বলবে বা আজ এক তারিখ, দু তারিখ এগুলো বলবে তখন কিন্তু মনের আনন্দে ইচি, নি বলতে শুরু কোরোনা। কারণ সেগুলো অন্য শব্দ অন্য ভাবে বলতে হয়। জানি বাপু, এটুকু শিখেই মাথা ভোঁ- ভোঁ করে ঘুরছে। তাই বাকিটুকু পরের পর্বের জন্য তোলা থাক। সায়োনারা বলে আমি এখন গেলুম।

ইতালির ইলিবিলি (৩)

রিনটিন তক্কে তক্কে ছিল ক দিন ধরেই। আজ রুণামাসি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতেই খপ করে ধরে ফেলেছে।

“শিগ্গির এ দিকে এসো তো মাসি, আমার অনেকগুলো কথা জানবার আছে।“

“আবার কী হল রে? বেশ তো শিখছিস ভাষাটা”।

“শিখছি বলেই তো জানতে চাইছি”।

“বেশ, বল শুনি কী জানতে চাস”। রুণা মাসি আরাম করে বসেন।

“আচ্ছা মাসি, এই যে ভাষাটা আমরা শিখছি, এটাকে কি ইতালিয়ানেও ইতালিয়ানই বলা হয়? মানে ইতালির লোকেরাও কি এটাকে ইতালিয়ান ভাষাই বলে?”

“বাঃ, ভালো প্রশ্ন করেছিস তো। আমার আগেই এটা খেয়াল করা উচিত ছিল।“ রুণা মাসি একটু লজ্জা পেলেন মনে হল। “না, ইতালির লোকেরা তাদের ভাষাকে বলে ইতালিয়ানো। ইতালিয়ানো বললে অবশ্য ইতালির মানুষকেও বোঝানো যায়। যেমন ধর, আমি একজন ইতালিয়- সোনো উন ইতালিয়ানো। আবার, আমি ইতালিয় বলি- পার্লো ইতালিয়ানো। বুঝলি তো?”

রিনটিন মাথা নাড়ল। “এবার আর একটা কথা বল মাসি, মা বাবাকে তো মাম্মা, পাপ্পা ডাকছি, কিন্তু ভাল ভাবে বলতে বা লিখতে গেলেও কি মাম্মা, পাপ্পাই বলব?”

“তা কেন বলবি? তুই বাংলা বা ইংরেজিতে মা বাবাকে ডাকার সময় যা ডাকিস, ফর্মালি লেখা বা বলার সময় কি তাই বলিস? শুদ্ধ ইতালিয়ানোতে মা হবেন মাদ্রে, আর বাবা হবেন পাদ্রে।“

“কেমন মাদার, ফাদারের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে, না মাসি?”

“যাচ্ছেই তো। বাংলা মাতা, পিতার সঙ্গেও মিল পাবি। বাংলা তো এসেছে সংস্কৃত থেকেই। আবার ইতালিয় ভাষা এসেছে ল্যাটিন থেকে। বড় হলে যখন আরো পড়বি তখন দেখবি সংস্কৃত আর ল্যাটিনে কী ভীষণ মিল।“

“ভাই বোনকে কী বলে গো মাসি?”

“ভাই- ফ্রাতেল্লো, বোন- সোরেল্লা।“

“দিদি, দাদা?”

“ওসব ওদের নেই বাপু। সব সমান। এই যেমন আমি তো তোর মাসি, তা আমিও জি.য়া, আবার তোর ফুলপিসিও জি.য়া। কাকি জেঠি মাসি পিসি সব জি.য়া। তেমনি কাকা জ্যাঠা মামা মেসো সব জি.ও।“ এই বলেই রুণামাসি ব্যাগ হাতড়ে একখানা ছবি বার করলেন। “এই দ্যাখ, এটা দেখলেই সব বুঝতে পারবি।“

“একটা কাজ করিস, রুণা মাসি বললেন, আমি চলে গেলে, অ্যালবাম থেকে কেটে কেটে যেখানে যার ছবি বসবে সেখানে সেটা বসিয়ে দিস তো”। (তোমরাও সেটা করতে পার কিন্তু।)

“তাহলে এবার বল দেখি রিনটিন, রুণা রিনটিনের মাসি, এটা ইতালিয়ানোতে কী ভাবে বলবি?”

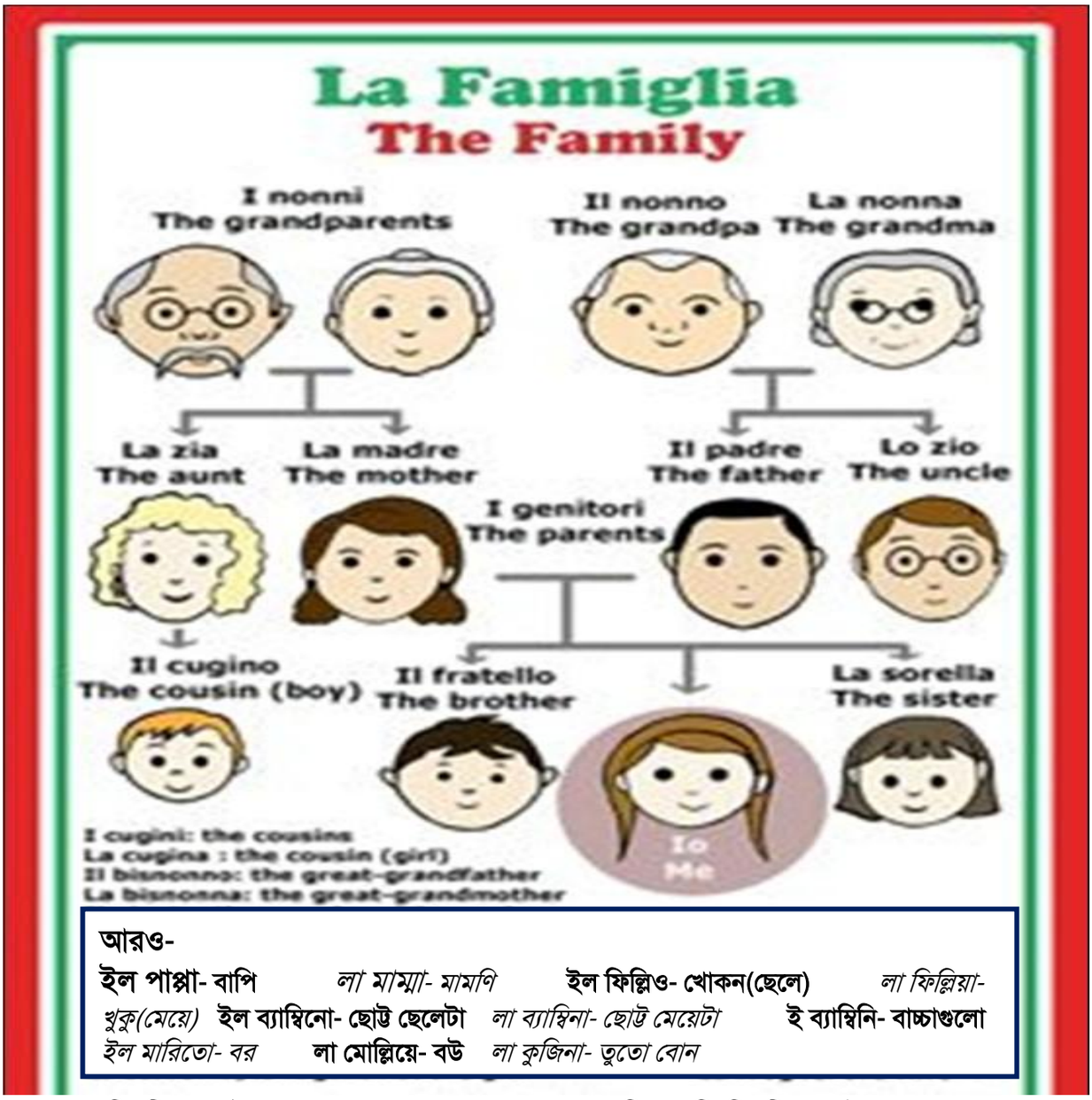

আরও-

ইল পাপ্পা- বাপি *লা মাম্মা- মামণি* **ইল ফিল্লিও- খোকন(ছেলে)** *লা ফিল্লিয়া- খুকু(মেয়ে)* **ইল ব্যাম্বিনো- ছোট্ট ছেলেটা** *লা ব্যাম্বিনা- ছোট্ট মেয়েটা* **ই ব্যাম্বিনি- বাচ্চাগুলো** *ইল মারিতো- বর* **লা মোল্লিয়ে- বউ** *লা কুজিনা- তুতো বোন*

রিনটিন একটু ভাবল, তারপর বলল, “রুণা এ লা জি.য়া দি রিনটিন, তাই তো?”

“ব্রাভো”, বললেন রুণামাসি।

“আর”, রিনটিন মুচকি হেসে বলল, “রিনটিন এ লা ফিল্লিয়া দে লা সোরেল্লা দি রুনা”। (এটার মানে তোমরা বলবে।)

“ওরেব্বাবা, তুই তো দিব্যি শিখে গেছিস রে। এ ফান্তাস্তিকো!”

রিনটিন একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দিল, যাতে মনে হয় ‘এ আর এমন কী কঠিন ব্যাপার!’

“আচ্ছা এই যে এতগুলো লেসন পড়লি, একটা জিনিস খেয়াল করেছিস?”

“কী বল তো মাসি?”

“সিংগুলার আর প্লুরাল কী করে হচ্ছে? ম্যাসকুলিন আর ফেমিনিনই বা কী করে আলাদা করছিস?”

“একটু একটু বুঝেছি। যেমন ও দিয়ে শেষ হলে সেটা ম্যাসকুলিন, আর আ দিয়ে শেষ হলে ফেমিনিন”।

“এগজ.াম্পল দিয়ে বোঝা”।

“ওই তো, ব্যাম্বিনো মানে একটা বাচ্চা ছেলে, ব্যাম্বিনা যেই হল অমনি ওটা হয়ে গেল বাচ্চা মেয়ে”।

“আর ব্যাম্বিনি?”

“অনেকগুলো বাচ্চা। ও হো, বুঝেছি বুঝেছি, ও দিয়ে শেষ হওয়া শব্দ প্লুরাল হলেই ই দিয়ে শেষ হচ্ছে”।

“একদম। তবে, খেয়াল রাখিস যে সব ম্যাসকুলিন শব্দ কিন্তু ও দিয়ে শেষ হয় না। অনেক সময় এ দিয়েও হয়। তবে ম্যাসকুলিন থেকে প্লুরাল করতে গেলে সব সময় ই হবে। ঠিক এই ছবিটার মত-

ম্যাসকুলিন নাউন

সিংগুলার প্লুরাল

ও(O)

ই(i)

এ(e)

Gat t o(গাত্তো)	Gat t i (গাত্তি)	Fi or e (ফিওরে)	Fi or i (ফিওরি)

"আর ফেমিনিনের বেলায়?"

"আরও সোজা। আ (a) কিংবা এ e) দিয়ে শেষ হলে মোটামুটি ধরে নিতে পারিস যে সেটা ফেমিনিন। আ- কে এ করে দিবি আর এ- কে ই(i) , ব্যস্।

A_____E

E_____I

আরও সোজা করে বললে এই দ্যাখ"-

Mel a (মেলা)	Mel e (মেলে)

"বাঃ রে, বেশ মজার তো। আরও ক'টা দাও না মাসি"।

মাসি রিনটিনকে যা করতে দিলেন, সেগুলো তোমরাও একটু চেষ্টা করে দ্যাখ না, পার না কি। কী করতে হবে বুঝেছ তো? সিংগুলার শব্দগুলো দেয়া আছে, তোমায় ম্যাসকুলিন ফেমিনিন বুঝে তার প্লুরাল করতে হবে। উত্তর যথারীতি পরের সংখ্যায় পেয়ে যাবে।

Quader no কোয়াদের্নো(খাতা)---------- (খাতাগুলো)

Penna পেন্না(পেন)---------- ---------- (পেনগুলো)

Padr e পাদ্রে(বাবা)---------- (বাবারা)

Ragazzaরাগাৎসা(মেয়ে)---------- (মেয়েরা)

Casaকাসা(বাড়ি)---------- (বাড়িগুলো)

Zi aজি.য়া(মাসি)---------- (মাসিরা)

আগের পর্বের উত্তর

ইশকুল	বাস	রাস্তা	কুকুর	গাছ	সবুজ	ড্রাইভার	নতুন	বয়	পৃষ্ঠাগুলো
স্কুওলা	আউতোবুস	স্ত্রাদা	কানে	আলবেরো	ভের্দে	আউতিস্তা	নুওভো	রাগাৎসো	পাজিনে

কোমে,	মাতেমাতিকা,	পার্লা,	পার্লো,	পার্লি,	লিঙ্গুয়া,	লিঙ্গুয়ে,	ইনসেনিয়াস্তি,	ইনসেনিয়াস্তে,	চেন্তো,	ভেন্তি,	কোয়ারান্তা,	মাদ্রে
কেমন,	অংক	বল	বলি	বলা	ভাষা	ভাষাগুলো	টিচাররা	টিচার	একশো	কুড়ি	চল্লিশ	মা

লুনেদি,	মার্তেদি,	মের্কোলেদি,	জোভেদি,	ভেনের্দি,	সাবাতো,	দোমেনিকা-
সোমবার,	মঙ্গলবার,	বুধবার,	বৃহস্পতিবার,	শুক্রবার,	শনিবার,	রবিবার

রুকু ও দৈত্য

শাশ্বতী ব্যানার্জি

নীচের গপ্পোটা পড়ে ফেলো দেখি কেমন পারো!

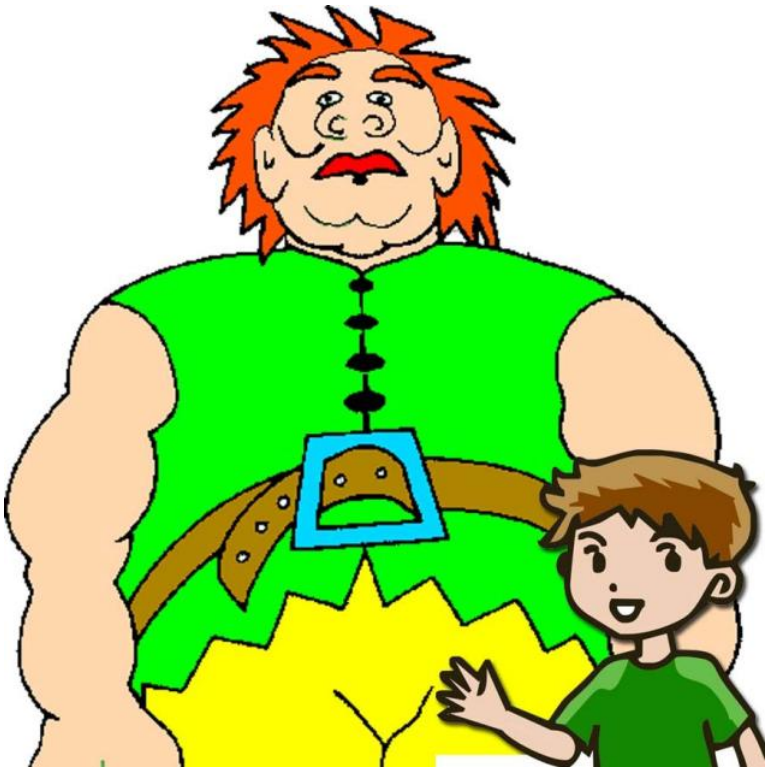

রুকুর আজ খুব মন খারাপ। সকাল থেকেই **দাঁ**র যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। মা লবঙ্গর তেল লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখনও কষ্ট আছে। তাই আজ **একল্** বন্ধ। প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলাও বন্ধ। দুপুরে **দেজ্যনে** সেরে **ত্যাত্** টা বালিশে দিতে না দিতে **জিও** বন্ধ হয়ে আসছে। পাশেই পিকুদের বাড়িতে জোরে রেডিও বাজছে, তাও **অরেই**এ এসে পৌঁছয় না।

এমন সময় -------

রুকু দেখে একটা বিশাল **জেয়ান** তার গোল আগুনের ভাঁটার মত **জিও রুজ** নিয়ে রুকুকে ডাকছে।দৈত্যের **অরেই**গুলো ঠিক কুলোর মত, **নে** টাও বিশাল, আর তার নীচেই বিকট **বুশ, দাঁ** গুলো হলদে রঙের, আর উপরের **ল্যাভ্র্** টা একটু বাঁকা। **জেয়ঁ**আর **সুরসিল** টা বেশ চওড়া আর তার সঙ্গে ইয়া বড় **মুস্তাশ**। **শেভো** টাও লাল রঙের! কী গলা রে!! বিকট গলায় দৈত্যটা বলল- **বন জ্যুর, কম্মা তালে ভু?** রুকু ত ভয়ে কাঠ। **ভোয়া** তো একেবারে বন্ধ। ভাবছে **জঁআম্ব** দুটোকে সোজা করে দৌড় লাগাই।

এমন সময় আবার কানে এল, **বন জ্যুর, কম্মা তালে ভু**? রুকু কোনোরকমে ঢোঁক গিলে বলল- **ত্র্যা বিয়ঁ মসিও।** বলার পরেই ভাবল আরে এ কোন ভাষায় সে কথা বলছে- ফরাসী না বাংলা !!! সে ত এতদিন বাংলা ছাড়া কিছুই জানত না, এ ভাষা সে কবে শিখল ? দৈত্যটা হেঁড়ে গলায় আবার রুকুকে বলল – তুমি আমার **আমি** হবে? রুকু দেখল আর

পালানর রাস্তা নেই। এর সঙ্গে ভাব করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে কোনরকমে ক্ষীণ গলায় বলল- **উই মঁসিয়।**

এর পরে মা এসে **লে** নিয়ে ডাকাডাকি করতেই রুকুর ঘুমটা ভেঙে গেল।

কেমন? পড়া হল তো? এবারে একখানা মজার খেলা খেলি এসো—ওপরের রঙিন শব্দগুলো একটা বাক্সে ভরে দিলাম আর অন্য বাক্সে তাদের বাংলা মানেগুলো দিলাম। এইবারে তাদের চটপট মিলিয়ে ফ্যালো দেখি!

দাঁ , একল, দেজ্যনে, ত্যাত, জিও, অরেই জেয়াঁ
জিও রুজ, নে, বুশ, ল্যভর, সুরসিল, মুসটাশ, শেভো,
কম্মা টালে ভু , বঁ জ্যুর, ত্র্যা বিঁয়া মঁসি্য়, ভোয়া,
জাঁম্ব, আমি , উই, লে

গোঁফ, চুল, কেমন আছো, দুধ, লাল চোখগুলো,
মুখ, চোখগুলো, নাক, মাথা, স্কুল, কান, দৈত্য, ঠোঁট,
ভুরু, লাঞ্চ, গলার স্বর, সুপ্রভাত, খুব ভালো, মহাশয়,
পা, বন্ধ, দাঁত, হ্যাঁ

এরপর পরের সংখ্যায়

বিচিত্র দুনিয়া

বড়দিনের বারবেলা

বয়েজ লাইফ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সত্যি ঘটনা, বলেছেন – অরিন্দম দেবনাথ।

বরফে ঢেকে থাকা সিঁড়ির ধাপগুলো খুব সন্তর্পণে উঠে, দরজায় চাবিটা ঢুকিয়ে কোন শব্দ না করে দরজাটা খোলার চেষ্টা করছিল কোস্ট গার্ডের লেফটেন্যান্ট স্কিপ এলেন। কী যে হল! তালাটা খুলছে না কেন? সব কি বরফে জমে গেল নাকি? তুষারঝড় আর তুষারপাত হয়ে চলেছে। এই ভরা দুর্যোগে বাড়ির সবাইকে চমকে দিতে নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকতে চাইছিল স্কিপ। সবাই চমকেই যাবে, কেননা গতকালই বাড়িতে টেলিগ্রাম করেছিল স্কিপ বড়োদিনে বাড়িতে আসতে পারবে না বলে। বহু কষ্টে ছুটি ম্যানেজ করে, হাইওয়ের বরফ ভর্তি পথ পার হয়ে , প্রায় এক কোমর তুষার ভরা ড্রাইভওয়ে হেঁটে পার হয়ে দুয়ারে পৌঁছে – এখন ঘরে ঢোকার চাবিটাই সাথ দিচ্ছে না। কাউকে না কাউকে ডাকাই যায়, কিন্তু তাহলে স্কিপের আসাটা আর সারপ্রাইজ হবে না।

আঙুলগুলো সব জমে গেছে। ওহ ক্রিসমাস এর আবহাওয়া বটে! চারদিকে শুধুই সাদা। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অবশেষে চাবিটা খুলল। ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে, ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল স্কিপ। একটু ও ঠাণ্ডা যেন ঘরে ঢুকে ভেতরের গরমটাকে না কমায়।

"হে হে সবাই উঠে পড়ো। আমি এসে গেছি। মা, বাবা, কে – তাড়াতাড়ি ওঠ, আর দেভকে বল, যদি এখুনি ও লেপের তলা থেকে বের না হয় তা হলে আমি এক তাল বরফ নিয়ে আসছি।"

'কে' হল স্কিপ এর ছোটোবোন, আর দেভ হল বড়োভাই।

কিন্তু, কী হল? কারো কোন সাড়া নেই কেন!? মা তো এই সময় রান্নাঘরে থাকে! মেহগনি কাঠের হাতল লাগানো সাদা ধবধবে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে, স্কিপের তুষারভর্তি জুতোতে ধাক্কা খেল একটা পড়ে থাকা টেলিগ্রামের কাগজ। হাতে তুলে স্কিপ বুঝল, এটা কেউ খুলে দেখে নি।

তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা খুলে স্কিপ বুঝল, এটা গতকাল পাঠানো তারই টেলিগ্রাম। যাতে লেখা আছে ক্রিসমাসে সে আসতে পারছে না। গতকালই এটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ডেলিভারি করেছে বিকাল চারটের সময়। তার মানে—

"মা, বাবা--- ," চিৎকার করতে করতে এক এক বারে দুটো করে সিঁড়ি টপকাচ্ছিল স্কিপ। দোতলায় উঠে দেখে মা বাবার ঘর খালি। বিছানা দেখে বোঝা

যাচ্ছে কেউ ব্যবহার করেনি বিছানা। একদম পরিপাটি করে সাজানো। স্কিপ ছুটল বোন এর ঘরের দিকে। নাঃ। ওখানেও কেউ নেই। ঘর খালি। এইবারে দেভ এর ঘর। স্কিপ এর বড় ভাই দেভ বিদ্যুৎ দফতরের বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। সে ঘরও খালি। বিছানার ওপর পরিপাটি করে স্নো ব্লাঙ্কেট সাজানো। তার ওপর পড়ে রয়েছে পাট পাট করে ভাঁজ করা জামা কাপড়। রান্না ঘরে গিয়ে স্কিপ দেখল, কেক বানানোর সমস্ত সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে। অথচ মা নেই।

পাগলের মত অবস্থা স্কিপের। ক্রিসমাসের দিন, ঘরে কেউ নেই, ভাবতে পারছে না স্কিপ। মা বাবা বোন দাদা এক সাথে বেপাত্তা! কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি তো? স্কিপের বাবা অ্যালেন এক জন নাম করা ডাক্তার। স্কিপ ফোন তুলে সোজা ফোন করল হাসপাতালে। দু বার ফোনটা বাজলো কিন্তু কেউ ফোনটা ধরল না। তৃতীয়বার ফোন করলো স্কিপ। এবার কেউ ফোনটা তুলল।

"হ্যালো— "না সরি। ডাক্তার অ্যালেন হাসপাতাল নেই। কখন আসবেন জানা নেই।"

উত্তেজনায় স্কিপ নিজের পরিচয় দিতে ভুলে গেছিলো। এইবার সে বলল, "আমি ডাক্তার অ্যালেন এর ছোট ছেলে স্কিপ বলছি। উনি কোথায় আছেন বলতে পারেন?"

"ওঃ স্কিপ! হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তার অ্যালেন প্রায় আপনার কথা বলেন। আপনি কোস্ট গার্ড এর হেলিকপ্টার পাইলট তো!"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, কিন্তু উনি কোথায় আছেন বলতে পারেন?"

"ওঃ অবশ্যই, উনি কাল একটি এমারজেন্সি কলে বাইরে গেছেন। সেখানে যমজ বাচ্চার সুস্থ প্রসব করিয়েছেন। এতটাই এমারজেন্সি ছিল যে মাকে হাসপাতালে আনা সম্ভব ছিল না, ওদিকে ভদ্রমহিলার স্বামী বাড়ি নেই। তারপর ওখানে আটকে গেছেন। তুষারধ্বসে সব রাস্তা বন্ধ। আর টেলিফোন কাজ করছে না ওখানে। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে গেছে।"

স্কিপ ফোনটা নামিয়ে রেখে ভাবতে বসল, বাবা না হয় বাইরে , কিন্তু মা , কে আর দেভ কোথায়?

এবারে সে ফোন করল দেভ এর অফিসে। ফোন বাজতে কেউ একজন সেটা তুলে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "কোথায় তার ছিঁড়েছে বলুন?"

স্কিপ বলল, "না না সে সব কিছু নয়। আপনাদের সিনিয়র এঞ্জিনিয়ার দেভের সাথে একটু কথা বলাতে পারেন?"

"সরি। কাজে বাইরে আছেন।"

"আপনাদের ত রেডিও ফোন আছে, ওনাকে একটা খবর দেবেন প্লিজ, যে উনি যেন একবার বাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করেন। জরুরি। আমি ওনার ভাই স্কিপ বলছি।"

চট জলদি উত্তর দিল অপারেটর, "হাই স্কিপ, আমি জো। তোমার সাথে একসঙ্গে হাইস্কুলে পড়েছি। একটু লাইনটা ধরো তো! দেখছি।"

খানিক পরে উত্তর দিল জো, "সরি স্কিপ, দেভের সঙ্গে এখুনি যোগাযোগ করা যাছে না। ওদের গাড়ি থেকে রেডিও উত্তর এসেছে, দেভ গাড়ি থেকে অনেক দূরে উপত্যকার মাঝে কাজে ব্যস্ত। তুষার জমে সব হাই টেনশন লাইনগুলো বিকল হয়ে গেছে। দেভ ব্যস্ত তার থেকে বরফ সরাতে। ভাল কথা স্কিপ, তোমার মা কি ফিল

টেলর এর কোন খবর পেয়েছেন? ফিল হল আমার কাকার হেলিকপ্টার পাইলট। দুদিন ধরে ফিল এর কোন খোঁজ নেই।"

স্কিপ জিজ্ঞেস করল, "তুমি জান আমার মা কোথায়?"

"সম্ভবত ফিল এর বাড়িতে। তোমার মা মাঝে মাঝে ফিল এর মা হারা বাচ্চাদুটোকে দেখাশোনা করেন।"

খানিকটা স্বস্তি পেল স্কিপ। মায়ের একটা খোঁজ তো পাওয়া গেল!

"ঠিক আছে জো, ফিল টেলরকে খোঁজার জন্য আমার কোন সাহায্য লাগলে বোলো।"

টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে ফিল টেলর এর বাড়ির নম্বর খুঁজতে শুরু করল স্কিপ। আচমকা টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা তুলে মায়ের গলা শুনতে পেল স্কিপ।

"হ্যালো স্কিপ!"

"মা, আমি আজ সকালে এসে দেখলাম কেউ বাড়িতে নেই। বাবা আর দেভ এর খোঁজ পেয়েছি কিন্তু 'কে' কোথায় জানি না।"

"কে তোর বাবার সাথে আছে। স্কুলে পড়ানোর সাথে সাথে স্কুলবাসও চালায় জানিস তো। শেষ বাচ্চাটাকে নামানোর পর জানতে পারে তোর বাবার এক জন নার্স লাগবে। কে হাত লাগাতে তোর বাবার কাছে যায় আর তার পর ল্যান্ড স্লাইড। সব ওখানে আটকে।"

"কিন্তু তুমি এখনও ফিল এর বাড়িতে কেন মা?"

"আর বলিস না। কাল দুপুরে ফোন করে বাচ্চাদুটো জানায় , ফিল বলে গেছে ও ক্রিসমাসে বাচ্চাদের জন্যে হরিণ শিকার করতে গেছে। দুপুরের মধ্যে ফিরবে। ফেরেনি, বাচ্চা দুটো ভয়ে আমাকে ফোন করে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে। কারণ ফার্নেস কাজ করছে না। কী করব? চলে এলাম তাই। বাচ্চাদুটোকে ছেড়ে আর যেতে পারি নি। এদিকে ফিলও ফেরেনি। এই তুষারঝড়ে কোথায় আটকে গেছে কে জানে?"

ফোনটা হঠাৎ করে কেটে গেল। কোন আওয়াজ নেই। ডেড! কী করবে ভাবছে স্কিপ। বাইরের অবস্থাটা দেখবে বলে দরজাটা খুলে বাইরে বেরোতে কানে এল দূরে হাইওয়েতে গাড়ির আওয়াজ। একটা গাড়ি এসে থামল। আর তার থেকে একটা দশাসই চেহারার মানুষ নেমে এল। বরফ ভেঙে আসতে লাগল তাদের বাড়ি লক্ষ করে।

স্কিপ প্রথমে ভেবেছিল ওঁর বাবা ডাক্তার অ্যালেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে, "হাই বাবা !" কিন্তু ভুলটা ভাঙল অচিরেই। লোকটা ডাক্তার অ্যালেন নয়। অন্য কেউ!

"লেফটেন্যান্ট অ্যালেন?" লোকটা দূর থেকে জিজ্ঞেস করল।

স্কিপ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আমি লেফটেন্যান্ট অ্যালেন।"

লোকটা বরফ ভেঙে উঠে এল বারান্দায়। গ্লাভস থেকে হাত বের করে এগিয়ে দিল, "আমি র‍্যাডক্লিফ। আমার ভাইপো জো বিদ্যুৎ দফতরে কাজ করে। ও একটু আগে আমাকে ফোন করে তোমার কথা বলল। ভাবলাম এই বরফ ভেঙে কারখানা যাবার পথে তোমার সাথে একবার একটু কথা বলে যাই।"

"আসুন , ভেতরে আসুন," স্কিপ বলল, "আপনি কি কাঠের ব্যবসা করেন?"

"একদম ঠিক।" উত্তরটা দিয়ে খানিক চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। স্কিপ বুঝতে পারছিল না কী বলবে। একবার ভাবল বলবে নাকি কোন সাহায্য লাগবে কিনা? তারপর ভাবল, দেখি না ভদ্রলোক কী বলেন। খানিকক্ষণ হাতদুটো ঘষে গরম করে

নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "তুমি কি এই দুর্যোগে আমার কোম্পানির হেলিকপ্টারটা নিয়ে উড়তে পারবে?"

স্কিপ বলল, "আমি ভেবেছিলাম ফিল টেলর ওই হেলিকপ্টার নিয়ে উড়তে গিয়ে এই দুর্যোগে হারিয়ে গেছে!"

"না, না। কাল ফিল ছুটিতে ছিল। ও গাড়িতে করে বেরিয়েছিল। তারপর আর ফেরেনি। কোন খবরও নেই।"

স্কিপ খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, "যাক! কোন বড়োরকমের খোঁজাখুঁজি করতে হবে না তবে। গাড়িটাকে হাইওয়ের ধারেই কোথাও একটা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক স্কিপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এক দৃষ্টিতে। বললেন, "আমার একজন পাইলট দরকার কয়েক ঘন্টার জন্যে। দেখ যদি এই দুর্যোগে ওড়া সম্ভব হয়।"

স্কিপ খানিক ভাবল। এই দুর্যোগে ওঁর কমান্ডার উড়তে অনুমতি দিতেন না নিশ্চয়ই।

"খুব জরুরি কি?"

"না ঠিক তা নয়। আসলে আমি আমার লোকেদের জঙ্গলে আনানেওয়া করার জন্যে একটা হেলিকপ্টার কিনেছি। এতে করে ওদের কষ্টটাও কমে, আর সময়টাও বাঁচে। আমার অনেক কাঠুরে এখন জঙ্গলে। ওদের কথা দিয়েছিলাম বড়োদিনে ওদের বাড়ি আনার ব্যবস্থা করব। কিন্তু এই দুর্যোগে... ওদিকে আমার পাইলটও নিখোঁজ।"

স্কিপ খানিক ভাবল, নিখোঁজ বাবা আর মাহারা দুটো বাচ্চাকে সঙ্গ দিতে মা এই দুর্যোগে বাড়ির বাইরে। দাদা পাহাড়ের মাথায় এই দুর্যোগে ইলেকট্রিক তার থেকে বরফ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। বাবা অনেক দূরে দুটো বাচ্চা প্রসব করিয়ে দুর্যোগে আটকে গেছেন, বোনও সেখানে আটকে রয়েছে। আর সে কিনা কোস্টগার্ড এর অভিজ্ঞ পাইলট হয়ে বাড়িতে বসে থাকবে? হতেই পারে না। সে- ও বেরোবে। যা হবে পরে দেখা যাবে। বলল "চল, দেখা যাক কী করা যায়। আগে হেলিকপ্টারটা দেখা যাক।"

দরজা খুলে বাইরে বেরোতে স্কিপ দেখল বরফ পড়ার কোন বিরাম নেই। হাওয়াও চলছে উল্টোপাল্টা। এই দুর্যোগে সান্তাও তার স্লেজ নিয়ে বেরোত না!

র‍্যাডক্লিফের সাথে তার করাত কলে এল স্কিপ। ওখানে হ্যাঙারে রাখা আছে হেলিকপ্টারটা। এঞ্জিন চালু করে স্কিপ বুঝল খুব ভাল অবস্থায় আছে যন্ত্রটা। খুব যত্ন নেওয়া হয়।

এবারে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট দেখতে। তারা বলছে হাওয়ার তেজ কমতে পারে। র‍্যাডক্লিফ তার বিশাল তর্জনীটা ম্যাপের ওপর রেখে স্কিপকে গন্তব্য বোঝাতে লাগল, "আমরা ওদেরকে জঙ্গলের ক্যাম্প থেকে তুলব আর এক এক করে বাড়িতে নামিয়ে দেব। কোন অসুবিধা হবে না তো?"

"ওদের জন্য সত্যি একটা আনন্দদায়ক দিন হবে," জবাব দিল স্কিপ। হেলিকপটারটাকে খানিক গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে এল স্কিপ। চাকার নিচে স্কি লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিল। তারপর রোটরটা চালু করল। ব্লাপ ব্লাপ আওয়াজ করে হেলিকপ্টার এর মাথার ওপরে ব্লেডগুলো ঘুরতে শুরু করল। থ্রটল একটু ঘোরাতে ব্লেডগুলো ঘোরার গতি হল মিনিটে দু'শোবার। স্কিপ বাঁ হাত দিয়ে পিচ লিভারটা ওপরের দিকে তুলল। হেলিকপ্টারটা মাটি থেকে আকাশে উড়ল। সঙ্গেসঙ্গেই একটা আচমকা হাওয়ার ঝাপটায় কেঁপে উঠল হেলিকপ্টারটা।

"তোমার এই হেলিকপ্টারটা দারুণ,"স্কিপ বলল ।

"দারুণ হাত তোমার লেফটেন্যান্ট," জবাব দিল র‍্যাডক্লিফ।

আকাশে উড়ে স্কিপ টের পেল যা ভেবেছিল তার থেকেও বেশি বরফ জমে আছে চারপাশে। নিচের কিছু প্রায় বোঝা যাচ্ছে না। বিশাল উঁচু বরফে ঢাকা গাছগুলোর ওপর দিয়ে হাইওয়েকে নিশানা রেখে স্কিপ আস্তে আস্তে উড়বার চেষ্টা করল প্রথমে। কিন্তু বরফে ঢাকা হাইওয়ে ঠিক বোঝা যাছে না। বাকি রইল ইলেকট্রিক হাই টেনশান লাইন। সেটাকে লক্ষ করে স্কিপ উড়তে লাগল। র‍্যাডক্লিফ বারে বারে সাবধান করতে লাগল স্কিপকে, কারণ হাওয়ার চাপ এড়াতে স্কিপ চাইছিল যতটা নিচু দিয়ে সম্ভব উড়তে। আর একটা কারণ অবশ্য ছিল যেটা সে র‍্যাডক্লিফকে বলেনি। ওর বড় ভাই দেভ এই উপত্যকার মাঝে ইলেকট্রিক লাইন থেকে বরফ পরিষ্কার করাচ্ছে। সে চাইছিল দাদাকে একটু সাহায্য করতে। ইলেকট্রিক তারগুলোকে যদি হাওয়া দিয়ে একটু জোরে দোলানো যায় তা হলে বরফগুলো ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে যাবে। সত্যি সত্যি হেলিকপ্টারের পাখার হাওয়ায় পরিষ্কার হচ্ছিল তার নীচ দিয়ে উল্টোদিকে ছুটে চলা তারগুলো।

একটুক্ষণের মধ্যেই স্কিপের মতলবটা ভালই বুঝতে পারল র‍্যাডক্লিফ। হা হা করে হেসে উঠল সে, "দারুণ মাথা ত তোমার লেফটেন্যান্ট! দেখ যদি কারেন্টটা আসে! আমি আমার ছেলের জন্যে একটা ইলেক্ট্রিক ট্রেন কিনে রেখেছি বড়দিনের উপহার হিসেবে, কারেন্ট না থাকলে সেটা চালাব কী করে?"

হেলিকপ্টারের পাখার হাওয়ায় ইলেকট্রিক তারগুলো দুলছিল আর মাঝে মাঝে একটার সাথে আর একটা তার ঠেকে যাওয়ায় তা থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছিল। ইলেকট্রিক ফিরে আসার লক্ষণ।

"এবার কীভাবে তোমার ক্যাম্পে পৌঁছব বল। তোমার লোকেদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনোটা জরুরি আবহাওয়া আরও খারাপ হবার আগে," বলল স্কিপ।

"প্রথমে উপত্যকাটা পার হও। তারপর অনেক উঁচু উঁচু গাছ দেখতে পাবে। সেগুলো পার হয়ে আমার কাঠ চেরাই কল," র‍্যাডক্লিফ বলল।

স্কিপ বলল, "তোমার পাইলটকে না খুঁজে পাওয়া গেলে কী করবে? বাচ্চাদুটো থাকবে কার কাছে? কেউ কি জানে ও কোথায় যেতে পারে?"

"না কেউ জানে না। গতকাল থেকে পুলিশ, স্কাউট, কাঠুরে সবাই মিলে ওঁর খোঁজ করে চলেছে। কোন সন্ধান নেই। জাস্ট ভ্যানিশ! ও এমনিতেই একটু চুপচাপ তারপর গত বছর ওঁর স্ত্রী মারা যাবার পর আরও চুপ হয়ে গেছে। বাজারে অনেক ধার হয়ে গেছিল, আমি আর তোমার বাবা ওকে সাহায্যও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কারো সাহায্য ও নেয় নি। নিজেই ধার শোধ করে দেবে বলেছিল," র‍্যাডক্লিফ জবাব দিল।

ঘ্যাঁট ঘ্যাঁট আওয়াজ করে হেলিকপ্টারটা উপত্যকা পার হয়ে বড়ো গাছগুলোর মাথা ডিঙোতেই দেখা গেল ধোঁয়ার স্তম্ভ। র‍্যাডক্লিফ বলল, "হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেয়ে আমার লোকেরা ধোঁয়া দিয়েছে।"

খানিক বাদে ওপর থেকে দেখা গেল বিশাল কাঠের বাড়ি। ওটা র‍্যাডক্লিফের কাঠচেরাই কারখানা। কাঠুরের দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে কারখানার সামনে। নিচের থেকে ভেসে আসছিল চিৎকার। সবাই একসাথে কী বলছে বোঝা যাচ্ছিল না।

স্কিপ কোথায় নামবে জানতে চাইছিল। নীচ থেকে কাঠুরের দল টের পেল এটা তাদের হেলিকপ্টার পাইলট ফিল নয়, অন্য কেউ। একজন নীচ থেকে দেখাতে লাগল কোথায় নামতে হবে। একটা সমতল হেলিপ্যাড। বরফে ঢাকা। স্কি লাগানো

হেলিকপ্টারটা টুক করে নেমে পড়ল বরফের মাঝে। বরফ পড়েই চলেছে। হাওয়া থামারও কোন লক্ষণ নেই। কাঠুরের দল উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে। র‍্যাডক্লিফ পরিচয় করিয়ে দিল স্কিপ এর সাথে। সবাই জানতে চাইল ফিল তাদের হেলিকপ্টার চালক কোথায়? র‍্যাডক্লিফ জানাল গতকাল স্নো স্লাইড এর পর থেকে ফিল এর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ও বাচ্চাদের জন্যে হরিণ শিকার করতে বেরিয়েছিল বরফ পড়ার আগে।

খানিক বাদে র‍্যাডক্লিফ এক কাঠুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল জেরি? এত কী ভাবছ?"

জেরি বলল, "টেলিফোন কাজ করছে না। জানো তো, আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। যমজ সন্তান হবে। কী করছে কে জানে!"

"তোমার স্ত্রী কি ডক্টর অ্যালেনের তত্ত্বাবধানে ছিল?" স্কিপ বলল, "ডক্টর অ্যালেন আমার বাবা।"

জেরি বলল, "তাই তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোথায় দেখেছি! তোমাকে একদম ডক্টর অ্যালেন এর মত দেখতে! ঠিক তাই, ডক্টর অ্যালেন আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করছিলেন!"

স্কিপ বলল, "তোমার যমজ সন্তান হয়েছে। আমার বাবা আর বোন তোমার বাড়িতেই আছে। তোমাকে নামিয়ে আমি বাবা আর বোনকে হেলিকপ্টারে তুলে নেব। কিন্তু ফিল কোথায় গিয়ে থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারো?"

"জানি। দু'দিন আগে ফিল আমার নতুন বন্দুকটা ধার নিয়েছে হরিণ শিকারের জন্য। কিন্তু খুব কঠিন জায়গা। বরফ না থাকলেও গাড়িতে যাওয়া খুব বিপদজনক। খুব খাড়াই, আর কঠিন কঠিন বাঁক।"

র‍্যাডক্লিফ বলল, "জায়গাটা কোথায় দেখাতে পারবে?"

স্কিপ তার পায়ের ওপর রাখা ম্যাপটা দেখাল। এর ওপর দেখাতে পারবে। জেরি বলল, "ম্যাপ লাগবে না। ওতে পাবে না। ওই যে ওই উপত্যকার ওপর খাড়া ন্যাড়া জায়গাটা দেখতে পাচ্ছো, ওখান থেকে তিন কিলোমিটার মত দূর। কিন্তু ফিল হেলিকপ্টার নিয়ে ওখানে যেতে ভয় পেত।"

স্কিপ বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আমি আবার আসছি। জেরির তো এখন বাচ্চাদের কাছে আগে পৌঁছোনোটা জরুরি।"

"মোটেই না," বলে উঠল জেরি, "চল আগে ফিল কে খুঁজে বের করি।"

ব্লাপ ব্লাপ করে হেলিকপ্টার উড়ে চলল। প্রচণ্ড হাওয়া তাকে বেসামাল করে দিচ্ছে। এটা কোস্ট গার্ডের হেলিকপ্টার নয়। সাধারণ যাত্রী পরিবহন এর হেলিকপ্টার। কোস্ট গার্ড এর পাইলট স্কিপের কাছে একে নিরাপদে উড়িয়ে নিয়ে চলা সত্যি এক বিশাল চ্যালেঞ্জ! নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু বরফ আর বরফ। খুব বেশি নিচে নামা যাচ্ছে না গাছের জন্যে। সব যাত্রীরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। ব্লাপ ব্লাপ করে হেলিকপ্টার উড়ছে।

"কোন ধারণা আছে ঠিক কোনখানে থাকতে পারে ফিল?" সামনের দিকে চোখ রেখেই স্কিপ জেরিকে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

এমন সময় নীচের দিক থেকে দুম করে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। গুলির শব্দ।

স্কিপ গোল হয়ে সে জায়গাটার ওপরে চক্কর দিতে লাগল। খানিক বাদে আবার গুলির আওয়াজ তারপর আরেকটা –

দেখা গেল বরফের ওপর একটা গাড়ির ছাদ শুধু জেগে আছে আর তার ওপর দাঁড়িয়ে ফিল পাগলের মত হাত নেড়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টারটা গাড়ির ওপরের আকাশে নিয়ে এল স্কিপ। নামানোর জায়গা নেই।

অতএব যন্ত্রটাকে যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি নিয়ে এল স্কিপ। মাটির সামান্য ওপরে স্থির হয়ে উড়ছিল হেলিকপটার। কাজটা কঠিন। "ওঃ! এটাই ত কোস্ট গার্ডের উপযুক্ত কাজ!" মনে মনে বলল সে। দু'জন কাঠুরে হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে ঝুলে পরে ফিলকে ধরে টেনে তুলল ভেতরে। অজ্ঞান হয়ে গেছে ফিল। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা। দুজন মিলে ফিলকে ম্যাসাজ করতে লাগল। হেলিকপ্টার ততক্ষণে উড়ে চলেছে জেরির বাড়ির দিকে।

খানিক পরে চোখ মেলল ফিল। স্কিপ বলল, "হাই, আমি স্কিপ, ডক্টর অ্যালেনের ছোটো ছেলে। তোমার বাচ্চারা ভাল আছে, আমার মা তোমার বাড়িতে তোমার বাচ্চাদের কাছে আছে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি মাকে তুলে নেব। হরিণ তো শিকার হল না, কাল বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে ডিনারে এসো। তোমার বন্ধুরাও সবাই থাকবে সেখানে। সপরিবারে। সবাই মিলে একসাথে হইহুল্লোড় করব।"

সব কাঠুরেরা একসাথে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। স্কিপ শিস দিয়ে গেয়ে উঠল কোস্ট গার্ডদের গান "সেম্পের পারাতুস ... "

বিদেশি গল্প- ইংরিজি

ওরা

অমিত দেবনাথ

তখন সন্ধে হয় হয়।

সূর্য দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশ রাঙা হয়ে গেছে শেষ বিকেলের রক্তবর্ণ ছটায়।

টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিল দুজন মানুষ – একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। লোকটার ছোটোখাটো চেহারা, উশ্‌কোখুশ্‌কো চুল, ময়লা গায়ের রঙ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল – এত উজ্জ্বল যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মহিলার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল, একমাথা সোনালি চুল, পরনে হালকা গরম ফ্রক এবং মহিলা এককথায় নিখুঁত সুন্দরি। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছু একটা নজর করছিল। লোকটা বিড়বিড় করে বলল, "এইবার দেখা যাবে।"

"তুমি সিরিয়াসলি বলছ?"

"সিরিয়াস মানে? একশোভাগ সিরিয়াস। দাঁড়াও না, শিগগিরি এর একটা ব্যবস্থা করছি।" লোকটা মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, তাই না? তোমাকে আমি একটু আলাদা ভেবেছিলাম।"

"আলাদা তো হতেই চাই, কিন্তু পারছি কই? জেরি, তুমি যা বলছ, তা কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?"

ঘন ভুরুর নিচে জেরির চোখদুটো আরও কঠোর হয়ে উঠল।

"ইউনিস, আমি ভেবেছিলাম," সে বলল, "তোমার মাথায় হয়তো কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। দেখো –- "

ইউনিস বাধা দিল। "আমি আমার মাথা যথেষ্ট খাটাচ্ছি, আর খাটিয়েও এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে তুমি যা বলছ সেটা কী করে সম্ভব? তুমি কি সত্যিই ভাবছ –"

"শ্ শ্ শ্;" লোকটা বলে উঠল, "ওই ওরা আসছে। ভালো করে নজর করো, ভালো করে। অবশ্য সেটা এদের মধ্যে আছে কি না বুঝতে পারছি না - "

পাহাড়ের ঢালে এবার পাশাপাশি দুজনে শুয়ে পড়ল। পাহাড়ের একটা গুহা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় বেরিয়ে আসছে, তাদের সংখ্যা অন্তত হাজার দশেক। বেরিয়ে আসছিল তারা গুহা থেকে, ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে কালো ধোঁয়ার মত।

বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে ভালো করে দেখতে দেখতেই আচমকা জেরি ইউনিসের হাত চেপে ধরল, চেঁচিয়ে বলল, "দেখো, দেখো, বড়ো ঝাঁকটার ডানদিকে – ওই যে আট নম্বর - না, ন'নম্বর সারিটা। দেখতে পাচ্ছ?"

জেরি বাইনোকুলারটা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইউনিস আস্তে করে সেটা সরিয়ে দিল।

"আমি এমনিতেই দেখতে পাচ্ছি," ইউনিসের গলা শান্ত, শুধু তার নীল চোখদুটো কুঁচকে গেল এক মুহূর্তের জন্য।

"দেখেছ?" জেরির গলায় অসহিষ্ণুতা, "এবার বলো, ঠিক না ভুল?"

"আমার মনে হয়, ওরা শুধুই বাদুড়।"

"রাবিশ!" রাগ ঝরে পড়ল জেরির গলায়, "কাকে বোঝানোর জন্য আমি সময় নষ্ট করছি? আমি তোমাকে পইপই করে বললাম, কীভাবে দেখতে হবে। আর কী, ওরা তো সব উড়ে বেরিয়ে গেল।" তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল জেরি, "তার মানে তুমি কিস্যু বুঝতে পারনি?"

"সত্যিই পারিনি, জেরি। আমি বাদুড় বিশেষজ্ঞ নই। আমি শুধু দেখলাম, ওরা উড়ছিল - "

"শুধু উড়ছিল নয়, শুধু উড়ছিল নয়। ওদের মধ্যে একটা অনেক উঁচুতে উঠেছিল, ঠিক বাজপাখির মত। এই নিয়ে তৃতীয়বার আমি ওটাকে দেখলাম। আমি ওটাকে আলাদা করতে পেরেছি। গায়ের লোম একটু বড়ো, রঙটা একটু আলাদা – তবে এগুলো কোন ব্যাপার নয়। যেটা ঘটনা, সেটা হল – বাদুড় কখনও এত ওপরে ওঠেনা। তার নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো রাত্তিরে ওপরে দমকা হাওয়া থাকে না, হয়তো ওদের পোকামাকড় ধরার সুবিধে হয়। কিন্তু বাদুড়েরা কখনই এত ওপরে ওঠে না।"

সে পকেট থেকে বার করল একটা মোটা মেরুন রঙের নোটবই, কী যেন মিলিয়ে দেখল। তারপর বইটা বন্ধ করে বলল, "ঠিকই আছে। আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছি। এখনই কাজে নামতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

"তথ্য কীসের? কীসের কথা বলছ তুমি?"

"কী- সে- র তথ্য?" রেগে গেল জেরি, "ভগবান! তোমাকে কাল রাত্তিরে আমি কী বোঝালাম? কিছুই শোননি দেখছি। শোনো – জন্তুজানোয়ারদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে,

ওরা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে না। যদি তুমি দেখ কোন কুকুর ঘুমনোর আগে পাক খাচ্ছে না, পায়রা মাথা ঝাঁকাতে ভুলে যাচ্ছে, বাদুড় আকাশের অনেক ওপরে উঠছে –"

"কী সব আজগুবি চিন্তাভাবনা মাথায় ঢুকিয়েছ বলতো? ইউনিস জেরির হাত ধরে বলল, "তোমার কি একটু মজাও করতে ইচ্ছে করে না? একটুও এমনি গল্পগুজব করতে? সারাক্ষণ এইসব ভারি ভারি কথাবার্তা?"

জেরি ইউনিসের হাত সরিয়ে দিল, বিড়বিড় করে বলল, "মেয়েরা করবে গভীর চিন্তাভাবনা? তাহলেই হয়েছে!" তারপর বলল, "শোনো, আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি তা যদি সত্যিই সফল হয়, তবে –"

ইউনিস কাটাকাটা গলায় বলল, "জেরি, আমার মনে হয়, তোমার কোন ডাক্তার দেখানো দরকার।"

জেরি হাসল। তিক্ত হাসি।

"ডাক্তার কেন, বল না, পাগলের ডাক্তার?"

"আমি জানি না, কেন আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে সময় নষ্ট করছি," ইউনিস বিরক্ত গলায় বলল।

জেরি কর্কশ হেসে বলল, "আমিও জানি না কেন আমি লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছি। অবশ্য যে কোন নতুন ধারণাই তো লোকের কাছে প্রথমে আজগুবি ঠেকে। এখনও সময় আছে। এখনও যদি মানুষ ওদের সম্পর্কে সাবধান না হয় –"

"ও- ও- ফ্!" বলে উঠল ইউনিস, "আবার সেই ওদের গল্প!"

"আগেরবার আমার একটু ভুল হয়ে গেছিল," জেরি ইউনিসের কথায় কান না দিয়ে বলে চলল, "আমি কাটাছেঁড়া করে দেখতে চেয়েছিলাম ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অন্যরকম কিনা। এমনকি একবার আমি একটা খরগোশের রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা পাবলিক হেলথ অফিসে পাঠিয়েও ছিলাম। ভেবেছিলাম ওরা কিছু ধরতে পারবে। কিন্তু ওরা রিপোর্টে স্রেফ নেগেটিভ লিখে ছেড়ে দিল। কিছু থাকলেও ওরা খেয়াল করেনি। আশ্চর্য! এটা তো কোন রুটিনমাফিক কাজ নয়, ওদের তো বোঝা উচিৎ ছিল!"

"আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে মনুষ্যেতর প্রাণীরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে?"

"কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে। কিন্তু আমি অনেক বেনিয়ম দেখেছি। আর এখন আমার একটা নিশ্চিত ধারণা হয়েছে।"

"সেটা কী?"

"সেটা কী?" জেরি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "সেটা বললে তুমি এক্ষুণি পুলিশের কাছে যাবে, বা অন্য কোথাও।" তার গলায় একটা সন্দেহের সুর। ইউনিস ব্যাগ্রভাবে বলল, "না না – আমি কোথাও যাব না, কাউকে বলব না। সত্যি বলছি।"

"বেশ। ধরে নেওয়া যাক, এই যে প্রাণীগুলোর কথা আমি বলছি, এরা আসলে কেউ কোন প্রাণী নয়, এরা একধরণের গুপ্তচর। কোথাকার গুপ্তচর, তা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, কিন্তু এরা অসম্ভব বুদ্ধিমান। এরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে – বন্যপ্রাণী বা গৃহপালিত, দু'রকম ভাবেই। এবং আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। মামুলি কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলে মনে হচ্ছে?

কিন্তু এটাই সত্যি। যাই হোক – এরা ভীষণ চালাক এবং লক্ষ্যে স্থির। এদের কিছু কিছু – ধরো প্রায় সবাই – মরে যাবে, তবু মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করবে না। কিন্তু সবারই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কেউ না কেউ ভেঙে পড়বেই। আমি ঠিক সেই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছি। একটা না একটা সময়ে আমি কোন কুকুর বা বেড়াল বা কাঠবেড়ালি বা কোন বাদুড়কে দিয়ে কথা বলাব – অবশ্যই ইংরেজিতে, আর তখনই ওদের সব জারিজুরি, সব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

ইউনিস হাঁ করে তাকিয়ে রইল জেরির দিকে। বলল, "তার মানে, তুমি জন্তুগুলোকে মারবে? যন্ত্রণা দেবে? ওদের কথা বলানোর জন্য? তুমি কি পাগল?"

"আমি জানতাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"জেরি, তুমি কি বুঝতে পারছ যে তুমি অসুস্থ? তুমি একধরণের মানসিক রোগে ভুগছ?"

"সে তো বটেই! লুই পাস্তুর প্রথম জীবাণুর কথা বলাতে তাকেও লোকে পাগল বলেছিল। আইনস্টাইন সময়ের মোচড়ের কথা বলাতেও তাই, অথবা –"

"ওইসব অন্যরকম জন্তু – মানে তুমি যেগুলোকে কাটাছেঁড়া করেছিলে – ওদের তুমি পেয়েছিলে কোথায়?"

"আমি তো তোমায় আগেই বলেছি যে আমি রেডউড ক্যানিয়নে একটা চালাঘরে থাকি। ওখানে অনেক রকম জন্তুজানোয়ার আছে – খরগোশ, হরিণ, ইঁদুর, রেকুন, কাঠবেড়ালি, গিরগিটি, বেজি, শেয়াল – আরও কত কী। যখনই আমার কোনোটাকে অস্বাভাবিক মনে হয়, আমি সেগুলোকে ধরার চেষ্টা করি বা গুলি করি। এতে অবশ্য আমার প্রচুর হয়রানি হয়েছে। আমার বেশ কিছু প্রতিবেশী আমার নামে রিপোর্ট করেছে। আমাকে জরিমানাও দিতে হয়েছে। কিন্তু আমি ওসবের তোয়াক্কা করিনি। তবে এখন আমি একটু অন্যরকমভাবে সমস্যাটার কথা ভাবছি। আমি ভাবছি আমার সমস্ত পরীক্ষাগুলো টেপ করে আর ছবি তুলে রাখবো। যদি আমার পরীক্ষা সফল হয়, তবে ওগুলোই হবে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তখন আর কেউ আমাকে অবিশ্বাস করবে না।"

"তুমি সত্যি সত্যিই তাহলে ভাবছ যে ওইসব ছোটোছোটো জন্তুগুলোকে যন্ত্রণা দিলে, নির্যাতন করলে ওগুলো কথা বলে উঠবে, তাও আবার ইংরেজিতে। এবং সেগুলো তুমি টেপ করে রাখবে, ছবিও তুলবে।"

"নিশ্চয়ই," জেরি জামার পকেটে রাখা নোটবইটা দুবার চাপড়ে বলল, "এখানে সব লেখা আছে। একশোটারও বেশি কেস। সেগুলো প্রমাণ করছে আমিই ঠিক। সব আমার অভিজ্ঞতা – যেমন ধরো, কিছু কিছু বেড়াল অস্বাভাবিক আচরণ করছে। তারা শরীরের কিছু অংশ পরিষ্কার করতে পারছে না। তার মানে এগুলো সত্যিকারের বেড়াল নয়, কারণ বেড়ালছানারা ছোটো থেকেই এগুলো শিখে ফেলে। মোরগ লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে না, কারণ এটা আসল মোরগ নয়। ছুঁচো পোকা ধরছে, কিন্তু সেটার মাথা কামড়ে খাচ্ছে না। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এগুলো স্রেফ নিয়মের ব্যতিক্রম, কিন্তু এগুলো থেকেই আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটার একটা ছবি ফুটে ওঠে। আমি কিন্তু জীবজগতের মধ্যেও একটা ওলটপালট দেখতে পাচ্ছি। আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমার ভুল হচ্ছে না। বিপদ কিন্তু ঘনিয়ে আসছে। এখনও যদি

বিশ্ববাসীকে সাবধান না করা যায়, তবে একদিন – খুব শিগগিরি – এরাই পৃথিবীর দখল নেবে। আমরা তৈরি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা –”

ইউনিস একদৃষ্টে জেরির দিকে তাকিয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। “আচ্ছা, তোমার এরকম কখনও মনে হয়নি যে এই - মানে চর, গুপ্তচর- এরা এত সহজে তোমার ফাঁদে পা দেবে না?”

“উল্টোটাও হতে পারে। ওরা তো জানে না যে ওদের রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি। কাজেই ওরা ইচ্ছে করেও ফাঁদে পড়তে পারে যাতে আরো কাছ থেকে মনুষ্যপ্রজাতির কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে পারে।”

ইউনিস উত্তর শুনে হাঁ হয়ে গেল। বলল, “আচ্ছা, এরকমও তো হতে পারে, এরা যেহেতু চর, হানাদার, তাই তুমি ওদের গোপন রহস্য জেনে ফেলেছ দেখে ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে?”

“পারেই তো,” ঠান্ডাগলায় জবাব দিল জেরি, “কিন্তু আমার ধারণা, ওরা কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসেনি। এটা ওদের পক্ষে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। ওদের মধ্যে কেউ যদি, ধরা যাক গাড়ি চাপা পড়ে, আর দেখা যায় তার শরীরে অদ্ভুত কোন অস্ত্র আছে, তাহলেই তো সব ধরা পড়ে যাবে। কাজেই আমার মনে হচ্ছে, ওরা এখন এসেছে শুধুই প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে। এমনও হতে পারে যে ওরা বহু দূর থেকেও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে, কারণ তাহলে আমি যেগুলোকে অ্যাদ্দিন ধরেছি বা মেরেছি, সেগুলো নিয়ে ঝামেলায় পড়ে যেতাম।”

“সব উত্তরই তো জেনে গেছ দেখছি,” ইউনিস তেতো গলায় বলল, “আর এখন তুমি তাহলে ওইসব নিরীহ, ছোটো ছোটো প্রাণীগুলোর ওপর ফের অত্যাচার শুরু করবে?”

“সবাই যে ছোটো ছোটো প্রাণী, তেমন ভেবো না। আমি এমন হরিণ দেখেছি, যেটা আসল হরিণ নয়, আর এমন ভাল্লুক দেখেছি, যেটা মৌচাকের পাশ দিয়ে চলে গেছে মধু না খেয়ে।”

“আমি কি আসতে পারি তোমার কান্ডকারখানা দেখতে?”

জেরি দারুণ অবাক হয়ে গেল।

“তুমি আসবে? দেখবে? অসম্ভব। জন্তুগুলো যখন যন্ত্রণার চিৎকার করতে থাকে, তখন সেটা সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। না না, তোমাকে আমি আসতে দিতে পারব না।”

ইউনিস উঠে দাঁড়াল। বলল, “তুমি একই সঙ্গে বোকা এবং অসুস্থ মানসিকতার। তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে।”

চলে গেল ইউনিস। তার চলে যাওয়া পথের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল জেরি। তারপর বলল, “যতই রাগ করুক, ওকে কিছুতেই ল্যাবরেটরিতে নেওয়া যাবে না। ওসব দৃশ্য মেয়েদের জন্য নয়।”

এখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার। আড়ষ্ট পায়ে জেরি উঠে দাঁড়াল, তারপর হেঁটে তার গাড়িটার কাছে গেল। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে সে হয়তো দেখবে ইউনিস গাড়িতে বসে আছে, কারণ এখান থেকে শহর অনেকটা দূরে। কিন্তু ইউনিস চলে গেছে। জেরি বেশ কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকল, তার সত্যিই একা একা ইউনিসকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে

নেই। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করে হাল ছেড়ে দিল জেরি, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল শহরের দিকে।

পরদিন সকালবেলা। জেরি তার ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে চিন্তা করছে কীভাবে তার কাজ শুরু করা যায়। পাঁচখানা বিশেষ ধরণের প্রাণীকে বন্দি করে রেখেছে সে পরীক্ষার জন্য। পাঁচটাই যথেষ্ট "সন্দেহজনক"। এর মধ্যে একটা ইঁদুর, যেটার আচরণ পুরোপুরি ইঁদুরের মত নয়, আর ইঁদুর কতটা গুপ্তচরগিরি করতে পারবে সে বিষয়ে তার নিজেরই সন্দেহ আছে। আছে একটা ফুটফুটে খরগোশ, কিন্তু সেটা সন্দেহজনক হলেও সেটাকে অত্যাচারের বদলে আদর করতেই বেশি ইচ্ছে করছে। শেষমেস জেরি যেটাকে বাছল, সেটা হল একটা ছোট্টো রেকুন। এইটুকু হলে হবে কি, ব্যাটার হাবভাব একেবারে দস্যুর মতো। এটাকেই আগে শূলে চড়ানো যাক। তবে এটাও ঠিক, জেরি ভালো করেই জানে যে শুধু পর্যবেক্ষণ করে সবসময় সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। রেকুনটা হয়তো আদৌ তার ধারণামতো গুপ্তচর নয়, এটা হয়তো স্রেফ একটা অতি চালাক, অতি ছট্‌ফটে একটা সাধারণ রেকুন, আর সে যেটাকে নির্দোষ ভাবছে, সেই চুন্নুমুন্নু চোখের ইঁদুরটাই হয়ত গুপ্তচর দলের মাথা। হতেই পারে। তবে কথা হল, কাউকে না কাউকে দিয়ে তো শুরু করতেই হবে।

অতএব, হাতে পাতলা গ্লাভস পরে, জেরি তারের খাঁচা থেকে রেকুনটাকে টেনে বের করল, ছট্‌ফট্ করতে থাকা প্রাণীটাকে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধল টেবিলের সঙ্গে। এমনভাবে বাঁধল, যাতে সেটা নড়াচড়া করলেও পালিয়ে যেতে না পারে।

তারপর, বিউটেন ওয়েলডিং টর্চটা জ্বালিয়ে সে রেকুনটার কাছে গেল।

"শোনো, আমি যা বলছি সবই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ," জেরি বলল রেকুনটাকে, "না না, না বোঝার ভান করে কোন লাভ হবে না। আমি যা যা বলব, তার সমস্ত উত্তর চাই, না হলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। পরিষ্কার ইংরেজিতে জবাব দাও – তুমি কে, কে তোমাকে পাঠিয়েছে এবং কেন। ঠিক আছে?"

রেকুনটা এতক্ষণ প্রাণপণে লাফঝাঁপ, টানাটানি করছিল কষে বাঁধা দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, জেরির গলা শুনে একটু থেমে গেল, তাকিয়ে রইল জেরির দিকে, চক্‌চকে চোখের পোষ না মানার দৃষ্টি। তারপর আবার টানাটানি শুরু করল দড়িটা, নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল ফোঁস্‌ফোঁস্ করে, অদ্ভুত সব আওয়াজ বেরতে লাগল গলা দিয়ে।

"হুম! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না মনে হচ্ছে, ভাবলেশহীন মুখে বলল জেরি, "আগুনের ছ্যাঁকা কীরকম হয় বোধহয় জানা নেই বাছাধনের। তুমি যে গ্রহ থেকে এসেছ, সেখানে লোকজন আগুনে পুড়ে মরে না বোধহয়। অবশ্য এরকমও হতে পারে, তোমাদের আসল চেহারায় তোমরা আগুনের ছ্যাঁকা টের পাওনা – অথবা এখন ছদ্মবেশ ধরে আছ বলে ছ্যাঁকা লাগছে না। আবার এও হতে পারে যে ছ্যাঁকা লাগছে না, অথচ এমন ভান করছ যেন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। দাঁড়াও চাঁদু – মুখে বুলি ফোটানোর অনেক রাস্তা আমার জানা আছে। তোর ব্যথা লাগছে না যখন, তখন আমি ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি। আগুনটা আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, এবার দ্যাখ কেমন লাগে –"

সে আগুনের শিখাটা আরেকটু বাড়াতেই সেটা নীলবর্ণ ধারণ করল। এবার জেরি সেটা নিয়ে সরাসরি ছ্যাঁকা দিল রেকুনটার বাঁদিকের একটা কানে, অসহায় প্রাণীটা ডাক ছাড়ল একটা, তারপর রীতিমত গোঙাতে লাগল। কানটা নাড়াতে লাগল ক্রমাগত।

"লাগছে তো? লাগবেই," জেরি বলল, "এ তো কিছুই না। তুই ব্যাটা যদি এখনও মুখ না খুলিস, তবে তোর গা- টা পোড়াতে থাকব। সহ্য করতে পারবি তো?"

দৃশ্যটা যতই ভয়ংকর লাগুক, আমাকে পিছিয়ে এলে চলবে না, জেরি মনে মনে বলল। যদিও প্রাণীটাকে শেষ অবধি জ্যান্ত পোড়াতে হবে ভাবলেই জেরির নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে উঠছে, তবুও যন্ত্রণা পেয়ে যদি প্রাণীটা ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজমূর্তি ধারণ করে, তাহলে হয়তো ওটা কথাও বলতে পারে।

জেরি যখন আগুনের শিখাটা প্রাণীটার বাঁ পায়ের কাছে নিয়ে এসেছে, ঠিক তখনই তার পেছনে ল্যাবোরেটরির দরজাটা খুলে গেল। আওয়াজ শুনেই ধক্ করে উঠল জেরির বুক, আগুন হয়ে গেল মাথা। পেছন ঘুরে তাকাল সে, যদি তার কোন প্রতিবেশী আবার তার কাজে নাক গলাতে আসে –

"এ কী! তুমি!" জেরি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারল না। "তোমাকে না বলেছিলাম –"

"না এসে পারলাম না," দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ইউনিস, তার চোখ সোজা বেঁধে রাখা রেকুনটার দিকে, সেই নীল চোখ এখন জ্বলছে রাগে, অবিশ্বাসে, ঘৃণায়। "ওঃ, তুমি কি মানুষ! একটা নিরীহ প্রাণীকে তুমি – এখনও ওর ভালো করে চোখ ফোটেনি –"

ইউনিস সোজা তাকাল জেরির দিকে, "এটাকে ধরেছ কেন?"

"ধরেছি, কারণ এটা ওর খাবার ধুয়ে খেত না – অন্তত যদ্দিন না পর্যন্ত না এটা বুঝতে পেরেছে আমি ওকে নজর করছি," জেরির উত্তর, "আটকানো জন্তুগুলোর মধ্যে এটা আমার লিস্টে এক নম্বরে আছে। আর ধরেছি তাতে তোমার কী? ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছে! তুমি এখন যাও এখান থেকে।"

"আমি যাব না," ইউনিস বলল।

"না গেলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।"

ইউনিস চট করে একবার চারদিক দেখে নিয়ে বলল, "বের করে দিলে আমি আবার আসব। তোমার ঘরে তো ছিটকিনিও নেই।"

"বেশ, ইচ্ছে হলে থাকো, তবে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি আমার কাজে নাক গলাও, তবে কিন্তু আর মেয়ে বলে মানব না, গায়ে হাত তুলব।"

সে রেকুনটার কাছে গিয়ে আবার একটা ছ্যাঁকা দিল সেটার পায়ে। যন্ত্রণায় অসহায় প্রাণীটার মুখ দিয়ে এবার প্রায় মানুষের মত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল।

"হুররে! এখন কী মনে হচ্ছে এটা রেকুনের আওয়াজ?" জেরি বলল ইউনিসকে, "জয় ভগবান, এর আগে এরকম আওয়াজ আমি আর কখন শুনিনি। বাজি ফেলছি –"

"এটার ছ্যাঁকা খাওয়ার আওয়াজ তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, তাই না?" ইউনিস বলল, "তুমি এসব বন্ধ করো বলছি, জেরি।"

"অসম্ভব," জেরি বলল, "আমি সাফল্যের দোরগোড়ায়, বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।"

আগুনের শিখাটা আবার এগিয়ে দিল জেরি।

আর তখনই, এক আশ্চর্যজনক নরম, নিয়ন্ত্রিত, জান্তব স্বরে রেকুনটা কথা বলে উঠল।

"ও- ও- হ্!" প্রাণীটা বলল, "আমি আর এত কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। লোকটা খুব ঝামেলা করছে।"

"ঠিক বলেছ," ইউনিস বলল। এবং একটা খাবি খেয়ে জেরি ঘুরে তাকাল ইউনিসের দিকে। দেখতে পেল ইউনিসের হাতে ঝক্‌ঝক্ করছে একটা উদ্যত পিস্তল।

"আমরা মানুষের ছদ্মবেশেও আছি," ইউনিস বলল, "বড্ড বেশি জেনে ফেলেছ, এবার ইষ্টনাম জপ করো।" তারপর সে জেরির মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটে গুলি চালাল।

[আর্থার পোর্জেস (ARTHUR PORGES) রচিত "দি ফ্যানাটিক" (THE FANATIC) অবলম্বনে।]

ছবিঃ শংখ করভৌমিক

ইয়েডোর ওটোকোডেটের গল্প

(গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট)

সংহিতা

পঞ্চম পর্ব

যাত্রা শুরুর আগে, সানজা কী মনে করে ভাবল যে একবার ভ্রাতৃপ্রতিম সেনানায়ক তাকাগি উমানোজোর সাথে দেখা করে নিলে হয় সেই সঙ্গে এটাও তার সাথে আলোচনা করে নেওয়া যায় যে কার্যসিদ্ধির জন্য কোন পথে গেলে ভালো হয়। উমানোজো ছিলেন আবার উদ্ধত স্বভাবের লোক। সানজাকে তিনি বেশ নির্দয়ভাবেই জানালেন, "বানজায়েমন তো চোরের অধম বটেই। কিন্তু তোমার অযত্ন আর অসতর্কতাতেই তো তলোয়ারটা খোয়া গেল। আমার কাছে সাহায্য চাওয়া অর্থহীন। তুমি যেভাবে ভালো বোঝো সেভাবে তোমাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে তলোয়ারটা।"

"আহ্," উত্তরে বললেন সানজা, "বুঝতে পারছি বেশ যে তলোয়ারের রকমফের নিয়ে বিচারে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছিলাম বলে এখনও তুমি মনে মনে রাগ পুষে রেখেছ। তুমি নিজেও বানজায়েমনের চেয়ে কোনো অংশে কম যাও না দেখছি।"

সানজার মনে নিজের পরিচিত লোকেদের সম্বন্ধে শুধু তিক্ততা ছেয়ে গেল। সে ঘর ছেড়ে বেরোলোই প্রথমে উমানোজোকে হত্যা করে তারপর বানজায়েমনের হদিশ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাই সে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল এক পান্থশালায় আস্তানা গেড়ে।

উমানোজোর ছিল মাছ ধরার শখ। একদিন তিনি তাঁর ষোলো বছরের ছেলে উমানোসুকে-কে নিয়ে গেলেন সমুদ্র সৈকতে, মাছ ধরার জন্য। যখন পিতাপুত্র দুজন মহানন্দে মাছ ধরছেন তখন হঠাৎই তাঁদের নজরে এলো যে এক সামুরাই বুঝি তাঁদের দিকে ধেয়ে আসছে। সামুরাই কাছে এসে পৌঁছোতে দেখা গেল যে সামুরাই আর কেউ নন, সানজা। উমানোজো ভাবলেন যে সানজা বুঝি কোনো জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন। তাই তিনি তাঁর ছিপ ফেলে সানজার সাথে মুখোমুখি দেখা করতে এগিয়ে গেলেন। তখন সানজা

চীৎকার করে উঠলেন, “ উমানোজো মশায়, দাঁড়াও, নিজেকে রক্ষা করো এইবারে। তুমি কিনা গিয়েছিলে বানজায়েমনের পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে! তুমি তোমার জুড়ির থেকে অনেক কদম এগিয়ে গেছ, কিন্তু তবুও তুমিই এখন এখানে উপস্থিত। আর তাই তুমিই জবাবদিহি করবে তোমার কৃতকর্মের। কোনো লাভ নেই এখন নির্দোষ সেজে। বাঁচাও নিজেকে, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক।” আর ঝলমলিয়ে উঠল সানজার খোলা তলোয়ার।

“না গো, সানজা মশাই।” নরম সুরে উত্তর দিলেন উমানোজো যাতে সানজার রাগ কিছু পড়ে যদিও তাঁর নিজের মনে প্রচুর উদ্বেগ জমেছিল, “আমি সত্যিই নির্দোষ এ ব্যাপারে, দয়া করে আপনার শৌর্য এই তুচ্ছ কারণে ক্ষয় করবেন না।”

“চতুর, মিথ্যেবাদী”, চেঁচিয়ে উঠল সানজা, “মোটেও ভেবো না যে তুমি আমাকে কথায় বশ করতে পারবে। আমি জানি তোমার মন কতটা নীচ।” আর তারপর ছুটে গিয়ে উমানোজোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কপালে এক কোপ বসিয়ে দিল সানজা। তাতে উমানোজো বালির ওপর পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

উমানোসুকে একটু দূরে মাছ ধরছিলেন। বাবাকে এরকমভাবে আক্রান্ত হতে দেখে ছুটে তাঁর কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা করলেন। আর একটা পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারলেন সানজাকে এই আশায় যাতে সানজার মন অন্যদিকে যায়। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছোনোর আগেই সানজা মারণ কোপ দিয়ে দিয়েছেন উমানোজোর শরীরে। ফলে উমানোসুকে যখন পৌঁছোলেন তখন উমানোজোর দেহ সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ।

“থামুন, সানজা মশায়” চীৎকার করে বললেন উমানোসুকে। তলোয়ার উঁচিয়ে বললেন তারপর, “আমার সঙ্গে লড়তে হবে আপনাকে, আমি আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।”

“তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে,” উত্তর দিলেন সানজা, “তাই যথাযথ কর্তব্য। কিন্তু যদিও আমি এইমাত্র তোমার বাবার সাথে ঝগড়া করে তাকে মেরে ফেলেছি, এবং একজন সামুরাইয়ের উপযুক্ত কর্তব্য হিসেবে আমিও খুশি মনেই তোমার হাতে প্রাণ দিতে রাজি; কিন্তু আমার জীবন অন্য একটা কারণে আমার কাছে মূল্যবান। তা হলো এই যে আমি হয়তো বানজায়েমনকে পাকড়াও করে তলোয়ার চুরির শোধ নিতে পারি। যখন আমি আমার প্রভুকে তাঁর তলোয়ারটা ফেরত দেব তখন আমি নিজেকে তোমার সামনে উপস্থিত করতে পারি তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং তুমি তখন আমাকে হত্যা করতে পার। এক যোদ্ধার সত্যনিষ্ঠ উচ্চারণ এ। তবে প্রতিশ্রুতি আর শপথ যে আমি রাখব তার নজির হিসেবে আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে তোমার অধীনস্থ করে রেখে যাব। প্রার্থনা করি তোমার প্রতিশোধোৎসুক হাত তুমি সংযত রাখো যতদিন না আমি আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারি।”

নিজের গোষ্ঠীতে অস্ত্রকুশলতার সিদ্ধিতে আর হৃদয়বত্তার শ্রেষ্ঠত্বে খ্যাত, সৎ ও নির্ভীক যুবা উমানোসুকে, সানজার বিনীত প্রার্থনা শুনে বলল, “ঠিক আছে, আমি আপনার ফেরার অপেক্ষা করব আর আপনার স্ত্রী-পুত্রকে প্রতিশ্রুতির পণ হিসেবে বন্দী করে রাখব।”

“আমার বিনীত ধন্যবাদ জানবে”, বললেন সানজা, “আমি যখন বানজায়েমনকে শাস্তি দিয়ে ফিরে আসব তখন নিজেকে হাজির করব তোমার কাছে তোমার প্রতিশোধের স্বার্থে।”

তখন সানজা চললেন ইয়েডোতে বানজায়েমনের খোঁজে। আর উমানোসুকে তাঁর পিতার কবরে শোক যাপন করতে লাগলেন।

এদিকে ইয়েডো পৌঁছে বানজায়েমন ভয়ানক নির্বান্ধব বোধ করছিলেন। তাঁর রুজি-রোজগারেরও কোনো উপায় ছিল না। যখন তিনি ওটোকাডেটের নেতা ব্যান্ডজুইনের চোবেই-এর নামডাক শুনলেন তখন তিনি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তারপর চোবেই-এর দলে ভিড়ে তলোয়ার চালানো শিখিয়ে নিজের দিন গুজরান করতে লাগলেন। কাজটা করতে করতে কেটেও গিয়েছিল বেশ কিছুদিন। কাজটাতে তাঁর কিছু নামডাকও হয়েছিল যখন তখন সানজা পৌঁছোলেন সেখানে আর খুঁজতে শুরু করলেন বানজায়েমনকে। কিন্তু দিন, মাস কেটে ক্রমে বছরও ঘুরে গেল নিষ্ফল খোঁজে। এদিকে তাঁর সমস্ত পয়সা-কড়িও গেল ফুরিয়ে। কিন্তু শত্রুর চালচলনের খবর কেন, শত্রুকে যে কিভাবে খুঁজে পাবে সে সম্বন্ধে সানজা বিন্দুমাত্র হদিশ করে উঠতে পারলেন না। অবশেষে চাতুরীর আশ্রয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তার বৃত্তি নিয়ে কাটাতে লাগলেন। এভাবে তাঁর পক্ষে তাঁর দিনের খোরাকটুকু জোটানোও দুরূহ ছিল। এত যন্ত্রণা সওয়ার পরেও তাঁর প্রতিশোধের সম্ভাবনা যেন চিরতরে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন তিনি মনে মনে ঠিক

করলেন যে ইয়োশিওয়ারা যেহেতু শহরের সবচেয়ে জমজমাট এলাকা সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করলে একদিন না একদিন তিনি বানজায়েমনকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবেন। তারপর তিনি বাঁশের চাটাইতে বোনা একটা টুপি কিনলেন যাতে তাঁর মুখটা পুরো ঢাকা পড়ে যায় আর তারপর গিয়ে থাকতে শুরু করলেন ইয়োশিওয়ারার রাস্তার ধারে।

একদিন বানজায়েমন আর চোবেই-এর দুই শাগরেদ, টোকেন গোম্বেই আর শিরোবেই, যাঁর অপ্রতিরোধ্য স্বভাবের জন্য যাঁকে "ছোট্টো ঘোড়া" বলে ডাকা হতো, ফুর্তি করছিলেন আর পান করছিলেন ইয়োশিওয়ারার এক চা-ঘরের ওপরের তলাতে। হঠাৎই নিচের রাস্তার দিকে চোখ পড়াতে টোকেন গোম্বেই দেখতে পেলেন যে এক সামুরাই হেঁটে গেলেন। যদিও তাঁর পরনে পুরোনো ছেঁড়া জামা তবুও তাঁর দারিদ্র্য ক্লিষ্ট চেহারার সাথে তাঁর অহঙ্কারদৃপ্ত ভঙ্গিটা মোটেই খাপ খাচ্ছিল না, তাঁকে সামুরাই বলে বেশ চেনা যাচ্ছিল।

"এই দেখো" বলে বাকিদের নজর সেদিকে ফেরাতে চাইল টোকেন গোম্বেই, "ঐ সামুরাইকে দেখো, জামাটা ওঁর যতই নোংরা, ছেঁড়া-ফাটা হোক না কেন চেহারার আভিজাত্যটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট। আমাদের সেপাইদের যতই ভালো কাপড় পরানো হোক না কেন আমাদের কিছুতেই ওঁর মতো সুপুরুষ দেখাবে না।"

"বটে" বলল শিরোবেই, "আমার খুব ইচ্ছে করছে ওঁকে এখানে ডেকে এনে আমাদের মধ্যে বসিয়ে একপাত্র সুরা খেতে ওঁর সঙ্গে। আবার আমাদের মতো সেপাই-সান্ত্রীদের মানায়ও না ওঁর মতো লোককে ডাকতে যাওয়াটা।"

"আমরা সহজেই সে বাধা পেরোতে পারি।" বললেন বানজায়েমন, "যেহেতু আমি নিজেও একজন সামুরাই, আমার ওঁর কাছে গিয়ে একটু সদালাপে কিংবা ওঁকে এখানে ডেকে আনার মধ্যে অশোভন কিছুই নেই।"

অন্য দুজনে রাজি হতে বানজায়েমন ছুটে নিচে গেলেন আর অপরিচিত সামুরাইকে অভিবাদন করে বললেন, "আমি আপনার কাছে একটু ধৈর্য প্রার্থনা করি, সামুরাই মশাই। আমি আপনার সেবার্থী ফুওয়া বানজায়েমন। আমি একজন রনিন, আপনাকে দেখে বোধ হচ্ছে যে আপনিও তাই। আশা করি, আপনাকে বন্ধুত্বের সম্মান দিতে চাইলে আপনি আমাকে উদ্ধত ভাববেন না এবং যদি আপনাকে নিমন্ত্রণ করি এই চা-ঘরের ওপরে বসে আমার অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে এক পাত্র সুরা পান করতে।"

অপরিচিত সামুরাই সানজা বই আর কেউ নয়। সেই সামুরাই তাঁর বাঁশের টুপির ঘন বুনোটের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে চিনতে ভুল করলেন না তাঁর শত্রুকে। আর চমকে দিয়ে তাঁর মুখের আবরণটা টান মেরে খুলে দিয়ে বললেন, "আরে বানজায়েমন, আমাকে কেমন দেখতে ভুলে গেছ তুমি?"

চলবে

রাশিয়ান গল্প

সোনার পাহাড়

বাংলা ভাষান্তরঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অনেক কাল আগে এক দূরের দেশে ছিল এক বেনের ছেলে। বেণে মানে জানো তো? তারা হল ব্যবসায়ী। জাহাজে চেপে দূর দূর দেশে ব্যাবসা করতে যায়। তা সে ছেলের বাবা মারা গিয়েছিল এমনি এক দূরদেশে ব্যাবসা করতে গিয়ে।

জমা টাকাপয়সা সব শেষ হলে একদিন বেণের ছেলে দেখল, ঘরে আর খাবার নেই। তখন সে করল কি, একটা কোদাল হাতে নিয়ে শহরের বাজারে কাজ খুঁজতে গেল।

সেখানে তো অনেক লোক কোদাল, কুড়ুল এইসব নিয়ে কাজ খুঁজতে এসেছে। তাদের সঙ্গে মিলে অপেক্ষায় রইল বেণের ছেলে। এমন সময় হল কি, ঝমঝমিয়ে জুড়িগাড়ি চালিয়ে হাজির হল একটা লোক। তার গাড়ির চাকা সোনায় মোড়া, আসনে হিরেমুক্তো ঝিলিক দিচ্ছে। ঘোড়ার সাজে সাত রাজার ধন সেলাই করা। কিন্তু মজা হল, তাকে আসতে দেখেই হঠাৎ কাজ

খোঁজারু সমস্ত লোকজন বাজার ছেড়ে একেবারে উধাও। সেখানে তখন একা দাঁড়িয়ে রইল সেই ছেলে।

জুড়িগাড়ি তার পাশে এসে থামল। গাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে সেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কী হে ছোকরা, কাজ খুঁজছ বুঝি? তা আমার সঙ্গে কাজ করতে যাবে?"

"যাবো তো বটেই," ঘাড় নাড়ল বেণের ছেলে, "সেইজন্যেই তো এসেছি। কিন্তু বলি মজুরি দেবে কত?"

"কত চাস?"

"উম্‌ম্‌- দিনে একশো রুবল হলেই কোনমতে চলে যাবে," বেণের ছেলে জবাব দিল।

"বড্ডো বেশি খাঁই দেখছি তোর?" লোকটা গম্ভীর গলায় বলল।

"তা একটু বেশি বইকি," জবাব দিল বেনের ছেলে," কিন্তু তোমায় দেখেই বাজার যে খালি হয়ে গেল। আমি নইলে কাজের লোক আর তুমি পাচ্ছো কোথা?"

খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল লোকটা। তারপর একগাল হেসে বলল, "ঠিক হ্যায়। কাল সূর্য ওঠার সময় জাহাজঘাটায় চলে আয়। আমি অপেক্ষা করব তোর জন্য।"

পরদিন সক্কালসক্কাল জাহাজঘাটায় কোদাল নিয়ে পৌঁছে বেণের ছেলে দেখে জলে ভাসছে একটা বেজায় সুন্দর সোনালী রঙের জাহাজ। তার ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল আগের দিনের সেই লোকটা। বেণের ছেলেকে দেখে সে একগাল হেসে বলে, "এসেছিস? আয়, আয়, কাজে যাই চল।"

জাহাজ তো ভেসে চলল অকূল দরিয়ায়। একমাস, দুমাস তিনমাস ভেসে চলবার পর সে এসে ভিড়ল একটা দ্বীপের গায়ে। দ্বীপের ভেতরে একটা জায়গায় হলদে আগুন জ্বলছে যেন দাউদাউ করে। সেইদিকে দেখে বেণের ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "ও কীসের আগুন?"

লোকটা হেসে বলল, "আগুন নয়। ও আমার সোনার প্রাসাদ। রোদে ঝলমল করছে।

তারপর তো তারা জাহাজ থেকে নেমে লোকটার বাড়িতে গেল। সেখানে দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র সব সোনার, কিন্তু তাদের সব্বার চেয়ে সুন্দর হল লোকটার মেয়ে। তার সোনার মতন গায়ের রঙ, অন্ধকারের মতন একঢাল চুল আর লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর তেমনই মিষ্টি স্বভাব তার।

বাড়ি পৌঁছে লোকটা বলল, "কাজকর্ম কাল হবে। আজ এসো সবাই মিলে আমরা ফূর্তি করি।" তারপর তো শুরু হল খানাপিনা গানবাজনার পালা। আনন্দফূর্তি চলছে এমন সময় বেণের ছেলে দেখে লোকটার মেয়ে তাকে ইশারা করে ডাকছে। কাছে যেতে সে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে। তারপর বলল, "তুমি খুব ভালো ছেলে। তবে সামনে তোমার অনেক লড়াই আছে। এইটে সঙ্গে রাখো, বিপদ এলে কাজে দেবে।"

এই বলে সে ছেলের হাতে তুলে দিলো একটুকরো চকমকি পাথর আর একটা লোহার পাত। আর বলল, "বিপদে পড়লে লোহার পাতে চকমকি ঘষে দিও, সব বিপদ কেটে যাবে।"

বেণের ছেলে সেই চকমকি আর লোহা নিয়ে লুকিয়ে রাখল তার আংরাখার নীচে গোপন এক থলের ভেতর।

পরদিন সকালে ঝকমকে রোদ উঠলে লোকটা বেনের ছেলেকে নিয়ে ফের জাহাজে উঠল। বলল, "চল এবারে কাজ করতে যাই।"

অমনি জাহাজ ছুটল পাল উঁচিয়ে জল কেটে। চলতে চলতে চলতে তিন মাস তিনদিন পরে তারা এসে উঠল এক দ্বীপে। তার মাঝখানটায় উঠে গেছে আকাশ ছোঁয়া একটা সোনারঙের পাহাড়।তার খাড়াই দেয়াল দেখলে ভয় লাগে। লোকটা বেণের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে মেঘের ওপরে চলে গেল। তবু পাহাড়ের চুড়ো মিলল না। পাহাড় হয়ে উঠল আরো খাড়াই। তখন তারা হামাগুড়ি দিয়ে চড়াই বাইতে লাগল। তবু পাহাড়ের চুড়ো মেলে না। সেইখানে পাহাড় একটা থামের মতন খাড়া উঠে গেছে ওপরদিকে। তার গা বেয়ে ওঠা মানুষের সাধ্য নয়।

তখন একটা চ্যাটালো পাথর দেখে তার ওপর বসে লোকটা বলল, "তেষ্টা পেয়েছে নাকি রে?"

বেণের ছেলে ঘাড় কাত করে বলল, "হ্যাঁ তো।"

"বেশ তাহলে আয়, একটু মিঠে শরবত খেয়ে নে দেখি!"

ছেলে তো সোনার পাত্রে ঢালা চমৎকার শরবত এক চুমুকে খেয়ে নিল। এদিকে হয়েছে কি, লোকটা সেই শরবতের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল ঘুম বিষ। যেই না শরবত খাওয়া অমনি বেণের ছেলে ঘুমে ঢলে পড়ল। লোকটা তখন করল কি, সঙ্গে আনা ঘোড়াদুটোর একখানাকে মেরে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়ে বেণের ছেলেকে কোদাল সহ তার মধ্যে ভরে পেট সেলাই করে দিল আবার। রক্তের গন্ধ পেয়ে তখন আকাশ কালো করে উড়ে এসছে একঝাঁক লোহার ঠোঁটওয়ালা পাখি। যেমন তাগড়া তাদের চেহারা তেমনই কটকটে তাদের গলার আওয়াজ। মরে পড়ে থাকা ঘোড়াটাকে সবাই মিলে ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে তারা উড়ে গেল পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়। তারপর ঠোঁট ডুবিয়ে তার মাংস খেতে শুরু করল।

খানিক বাদে ঘোড়া খাওয়া শেষ হতে ছেলের ঘুম ভাঙল। হাঁচোড়পাচোড় করে ঘোড়ার পেট থেকে কোদাল হাতে বেরিয়ে এসে সে দেখে পাহাড়ের মাথায় সোনা, শুধু সোনা।

তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে নীচে থেকে লোকটা বলে, "এইবার কাজ শুরু করে দে। মাটি কেটে সোনা তোল আর নীচে ফেল।"

বেণের ছেলে তো সোনা কাটতে লাগল। এক দুই তিন করে একে একে বিশ বস্তা সোনা নীচে ফেলে দিল সে। তখন লোকটা সোনার বস্তাগুলো অন্য ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে নীচের দিকে রওনা দিল।

"আর আমার কী হবে?" ওপর থেকে হেঁকে বলল বেণের ছেলে।

"তোর আবার কী হবে? ওইখানে পড়ে শুকিয়ে মর! এখন অবধি নিরানব্বইটা লোক ওইখানে পড়ে মরেছে। তোকে নিয়ে একশোজন হবে। এ পাহাড় থেকে কেউ জ্যান্ত নামতে পারেনি আজ অবধি।" এই বলে লোকটা ঘোড়া আর সোনা নিয়ে চলে গেল।

বেণের ছেলে তো মহাদুঃখে পাহাড়ের মাথাতেই বসে রইল। সূর্য অস্ত গিয়ে রাত এল। হু হু করে হাওয়া বইতে লাগল। লোহার ঠোঁটওয়ালা পাখিগুলো তার মাথার ওপরে চক্কর কাটতে লাগল। তারা জানে এ ছেলে শিগগিরই পাহাড়ের মাথায় পড়ে মরবে। তখন তাদের ভোজ হবে।

তখন হঠাৎ বেণের ছেলের মনে পড়ে গেল লোকটার মেয়ের দেয়া উপহারের কথা। তাড়াতাড়ি পোশাকের ভেতর থেকে লোহা আর চকমকি বের করে এনে জোরে জোরে ঠুকল

সে। অমনি তার থেকে একঝাঁক আগুনের ফুলকি বের হয়ে এসে তাই থেকে তৈরি হল একজন বিরাট মানুষ। মানুষ তার সামনে মাথা নিচু করে বলল, "হুকুম করুন।"

তাই শুনে বেণের ছেলে তাড়াতাড়ি খানিক সোনা তার পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে বলল, "আমায় শিগগির এইখান থেকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে চল।"

বিরাট মানুষ তক্ষুনি তাকে কোলে করে নিয়ে সাবধানে পাহাড় থেকে নেমে এক ছুটে তাকে সমুদ্রের ধারে বসিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। সমুদ্র দিয়ে তখন ভেসে যাচ্ছিল একটা জাহাজ। বেণের ছেলেকে দেখে তারা এগিয়ে এসে নোঙর করে তাকে জাহাজে তুলে নিল। তারপর অনেকদিন সমুদ্রে ভেসে ভেসে শেষমেস সে তার দেশে ফিরে এল।

****

দেশে ফিরে সোনাটোনা বেচে বেণের ছেলে দিব্যি আছে। কিন্তু তার খালি মনে পড়ে সেই সোনার প্রাসাদের মেয়ের কথা। ভালোবেসে সে মেয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল যে! অবশেষে একদিন সে ঠিক করল দুষ্টু লোকটাকে সাজা দিয়ে সেই মেয়েটাকে বিয়ে করে আনতে যাবে সে।

অনেক ভেবেচিন্তে সে এক বোতল তুরান দেশের সুরা জোগাড় করে তার মধ্যে খানিক ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে পোশাকের মধ্যে বোতলটা লুকিয়ে নিল। তারপর লম্বা লম্বা চুলদাড়ি গজিয়ে গরিব মানুষ সেজে একটা কোদাল নিয়ে বাজারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

খানিক বাদে ফের ঝমঝমিয়ে জুড়িগাড়ি চালিয়ে হাজির সেই লোকটা। বাজারের সব লোকজন তাকে আসতে দেখেই পালিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে একলা ছদ্মবেশী বেণের ছেলে। লোকটা তাকে চিনতেই পারল না। কাছে এসে বলে, "কাজ করবি নাকি?"

"করব। তবে মাইনে লাগবে দিনে দুশো রুবল," বেণের ছেলে জবাব দিল।

"বাপ রে! তোর মাইনে দেখি বড্ডো বেশি?"

"দিলে দাও, নইলে অন্য লোক দেখ গে যাও। পাবে কোথায় অন্য লোক তুমি? সবাই তো তোমায় আসতে দেখেই পালিয়ে গেছে," বেণের ছেলে জবাব দিল।

লোকটা খানিক ভেবেচিন্তে বলে, "চল তবে আমার সঙ্গে জাহাজঘাটায়।"

জাহাজঘাটায় এসে ফের তারা লোকটার সেই সোনার জাহাজে চড়ে ভেসে গেল গভীর সমুদ্রে। তারপর একদিন জাহাজ গিয়ে সেই সোনার প্রাসাদে পৌঁছোল। রাত্তিরে অনেক খাওয়াদাওয়া ফূর্তি হল, আর তার পরদিন তারা গিয়ে চড়ল সেই সোনার পাহাড়ে।

তার মাঝবরাবর উঠে লোকটা ফের বলে,"তেষ্টা পেয়েছে নাকি?"

বেণের ছেলে বলে, "তা তো পেয়েছে। আমার কাছে এক বোতল তুরান দেশের দারুণ সুরা আছে। চাও তো তোমায় খানিক দিতে পারি।"

শুনে লোকটার চোখ লোভে চিকমিক করে উঠল। বলে, "কই দে দেখি! আগে সেইটে খাই, তারপর দুজন মিলে আমার শরবতটাও খাব।"

বেণের ছেলে তখন পোশাকের মধ্যে থেকে আগে থেকে লুকিয়ে নিয়ে আসা ঘুমপাড়ানি বিষ মেশানো তুরান দেশের সুরা বের করে লোকটাকে খাওয়াল। লোকটার কোন সন্দেহই হল না।

খানিক বাদে যেই না লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে অমনি সঙ্গে আনা দুটো ঘোড়াগুলোর একখানাকে মেরে ফেলে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে লোকটাকে একটা কোদালসহ ভরে দিল তার ভেতরে।

তারপর উড়ে এল লোহার ঠোঁটওয়ালা পাখির দল। মরা ঘোড়াকে ঠোঁটে তুলে উড়ে গেল

পাহাড়ের চুড়োয়। সেইখানে বসে ঘোড়া খাওয়া শেষ করতে লোকটা ঘোড়ার পেট থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সে পাহাড়চুড়োয় আটকা পড়েছে। নীচে থেকে বেণের ছেলে হেঁকে বলল, "আমায় চিনতে পারোনি তুমি। আমি সেই ছেলেটা যাকে তুমি পাহাড়চূড়োয় একশো নম্বর মরা মানুষ হবার জন্যে ফেলে রেখে গিয়েছিলে। আমি জানি কেমন করে ওখান থেকে নামতে হয়।"

"আমায় বলে দে না!" লোকটা মিনতি করে বলল।

"আগে কোদাল দিয়ে পাথর খুঁড়ে চল্লিশ বস্তা সোনা ফেলো নীচে, তারপর বলছি তোমায়," জবাব দিল বেণের ছেলে।

লোকটা আর কী করে! কোদাল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বস্তা বস্তা সোনা ফেলতে শুরু করল নীচে। চল্লিশ বস্তা সোনা হতেই বেণের ছেলে সেই সোনা সঙ্গে আনা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে বলল, "বদমাশ লোক, তুই নিরানব্বইটা লোককে এইভাবে মেরেছিস। এইবার তুই হবি লোহাপাখিদের একশো নম্বর খাবার।"

এই বলে লোকটার কান্নাকাটিতে মোটে কান না দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে গেল পাহাড় থেকে। তারপর লোকটার জাহাজে চেপে ফিরে গেল তার সোনার প্রাসাদে। সেখানে

তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই সোনার মেয়ে। তাকে বিয়ে করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে সে সুখেশান্তিতে ঘর করতে লাগল। আর দুষ্টু লোকটার হাড়গুলো পড়ে রইল সেই সোনার পাহাড়ের চুড়োয়। কেউ আর কোনদিন তার খোঁজ পেল না।

পোলেভয়- এর রাশিয়ান 'স্কাজকি' থেকে নিসবেত বাইন এর ইংরিজি অনুবাদ অবলম্বনে।

বৈজ্ঞানিক

পাই কাহিনী

‘পাই’(π) কাকে বলে জানো?

ক্লাশ সিক্স বা তার ওপরে যারা পড়ো তারা অনেকেই হাত তুলবে জানি। ওইটা অংক ক্লাশের একটা বিটকেল জিনিস যেটা দিয়ে বৃত্তের পরিধি, ক্ষেত্রফল এইসব মাপে। এককথায় অংকের যন্ত্র বা টুল একটা।

শোনো বলি তবে। ‘পাই’ কিন্তু অত তুচ্ছ জিনিস নয়। ওর মধ্যে বিরাট এক রহস্য রয়েছে। কিছু একটা ম্যাজিক কাজ করে ওতে। যতবড়োই বৃত্ত হোক না কেন, তার পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে তার মান সবসময় ওই ‘পাই’ এর সমান হয়। তোমার চোখের মণিতে যে হিসেব, গোটা সূর্যটাও সেই একই হিসেব মেনে চলে। একই হিসেব মেনে চলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না এমন ছোট ডিএন এ তন্তুর প্যাঁচগুলোও, মেনে চলে

আলোকতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গেরা, মেনে চলে পুকুরে ঢিল ফেললে তার থেকে তৈরি হওয়া গোল তরঙ্গের দল।

শুধু কি বৃত্তের মাপ? 'পাই' আরো অনেক আশ্চর্য জায়গায় দেখা দেয় এসে। যেমন ধরো, তুমি যদি বেশ কয়েকটা পূর্ণসংখ্যা এলোমেলোভাবে বেছে নিয়ে একজায়গায় রাখলে। তারপর তার থেকে যেকোন দুটো পূর্ণসংখ্যা তুললে চোখ বন্ধ করে। এবারে মজাটা হবে এই যে অংক কষলে দেখা যাবে যে দুটো সংখ্যাই তুমি এভাবে বেছে তোলো না কেন, তাদের দুটোকেই ভাগ করা যায় এমন কোন সংখ্যা না থাকবার চান্স সবসময় হবে ($৬/\pi^২$)। কী করে হয়? কেউ জানে না।

আরো আছে। ধরো একটা নদী। সে চলেছে এঁকেবেঁকে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে। তুমি চললে তার দৈর্ঘ্য মাপতে। যদি তুমি দুটো মাপ নাও, একটা হল তার আঁকাবাঁকা স্রোতের মোট দৈর্ঘ্য আর অন্যটা তার উৎসবিন্দু থেকে মোহানাবিন্দুর সরলরেখার দৈর্ঘ্য তাহলে দুনিয়ার সব নদীর জন্যই তার মান হবে ওই π ।

বোঝাই যাচ্ছে প্রকৃতির নানান বস্তুকে আর তার রহস্যকে বোঝবার জন্যে যত অংক তাতে এই ম্যাজিক নম্বরটার কী বিশাল ভূমিকা। অতএব তার মান বের করতে হবে। চলো শুরু করা যাক। লাগবে একটা সুতো আর একটা স্কেল। কৌটোর ঢাকনা দিয়ে কাগজের গায়ে গোল ছাপ দাও একখানা। তারপর গোলবরাবর সুতো ফেলে পরিধিটা মেপে নাও তার। এবারে বৃত্তটার ঠিক মাঝখানের বিন্দুর ওপর দিয়ে তার পরিধির এপাশ থেকে ওপাশ অবধি লম্বা করে সুতো ফেললেই বেরিয়ে আসবে ব্যাস। তাকেও স্কেলে মেপে নাও।

এবারে প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দিয়ে ভাগ করলেই পাই এর মান—

দাঁড়াও দাঁড়াও। এইবারেই তো খেলা শুরু।

ভাগটা শুরু করলে ধরো। প্রথমে পাবে তিন। দেখবে একটু ভাগশেষ থাকছে। কোই বাত নেহি। একটা দশমিক বসিয়ে শূন্য টেনে এনে ফের করো, আসবে ১। ফের একটু ভাগশেষ থাকবে। মানে নিখুঁত ভাগফলটা পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে করতে থাকো, করতেই থাকো—ভাগটা কোনদিন শেষ হবে না। প্রকৃতির এই ম্যাজিকটা, চোখের তারা, সূর্য, মৌলিক সংখ্যার হিসেব কিংবা নদীর দৈর্ঘ্য যেমন সমস্তকিছুকেই যে সংখ্যাটা নিয়ন্ত্রণ করে কিছুতেই তার পুরোপুরি নিখুঁত মান ধরা দেবে না তোমার কাছে।

$\pi =$

3.14159265358979323846
26433832795028841
97169399375105820974
94459230781640628620
89986280348253421
70679821480865132823
06647093844609550

অথচ বিশ্বটাকে ঠিকঠাক মেপেজুপে ফেলতে হলে, তাকে এক্কেবারে ঠিকঠাকভাবে জানতে হলে ও সংখ্যার নিখুঁত মাপ না জানলে চলবেই না। তাহলে উপায়?

মানুষ তার সভ্যতার একেবারে শুরুর দিক থেকেই ক্রমাগত তাই 'পাই'কে সবটা না হলেও যত বেশি নিখুঁতভাবে ধরা যায় সেই চেষ্টা করে চলেছে। প্রাচীন মিশরীয়রা তার মান বের করতে পেরেছিল মাত্রই দশমিকের পর দু ঘর অবধি—৩.১৪ । তার ফলে ওই সম্পর্কিত সমস্ত মাপজোকের ভুলকে তারা একশো ভাগের এক ভাগের কমে নামাতে পেরেছিল। কিন্তু মহাবিশ্বের নানান রহস্যকে সঠিকভাবে হিসেব করে বোঝবার চেষ্টা করতে গেলে সে ভুলটাও অনেক সময় মারাত্মক হয়ে ওঠে। ওর পরে এক এক ঘর মান বের করতে পারা মানে সেই ভুলের পরিমাণটাকে দশের গুণিতকের হারে কমিয়ে আনা। মানে ৩.১৪ এর পর কোন সংখ্যাটা রয়েছে সেইটে খুঁজে পেলে মানেই হিসেবের ভুলের পরিমাণ কমে গিয়ে হল হাজার ভাগের এক ভাগ।

এখন কমপিউটার আবিষ্কার হবার পর সে মানটা অনেক নিখুঁতভাবে বের করা গেছে। ৩ এর পর দশমিকের পর ৫ ট্রিলিয়নখানা সংখ্যা অবধি যেতে পেরেছে আমাদের কমপিউটাররা। কিন্তু তবু সে ভাগের শেষ মেলেনি। কে জানে, মহাবিশ্বের কোন এক বিরাট রহস্য হয়ত লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে।

কিন্তু সভ্যতার যখন সূচনা ঘটছে তখন না ছিল কমপিউটার, না ছিল সুক্ষ মাপজোক করবার মত অংক বা যন্ত্রের হদিশ।

সেই সময়ে বসে আর্যভট একখানা প্রায় অসাধ্যই সাধন করে ফেলেছিলেন বলতে পারো। তিনি পাই এর যে মানটা বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে ভুলের পরিমাণ ছিল দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। পাই- এর মান তাঁর হিসেবে এসেছিল ৩.১৪১৪৬ (এর প্রথম চার ঘর নিখুঁত আর শেষ ঘরটা মোটামুটি আনুমানিক)। আপাতদৃষ্টিতে এই ছোট্টো কাজটা কিন্তু পাই দিয়ে দুনিয়ার নানান মাপজোকের শাস্ত্রটায় ভুলের পরিমাণকে দশ হাজার ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। কেমন ম্যাজিক?

আজ তবে এই অবধি রইল। এরপর শুরু হবে আর্যভটের পরবর্তীকালের এমনই কিছু সব মহাধুরন্ধর ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর তাঁদের কাজকর্মের আশ্চর্য সব খবর।

জলের বোতলের কারুকার্যের নেপথ্যকাহিনি

সুজিতকুমার নাহা

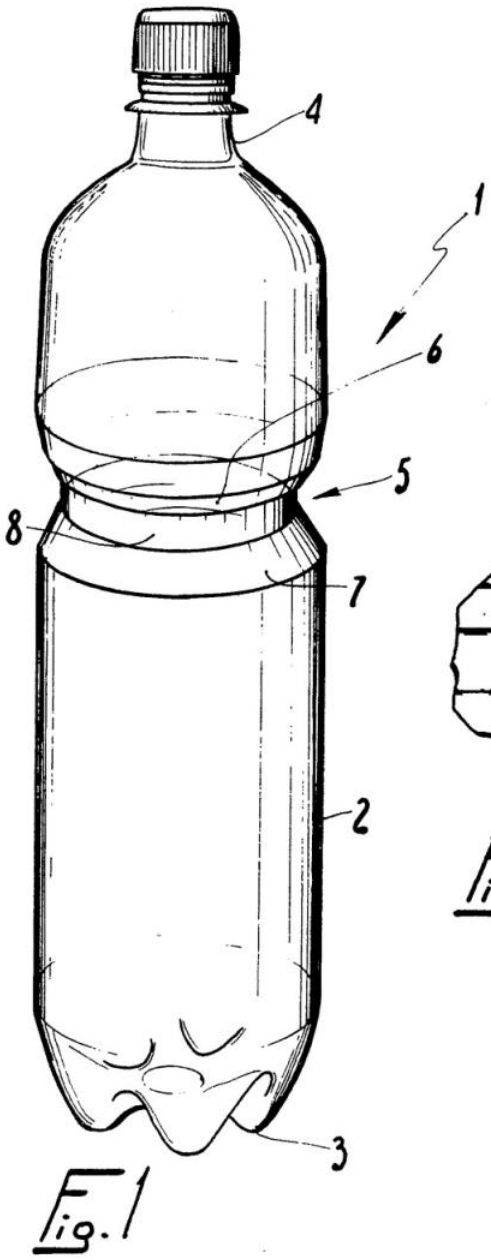

Fig. 1

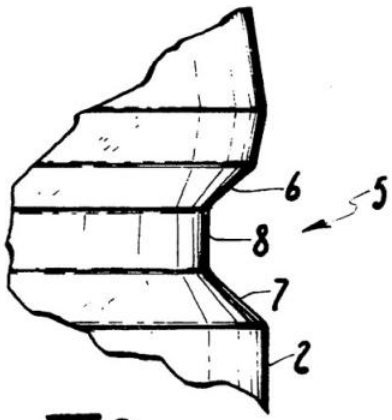

Fig. 2

কৃষ্ণনগরে কাকুর বাড়িতে পৌঁছতে বেলা প্রায় দশটা বাজল। গুড ফ্রাইডের ছুটি থাকায় কাকু , কাকিমা ছাড়াও খুড়তুতো দাদা পিকলু, গোপাবউদি ও ভাইঝি টুম্পা বাড়িতেই ছিল। পিকলুদা শিক্ষক, গোপাবউদি অধ্যাপিকা আর টুম্পা ছাত্রী। ছুটির দিন ছাড়া এই সময় ওরা কেউই বাড়িতে থাকে না।

কাল ফোন করে আগাম জানিয়েছিলাম, তাই আয়োজনের খামতি ছিল না। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পরই হাত-মুখ ধুয়ে যেতে হল ডাইনিং হলে। বসল জম্পেশ প্রাতরাশের আসর। খাওয়ার সাথে চলল আড্ডা। কিছুক্ষণ সাদামাটা পারিবারিক কথাবার্তা চলার পরই হঠাৎ আলোচনা তীক্ষ্ণ বাঁক নিল টুম্পার একটা অদ্ভুত প্রশ্নের হাত ধরে। ব্যাপারটা বরং খুলেই বলি।

শেয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার আগে একটা প্যাকেজড্ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের বোতল কিনেছিলাম। পুরো জল শেষ না হওয়ায় বোতলটা ফেলা হয় নি। ডাইনিং টেবিলের একপ্রান্তে সেটা শোভা পাচ্ছিল। বোতলটা দেখিয়ে টুম্পা প্রশ্ন করল, “জল ফুরোলেই তো ওটা বাতিল হবে। তাহলে বোতলটার গায়ে এত নকশার বাহার কেন?”

পিকলুদা পনির পকোড়া চিবোতে চিবোতে বলল, "এটাও জানিস না ! দেখতে সুন্দর লাগবে বলেই গা- টায় কারুকার্য করা হয়েছে।"

গোপাবউদি পিকলুদার কথায় ঘোরতর সন্দেহ ব্যক্ত করল। 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' জিনিসকে দৃষ্টিনন্দন বানানো তো ভস্মে ঘি ঢালারই সামিল! গোপাবউদির ধারণা, সৌন্দর্যবৃদ্ধি নয়, এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে অন্য কারণ।

ছেলে- বউমার বিতন্ডায় কাকিমা নিরপেক্ষ অবস্থান নিল। ঝানু কূটনীতিকদের স্টাইলে বলল, "দেখতে যে ভালো লাগছে সেটা ঠিক। তবে শুধু দেখার জন্যই এত কিছু করা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

কাকু কিছু বললেন না। শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, প্রকৃত কারণটা মোটেই ওঁর অজানা নয় ।

আমি কাকুকে প্রস্তাব দিলাম , "আসল কারণটা তুমিই খোলসা করে জানিয়ে দাও না! "

প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে কাকু বললেন, "টেকনিক্যাল টার্ম বাদ দিয়ে বোঝানোর এলেম আমার একদমই নেই। সবাই ভিরমি খাবে মোমেন্ট অফ্ ইনার্শিয়া, রেডিয়াস অফ্ জ্যাইরেশন, নিউট্রাল অ্যাক্সিস্ এসব শুনলে! সহজ করে বরং তুই- ই বলে দে।"

অগত্যা আমাকে মাঠে নামতেই হল। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, "টেকনিক্যাল কচকচি বাদ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব আমরা। শুরু করব একটা প্রশ্ন দিয়ে। আচ্ছা, প্যাতপেতে জিনিসকে পোক্ত বানানোর কি কোনো সহজ রাস্তা আছে?"

সবাই নিরুত্তর।

আমি আবার ভাষণ শুরু করলাম, "স্রেফ আকার পাল্টেই এটা করা সম্ভব। এর অনেক নজির ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইস্পাতের পাতলা চাদর এত নমনীয় যে মাদুরের মতো গোল করে গুটিয়ে রাখা সম্ভব। অথচ সেই চাদর দিয়ে বানানো করোগেটেড শিট্ বা চলতি কথায় টিনের শিট্ এত মজবুত যে টিনের চালের ওপর গিয়ে চড়ে বসলেও তা দুমড়োয় না।"

এবার একটা মোক্ষম প্রশ্ন করল টুম্পা। জানতে চাইল, মূল উপাদান এক থাকা সত্ত্বেও আকারের সাথে মজবুতির এই বিশাল পরিবর্তনের পেছনে কারণটা কী।

"খুবই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন," আমি টুম্পার প্রশ্নের তারিফ করে বললাম, "বক্রন বা বেন্ডিং ঠেকাতে সাদামাটা চেহারার তুলনায় ঢেউতোলা কিংবা খাঁজওলা আকার অনেক বেশি উপযুক্ত। মোদ্দা কথা হল, বস্তুর উপাদান এক জায়গায় না রেখে ছড়িয়ে দিতে পারলে বস্তুর বক্রন- প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। টাটার 'সুমো' বা মাহিন্দ্রার 'বোলেরো' গাড়ির ছাদে লম্বালম্বি খাঁজ রাখা থাকে এই কারণেই। ভারী মালপত্র বইবার মতো পোক্ত করার জন্যই ইঞ্জিনিয়াররা বানিয়েছেন খাঁজযুক্ত ছাদ। সমতল ছাদ হলে ভয় থাকত মালের ভারে তুবড়ে যাবার।"

গোপাবউদি মন্তব্য করল, ''এখন বুঝতে পারছি বড়ো সাইজের হাতা-খুন্তির হাতল লম্বার দিকে সাদামাটা হলেও আড়াআড়ি দিকে সমতল না হয়ে কেন কিছুটা গোল আকৃতির হয়।''

টুম্পা বলল, ''কাকুমণি, আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। জল ফুরোলেই ফেলে দেওয়া হবে বলে জলের বোতলের দেওয়াল মোটা বানিয়ে দাম বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। খাঁজটাজগুলো দেওয়া হয় পাতলা ন্যাতপেতে বোতলকে পোক্ত বানানোর জন্যই। ওগুলো না রাখলে সামান্য চাপেই বোতল দুমড়ে গিয়ে অসুবিধে ঘটাত।''

আমি হেসে বললাম, ''কথাটা একশো শতাংশ ঠিক।''

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই কাকিমা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ''এগারোটা তো বাজতে চলল! বউমা, এখুনি রান্নাঘরে চলো। অনেক কাজ পড়ে আছে।''

অত: পর আমাদের জমাটি আড্ডার আসর ভঙ্গ হল।

মহাবিশ্বে মহাকাশে

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকগুলি তারা নিয়ে গঠিত কালপুরুষ তারকামণ্ডল। এর সংস্কৃত নাম মৃগনক্ষত্র আর পাশ্চাত্য নাম ওরিয়ন (Orion)। এই তারকামণ্ডলের ১৩ টি তারা পৃথিবী থেকে খুব সহজে খালি চোখে দেখা যায়। তারাগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে কালপুরুষ মণ্ডলে একটি পুরুষের আকৃতি লক্ষ করা যায়। এর দক্ষিণ বাহুতে যে দুটি তারা আছে তার পূর্বেরটির নাম আদ্রা (Betelgeuse) । তাম্রবর্ণের এই বিশাল তারাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নানা বিস্ময়।

আদ্রা নক্ষত্রটি আমাদের কাছে নানা নামে পরিচিত। সংস্কৃতে একে অভিহিত করা হয়েছে ‘বাহু’ নামে (যেহেতু এই তারাটি কালপুরুষের একটি বাহুর উপর অবস্থিত)। ইরানে পার্সীদের কাছে এর পরিচয় ছিল ‘বেস্‌ন’ (Besn) নামে— যার অর্থ ‘বাহু’। ইউরোপে স্লোভেনদের (Sloven) কাছে এর নাম ছিল ‘বেটেল গেজা’ (Betel geza) । আরব দুনিয়ায় তারাটি তিনটি নামে পরিচিত ছিল—

- আল ধিরা (Al Dhira) , যার অর্থ ‘বাহু’।
- আল মান্‌কির (Al Mankib) , অর্থ ‘স্কন্ধ’।
- আল ইয়দ আল ইয়ম্মা (Al Yad al Yamma) , অর্থাৎ দক্ষিণহস্ত।

কপটিকদের কাছে আদ্রা পরিচিত ছিল ‘ক্লারিয়া’(Klaria) নামে, যার অর্থ বাহুবন্ধনী(armlet) । ইউফ্রেতিস নদীর তীরে যারা বাস করত তারা এই তারাটিকে ডাকত ‘গুলা’ (Gula) নামে।

পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব প্রায় 427 ± 92 আলোকবর্ষ (131 পারসেক)। এত দূরে থাকা সত্ত্বেও তারাটিকে কালপুরুষ মণ্ডলের অন্যান্য তারার তুলনায় যথেষ্ট বড়ো ও উজ্জ্বল দেখায়। তারাটি কত বড়ো হতে পারে? উত্তর শুনলে অবাক হতে হয় বইকি। বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন যে 16 কোটি সূর্য এই তারার ভিতর অনায়াসে ঢুকে যাবে। আর যদি পৃথিবীকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে প্রায় 20800000 কোটি পৃথিবী এর ভিতর এঁটে যাবে। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায় তারাটি কত বড়ো। আমরা খালি চোখে আকাশে যত তারা দেখতে পাই তাদের মধ্যে আদ্রাই সবচেয়ে বড়ো।

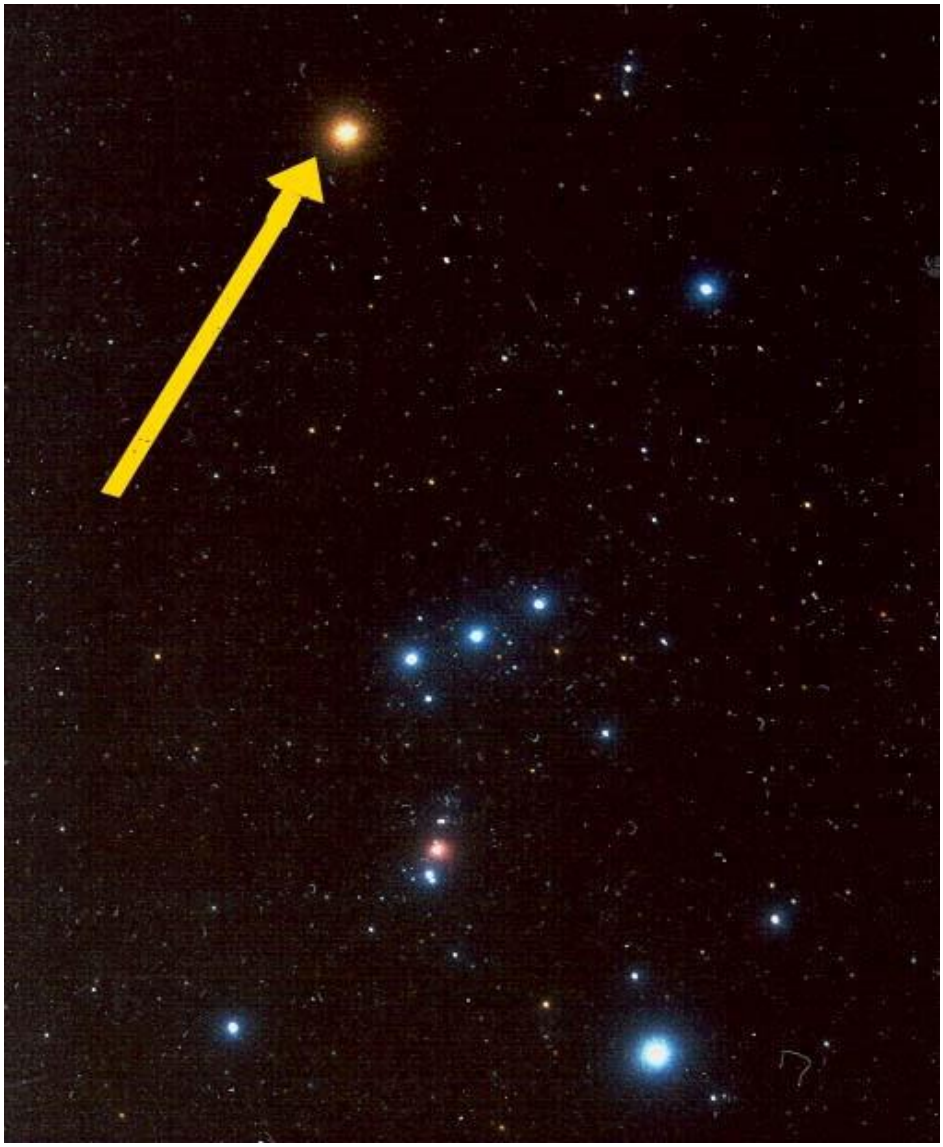

এত বড়ো তারা হয়েও আদ্রা সূর্যের চেয়ে ঠান্ডা। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা যেখানে 5800 কেলভিন সেখানে আদ্রার পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা 3100 কেলভিনের কাছাকাছি। এমনটা হওয়ার কারণ কী? বৈজ্ঞানিকদের অনুমান আদ্রার হাইড্রোজেন জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে, কেন্দ্রে এখন শুধু হিলিয়াম দহন চলছে। কম তাপমাত্রা আর বিশাল আকৃতির জন্য একে শীতল দানব তারা (cool supergiant star) বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের তারা মহাকাশে খুব কম

দেখা যায়। বৃশ্চিক রাশিতে (constellation scorpio) এই ধরনের আরেকটি লাল বর্ণের তারা আছে। তার নাম জ্যেষ্ঠা (Antares) । বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের ছায়াপথে প্রতি দশ লক্ষ তারার মধ্যে একটি এই ধরনের তারার সন্ধান মিলতে পারে।

অতি বৃহৎ তারা হওয়া সত্ত্বেও আদ্রার ভর তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সূর্যের ভরের 20 গুণও নয়। এমনটা হওয়ার কারণ তারাটি প্রতি বছর $2x10^{24}$ কিলোগ্রাম ভর (0. 000001 সৌরভর পরিমাণ পদার্থ) বাইরে নিক্ষেপ করে চলেছে। এই হিসেব থেকে অনুমান করা যায় যে জীবনের মূল পর্যায়ে তারাটির বর্তমান ভরের দ্বিগুণ ভর ছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আদ্রার ব্যাস প্রায় 60% এর মতো বাড়ে কমে। ফলে এর আকার- আয়তনেরও হ্রাস- বৃদ্ধি ঘটে।

আদ্রা নক্ষত্রকে ঘিরে আছে ধুলো ও গ্যাসের বলয়। একটা- দুটো নয়, অনেকগুলি। সবচেয়ে দূরের বলয়টি আছে নক্ষত্রটির কেন্দ্র থেকে 3. 3 আলোকবর্ষ দূরে (1 আলোকবর্ষ= 950000 কোটি কিলোমিটার)। নক্ষত্রটির চারপাশে যে প্রধান ধূলিবলয়টি আছে তার ব্যাস বর্তমানে 0. 3 আলোকবর্ষের মতো। এটা প্রতি সেকেন্ডে 10 কিলোমিটার বেগে প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা আদ্রার বর্ণমণ্ডলে যে গ্যাস আর ধুলো আছে তা নাক্ষত্রিক বাতাসে তাড়িত হয়ে এই ধুলোর বলয়গুলি সৃষ্টি হয়েছে। নক্ষত্রটির বর্ণমণ্ডলও কম বিস্ময়কর নয়। এর প্রান্তবর্তী অঞ্চলে গ্যাসের উষ্ণতা 2600 কেলভিনের মতো। আবার তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে 1500 কেলভিন উষ্ণতার অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুস্রোত। এধরনের ঘটনা খুব কমই দেখা যায়।

আরেকটি বিস্ময়ের কথা বলব। সেটা হল এর আবহমণ্ডল। সূর্যের আবহমণ্ডলের তুলনায় এর আবহমণ্ডল অত্যন্ত হালকা। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন আদ্রার আবহমণ্ডলের ঘনত্ব সূর্যের আবহমণ্ডলের তুলনায় দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। প্রকান্ড তারা হয়েও আদ্রার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অবাক করার মতো, তাই নয়? তবে এই বিশাল তারাটির বর্ণমণ্ডলটি বিশাল। কত বড়ো হতে পারে? গণিতের হিসেবে না গিয়ে অন্যভাবে ধারণাটা দেবার চেষ্টা করছি। সূর্য ও আদ্রার মধ্যে যদি স্থান পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ আদ্রাকে যদি সূর্যের জায়গায় বসানো যায় তাহলে নক্ষত্রটির বর্ণমণ্ডলের সীমা নেপচুন এবং প্লুটোর কক্ষপথের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবী আদ্রার পেটের ভিতর ঢুকে যাবে।

আদ্রা একটি বিষমতারা (variable star)। এর দীপ্তি বাড়ে কমে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এর প্রভার মান 0. 2 থেকে 1. 2 এর মধ্যে ওঠানামা করে। এর দুটি সঙ্গী তারা আছে। প্রথমটি 5 A. U. দূর থেকে এবং দ্বিতীয়টি 45 A. U. দূর থেকে আদ্রার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে'— এ কথা বিশ্ববাসীদের কাছে যেমন সত্য মহাবিশ্ববাসীদের কাছেও তেমন সত্য। আদ্রাও এগিয়ে চলেছে এই শেষ পরিণতির দিকে। আগেই বলেছি তারাটির কেন্দ্রে এখন চলছে হিলিয়াম দহন। এই দহন শেষ হলে এটি নিয়ন- অক্সিজেন শ্বেত বামনে (Ne-O white dwarf) রূপান্তরিত হবে। তখন এর আকার সঙ্কুচিত হতে হতে পৃথিবীর মতো হবে। এই সময় এর ঘনত্ব এবং ঔজ্জ্বল্য অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যাবে।

কয়েকটি পর্যায় পেরিয়ে আদ্রা নক্ষত্র সুপারনোভার দিকে এগোতে থাকবে। নক্ষত্রটির কেন্দ্রে এখন হিলিয়াম দহন চলছে। কেন্দ্রের তাপমাত্রা 60 কোটি কেলভিনে পৌঁছলে শুরু হবে কার্বন দহন এবং তৈরি হবে নিয়ন আর হিলিয়াম। এই পর্যায়টা চলবে 600 বছর ধরে। এরপরে তাপমাত্রা 120 কোটি কেলভিনে পৌঁছলে শুরু হবে নিয়ন দহন এবং তৈরি হবে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন। মাত্র এক বছর পরেই কেন্দ্রের তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে 150 কোটি কেলভিনে। শুরু হবে অক্সিজেন দহন আর সেই সঙ্গে তৈরি হবে সিলিকন ও হিলিয়াম। ছয় মাস পরে কেন্দ্রের তাপমাত্রা যখন 270 কোটি কেলভিনে পৌঁছবে তখন সিলিকন পুড়ে তৈরি হবে নিকেল যা

নিউট্রনাইজেশন (Neutronization) হয়ে লোহায় রূপান্তরিত হবে। ব্যাস দহন শেষ। কেন্দ্রে যত লোহা জমতে থাকবে অভিকর্ষ চাপ তত বাড়তে থাকবে। ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধির ফলে নক্ষত্রটির কেন্দ্রের ঘনত্ব এক সময় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 3×10^9 গ্রামে পৌঁছে যাবে। নক্ষত্রটির এই অতি

ঘন অবস্থাটা কেমন হবে তা সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। লুডো খেলার ছক্কার আয়তনের সমপরিমাণ পদার্থ তুলে আমরা আমাদের হাতের তালুতে রাখতে পারব না। কারণ ঐটুকু পদার্থের ভর হবে তিন লক্ষ কিলোগ্রামের মতো। এবারে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে কী প্রচন্ড চাপ তৈরি হবে নক্ষত্রটির কেন্দ্রে। কেন্দ্রের ভর ও ব্যাস যথাক্রমে এক সৌরভরের বেশি ও তিন হাজার কিলোমিটার হলে প্রচন্ড অভিকর্ষীয় চাপে ঘটবে বিস্ফোরণ যা সুপারনোভা নামে পরিচিত। চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে গামা রশ্মি। বিজ্ঞানীদের মতে এটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারনোভা। বিস্ফোরণের ঠিক পর মুহূর্তে (এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে) তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে 500 কেলভিনে। সেইসঙ্গে শেষ হবে আদ্রা নক্ষত্রের জীবনকাল। তবে সেটা হতে এখনও অনেক দেরি। আমরা কেউই দেখে যেতে পারব না। আশঙ্কা হয়, যে হারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তাতে সেইসময় মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে কিনা।

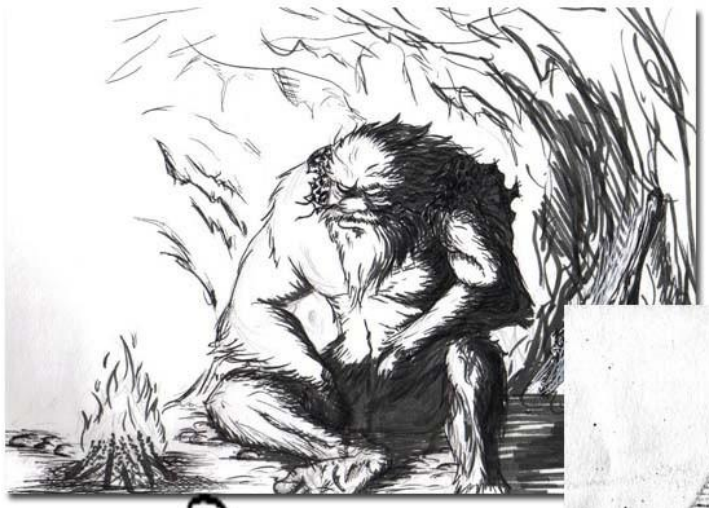

গুহাবাসী মানুষ আজ আকাশবাসী

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলা একটা গল্প পড়েছিলাম। একটা দেশ ছিল যেখানে জমি বিক্রি হত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং উচ্চতা মেপে। ঐ জমি কিনে কেউ বাড়ি করতে চাইলে ঐ মাপ অনুযায়ী বাড়ি করতে হত। কারণ বাড়িটির ছাদ এবং তার উপরের আকাশ বিক্রি করার অধিকার জমির প্রথম মালিকের থাকত। এইভাবে আকাশ বিক্রি করে করে জমির প্রথম মালিকের যেমন রোজগার হত তেমন বাড়ির তলা বাড়তে থাকত। তবে প্রতি তলার মালিক হত আলাদা আলাদা। গল্পটার মধ্যে ফ্ল্যাট বাড়ির ধারণা রয়েছে। যদিও গল্পটা যখন পড়েছিলাম তখন ফ্ল্যাট বাড়ির তেমন চল ছিল না। তখন অধিকাংশ বাড়ি হত একতলা অথবা দু'তলা। কারও তিন বা চারতলা বাড়ি থাকলে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় সাধারণ মানুষ উপরদিকে তাকিয়ে মনে মনে বলত, 'বাব্বা, কী বিশাল বাড়ি'।

দিন পাল্টেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষ এখন বানাচ্ছে আকাশছোঁয়া বাড়ি। আর সেইসব বাড়ির কাছে আগেকার দিনের বড় বাড়িগুলি যেন লিলিপুট। দেশে দেশে এখন আকাশছোঁয়া বাড়ি বানানোর যেন প্রতিযোগিতা চলছে। আজ কোনো দেশ একশতলা বাড়ি বানাচ্ছে তো কাল অন্য আরেকটি দেশ তার চেয়েও উঁচু বাড়ি বানাচ্ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে? ভবিষ্যতে দু'শো তলা বাড়িও লিলিপুট হবে কি না কে বলতে পারে? এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত্ব করতে মানুষকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে দীর্ঘ পথ।

আদিম মানুষের ঘরবাড়ি

পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে। এরা দেখতে আমাদের মত ছিল না। আকারে ছিল অনেক বড়। হাত দুটো ছিল লম্বা- হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। কপালের হাড় ছিল নীচু। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটত। অনেকটা বড় বানরের মত দেখতে। তবে বুদ্ধি ছিল বানরের চেয়ে কিছুটা বেশি। এই যুগের মানুষকে বলা হয় 'নিয়ান্ডার্থাল'। এর পরে মানুষ অনেক বদলে গেছে। পরের পর্বের মানুষকে বলা হয় 'হোমো স্যাপিয়েনস'। আমরা এদেরই ধারা। এদের মগজ আরও উন্নত ছিল। তবে এখনকার মানুষের মত নয়।

আদিম মানুষ ছিল বন্য। পশুদের মতই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এক জঙ্গলের খাবার ফুরিয়ে গেলে অন্য জঙ্গলে চলে যেত। তবে মগজে বুদ্ধি থাকায় সেটাকে কাজে লাগিয়ে সবসময় চেষ্টা করত উন্নত জীবনযাপনের পথ খুঁজে বের করতে। আদিমকালে মানুষের মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই ছিল না হিংস্র পশুর আক্রমণের ভয়, ঝড়- বৃষ্টিতে ভেজার ভয়, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কষ্ট পাওয়ার ভয় সবসময় তাদের তাড়া করে বেড়াত। বনে- জঙ্গলে, পাহাড়- পর্বতে ঘুরতে ঘুরতে তারা লক্ষ করল পাহাড়ের গায়ে ছোট, বড় অনেক গুহা আছে। সেখানে থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যেমন বাঁচা যায় তেমন হিংস্র পশুর আক্রমণ অনেক সহজে মোকাবিলা করা যায়। কারণ তখন চারদিকে দৃষ্টি রাখার বদলে একদিকে দৃষ্টি রাখলেই হয়। অতএব গুহাই হল মানুষের আদিম বাসস্থান।

গুহা কিন্তু মানুষের বাসস্থানের সমস্যা পুরোপুরি মেটাতে পারল না। পার্বত্য এলাকায় গুহা পাওয়া গেলেও সমতলের গভীর জঙ্গলে তো গুহা পাওয়া যায় না? তাহলে তারা থাকবে কোথায়? এছাড়াও মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় গুহার অভাব দেখা দিল। কাজেই তখন সে নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই নিজেই তৈরি করার কথা ভাবতে শুরু করল। কিন্তু কীভাবে? সে তো শুধু পাথর চেনে। অতএব পাথরকেই তারা বাড়ি তৈরির উপাদান হিসেবে প্রথম বেছে নিল। বড় বড় পাথর নীচে দিয়ে তার উপর অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে মানুষ তৈরি করল নকল গুহার মত এক ধরনের আশ্রয়স্থল। এগুলি দেখতে হত উলটানো মৌচাকের মত। ভিতরে ঢোকার জন্য দরজার মত একটা ফোকর থাকত। জানালা- টানালা কিছু থাকত না। ফলে ভিতরে কোনো আলো ঢুকতো না। ফলে বাসার ভিতরে ঢুকলে রাত না দিন কিছুই বোঝা যেত না। রাতে ঘুমানোর সময় হিংস্র পশুর আক্রমণ ঠেকাতে দরজার সামনে একটা বড় পাথরের চাঁই বসিয়ে রাখত। সকালে তা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। এই ধরনের আশ্রয়স্থলকে বলা হয় 'বি- হাইভ- হাট'। মানুষ দেখল পাথরগুলি গোলাকার না সাজিয়ে যদি চৌকো আকারে সাজানো যায়

তাহলে ঘরের ভিতরের জায়গা অনেক বেশি পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ঘরের ছাদ ঢাকার জন্য তারা শিকার করা পশুর দেহের চামড়া বা গাছের বড় বড় পাতা ব্যবহার করতে শুরু করল। এইভাবে মানুষ বাসা বানানোর জন্য পাথর ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার শিখল। মানুষের তৈরি স্থাপত্যের প্রথম পদক্ষেপ।

পাহাড়ের কাছাকাছি যারা থাকত তাদের পক্ষে পাথর দিয়ে বাসা বানানোর সুবিধা ছিল। কিন্তু যারা পাহাড় থেকে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলে থাকত তাদের পক্ষে দূর থেকে ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তারা বাসা বানানোর জন্য অন্য উপকরণের কথা ভাবতে শুরু করল। জঙ্গলে গাছ প্রচুর। তাই তারা বাসা বানালো ছোট ছোট গাছ ও গাছের ডাল দিয়ে। মানুষ ততদিনে আগুনের ব্যবহার ও পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাতে শিখে গেছে। এই অস্ত্রকেই সে কাজে লাগালো। ঝোপঝাড় পরিস্কার করে, মাটি খুঁড়ে, কেটে আনা গাছগুলো গোলাকার করে পুঁতে দিল। এরপর গাছের মাথাগুলিকে এক জায়গায় টেনে এনে বেঁধে দেওয়া হল। তৈরি হল বাসার কাঠামো। গাছের বড় বড় পাতা বা পশুর চামড়া দিয়ে কাঠামোর গা ঢেকে দিয়ে তৈরি হল নতুন এক ধরনের বাসা। বড় ঝুড়ি উল্টো করে বসিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয় এই গোলাকার বাসাগুলি দেখতে তেমনই হল। এক্ষেত্রেও বাসায় বা ঘরে ঢোকা বা বেরোনোর জন্য শুধু একটি দরজা থাকত, কোনো জানালা থাকতো না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোই তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জানালার ধারণা তখনও তাদের মাথায় আসে নি। যাই হোক, অন্য এক উপায়ে বাসা তৈরি করতে তো মানুষ শিখল?

এই প্রসঙ্গে অন্য আরেক ধরনের বাসার কথা বলি। পশু শিকার করে মানুষ তার মাংস খেত। চামড়াটা শুকিয়ে নিয়ে নিজেদের গা ঢাকার কাজে লাগাত। হাড়গোড়গুলো ফেলে দিত। এক সময় তারা লক্ষ করলো যে এই হাড়গোড়গুলো জলে ভিজলেও সহজে নষ্ট হয় না। মাথায় এল বাসা বানানোর অন্য এক চিন্তা। শিকার করা পশুর হাড়, শিং, চামড়া, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হল নতুন এক ধরনের বাসা। এগুলিও দেখতে উল্টিয়ে বসানো গোলাকার ঝুড়ির মত হত। মস্কোর ইতিহাসের জাদুঘরে এরকম একটা ঘরের ছাঁচ আছে।

প্রথম দিকে গোলাকার বাসা বানানোর প্রবণতা বেশি ছিল। পরে অবশ্য বর্গাকার বা আয়তাকার বাসা বানানোর দিকে মানুষ বেশি ঝুঁকে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে বাসার উপরের ছাউনিটা অনেক বড় করতে হয়। প্রথমে একচালা পরে দোচালা, চারচালার প্রবর্তন হয়। ঘরের দেওয়ালও অনেক বড় হওয়ায় সেগুলো শক্তপোক্ত করার জন্য মাটির প্রলেপ লাগানো হয়। এধরনের বাড়ি এখনও গ্রামেগঞ্জে দেখতে পাওয়া যায়।

জল ছাড়া তো বাঁচা যায় না। তাই মানুষ চেষ্টা করত কাছাকাছি কোনো জলের উৎস আছে এমন জায়গায় থাকতে। তবে শিকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। কিছু মানুষ লক্ষ করল বড় বড় জলাশয়ে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। ডাঙার অন্যান্য শিকারের মত তা চট করে ফুরিয়ে যায় না। দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকা যায়। যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসবাসের ভাবনা মানুষের মাথায় এল। এরা হ্রদের জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুঁতে তার উপর ঘর বানালো।

নিওলিথিক আমলের মানুষ কৃষিকাজ জানত। এরা সাধারণত মাটির ঘর বানিয়ে বসবাস করত। এরা দল বেঁধে থাকত। ফলে গ্রামের ধারণা তখন এসে গিয়েছিল। এই সময়ে হ্রদের কাছাকাছি যারা থাকত তারা জলের উপর কাঠের বাসা বানাত। এই হ্রদবাসীরা কর্মঠ ও কর্মকুশল জাতি ছিল। এরা মাছ শিকারের পাশাপাশি পশু পালনও করত। 1851- 54 সালের শীতকালে

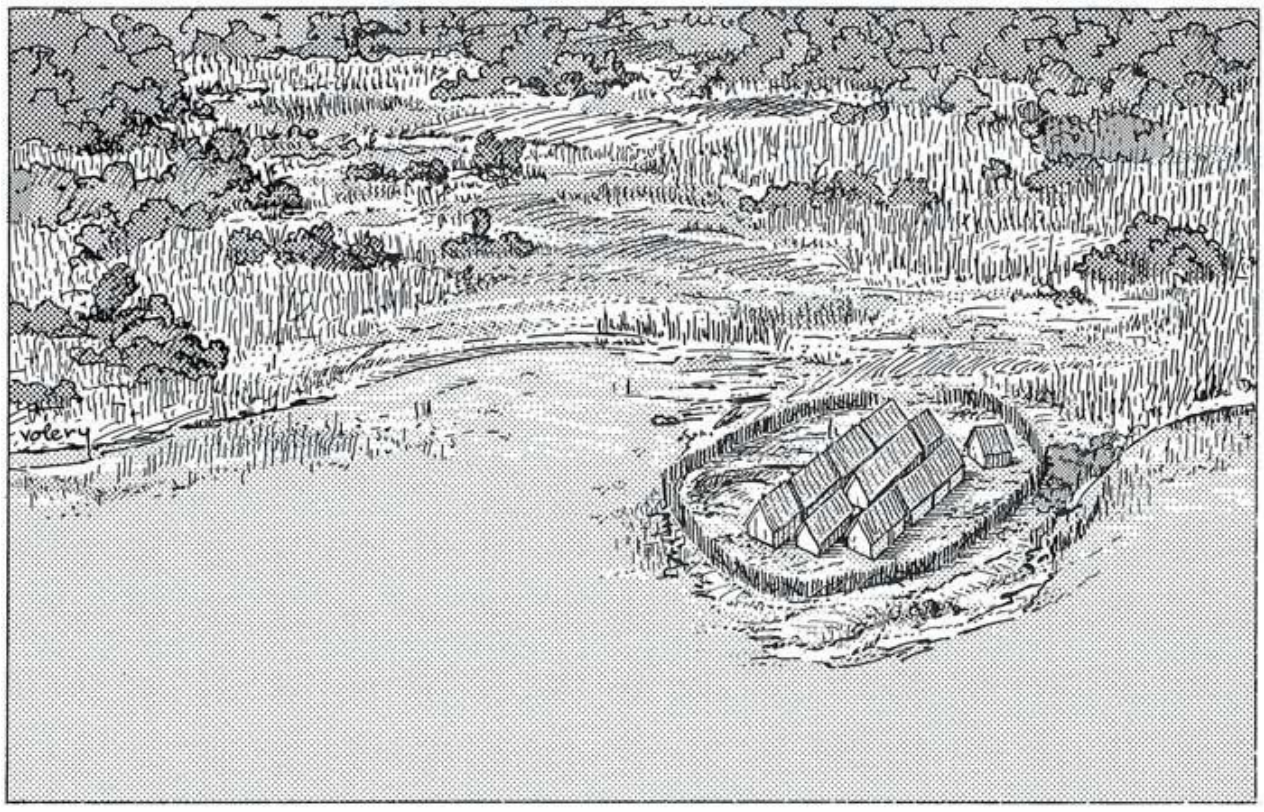

জুরিক হ্রদের জল অস্বাভাবিক কমে যায়। সেই সময় এই হ্রদের তীরে অপ্রত্যাশিতভাবে খুঁজে পাওয়া যায় পুরো একটি প্রাগৈতিহাসিক নিওলিথিক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই প্রাগৈতিহাসিক আমলের সুইস্ হ্রদবাসীরা জলের উপর বাসা বানাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সুইজারল্যান্ডের নিউ শাতেল হ্রদে প্রায় পঞ্চাশটা এরকম হ্রদবসতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নিউগিনি এলাকাতেও নিওলিথিক হ্রদবাসীদের এই ধরনের বাসা বানানোর কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গেছে।

স্থায়ী ঘরবাড়ি

আদিম যুগের মানুষেরা ছিল যাযাবর। যেখানে যতদিন খাবার পাওয়া যেত ততদিন সেখানেই থাকত। খাবার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। ফেলে রেখে যেত লতাপাতা দিয়ে বনানো বাসা। নতুন জায়গায় আবার তারা নতুন বাসা বানাত। আগের বাসাটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে কালের নিয়মে নষ্ট হয়ে যেত। চাষবাস শেখার পর মানুষের জীবনের ধারাটাই পাল্টে গেল। যাযাবর জীবন ছেড়ে তারা স্থায়ী বসবাসের কথা ভাবতে শুরু করল। ততদিনে তারা আরও অনেকটা সভ্য হয়েছে। আগুনের ব্যবহার শিখেছে। গোরু, ঘোড়ার মত পশুকে পোষ মানাতে পেরেছে। সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

স্থায়ী বসবাসের জন্য দরকার শক্তপোক্ত বাসা। লতাপাতা দিয়ে বানানো বাসা বেশিদিন টেঁকে না। ঝড়জলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে বাসা টেঁকসই করা যায়, ভাবতে ভাবতে একদিন মানুষ গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো বাসার দেওয়ালে মাটি লেপে দিল। বাঃ, ঝড়জলে তো বাসা তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে না? তাহলে মাটি দিয়ে বানানো বাসা আরও অনেক টেঁকসই হবে? শুরু হল মাটি দিয়ে বাসা তৈরি। ছাদের ছাউনি দিতে গাছের পাতার বদলে ব্যবহার হল খড়। মানুষ তখন ধান ফলাতে শিখে গেছে। জল যাতে তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে পারে তাই চালে ঢাল রাখা হল। প্রথমে একদিকে; হল একচালা ঘর। পরে দু'দিকে বা চারদিকে ঢাল রেখে মানুষ তৈরি করল দোচালা বা চারচালা ঘর। দেওয়াল মাটির হওয়ায় ঝড়জলের সময় জলের ঝাপটা বা শীতকালে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারল না। এধরনের বাড়ি এখনও আমরা গ্রামেগঞ্জে দেখতে পাই। সাধারণভাবে এগুলিকে আমরা কুঁড়ে ঘর বলে থাকি। এই ধরনের মাটির বাড়ি শুধু যে একতলা হয় তা নয়; দোতলাও হয়। ঘরের ভিতরে যাতে আলো, বাতাস খেলতে পারে তাই জানালাও বসানো হল। এভাবেই শুরু হল মানুষের স্থায়ী বাসা বানানোর প্রথম প্রচেষ্টা।

ধীরে ধীরে মানুষ মাটির আরও ব্যবহার শিখল। হাঁড়ি- কলসি বানাতে শিখল। ইট তৈরির কলাকৌশল শিখল। কিছু ধাতুর ব্যবহারও শিখে ফেলল। তা দিয়ে তারা নানারকম যন্ত্রপাতি বানাল। এবার মাটির বদলে ইট দিয়ে বাড়ি তৈরির কায়দা রপ্ত করে ফেলল। প্রথম প্রথম কাঁচা ইট ব্যবহার হত। পরে পোড়া ইটের ব্যবহার শিখল। এতে বাড়ি আরও টেঁকসই হল। ইতিমধ্যে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন এল। এতদিন ছিল গ্রামীণ জীবন। বন- জঙ্গল কেটে মানুষ এবার নগর পত্তন করল। প্রাচীন ভারতে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। সে কথায় পরে

আসছি। ইটের ব্যবহার শেখার পর উঁচু বাড়ি তৈরির প্রতি মানুষের ঝোঁক বাড়তে লাগল। একতলা, দোতলা বাড়ি তো ছিলই; সেইসঙ্গে তৈরি হতে লাগল প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির ইত্যাদি। মানুষ আগের তুলনায় অনেক সভ্য হল ঠিকই তবে পরস্পর হানাহানি কমলো না। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, রাজায় রাজায় যুদ্ধ লেগেই থাকত। নিজেদের সুরক্ষার জন্যই তৈরি করতে হয়েছিল দুর্গ, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। সাধারণ ঘরবাড়ির তুলনায় দুর্গ, মন্দির, রাজাদের থাকার প্রাসাদ হত অনেক বেশি উঁচু ও বড়। এইভাবেই মানুষ আকাশের দিকে হাত বাড়াল তার বাসস্থানকে বা স্থাপত্যকে ক্রমশ উঁচু এবং গরিমাময় করে তোলার জন্য।

ভারতে প্রাচীন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাঃ মহেঞ্জোদরো- হরপ্পা

মানুষের সামাজিক জীবন তখন অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। গুহা ছেড়ে সে যেমন ঘরবাড়ি বানাতে শিখেছিল তেমন গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি সে নগরকেন্দ্রিক জীবন গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। প্রাচীন ভারতে নগরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল মূলত নদীকে কেন্দ্র করে। ভারতে যেমন সিন্ধু নদীর

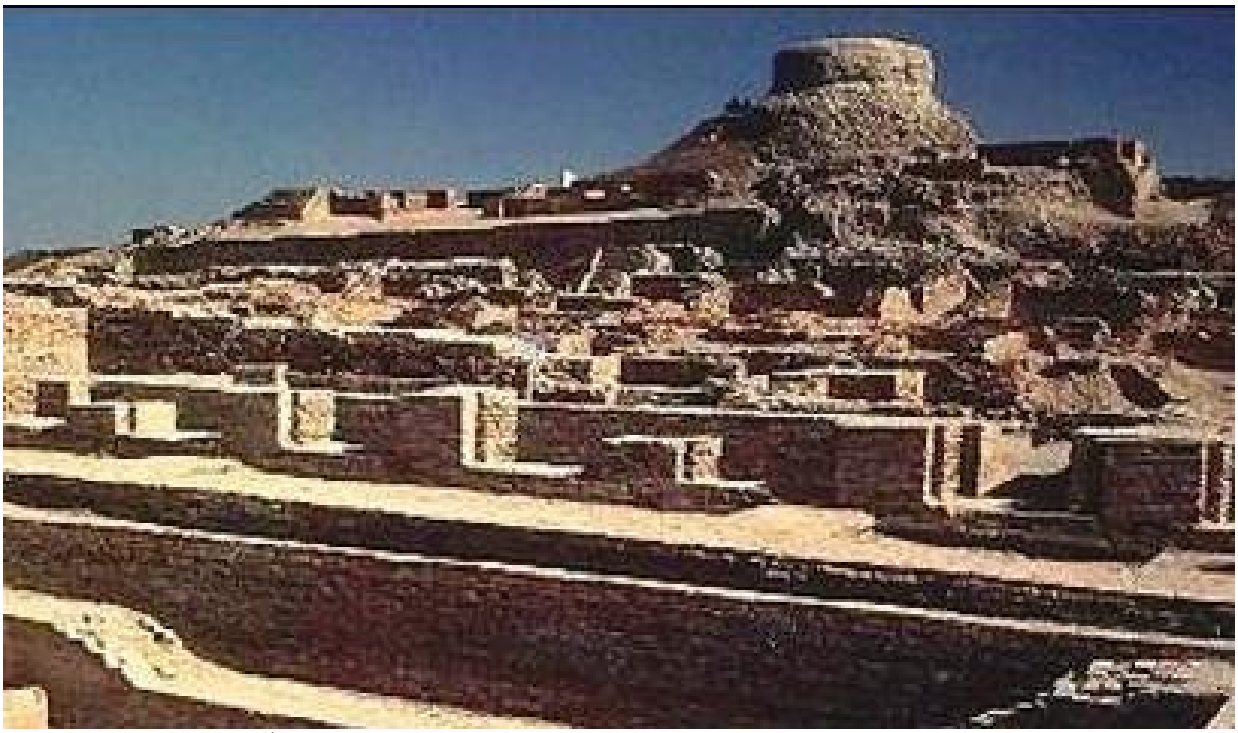

অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা তেমন নীল নদের তীরে মিশরীয়, টাইগ্রিস- ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। মহেঞ্জোদরো- হরপ্পায় দুটি উন্নত ও পরিকল্পিত নগরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানকার রাস্তাগুলি ছিল সোজা, লম্বা

ও চওড়া। একটা রাস্তার সঙ্গে আর একটা রাস্তার সংযোগ হত সমকোণে। পোড়া ইটের তৈরি এক কামরা থেকে চার কামরার ঘরবাড়িগুলি এক তলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত উঁচু হত। উপরে ওঠার সিঁড়ি থাকত। মহেঞ্জোদরোতে একটা বিরাট স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া দেছে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল যথাক্রমে 180 ফুট ও 108 ফুট। হরপ্পাতে 169 ফুট × 135 ফুট মাপের একটা বিশাল আকারের ঘর পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই ঘরে শস্য মজুত করে রাখা হত। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ লোহার ব্যবহার না জানলেও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানতো।

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় আনুমানিক 1500- 1400 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এরপরে শুরু হয় আর্য সভ্যতা। এই সভ্যতা ছিল মূলত গ্রামীণ। তাই এই সময়ে বসবাসের জন্য উঁচু বাড়ি তৈরির তেমন চেষ্টা ছিল না। বাড়ি তৈরির উপাদান হিসেবে ইট, কাঠ, বাঁশ, মাটি ইত্যাদ্রির ব্যবহার বেশি ছিল। পাথরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল আরও কিছুটা পরে।

ধর্মীয় স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহার

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রাচীন স্থাপত্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সু- উচ্চ মন্দির, মসজিদ, গির্জা, চৈত্য, বিহার ইত্যাদি স্থাপত্যগুলি তারই নিদর্শন। ধর্ম আলোচনার জন্য বৌদ্ধরা নির্মাণ করতেন 'চৈত্য'। চৈত্য দু'ধরনের হত- গৃহ- চৈত্য ও গুহা- চৈত্য। গৃহ- চৈত্য হত বড় হল ঘরের মত যেখানে অনেকে একসঙ্গে বসে ধর্ম আলোচনা করতে পারতেন। আর গুহা চৈত্য তৈরি হত পাহাড়ের পাথর কেটে। যেমন, অজন্তা, কার্লি ইত্যাদি। বৌদ্ধরা ধর্ম ও শিক্ষা প্রসারের জন্য যেসব আবাসিক বিদ্যায়তন তৈরি করতেন সেগুলিকে বলা হত 'বিহার'। পোড়া ইটের তৈরি এরকমই এক বিহার ছিল নালন্দাতে যা 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে খ্যাত।

চৈত্য ও বিহার ছাড়াও আরও তিনটি নিদর্শন আছে বৌদ্ধ স্থাপত্যের। এগুলি হল স্তম্ভ, স্তূপ এবং বেষ্টনী। স্তম্ভ হল একধরনের উঁচু থাম। এর গায়ে বৌদ্ধ ধর্মের বানী খোদিত করা হত। এই থামগুলি সাধারণত ইট বা পাথর দিয়ে তৈরি হত। স্তূপ দেখতে অর্ধগোলাকার। সাধারণত ইট বা মাটি দিয়ে তৈরি হত। ভিতরটা হত নিরেট। এর চারদিকে ঘিরে থাকত পাথরের তৈরি বেষ্টনী। চারদিকে চারটি প্রবেশ পথে চারটি পাথরের তৈরি সু- সজ্জিত তোরণ থাকত। স্তূপের মাথায় থাকত একটি ছাতা। তার নীচে রাখা হত একটি পেটিকা। কথিত আছে এই পেটিকার মধ্যে পুরে রাখা হত গৌতম বুদ্ধের দেহের হাড়ের টুকরো বা নখ বা তাঁর ব্যবহৃত কোনো- দ্রব্যসামগ্রী।

মন্দিরঃ প্রাচীন ভারতে উঁচু স্থাপত্যের নিদর্শন

সারা ভারতে অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে। সাধারণ ঘরবাড়ি খুব উঁচু না হলেও মন্দিরগুলি হত খুবই উঁচু এবং সেগুলি তৈরি হত মূলত পাথর দিয়ে। ইটের তৈরি মন্দির যে ছিল না, তা নয়।

তবে সেগুলি খুব উঁচু হত না। প্রথমদিকে পাথরের মন্দিরও ছোট হত। দেখতেও তেমন সুন্দর হত না। খন্ড খন্ড পাথর একটার উপর একটা বসিয়ে মন্দির তৈরি হত। 350 খ্রিস্টাব্দে তৈরি মধ্যপ্রদেশের তিগাওয়ার ছোট্ট মন্দিরটি তারই নিদর্শন। সম্ভবত এটাই সবচেয়ে পুরোনো মন্দির।

গর্ভগৃহের উপরের ছাদকে বলা হয় 'শিখর'। সময়ের সাথে সাথে শিখর ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। খাজুরাহো, ওড়িশার কোনার্ক, জগন্নাথ, লিঙ্গরাজ, রাজারানি প্রভৃতি মন্দিরগুলি শুধু সুউচ্চই নয়, স্থাপত্যের এক ধ্রুপদী রূপ। ভারতবর্ষে এমন সুন্দর সুষম বিন্যাসের মন্দির খুব কমই আছে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির মত দেখতে নয়। এগুলির নির্মাণ-শৈলী আলাদা। এখানকার বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির, বৈকুন্ঠ পেরুমল মন্দির, তাঞ্জোরের শিবমন্দির, ত্রিমূর্তি মন্দির, মাদুরাই- এর মীনাক্ষী মন্দির ইত্যাদি। তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের শিখর 190 ফুট উঁচু। প্রথমদিকে মন্দিরের প্রবেশপথে কোনো তোরণ তৈরির প্রথা ছিল না। পরবর্তীকালে তা শুরু হয়। এগুলিকে বলা হয় গোপুরম। এগুলি খুব উঁচু। এগুলির ভিতরে কোনো ঘর নেই। পুরোটাই নিরেট। মাথায় অর্ধবৃত্তাকার লম্বাটে ছাদের উপর ছুঁচলো শিখা দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি গোপুরম আছে যেগুলি প্রায় ন- তলা বাড়ির সমান উঁচু। এগুলিকে বহুতল তৈরির প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

ভারতে মুসলিম ও পাশ্চাত্য স্থাপত্য

মুসলিম আমলে স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান ও গম্বুজ। পরবর্তীকালে এই স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যের কিছু উপাদানের মিলন ঘটে। এই যুগে সবচেয়ে চমকপ্রদ স্থাপত্য হল তাজমহল যা সপ্তম আশ্চর্যের একটি।

ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংরেজ প্রভৃতি দেশের বণিকদের ভারতে যাতায়াত শুরু হওয়ার পর তাদের হাত ধরে এদেশে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের প্রবেশ ঘটে। তবে এদের কারুরই স্থাপত্য তেমন উচ্চমানের ছিল না। মূলত উঁচু গির্জা তৈরিতেই এদের বেশি আগ্রহ ছিল। গোয়াতে পর্তুগিজদের তৈরি কয়েকটি দর্শনীয় গির্জা আছে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর তাদের প্রথম রাজধানী ছিল কলকাতা। তাই কলকাতাতেই তাদের দেশীয় স্থাপত্যের অনুকরণে গির্জা, আদালত, রাইটার্স বিল্ডিং, জিপিও, গভর্নরের বাড়ি, হাইকোর্ট, টাউন হল, ইত্যাদি গড়ে ওঠে। জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের বসত ও বাগান বাড়িগুলি ছিল প্রাসাদোপম। তাই কলকাতাকে বলা হত প্রাসাদনগরী।

বিদেশে প্রাচীন স্থাপত্য

বিদেশে প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মধ্যে অন্যতম মিশরের 'পিরামিড'। এই অতিকায় পিরামিডগুলি আজও বিশ্বের বিস্ময়। সেই সঙ্গে বিশাল স্ফিংক্স আর মন্দিরগুলিও সমান বিস্ময়কর। বিরাট আকারের চিওপ্সের পিরামিডের ভূমি 756 ফুট বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ ক্ষেত্র।

এটি 480 ফুট অর্থাৎ, প্রায় 48 তলা বাড়ির সমান উঁচু। আধুনিক যুগে এত উঁচু বাড়িকে স্কাইস্ক্রেপার বা বহুতল বালা হয়। কিন্তু পিরামিড অত উঁচু হয়েও বহুতলের মর্যাদা পাবে না। এর কারণ এর ভিতরে ঘর আছে মাত্র তিনটি—একটি ফারাওয়ের ঘর, একটি রানির ঘর আর মাটির নীচে আরেকটি ঘর। এই ঘরে সম্ভবত মৃত ফারাও ও রানির উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র রাখা হত। পিরামিডের বাকি অংশ নিরেট। যে সময়ে এই প্রকান্ড স্থাপত্যগুলি তৈরি

হয়েছিল সেই সময়ে আধুনিক যুগের মত ক্রেনের ব্যবহার ছিল না। অত বড় বড় পাথর অত উঁচুতে কীভাবে তুলেছিল সেটা একটা বিস্ময়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান মাটি বা বালি দিয়ে নত তলের মত নীচু থেকে ক্রমশ উঁচু ঢালু রাস্তা তৈরি করে পাথরের চাঁইগুলি অনেকে মিলে ঠেলে ঠেলে উপরে তুলতো। প্রাচীনকালে পিরামিডই ছিল সবচেয়ে উঁচু স্থাপত্য।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুই নদীর মাঝখানের ভূভাগে গড়ে উঠেছিল এক প্রাচীন সভ্যতা। নাম তার মেসোপটেমিয়া। বর্তমান নাম ইরাক। এখানকার প্রাচীন উঁচু স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় মন্দিরের কথা। মন্দিরগুলি তৈরি হত, হয় পিরামিডের আকারে নয়তো পাহাড়ের আকারে। জিগুরাত ছিল এদের মন্দিরের নাম। এগুলি বেশ উঁচু হত। যেহেতু মেসোপটেমিয়ার দু- দিক দিয়ে দুটি নদী বয়ে গেছে তাই এখানে মাটি পাওয়া যেত অঢেল। এদেশের মানুষদের ইট তৈরির প্রযুক্তি জানা ছিল। তাই এখানকার ঘর- বাড়ি- প্রাসাদ- মন্দির সবই তৈরি হত পোড়া বা কাঁচা ইট দিয়ে। 'ঝুলন্ত বাগান' মেসোপটেমিয়ার এক বিস্ময়কর স্থাপত্য। এখানকার উঁচু ও বড় বাড়িগুলিতে থাকতো লম্বা লম্বা বারান্দা। তাতে তৈরি হত বাগান। দেখে মনে হত বাগানগুলি যেন ঝুলছে।

ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সংযোগস্থলে অবস্থিত গ্রিস উন্নত প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা এই দেশে উঁচু বা বড় আকারের কোনো প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন নেই বললেই চলে। ছোট আকারের হলেও সেসময়কার বাড়িঘর বা মন্দিরের শিল্প- সৌন্দর্য অতুলনীয়। মন্দিরগুলি তৈরি হত মূলত শ্বেতপাথর দিয়ে। পৃথিবী বিখ্যাত পার্থেনান মন্দিরটি (449- 440 খ্রি.পূ.) দেবী অ্যাথেনার নামে। এই দেবীর নামেই শহরের নাম হয়েছে অ্যাথেন্স। পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত এই মন্দিরটি লম্বায় 228 ফুট এবং চওড়ায় 101 ফুট 4 ইঞ্চি। এই মন্দিরটির কাছাকাছি অ্যাথেনা দেবীর নামে আরও একটি মন্দির ছিল। তার নাম অ্যারেকথিওন (421- 405 খ্রি.পূ.) এছাড়াও শিল্প- সৌন্দর্যের বিখ্যাত অন্যান্য মন্দিরগুলি হল অ্যাপোলো, আর্টেমিস, ইলিজাস, থোজিয়ান ইত্যাদি।

এতদিন বাড়িঘর, মন্দির, পিরামিড ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হত হয় পাথর নতুবা ইট।

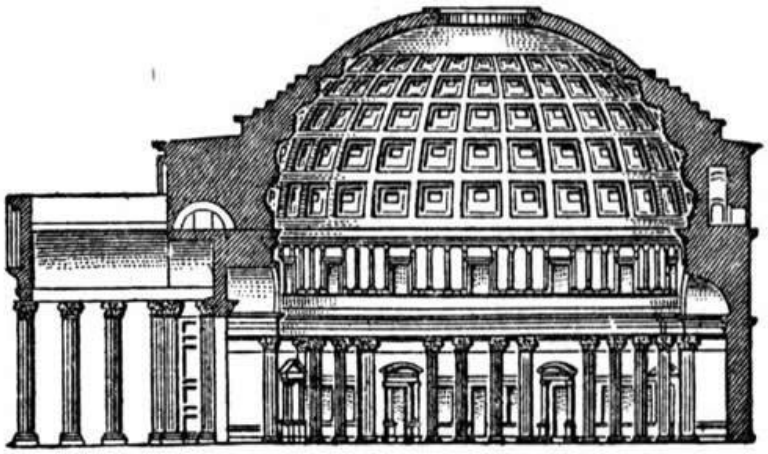

স্থাপত্য শিল্পে রোমানরাই প্রথম কংক্রিটের ব্যবহার শুরু করে। ইট বা পাথরের কুচি, চুন এবং পোজোলানা (আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে বেরিয়ে আসা এক ধরনের মাটি) দিয়ে তৈরি কংক্রিটের সাহায্যে এরা মস্ত বড় বড় ঘরবাড়ি তৈরি করতে সমর্থ হল। 25 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তৈরি রোমের প্যানথিওন মন্দিরের সামনের দিকটা আয়তাকার হলেও পিছনের দিকটা হত গোলাকার। এই গোলাকার অংশটিই

মন্দির। মাথাটা হত গম্বুজাকৃতির। আয়তাকার অংশটির মাপ প্রায় 110 ফুট × 85 ফুট এবং গোলাকার বা বৃত্তাকার অংশটির ব্যাস 142 ফুট 6 ইঞ্চি। থামগুলির উচ্চতা 46 ফুট 5 ইঞ্চির মত। গম্বুজাকৃতি মাথার উপরে 27 ফুট ব্যাসের একটি খোলা অংশ দিয়ে ভিতরে আলো ঢোকার ব্যবস্থা করা হত।

দু- লক্ষ পঁচাশি হাজার বর্গফুট আয়তনের (750 ফুট × 380 ফুট) কারকাল্যা স্নানাগারে প্রায় 1600 মানুষের স্নানের ব্যবস্থা ছিল। রোমের এই স্নানাগারটি প্রাসাদসম যে অট্টালিকায় ছিল তার মাঝখানে 183 ফুট × 79 ফুট মাপের একটি বিরাট হলঘর ছিল। কংক্রিটের তৈরি এই ছাদের উচ্চতা মেঝে থেকে 108 ফুট ছিল।

বিশাল আকারের স্নানাগার রোমে আরও অনেকগুলি ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্নানাগারগুলি হল টাইটাস, ফোরাম, পম্পেইয়ের স্টেবিয়ান, অ্যাগ্রিপ্যা ইত্যাদি।

রোমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল অ্যামফিথিয়েটার। এই ইনডোর স্টেডিয়ামগুলিতে নানা ধরনের খেলা হত। এমনকী বাঘ- সিংহের মত হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াইও হত। রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম এরকমই একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। চার তলা সমান উঁচু কলোসিয়ামে দর্শকাসন ছিল পঞ্চাশ হাজারের মত। উপবৃত্ত আকারের এই কলোসিয়ামটি লম্বার দিকে 620 ফুট ও চওড়ার দিকে 513 ফুটের মত। এর ভিতরের এরিনা, অর্থাৎ খেলার জায়গাটি দৈর্ঘ্যে 287 ফুট এবং প্রস্থে 150 ফুট। রোমে গেলে এখনও একে দেখা যাবে। তবে কোনো খেলাধুলা এখন আর এখানে হয় না। রোমের বাইরে পম্পেই ও ভেরোনাতে এই ধরনের অ্যামপিথিয়েটার আছে।

খ্রিস্টপূর্ব যুগের স্থাপত্য শিল্পের ধারা যেন অনেকটাই পালটে গেল খ্রিস্ট- উত্তর যুগে চতুর্থ শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত গির্জা স্থাপত্যেরই প্রাধান্য ছিল। নবম শতকের পর থেকে গির্জার সঙ্গে ঘন্টাঘর (বেল- টাওয়ার) নির্মাণ শুরু হয়। এগুলি বেশ উঁচু হত। যেমন ইতালির পিসাতে হেলে- পড়া ঘন্টাঘরটি প্রায় আটতলা সমান উঁচু। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে গির্জার পাশাপাশি বড় বড় প্রাসাদ ও দুর্গ গথিক স্থাপত্যের রীতিতে তৈরি হতে শুরু করে। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ ও দুর্গ হল- ইংল্যান্ডের সলিসবেরি ক্যাথিড্রাল, ক্যান্টারবেরি

ক্যাথিড্রাল, পিটার বরো ক্যাথিড্রাল, ইয়র্ক মিনিস্টার, ডিল ক্যাসেল, স্টোকাসে ক্যাসেল, টাটারশ্যাল ক্যাসেল ইত্যাদি। কলকাতা হাইকোর্ট ও সেইন্ট পল্‌স গির্জা এই রীতিতে তৈরি।

আধুনিক স্থাপত্য- আকাশছোঁয়া বাড়ি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘটেছে শিল্প- বিপ্লব। এর পরেই সামাজিক জীবনে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। কলকারখানাকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক শহর। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্যজীবন ছেড়ে মানুষ দ্রুত প্রবেশ করে শহর- কেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে। ফলে একই জায়গায় বহু লোকের বাসস্থানের প্রয়োজন দেখা দিল। একেই কলকারখানার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জমি, এরপরে বিশাল এলাকা জুড়ে যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে অত জমি পাওয়া যাবে কোথায়? পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সকলের বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে বনাঞ্চল বা কৃষিজমির দিকে হাত বাড়াতে হবে। কৃষিজমি কমে গেলে মানুষের অন্ন জুটবে কোথা থেকে? আর বনাঞ্চল ধ্বংস হলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হবে তো? তাহলে উপায় কী? সমুদ্রে যদি বাসস্থান তৈরি করা যায় তাহলে সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে। কোনো কোনো দেশে সমুদ্রে বা নদীতে হাউসবোটে থাকার প্রচলন আছে ঠিকই, তবে তা ভবিষ্যতের সমাধান সূত্র হতে পারে না। ভবিষ্যতে সমুদ্রের বুকে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। তবে সেই প্রযুক্তি আয়ত্ত্ব করার আগেই মানুষ অন্য একটি প্রযুক্তি আয়ত্ত্ব করে ফেলেছিল। সেটা হল 'রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট'(R. C. C.) প্রযুক্তি। এটা কী ধরনের প্রযুক্তি? মানুষ দেখল কংক্রিটের মধ্যে লোহার দন্ড ঢুকিয়ে দিলে কাঠামোয় যেমন জোর বাড়ে তেমন টেকেও বেশিদিন।

কংক্রিট আবিষ্কারের আগে দোতলা বড়জোর তিনতলার বেশি উঁচু বাড়ি বানানো সম্ভব হত না। রোমান আমলে এই বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আগের চেয়ে উঁচু স্থাপত্য বা ঘরবাড়ি তৈরি সম্ভব হলেও তা পিরামিডের উচ্চতাকে কখনই ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কংক্রিটের সঙ্গে লোহার বা ইস্পাতের হাত ধরাধরির পরেই স্থাপত্যই হোক বা মাথা গোজার ঠাই হোক তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখি হতে থাকে। কারণ আকাশের তো কোনো সীমারেখা নেই? সেইসঙ্গে উঁচু স্থাপত্য হিসাবে পিরামিডের চার- সাড়ে চার হাজার বছরের গৌরব ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বহুতল বাড়ির চাহিদা বাড়তে থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এর উচ্চতাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। দশ- বারো তলা বাড়ি বানিয়েই মানুষ থেমে গেল না। আরও আরও উঁচু বাড়ি চাই। একটি গ্রামে বা ছোটখাট শহরে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে বাস করা মানুষদের যদি একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মন্দ কী? তাহলে অনেকটা জমি বাঁচানো যায়। 1854 সালে আমেরিকান প্রযুক্তি বিজ্ঞানী এলিমা গ্রেভস ওটিস আবিষ্কার করলেন লিফ্‌ট (l i f t) । এরপরে এল চলমান সিঁড়ি (escal at or) । ব্যাস, মানুষকে আর পায় কে?

বিংশ শতাব্দী থেকেই দেশে দেশে উঁচু বাড়ি তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এখন আর মানুষ পঞ্চাশ বা একশ তলায় সন্তুষ্ট নয়। সে চায় আরও উঁচু বাড়ি- আকাশছোঁয়া বাড়ি। খুব উঁচু বাড়ি বানানোর জন্য শক্ত ভিতের প্রয়োজন। এরজন্য দরকার 'পাইলিং'। এটা কী বস্তু? বাড়ি

যাতে বসে না যায় সেজন্য ভিত্তিদন্ড খুব ভারী কোনো ওজনের সাহায্যে হাতুড়ির মত ঠুকে ঠুকে মাটির অনেক নীচে পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চতার বিচারে আকাশছোঁয়া বাড়িগুলি পিরামিডকে হারিয়ে দিলেও গঠন কাঠামো অনেকটা পিরামিডের মতই রাখা হয়। অর্থাৎ ভূমি যথেষ্ট চওড়া থাকে, তারপর কাঠামো যত উপরে উঠতে থাকে তত সরু হতে থাকে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে 300 মিটারের (1000 ফুট) বেশি উঁচু বহু বাড়ি। আকাশছোঁয়া বাড়ির পথ চলা শুরু হয়েছিল 1871 সালে। চিকাগো (Chicago) শহর এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে শহর গড়ে তোলার সময় মাথা তুলে

দাঁড়ালো 42 মিটার (138 ফুট) উঁচু একটি বাড়ি (হোম ইনশিওরেন্স বিল্ডিং)। দশ তলা এই বাড়িটিতে 1890 সালে আরও দুটি তলা যোগ হয়। আধুনিক আকাশছোঁয়া বাড়িগুলির পাশে এই বাড়িটি লিলিপুট ঠিকই তবুও এই বাড়িটিই প্রথম উঁচু বা বহুতল বাড়ি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেসময় এটাই ছিল মানুষের নির্মাণ বিদ্যার (construction engineering) বড় সাফল্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাড়ির তলা যেমন বাড়তে থাকে ছাদও তেমন উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে একসময় তা আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। শুরু হয় আকাশছোঁয়া বাড়ির যুগ। 1920 সালে 241 মিটার (792 ফুট) লম্বা 55 তলার উলওয়ার্থ বিল্ডিং (Woolworth Building) তৈরি হল নিউ ইয়র্ক শহরে। না, এরপরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র আট বছর পরেই অর্থাৎ, 1928 সালে আমেরিকায় তৈরি হল 77 তলার ক্রিসলার বিল্ডিং (Chrysler Building)। বাড়িটি 319.5 মিটার (1048 ফুট) লম্বা। 1930 সালে অর্থাৎ দু- বছর পরেই এখানেই তৈরি হল দ্য এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (The Empire State

Bui l di ng) । 102 তলা এই বাড়িটি 381 মিটার (1,252 ফুট) উঁচু। 35- 40 বছর বাদে তৈরি হল দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার (The World Trade Centre)। আমেরিকাবাসীদের গর্বের এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল 1966- 1970 সালের মধ্যে। 110 তলা এই বাড়িটি 412 মিটার (1, 353 ফুট) উঁচু। বাড়িটি সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে দ্য সিয়ারস টাওয়ার নামে আরেকটি বাড়ি তৈরি হয়েছিল। বাড়িটি ১১০ তলার হলেও দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড- এর থেকে উঁচু (৪৪২ মিটার/১,৪৫০ ফুট) ছিল। বাড়িটির বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার।

প্রথম দিকে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতেই আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরি হত। প্রথম দশটি উঁচু বাড়ি আমেরিকাতেই তৈরি হয়েছিল। বাড়িগুলির অধিকাংশই ছিল চিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরে। 1998 সাল পর্যন্ত দ্য সিয়ার্স টাওয়ারই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। 1999 সালের অগাস্ট মাসে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে মালয়সিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মাথা তুলে দাঁড়ালো পেত্রোনাস টাওয়ার (Petronas Tower)। আর এরই সাথে সবচেয়ে উঁচু বাড়ির শিরোপা চলে এল এশিয়ায়। একই রকম দেখতে দুটি বাড়ির প্রত্যেকটি 452 মিটার (1,482 ফুট) উঁচু। 88 তলার এই বাড়ি দুটিকে 44 তলায় একটি সেতুর সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। পেত্রোনাস টাওয়ার- এর সবচেয়ে উঁচুতে আকাশ ছোঁয়ার রেকর্ড পাঁচ বছর পরে ভেঙে দিল তাইপেই- 101 (Tai pei - 101) । তাইওয়ানের এই 101 তলা বাড়িটি 509 মিটার (1,670 ফুট) উঁচু। দেশে দেশে তখন শুরু হয়ে গেছে আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরির প্রতিযোগিতা। তাই সবচেয়ে লম্বা বাড়ির তকমা তাইপেই- 101 এর ঝুলিতে বেশিদিন রইল না। ছয় বছর পরেই সবকটি আকাশছোঁয়া বাড়ির গৌরব ম্লান করে দিয়ে দুবাইয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো বার্জ খলিফা বা বুর্জ খলিফা (Burj Khalifa) স্কাইস্ক্রেপার। 160 তলারও বেশি উঁচু এই বাড়িটি আকাশকে আলিঙ্গন করে যেন বলতে চাইছে, 'হে বিশ্ববাসী, দেখ স্থাপত্য- নির্মাণ শিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন'। সত্যই 828 মিটার (2,717 ফুট) উঁচু এই বাড়িটি বিশ্বের এক নয়া বিস্ময়। সে সময় বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল যে এর চেয়ে উঁচু বাড়ি আর তৈরি করা সম্ভব নয়। সেই ধারণা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে। পৃথিবীর মানুষ খুব শীঘ্রই দেখতে পাবে 'স্কাই সিটি' (Sky City) ও 'কিংডম টাওয়ার' (Kingdom Tower) নামে দুটি আকাশছোঁয়া বাড়ি। প্রথমটি চিনের হুয়াং (Huang) প্রদেশে তৈরি হবে, আর দ্বিতীয়টির নির্মাণ- কাজ সৌদি আরবের জেড্ডা (Jeddah) শহরে 2013 সালের 1 এপ্রিল শুরু হয়ে গেছে। 167 তলার এই বাড়িটি পুরো 1 কিলোমিটার, অর্থাৎ 1000 মিটার (3,281 ফুট) উঁচু হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের অনুমান বাড়িটির নির্মাণ- কাজ আনুমানিক 2019 সালের মধ্যে শেষ হবে। তখন এটাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। হুয়াং প্রদেশের স্কাই সিটি বাড়িটি 838 মিটার (2,749 ফুট) উঁচু হবে এবং এতে থাকবে 202 টি তলা (floor)। উচ্চতার বিচারে এই বাড়িটি কিংডম টাওয়ারের পরে থাকলেও তলার হিসাবে জেড্ডার বাড়িটিকে পিছনে ফেলে দেবে। অন্যান্য আকাশছোঁয়া বাড়িগুলি যে প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে স্কাই সিটি সেভাবে তৈরি হবে না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে এক নতুন প্রযুক্তি। প্রথমে নির্মাণ- কাজের জায়গাতেই প্রতিটি তলা আলাদা আলাদা ঢালাই করে তৈরি করে নেওয়া হবে। এরপরে

সেগুলি অর্থাৎ প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্লকগুলি (pr ef abr i cat ed bl ocks) একটার উপরে আরেকটা বসিয়ে বসিয়ে কাঠামোটা তৈরি করা হবে এবং সেগুলি ইন্টারলকের (interlocked) সাহায্যে আটকে রাখা হবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে মূল কাঠামোটা তৈরি হবে অ্যাসেম্বলিং পদ্ধতিতে। ইঞ্জিনিয়ারদের আশা ব্লকগুলি (floors) তৈরি করতে মাস চারেক (120 দিন) সময় লাগবে। আর মূল কাঠামোটি অর্থাৎ বাড়িটি তৈরি করতে সময় লাগবে আর তিন মাসের (90 দিন) মত। সব ঠিকঠাক চললে কিংডম টাওয়ার শেষ হওয়ার আগেই স্কাই সিটি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং কিছুদিনের জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ বাড়ির সম্মান আদায় করে নেবে।

গগনচুম্বী বাড়িগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বাড়িগুলি যেন একই ধাঁচে তৈরি। মাটির উপরের অংশটি অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও যত উপরে উঠেছে তত সরু হয়ে গেছে। কেন এমন হয়েছে? সেটাই আমরা এবার খুঁজে দেখব। বাড়ি যত উঁচু হবে তত তার ওজন বাড়বে। উচ্চতা দ্বিগুণ হলেই বাড়ির ওজন বেড়ে যায় চার থেকে আট গুণ। এছাড়াও আছে বায়ু প্রবাহ। বাড়ি যত উঁচু হবে হাওয়ার ধাক্কা বা ঝাপটা তত বেশি লাগবে। এক্ষেত্রেও বাড়ি দ্বিগুণ উঁচু হলেই হাওয়ার ধাক্কা চার গুণ বেড়ে যায়। তাই অতি উঁচু বাড়ির নক্সা করার সময় উপরের বাধাগুলি মাথায় রাখতে হয়। বাড়ির উপরের অংশ যদি ক্রমশ সরু হয় তাহলে বাইরের দিকের ক্ষেত্রফল কমে যাবে ফলে বাড়ির উপর বায়ুর চাপ কম পড়বে। সেইসঙ্গে বাড়ির ওজন কমে যাবে এবং চাপ চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এই কারণেই আকাশছোঁয়া বাড়িগুলির নক্সা প্রায় একই রকম হয়ে থাকে অর্থাৎ বাড়ি যত উঁচু হয় উপরের অংশ তত সরু হয়। এই প্রসঙ্গে বলি সব দেশের মাটির চরিত্র একই রকম নয়। বায়ুপ্রবাহও একই ধরনের হয় না। তাই কোনো দেশ ইচ্ছে করলেই যত খুশী উঁচু বাড়ি করতে পারে না। শুধু তাই নয়, দেশের যেকোনো জায়গায়ও আকাশচুম্বী বাড়ি করা যায় না। আকাশছোঁয়া বাড়ির নক্সা করার আগে নক্সাকার যেখানে বাড়িটি হবে সেখানকার বায়ুচাপ, বৃষ্টিপাত, মাটির চরিত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত 100 বছরের নানা তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে নেন। কারণ সামান্যতম ভুলের জন্য পুরো কাঠামো তথা বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে।

দেশে দেশে এখন আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে। কোনো দেশে কোনো একটি বাড়ি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য কোনো দেশের অন্য একটি বাড়ি তৈরি হয়েছে তার চেয়েও উঁচু। এই প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়? জানা নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা যেভাবে দ্রুতলয়ে বাড়ছে তাতে এখনি আকাশে বাড়ির মাথা তোলার সীমারেখা টানা যাচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে জেড্ডার কিংডম টাওয়ার পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ির সম্মান পেতে চলেছে। কিন্তু এই সম্মান সেই দেশের মানুষ বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন কি? কারণ দুবাইতে ইতিমধ্যে যে গগনচুম্বী বাড়িটি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার নির্মাণ-কাজ 2025 সাল নাগাদ শেষ হলে এতদিনের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে। 400 তলার এই বাড়িটি 2· 4 কিলোমিটার অর্থাৎ 2400 মিটার (7874 ফুট) উঁচু হবে। কিংডম টাওয়ারের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি উঁচু। ভাবা যায়? বাড়িটির নাম হবে 'সিটি টাওয়ার। এখানেই কি শেষ? উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

শেষের কথা

আকাশছোঁয়া বাড়িগুলির আকাশে মাথা তোলার সত্যিই কি কোনো সীমারেখা নেই? আকাশ কি এতই উদার? এখনও জানা নেই। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই অন্তিম রেখাটির সন্ধান পাওয়া পর্যন্ত। যদি পাওয়া যায়, তখন মানুষ কী করবে? মাটি ছেড়ে কি আকাশে ভাসমান বাড়ি বানাবে? বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে মানুষ যে অসাধ্য সাধন করছে তাতে মনে হয় না তার পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব। আজ যা কল্পনায় ভবিষ্যতে তা বাস্তব রূপ নিয়েছে এমন উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক আছে? তবে কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফসল যেন সকলের কাজে লাগে।

এতটুকু বাসা

কিশোর ঘোষাল

আজ থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগেকার কথা। গভীর জঙ্গলে একদল আদিম মানুষের তাড়া খেয়ে, এক পশু প্রাণভয়ে ঢুকে পড়ল পাহাড়ের এক গুহায়। গুহায় ঢুকেও সে পশু কিন্তু নিস্তার পেল না। সমবেত মানুষের ভারি ও ধারালো পাথুরে অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাল সেই পশু। শিকারকে হত্যা করে, সেই দলের মেয়ে ও পুরুষ, প্রায় সবাই আনন্দে চিৎকার ক'রে, সেই পশুর চামড়া ছাড়াতে বসে গেল। কিন্তু সেই দলের কর্ত্রী, বয়স্ক মহিলা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন

গুহার ভেতরটা। তিনি দেখলেন, এই গুহার তিনদিকে নিরেট পাথরের দেয়াল আর মাথার ওপর পোক্ত ছাদ। ঝড়- বৃষ্টি, প্রচণ্ড রোদ, ভীষণ ঠাণ্ডা, হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ, অন্য দলের আদিম মানুষদের আক্রমণ। এই সমস্ত বিপদ থেকেই এই গুহা বেশ নিরাপদ, একথা বুঝতে বয়স্ক সেই আদিম মহিলার অসুবিধে হল না। এতদিন তাঁরা জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছতলায়, গাছের উপরে, কিংবা ঘন ঝোপের মধ্যে বাস করতেন। সেখানে সারাক্ষণই বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। কিন্তু পাহাড়ের এই গুহায় মিলতে পারে অনেক বেশি নিরাপদ আশ্রয়! এখন থেকে তাঁরা এই গুহাতেই থাকবেন। সেই বয়স্ক মহিলা, তার দলের দুই পুরুষকে বললেন, তাদের অপেক্ষায় থাকা দলের বুড়ো- বুড়ি আর শিশুদেরকেও এখানে নিয়ে আসতে। আজ থেকে প্রশস্ত এই গুহাই হবে তাঁদের আশ্রয়, তাঁদের বাসা। আর সেই থেকে শুরু হল মানুষের বাসা বানানোর, মাথা গোঁজার একটু আশ্রয় বানানোর প্রক্রিয়া।

পাহাড়ের সেই গুহায় নিশ্চিন্তে চলতে লাগল, তাদের জীবনযাপন। রাত্রে শোবার আগে গুহার মুখটা বড়ো বড়ো পাথর আর মোটা মোটা গাছের ডাল ঘিরে বন্ধ করে দিলে, সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়। গুহার মধ্যে যথেষ্ট খাবার সঞ্চয় করে রাখলে, প্রচণ্ড বর্ষাতেও গুহার মুখে বসে উপভোগ করা যায় সামনের জঙ্গলে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য ও শব্দ। বাচ্চারা, অশক্ত বুড়ো- বুড়িরাও গুহার মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে বর্ষার দিনে- রাতে। প্রচণ্ড শীতে গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে উষ্ণ হয়ে ওঠে গুহার ভেতর, সব্বাই ভীষণ আরাম বোধ করে। এইভাবেই সেই গুহার বাসায় গভীর জঙ্গলের মধ্যেও জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠল।

কিন্তু এমনটা বেশিদিন চলল না। প্রশস্ত গুহা ঠিকই, কিন্তু দলে মানুষ যে বেড়েই চলেছে। কয়েকবছরের মধ্যেই দলের লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেল, গুহার ভিতরে জায়গার অভাব হতে লাগল। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হতে লাগল। আশে পাশে এমন আরো গুহার খোঁজ তারা করেছিল কিন্তু পায় নি। সেই বয়স্কা মহিলাও, এখন বার্ধক্যের মুখে। একদিন তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন, গুহা না পেলেও আরো বাসা চাই। কিন্তু কি উপায়? নতুন গুহা ছাড়া অন্য আর কোন উপায় হতে পারে, এ কথা তখন দলের সকলের চিন্তায়। সেই বয়স্কা মহিলার এক নাতি সামনে এল, বলল, সে বানাতে পারবে। এত পোক্ত হয়তো হবে না, কিন্তু সেই বাসাতেও চারদিকে দেয়াল থাকবে, থাকবে মাথার উপর ছাদ। তাকে কাছে ডেকে বয়স্কা মহিলা তার সঙ্গে কথা বললেন, অনেকক্ষণ। তাঁর এই যুবক নাতিটি খুব শক্তিমান শিকারী নয়, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। নানান ধরনের নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র সে বানিয়েছে অনেক, তাতে করে শিকার করা আগের থেকে অনেকটাই সহজ হয়েছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বেশ, বানা দেখি একটা বাসা, দেখি সে বাসা কেমন হয়?

পরদিন থেকেই গুহার সামনে, সেই যুবক শুরু করল মানব সভ্যতার প্রথম বাসাটি বানাতে। তার সঙ্গী হল আরো চার পাঁচজন শক্তিমান যুবক। জঙ্গল থেকে গাছের মোটা মোটা ডাল কেটে আনল। দুই সারিতে মাটি খুঁড়ে শক্ত করে পুঁতে দিল সেই মোটা মোটা ডাল। দুই সারি ডালের মাথায় চাপিয়ে, শক্ত লতা দিয়ে কষে বেঁধে দিল একটু হালকা গাছের ডাল। তারপর লম্বার দিকে আরো কিছু গাছের ডাল চাপিয়ে, লতা দিয়ে বেঁধে বানিয়ে ফেলল একটা কাঠামো।

এবার সকলে মিলে জঙ্গল থেকে কেটে আনল বড়ো বড়ো পাতা, সেই সব পাতা বিছিয়ে দিল কাঠামোর ছাদে, চারপাশের দেওয়ালে, লতা দিয়ে আর সরু গাছের ডাল দিয়ে বেঁধে দিল, মোটা ডালের কাঠামোর সঙ্গে। তৈরি হয়ে গেল মানুষের প্রথম বাসা। কিন্তু বর্ষার সময়, পাতার ফাঁক দিয়ে ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যে! গুহার মধ্যে বড়োবড়ো পশুর বাড়তি চামড়া ছিল অনেক। ছাদে সেই চামড়াগুলি বিছিয়ে, টানটান করে বেঁধে দিলে, বন্ধ হয়ে গেল ঘরের ভিতর জল পড়া।

দলের অনেকের এই নতুন বাসা মনঃপূত না হলেও, নেত্রী মহিলার কিন্তু ভারি পছন্দ হল। তার কারণ তাঁর মাথায় ছিল আরো অনেক চিন্তা। নতুন বাসার সামনে তিনি তাঁর যুবক নাতির কাঁধে হাত রেখে, বললেন, আমাদের এই দলটা এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে। গুহাতে থাকার জায়গা তো হচ্ছেই না, তাছাড়াও ফুরিয়ে আসছে এই জঙ্গলের পশুকুল। সবার খাবার মতো ফলমূলও সবসময় আর পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের সকলের খাবার যোগাড়ের জন্যে এই জঙ্গল ছেড়ে, অনেক দূরের অন্য কোন জংগলে যদি যেতেই হয়, তুই এমন অনেক বাসা বানাতে পারবি তো? যুবক নাতি খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, পারবো, ঠাকুমা। এর চেয়ে অনেক ভালো শক্ত পোক্ত বাসা বানাতে পারবো। কারণ এই বাসা বানাতে গিয়েই অনেক কিছু শিখে নিয়েছি। যে ভুল ভ্রান্তি আছে, সেগুলো সব শুধরে নেব। নাতির উপর ভরসা করে, নেত্রী মহিলা দলের সকলকে নির্দেশ দিলেন, পরের দিনই খুব ভোরে এই গুহা ছেড়ে তাঁরা চলে যাবেন। অন্য কোন জঙ্গলে, যেখানে পাওয়া যাবে অনেক ফলমূল, শিকার করার মতো অনেক পশু, আর পর্যাপ্ত খাবার জল।

সেই নতুন বাসা, পাহাড়ের গুহার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে, দলটি পরের দিন ভোরেই রওনা হল, নতুন জীবনের দিকে। নদীর ধারে, নিজেদের প্রয়োজন মতো তারা বানিয়ে তুলবে অনেক নতুন বাসা, গড়ে তুলবে গ্রাম। শুরু হয়ে যাবে মানব সভ্যতার নতুন দিশা।

২

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা জায়গা সাফ করে গড়ে উঠল প্রথম মানব বসতি। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল বসতি, বেড়ে উঠতে লাগল নানান প্রয়োজন। মানুষ শিখে ফেলল চাষবাস, পশুপালন। পশুরা আর মানুষের সঙ্গে এক বাসায় থাকে না, তাদের জন্যে তৈরি হল আস্তাবল, গোশালা। চাষের ফসল সঞ্চয় করে রাখার জন্যে তৈরি হল শস্যের গোলা।

দিন- কে- দিন নতুন নতুন প্রয়োজনে ভাবনা চিন্তা করতে করতে উন্নত হতে লাগল ঘরদোর বানানোর নানান প্রযুক্তি। কাঠের খুঁটির কাঠামো আর গাছের পাতায় ছাওয়া দেওয়ালের ঘরের স্থায়িত্ব কম। ঝড়ে উড়ে যায়, বর্ষার জলে পচে যায়, বড়োসড় জন্তুদের ধাক্কায় উলটে যায়, আগুন লাগলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব কিছু।

নতুন ভাবনায় এল আরো বেশি নিরাপত্তা, আরো বেশি আরাম, আরো বেশি সৌন্দর্য। জটিল হয়ে উঠতে লাগল বাসা বানাবার প্রযুক্তি। শুধু গাছের ডাল, আর পাতা নয়, উন্নতি এল ঘর বানাবার উপাদানেও। অঞ্চল অনুযায়ী সহজে পাওয়া যায় এমন উপাদানে তৈরি হতে লাগল শক্ত পোক্ত ভিত, দেওয়াল। সে দেওয়াল কোথাও পাথরের, কিংবা কোথাও বা মাটির। রোদে পোড়ানো মাটির ইট, পাথরের মতো সাজিয়ে, মাটি, চুন আর সুরকি দিয়ে গেঁথে তোলা হতে লাগল দেওয়াল। কোথাও আবার গাছের সরু ডালের ঘন বুনোট কিংবা বাঁশের চালির উপর মাটির প্রলেপ দিয়েও হালকা দেওয়াল বানানো চালু হয়ে গেল। আর কাঠের কাঠামোর উপর ধান বা অন্য শস্যের খড় পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হল, দুপাশে ঢালু করে - দোচালা, চারদিকে ঢালু – চারচালা, ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি হতে লাগল সর্বত্র।

আরো পরে আগুনে পোড়ানো ইট, খাপরা, টালি ব্যবহার করে ঘরদোর হয়ে উঠল অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক এবং আগের প্রযুক্তির থেকে অনেক বেশি টেকসই আর সুন্দর। আজ থেকে ছ- সাত হাজার বছরের পুরোনো প্রযুক্তির এই রকম ঘর বাড়ি আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘরগুলির বিশেষত্ব হল, প্রচণ্ড গরমের সময় তুলনামূলক ভাবে ঠাণ্ডা, আবার প্রচণ্ড শীতে অনেকটাই উষ্ণ। স্থানীয় উপাদান থেকে গ্রামের মানুষরাই এইরকম ঘর চটপট বানিয়ে নিতে পারে, সে কারণে খরচও অনেক কম।

জনসংখ্যা বাড়তে লাগল, বড়ো হতে হতে অনেক গ্রাম শহরের আকার নিতে শুরু করল। জটিল হয়ে উঠতে লাগল আমাদের সামাজিক কাঠামো। রাজা, মন্ত্রী, আমলা, বণিক শ্রেণীরা হয়ে উঠল সমাজের অনেক বেশি প্রভাবশালী ও বিত্তশালী, সমাজে ধর্মের প্রাধান্য বাড়তে লাগল। সেই অনুযায়ী উন্নতি হতে লাগল ঘর বানানোর প্রযুক্তিরও। গ্রামের ঘরবাড়ির থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেল শহরের ঘরবাড়ি। সে সব বাড়ির দেওয়াল পাথরের কিংবা আগুনে পোড়ানো শক্ত ইটের। কাঠের কড়িবরগার কাঠামোর উপর পোড়ামাটির কিংবা পাথরের পাতলা টালি বিছিয়ে চুনসুরকি- খোয়ার পুরু প্রলেপে ঢালাই করে সুন্দর সমতল হয়ে উঠল বাড়ির ছাদ। সমতল ছাদের উপর আরো ঘর বানিয়ে দোতলা, তিনতলা বাড়ি বানাতেও আর বাধা রইল না। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ২৬০০ বছর

আগে (2600 BC) , এরকমই অজস্র ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছিল হরপ্পা- মহেঞ্জোদারো সভ্যতার শহরগুলিতে।

আগেই বলেছি প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরবাড়ির আকার, সৌন্দর্য আর জটিলতা বাড়তেই থাকল শহরের বাসিন্দাদের চাহিদা অনুযায়ী। সে সব পুরোনো বাড়িগুলির আজ আর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। কিছু কিছু মন্দির, আজও টিকে আছে, সেই সব দিনের প্রযুক্তির অদ্ভুত নমুনা হয়ে। মিশরের নাইল নদীর তীরে থিবস শহরের লাক্সর মন্দির মোটামুটি ১৩৯২ বি.সি.তে নির্মাণ হয়েছিল, যার ধ্বংসাবশেষ আজও আমাদের বিস্মিত করে।

সারা বিশ্বে ঘরবাড়ি বানানোর প্রযুক্তিতে চুন- সুরকির ব্যবহার বহু প্রাচীন এবং ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু ১৮১৭ সালে ইউরোপে সিমেন্ট আবিষ্কারের পর থেকেই ঘরবাড়ি বানানোর প্রযুক্তিতে এসে গেল আমূল পরিবর্তন। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই ভাইক্যাট ১৮১৭ সালে চক (chalk – $CaCO_3$) আর ক্লে পুড়িয়ে প্রথম সিমেন্ট বানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ অ্যাস্পডিন ১৮২৪ সালে ভাইক্যাটের পদ্ধতিতে আরও কিছু পরিবর্তন করে বেশি উত্তাপে (প্রায় ১৪৫০° সেন্টিগ্রেড) পুড়িয়ে এবং কিছু পরিমাণে জিপসাম মিশিয়ে তৈরি করলেন পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের পোর্টল্যাণ্ড স্টোন, সে সময় বড়ো বড়ো প্রাসাদ বানাতে খুবই জনপ্রিয় ছিল, এই সিমেন্টের রঙ আর ওই পাথরের রঙ প্রায় একই রকম ছিল বলে অ্যাস্পডিন সায়েব সিমেন্টের নাম দিয়েছিলেন পোর্টল্যাণ্ড। আগেকার চুন- সুরকির থেকে সিমেন্ট, ইট ও পাথরের গাঁথনির জোর অনেক বাড়িয়ে দিল, তাড়াতাড়ি জমে যাওয়ার দরুন কাজের গতিও বেড়ে গেল। আর চুন- সুরকির চেয়ে সিমেণ্টের জোড় অনেক পোক্ত হওয়ায়, অনেক স্থায়ী হয়ে উঠল বাড়ির কাঠামো।

আধুনিক সিমেন্ট তৈরি হতেই, বদলে গেল কংক্রিট (Concrete) (যাকে আমরা বাংলায় ঢালাই বলি)। প্রাচীন কাল থেকেই ইট-ভাঙা খোয়া অথবা পাথরকুচি, সুরকি কিংবা বালির সঙ্গে চুন মিশিয়ে ঢালাই হত। এখন পাথরকুচি, বালি আর সিমেন্টের ঢালাই হয়ে উঠল আরও শক্তপোক্ত, আর অনেক বেশি স্থায়ী। তবে কংক্রিটে কিন্তু একটা অসুবিধে বরাবরই ছিল, কংক্রিটের compressive stress অর্থাৎ চাপ সহ্য করার দারুণ ক্ষমতা থাকলেও, টান সহ্য করার শক্তি (Tensile stress) অথবা বাঁকা চাপ নেবার শক্তি (bending stress) খুব কম। নতুন প্রযুক্তিতে কংক্রিটের মধ্যে হিসেব মতো লোহার রড (Steel bar) ঢুকিয়ে দিয়ে, কংক্রিটকে আরো শক্তিশালী করে তোলা হল। নতুন ধরনের এই ঢালাইয়ের নাম হল রি-ইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট (Reinforced Cement Concrete), বাংলায় বলা যায় বর্ধিতশক্তি ঢালাই। সংক্ষেপে বলা হয় আর.সি.সি. (R. C. C)। এই আর.সি.সি., ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে সব নির্মাণেই এনে দিল আমূল পরিবর্তন।

আগেকার দিনে, ইটের বা পাথরের মোটা মোটা ভিত বা গাঁথনি করে, মোটা মোটা লোহার বিমের কড়ি-বরগার ওপর ছাদ ঢালতে যেমন সময় লাগত, তেমনি খরচও হতো বিরাট। এখন আর.সি.সি.র ভিত, কলাম, বিম, ছাদের কাঠামো অনেক হালকা হয়েও অনেক বেশি শক্তপোক্ত হয়ে উঠল। দেওয়ালের জন্যে ইটের ব্যবহার আজও রইল, কিন্তু সে শুধু দুই কলমের মধ্যে ফাঁক ভরাট করার জন্যে, সে দেওয়াল আগেকার তুলনায় অনেক পাতলা। অতএব খরচ অনেক কমে গেল। ভূমিকম্পেও এই আর.সি.সি. কাঠামোর বাড়ি সহজে ভেঙে যায় না, অথবা হুড়মুড় করে ভেঙেও পড়ে না। আর সব থেকে যেটা সুবিধে হল বহুতল বাড়ি বানানো সহজ হয়ে গেল, আজকের প্রযুক্তিতে খুব সাধারণ লোকেও তিন-চার-পাঁচতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলছে বিস্তর, আর আকাশছোঁয়া বাড়ির কথা তো এই বিভাগে আগেই বলেছি।

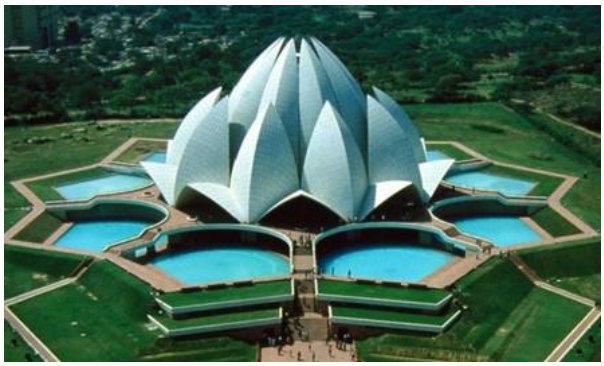

ওপরে আধুনিক দোতলা একটি ছিমছাম বাড়ির ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, প্রাচীন কালের গুহার আবাস থেকে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি, আর সেইসঙ্গে বাহাই হাউস অফ ওয়ারশিপের লোটাস টেম্পলের ছবি। দিল্লিতে অবস্থিত এই মন্দিরটির নির্মাণ ১৯৮৬ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। আধুনিক আর.সি.সি কাঠামোর এক অনবদ্য সুন্দর নির্মাণ নিদর্শন।

তবে আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে মোটামুটি ১৬৪৩ সালে পোড়ামাটির ইট, টেরাকোটা- টালি আর চুনসুরকির গাঁথনি করে নির্মিত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই- পঞ্চরত্ন মন্দিরের শিল্প সুষমা, আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়েও গড়ে তোলা আর হয়তো সম্ভব নয়। সেই সময়কার অত্যন্ত সীমিত প্রযুক্তি দিয়েও এমন অদ্ভুত শিল্প নির্মাণের কৃতিত্বের কথা আমরা ন ভুলে না যাই। আমাদের সকলের উচিৎ এই মন্দিরগুলিকে খুব যত্নে সংরক্ষণ করা, আর সেটাই হবে সেই সময়কার নাম না জানা বাস্তুবিদ- শিল্পীদের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন।

উদ্ভিদ সংকর ও জানকী অম্মল

সংহিতা

গন্ধলেবু আর গন্ধরাজ ফুল একই গাছে হলে সে গাছ কেমন গাছ হবে? কিংবা একই জাতের গাছ আলু আর টোম্যাটোকে একই গাছে যে পোম্যাটো বলে ফলানো হয়েছিল সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল? সম্ভব হয়েছিল জেনেটিসিস্ট, বা বংশগতি বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর গবেষণার ফলে। উদ্ভিদ সংকর নিয়ে যেসব যুগান্তকারী গবেষণায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র সুলভে নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণার কান্ডারি ছিলেন জানকী অম্মল।

কেরালার তেল্লিচেরি অঞ্চলে জানকী জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর। তাঁদের থিয়্যা পরিবারটিতে তাঁকে নিয়ে বারোটি ভাইবোন ছিল। ছয় ভাই, ছয় বোন। তাঁর বাবা দেওয়ান বাহাদুর এড়াওলাথ কক্কত কৃষ্ণান ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাবজজ। জানকীর পরিবারে মেয়েদের বৌদ্ধিক চর্চা্র অনিবার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষত ললিতকলা চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার চল ছিল। তবে জানকী পড়াশোনার বিষয় হিসেবে পছন্দ করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান।

তেল্লিচেরিতে ইস্কুলের পড়াশোনার পাট শেষ করে জানকী পাড়ি দিয়েছিলেন মাদ্রাজ। সেখানে তিনি জোড়া স্নাতক সম্মান অর্জন করেছিলেন কুইন মেরিস্ কলেজ থেকে আর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের থেকেই অর্জন করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি। সেখানেই অধ্যাপকদের প্রভাবে উদ্ভিদকোষের বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াতে তাঁর অপার কৌতূহল তৈরি হয়েছিল।

সেই কৌতূহল মেটাতেই জানকী উচ্চতর গবেষণা ও সেই সংক্রান্ত পঠনপাঠনে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বারবার বৃত্তিতে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলেন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠনপাঠন ও গবেষণা। প্রথমে সেখান থেকেই অর্জন করেন মাস্টার্স ডিগ্রি ও পরে ডি. এসসি ডিগ্রি। এরপরেই ১৯৩২ সালে তাঁর সুবিশাল কর্মজীবনের শুরু। আজকের থিরুভানন্তপুরমের মহারাজা কলেজ অব সায়েন্স- এ উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা হিসেবে কাটিয়েছিলেন ১৯৩৪ সাল অবধি। তারপর যোগ দিয়েছিলেন কোয়েম্বাটোরের সুগারকেন ব্রিডিং ইন্সটিটিউটে। পরবর্তী পাঁচবছর সেখানেই কাজ করেন জিন বিশেষজ্ঞের পদে। তারপর কাজ করেছিলেন ইংল্যান্ডে, লন্ডনের জন

ইনেস হর্টিকালচারাল ইন্সটিটিউসনে সহকারী কোষবিদের পদে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। তারপরে ওয়াসলির রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে কাজ করেছিলেন কোষবিদের পদে। ১৯৫১ সালে ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিমন্ত্রণে দেশে ফিরে বটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরে তিনি ঐ সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল পদেও কাজ করেছিলেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী জানকী অম্মল মূলত আখের সাথে ভুট্টা ও অন্যান্য ঘাসের সংকর প্রজাতির সৃষ্টি করেন। তারমধ্যে যুগান্তকারী সংকর হিসেবে বিবেচিত হয় আখের সাথে বাঁশের প্রজাতির সংকর। তাঁর এইসব গবেষণা উচ্চফলনশীল শস্য আবিষ্কারের সাথে জড়িত। অর্থাৎ তাঁর গবেষণা পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় খাবারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

তবে গবেষক জীবনের শুরুতে ইংলন্ডে তাঁর কাজ ছিল মূলত বাগানের গাছেদের নিয়ে। এই সময়ে তিনি চাষ করা হয় এমন গাছেদের কোষের ক্রোমোজোমের মানচিত্র প্রস্তুত করেন যাতে এই সমস্ত গাছের দেহকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা আর তাদের জোড় বিন্যাসগুলি বর্ণনা করেছিলেন। এই গবেষণাপত্রটি তৈরিতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সি ডি ডার্লিংটন। এই সময়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে নানান পুষ্পল বৃক্ষ যেমন ম্যাগনোলিয়ার উপর কোলচিসাইন নামের রাসায়নিকের প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী ফুল ফলানো সম্ভব। তাঁর অন্যান্য অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আলু ও টম্যাটো গাছের প্রজাতি, ধুতুরা, পুদিনা, লেবুগন্ধী ঘাস এবং খামালু।

তাঁর গবেষণাই প্রথম আলোকপাত করেছিল যে উত্তরপূর্ব হিমালয়ের ঠান্ডা কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়া এই অঞ্চলে উদ্ভিদের নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হওয়ার মূলে এবং সে কারণেই অপেক্ষাকৃত শুকনো জলবায়ুর পশ্চিম হিমালয়ের তুলনায় আর্দ্র পূর্ব হিমালয়ে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা অনেক বেশি। চিন ও মালয়ের আবহাওয়া ও সেখানকার ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের প্রভাবে পূর্ব হিমালয়ে প্রচুর প্রাকৃতিক সংকর প্রজাতির উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলেও তাঁর গবেষণায় প্রকাশ পায়।। তাছাড়াও তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজীবনে নানান গাছের ব্যবহার।

তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে জানকী ভারত সরকারের অধীনস্থ উদ্ভিদ ও ভেষজ গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজ করেছিলেন। ১৯৭০ সাল থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন বটানিতে ইমারিটাস বৈজ্ঞানিক পদে যোগ দিয়েছিলেন। এই সংস্থারই ফিল্ড ল্যাবরেটরি ছিল মাদুরাভয়ালে। ১৯৮৪ সালে দেহাবসান হওয়া অবধি বাকি জীবন সেখানেই কাটান জানকী।

তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূষিত করেছিল সাম্মানিক এল. এল. ডি উপাধিতে। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানেও ভূষিত করেছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষকের দীর্ঘজীবনে জানকী যেমন নানান সংস্থার সদস্য সম্মান, ও পুরস্কার অর্জন করেছিলেন, তেমনই উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার প্রসারে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও পরিবেশ মন্ত্রক ২০০০ সাল থেকে চালু করেছেন ট্যাক্সোনমি গবেষণার ক্ষেত্রে ই. কে. জানকী

অম্লল পুরস্কার। এইভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংকর ও প্রজাতির গবেষণায় জানকীর উজ্জ্বল অবদান অম্লান থেকে যাবে।

লক্ষ করি পক্ষীকে

বাউরিয়ায় বাঁশপাতি

মনস্বিনী ঘোষাল

সময়টা ছিল ২০১৩-র ডিসেম্বর। বাবার সঙ্গে বাউরিয়ায় একটা পিকনিকে যাব ঠিক হল। বাউরিয়া জায়গাটা কলকাতার বাইরে হাওড়া জেলার শহরতলি। আশা করেছিলাম, কলকাতা শহরে যে সব পাখিদের সচরাচর দেখা যায় না, সেরকম কিছু পাখির নিশ্চয়ই ওখানে দেখা মিলবে। মা ও বাবার উৎসাহ পেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, ছ'মাস আগেই বাবার কিনে দেওয়া নতুন ক্যামেরাটা নিয়ে। ক্যামেরাটা কেনার পর থেকে হাত-খুলে ব্যবহার করার ঠিক সুযোগ মেলেনি তখনো।

সেখানেই সুন্দর ছোট্ট এই পাখিটির দেখা মিলল। এ পাখির ইংরিজি নাম 'গ্রিন বি-ইটার' (Green Bee-eater)। বাংলা নামটা দারুণ সুন্দর, 'বাঁশপাতি'। ইংরিজি নাম থেকেই বোঝা যায়, এদের প্রিয় খাদ্য হল মৌমাছি, ভীমরুল জাতীয় পোকা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ।

শহরতলির মাঠের ধারে টেলিফোন বা ইলেক্ট্রিকের তারে এদের বসে থাকতে দেখা যায়।

বাঁশপাতির একটা মজার স্বভাব হল – এরা বিনা কারণেই যে জায়গায় বসে থাকে, সেখান থেকে উড়ে, একটু ঘুর পাক খেয়ে আবার একই জায়গায় ফিরে এসে বসে। পাখিরা সাধারণত গাছের ডালে পাতার আড়ালে বাসা বানায়। কিন্তু এরা বানায় ঢালু জমিতে, সুড়ঙ্গের মত গর্ত করে।

বাউরিয়ায় সেদিন দেখা অন্যরকম পাখিগুলোর মধ্যে এটি ছিল একটি। আমার ক্যামেরায় ধরা পড়া অন্য পাখিগুলির কথাও আবার হবে, অন্য আরেকদিন।

বিচিত্র জীবজগত

পোকারা ফেলনা নয়

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

এক চীনদেশি গল্প

সে অনেক কাল আগের কথা। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পেরিয়ে, তিব্বত টপকে যে চীন দেশ সে দেশের ঘটনা। সেটা ১২৩৫ সাল, ওদেশের একজন নাম তার সুং সু। তিনি একটি বই লিখলেন। দীর্ঘকাল পরে ১৯৮১ সালে সে বইটির ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হল। সেটি লিখলেন বি ই ম্যাকনাইট। অনুবাদ গ্রন্থটির নাম "দি ওয়াশিং অ্যাওয়ে অফ রংস।" প্রতিদিন তো কত বই প্রকাশ হচ্ছে তা হলে এই বইটির কথাই বা এত ঘটা করে বলা কেন। কি লেখা রয়েছে এই বইটাতে।

সে কালে সুং সু- র কাজ ছিল যেখানে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটত সেগুলির খোঁজখবর করা। তাঁর লেখা বইয়ে তিনি একটি খুনের ঘটনার কথা লিখেছেন। চীন দেশের একটি গ্রামে একটি মানুষকে কুপিয়ে খুন করা হয়। সেই স্থানের প্রশাসকের মনে হল এই খুনটি কাস্তের সাহায্যে করা হয়েছে। চীন দেশের মত আমাদের দেশেও খেতখামারে কাজ করার জন্য বাঁকানো কাস্তের

ব্যবহার চাষিরা করে থাকে। এর সাহায্যে ফসল কাটা হয়। কাস্তের এক দিকে বেশ ধারালো ছোট ছোট দাঁত থাকে। তাই কাস্তের সাহায্যে মানুষকে আহত বা খুন করা খুব সহজ।

ওই খুনের সাক্ষী যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বা অন্য ভাবে চেষ্টা করেও খুনের কিনারা করা যায় নি। শেষকালে ওখানের প্রশাসক গ্রামের সব পুরুষ মানুষদের এক জায়গায় জমায়েত হতে নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে করে নিজের কাস্তেটিকে আনার কথাও বললেন। পুরুষেরা জমায়েত হলে, প্রত্যেকের কাস্তেটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে আদেশ দিলেন। প্রশাসকের মনে হয়েছিল, যে কাস্তের সাহায্যে খুন করা হয় সেটাতে নিশ্চয় রক্ত বা ছোট মাংসের টুকরো লেগে থাকবে। আর সেই গরমকালে (খুনটি করা হয় গরমকালে) মাছিরা রক্ত- মাংসের আকর্ষণে চলে আসবে নিশ্চয়। প্রশাসকের চিন্তাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়। সেদিন খুনী ব্যক্তির কাস্তেতে এবং তার হাতলে আপাত অদৃশ্য রক্ত- মাংসের আকর্ষণে মাছিরা এসে জড় হয়েছিল। সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে খুনের স্বীকারোক্তি দেয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে সেকালে ওই অসাধারণ ব্যক্তিটি (প্রশাসক) মাছিদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কত ওয়াকিবহাল ছিলেন।

সুং সু তাঁর বইতে বিশেষ ধরণের মাছি যারা মৃতদেহে ডিম পাড়ে, তাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখে গেছেন। এই মাছিরা দেহের যে সব প্রবেশদ্বার রয়েছে (যেমন নাকের ছিদ্র, মুখ, ইত্যাদি) সেখানে বা ক্ষতস্থানে এসে ভিড় করে। তিনি এই সব মাছির শূককীট, পূর্ণাঙ্গ দশা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান কালের কীটতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেছেন, কোন মৃতদেহের কাছে বিভিন্ন ধরণের পতঙ্গ এসে ভিড় করে। এদের মধ্যে এক ধরণের মাছি, ইংরাজিতে যাদের ব্লো ফ্লাই বলে, মৃত্যুর কয়েক মিনিটের মধ্যের এসে হাজির হয়। মৃতদেহ থেকে নির্গত গ্যাস এরা সহজেই চিনতে পারে। আমাদের দেশেও এই সব মাছির অভাব নেই। আম কাঁঠালের সময় সাধারণ মাছির চেয়ে একটু বড় নীল বা সবুজ রঙের মাছি, পাকা আম কাঁঠালের ওপর এসে বসে। এগুলোই ব্লো ফ্লাই। মৃতদেহে এসে ভিড় করা মাছি এবং অন্য পতঙ্গদের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে অপরাধের কিনারা করা সম্ভব হচ্ছে। এই বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে, এর নাম ফরেনসিক এন্টোমোলজি। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি সম্বন্ধে আবার পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

আর একটি খুনের গল্প

এবার চলে আসি আধুনিক কালের একটি ঘটনায়। ঘটনার সূত্রপাত গত শতাব্দীর মধ্যভাগে; আরও সঠিক ভাবে বললে ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে। কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ক্লিনটন শহরের ১২ বছরের

একটি স্কুল ছাত্রীর উপর অত্যাচার এবং খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মেয়েটির সহপাঠী ১৪ বছরের স্টিভেন মারে ট্রাসকট।

আদালতের একটি হল ঘর। অন্যদের সঙ্গে স্টিভেন মামলার রায় শোনার জন্য উদগ্রীব। মহামান্য জজ সাহেব রায় পড়ে শোনাচ্ছেন। জজ সাহেব জানালেন, লিনে হারপারের উপর অত্যাচার করা এবং তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার অপরাধে স্টিভেন মারে ট্রাসকটকে দোষী সাব্যস্ত করা হল এবং এই অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখের মধ্যে। স্টিভেন সহ অনেকেই স্বপ্নেও ভাবতেই পারেনি এমন সাজা হবে। পুলিসকে এবং আদালতে স্টিভেন বরাবরই বলে এসেছে সে দোষী নয়। অথচ কেউই তার কথা বিশ্বাস করে নি। শুধু তাই নয়, একজন ১৪ বছরের বালককে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে আদালতে দেখা হল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর, স্টিভেন জেলের ঘরে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটায়। কেঁদে বুক ভাসায়, কূলকিনারা পায় না কিছুতেই। ৮ ডিসেম্বর যতই এগিয়ে আসে আতঙ্ক ততই বাড়ে। মনে হয় আজই বুঝি তার জীবনের শেষ দিন। রাত্রে জেলখানায় কোন আওয়াজ হলে চমকে উঠে বসে, ভাবে তাকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখনই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে!

সে দিনটা ২০শে নভেম্বর ১৯৫৯, স্টিভেনকে জানানো হল তাকে আরও কয়েকটা দিন বেশি বাঁচার সুযোগ দেওয়া হল। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ৮ ডিসেম্বর, তার বদলে পরের বছর ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখের মধ্যে ফাঁসি হবে। ১৪ বছরের ছেলেটার মনে যে বিশেষ কোন ছাপ পড়ল তা নয়। তাকে তো এবার যেতেই হবে। সেই শেষ যাত্রার জন্য যতটা প্রস্তুত থাকা যায়।

জীবনে অভাবনীয় কিছু ঘটনা ঘটে, তেমনটাই ঘটল স্টিভেনের জীবনে। তারিখটা ছিল ২২শে জানুয়ারি ১৯৬০। স্টিভেনের ফাঁসির আদেশ রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। সেদিন স্টিভেন নতুন জীবন ফিরে পেল। তারপর জেলখানায় প্রায় এক দশক কেটে গেল। শান্তভাবেই এ জীবনকে মেনে নিয়েছিল স্টিভেন।

স্টিভেন মারে ট্রাসকটের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘটনায় কানাডার জনমানসে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ওদেশের সাংবাদিক ইসাবেল লির্বোডেইস এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করে ১৯৬৬ সালে একটি বই লিখলেন, দি ট্রায়াল অফ স্টিভেন ট্রাসকট। ওনার মতে স্টিভেনকে অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং তা করা হয়েছে তাড়াহুড়া করেই। বহু তথ্য আদালতে পেশ করে হয়নি। এই বইটি সরকারকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করল। স্টিভেনকে প্যারোলে ছাড়া হল ২১শে অক্টোবর ১৯৬৯। শুরু হল নতুন ভাবে বাঁচা, নতুন নামে। জীবনসঙ্গী হিসেবে খুঁজে পেল এমন একজনকে যে সব সময়েই মনে করেছে স্টিভেন নির্দোষ। প্যারোলের বিধিনিষেধ উঠে গেল ১৯৭৪ সালের ১২ই নভেম্বর।

সেই বিশেষ দিনটি - ৯ জুন ১৯৫৯

ফেরা যাক সেই ঘটনা বহুল দিনটিতে, ৯ জুন ১৯৫৯ মঙ্গলবার। রয়্যাল ক্যানাডিয়ান এয়ারফোর্সের একটি বেস, অন্টারিও প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের একটি শহর, ক্লিনটনে। সময়টা শেষ বিকাল। বছর ১২ বয়েসের একটি ফুটফুটে মেয়ে সেরিল লিনে হার্পার। ৬ টা নাগাদ রাত্রের খাবার খেতে খেতে বাবা- মার অনুমতি চেয়েছিল সন্ধেবেলা সাঁতার কাটতে যাবার। অনুমতি মেলেনি। তাই কিছুটা ক্ষুণ্ন মনেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। স্কুলে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সহপাঠী বন্ধু বছর ১৪- র স্টিভেন মারে ট্রাসকটকে বলেছিল তাকে যেন সাইকেলে চাপিয়ে বড়োরাস্তায় পৌঁছে দেয়। এক জনের বাড়িতে ছোট্টো ঘোড়া (পনি) আছে, তা দেখতে যাবে সে।

স্টিভেন সেরিলকে সাইকেলে চাপিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল হাই রোডে। তারপর পুনরায় স্কুলে ফিরে আসে রাত্রি ৮ টা নাগাদ। ওর বন্ধুরা তা দেখেছিল। কিন্তু সেরিল লিনে হার্পার আর কোন দিন ফিরে আসেনি। দুদিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় হাইরোডের কাছে জঙ্গলের মধ্যে। তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। মারার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে পরিধেয় বস্ত্রটি। সেটির সাহায্যে গলায় ফাঁস দেওয়া হয়েছে। জীবিত অবস্থায় সেরিলকে শেষবারের মত দেখা যায় স্টিভেনের সঙ্গে, যখন স্টিভেন তাকে সাইকেল চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিস তাই স্টিভেনকে ধরেছে সন্দেহের বশে।

আদালতের রায়

মৃত্যুর সঠিক কাল নির্ধারণের জন্য ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সময় নির্ধারণের জন্য যে বিষয়গুলি দেখা হয়েছিল সেগুলি – ১) মৃতের পাকস্থলীতে খাদ্যের পরিমাণ, ২) খাদ্য কতটা হজম হয়েছিল, ৩) মৃত্যুর পর দেহে কতটা পরিবর্তন হয়েছিল (রিগর মর্টিস), ৪) দেহে কতটা পচন ধরেছিল, এবং ৫) দেহের ভিতরের অঙ্গগুলির (থাইমাস, যকৃৎ, ফুসফুস, ইত্যাদি) কতটা পরিবর্তন হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয়গুলির বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা করে তৎকালীন ফরেনসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে জানান যে সেরিলের মৃত্যু ঘটেছে ৭ টা থেকে ৭- ৪৫ মিনিটের মধ্যে।

সেরিল লিনের মৃতদেহে মাছির ম্যাগট পাওয়া যায়। পরীক্ষার জন্য সেগুলি কীটতত্ত্ববিদ এলগিন ব্রাউনের কাছেও পাঠানো হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞানী ব্রাউনের পাঠানো রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয় নি। সেই সময় আরও অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল কিন্তু পুলিস সেদিকে নজর দেয়নি। স্টিভেন ট্রাসকটকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতেই আদালতের রায় দেওয়া হয়েছিল – ট্রাসকটের ফাঁসি। শেষ হয়ে যাচ্ছিল স্টিভেনের জীবন।

শুধুই ভুলে ভরা

শুরু হয়েছে নতুন শতাব্দি, হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ট্রাসকট দম্পতি মনে মনে তৈরি হয়েছেন শেষ চেষ্টা করার – খুনী ছাপটি কি মুছে ফেলা যায় না? ২০০০ সালের ২৯ শে নভেম্বর, তাঁরা দরখাস্ত করলেন ১৯৫৯ সালের কেসটির পুণর্বিবেচনার জন্য। ইতিমধ্যে চার দশক কেটে

গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা আবার নির্ধারণ করতে বসলেন সেরিল লিনের মৃত্যুর সঠিক সময়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের সঙ্গে পুণঃ বিবেচিত হল মাছির শূককীটের বিষয়টি।

যে কজন ডাক্তার বিজ্ঞানীর মতামত নেওয়া হয়েছিল তাঁরা সকলেই জানালেন, যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতে সেরিল লিনের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয়েছিল ৭- ০০ থেকে ৭- ৪৫ মিনিট, তা সঠিক নয়। তৎকালীন বিজ্ঞানীদের অজ্ঞতা এবং বর্তমান কালের বিজ্ঞানের অগ্রগতি, এই দুটি রিপোর্টের মধ্যে ফারাক ঘটিয়েছে। সেরিলের মৃত্যু সন্ধ্যা ৭- ৪৫ মিনিটের মধ্যে হয়েছে – এই ভ্রান্তির জন্যই হয়েছে স্টিভেনের ফাঁসি হতে চলেছিল। পাকস্থলীতে খাবারের স্থায়িত্ব সাধারণভাবে দেড় থেকে দু'ঘণ্টা হলেও, আরও অনেক বিষয়ের উপর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। অনেকক্ষেত্রে খাবারের স্থায়িত্ব ৬ ঘণ্টা বা তার বেশি হয়ে থাকে। তাই ১৯৫৯ সালে, সেরিলের মৃত্যুর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক যত্নবান হওয়া উচিৎ ছিল বলে বর্তমান প্রজন্মের ডাক্তার বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন। তাছাড়া লিনের দেহের যথেষ্ট পচন না ধরা এবং আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির স্বল্প পরিবর্তনের বিষয়টির কথা ভেবে ডাক্তাররা মনে করেন লিনের মৃত্যু ৯ জুন ১৯৫৯ সন্ধ্যা ৭- ৪৫ মিনিটের পর এমনকি ১০ জুন তারিখেও হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে স্টিভেন ট্রাসকটকে দোষী করা যায় না।

কীটতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হওয়া

স্টিভেন ট্রাসকটকের পক্ষ থেকে বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির ডঃ রিচার্ড মেরিটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। উনি লিনের দেহে যে ব্লো ফ্লাইয়ের ম্যাগটগুলি পাওয়া গেছিল ($^1/_2$ মিলিমিটার লম্বা) তার পরিমাপ, জুন মাসের তাপমাত্রা এবং ব্লো ফ্লাই শূককীটের পূর্ণাঙ্গ মাছিতে রূপান্তরের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে জানান যে ৯ জুন ১৯৫৯ তারিখে ব্লো ফ্লাইগুলি মৃতদেহে ডিম পাড়লে, তার থেকে উৎপন্ন লার্ভা বা ম্যাগটগুলি ১১ জুন তারিখে অত ছোট ($^1/_2$ মিলিমিটার) হত না। লার্ভাগুলির দৈর্ঘ্য আরও বেশি হত।

আদালতে গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত

১৯৫৯ সালের পোস্টমর্টেম রিপোর্টগুলি পুনর্বার বিবেচনা করে ডাক্তার বিজ্ঞানীরা যে নতুন রিপোর্ট আদালতে জমা দেন সেগুলি এবং নতুনন তথ্যের (ডঃ মেরিটের রিপোর্ট) ভিত্তিতে অন্টারিও কোর্ট অফ অ্যাপিল, ২০০৭ সালের ২৮ শে আগস্ট লিনে হার্পারকে খুনের জন্য স্টিভেন ট্রাসকটকে দোষী

সাব্যস্ত করবার সিদ্ধান্তটি “আদালতের ভুল” (Miscarriage of Law) বলে স্বীকার করে নেন। ট্রাসকটকে খুনের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ২০০৮ সালের ৭ ই জুলাই অন্টারিও সরকারের তরফ থেকে স্টিভেন ট্রাসকটকে ৬.৫ মিলিয়ন ডলার (বর্তমান মূল্যে ৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখা - মেডিকো- লিগ্যাল এন্টোমোলজি

মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশেষ ধরণের মাছি সহ কিছু পতঙ্গ মৃতদেহের কাছে এসে হাজির হয়। উদ্দেশ্য ডিম পাড়া। এই সব মাছিদের (হাউস ফ্লাই নয়) ডিম পাড়ার আদর্শ জায়গা হচ্ছে মুখ, নাক এবং কানের ছিদ্র। মানুষের মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি সৎকার করা হয় বা কবর দেওয়া হয়। তাই মাছি বা অন্যান্য পতঙ্গদের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষদের চোখে পড়ে না। কিন্তু যে সব মৃতদেহ মাঠেঘাটে বা জঙ্গলে পড়ে থাকে সেই সব ক্ষেত্রে মাছি এবং শূককীটের উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়বে। কীটপতঙ্গের ডিম থেকে শূককীট এবং শেষে পূর্ণাঙ্গে রূপান্তর নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ঘটে থাকে। তা তাপমাত্রা এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গে রূপান্তরের সময় সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে পারলে সেই তথ্য নানাভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এই জাতীয় তথ্যের সাহায্যে কীটতত্ত্ববিদেরা বহু অপরাধের কিনারা করেছেন। আদালতে সেই তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধীর সাজা হয়েছে।

পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের দেশে এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। যদিও চীন দেশে প্রায় ৮০০ বছর আগে খুনীকে ধরার জন্য কীটপতঙ্গের ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আজও আমরা এই ধরণের ভাবনাচিন্তা করিনা। এদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে ফরেনসিক এন্টোমোলজির স্থান হয় নি। জীবনবিজ্ঞানের ছাত্রদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শুনলে অবাক হতে হবে, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা বা অঙ্কের অধ্যাপকদের কেউ কেউ উপরোক্ত বিষয় তিনটিকে “পিওর সায়েন্স” বলে মনে করেন, অবশ্যই তা তাঁদের চরম অজ্ঞতাবশত। অথচ নিত্য নতুন জীবন বিজ্ঞানের শাখার উদ্ভব হচ্ছে। আশার কথা এই যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী বিজ্ঞানীরা মানব কল্যাণে একসঙ্গে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। আমাদের মত মানুষেরা সব সময়েই স্বপ্ন দেখছেন, এদেশেও ফরেনসিক এন্টোমোলজি, মেডিকো- লিগ্যাল এন্টোমোলজি, ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা হবে। সাধারণ মানুষ এই বিজ্ঞানের মানব কল্যাণমুখী দিক সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

প্রতিবেশী গাছ

শ্রীহস্তিনী বা হাতিশুঁড় গাছ

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন সকালেই বেড়িয়ে পড়েছিলাম ইলামবাজার যাব বলে। উদ্দেশ্য ওখানের পুরানো পোড়ামাটির মন্দির দেখা। ইলামবাজার পৌঁছে প্রথমে হাটতলায় বাজারের মধ্যে অষ্টকোণাকৃতি দেউল দেখে বামুনপাড়ার মন্দির দেখতে চলেছি। বামুনপাড়া পৌঁছে সামনেই পড়ল শিবের দেউল। সুন্দর মন্দিরটির চারপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ধারেই অন্য আগাছার মাঝে একটি গাছে বাঁকানো পুষ্পদণ্ডে ফুটে রয়েছে সাদা সাদা

ফুল, গজদন্তের মত শুভ্র এই ফুল। হাতিশুঁড় গাছ। পুষ্প দণ্ড বাঁকানো হাতির শুঁড়ের মত, তাই গাছটির এই নাম। সংস্কৃত নাম শ্রীহস্তিনী। মনে পড়ল কয়েক দশক আগে কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, চোখ টকটকে লাল হয়েছে, কড় কড় করছে মনে হচ্ছে বালি পড়েছে। এমনটা হলে হাতিশুঁড় গাছের পাতার রস অব্যর্থ ওষুধ। এই গাছটিকে ওড়িয়া ভাষায় হাতিশুন্ডা আর তেলেগুতে বলে নাগদন্তী।

এই ভেষজ গাছটি বর্ষজীবী ছোট গুল্ম। গাছটি আগাছার সঙ্গে এখানে সেখানে জন্মায় তাই সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। মোটামুটি এক দেড় ফুট লম্বা, গাছের কাণ্ড ফাঁপা, নরম, সারা দেহে ছোট ছোট রোম আছে। গাছের উপরের দিকের কাণ্ড চৌকো, নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত গোলাকার। পাতা খসখসে, একের বিপরীত অন্য পাতাটির অবস্থান। ডালের নীচের দিকের পাতা বড়, পত্রবৃন্ত লম্বা। বড় পাতাগুলি দেখতে বর্শার ফলার মত; বড় পাতার মাপ ২$^{১}/_{২}$ x ২ ইঞ্চি। পাতাগুলি আঙুল দিয়ে ঘষলে গন্ধ পাওয়া যায়। ফুলগুলি শ্বেতশুভ্র। পত্রদন্ডে ছোট ছোট ফুলগুলি দুই সারিতে পর পর সাজান থাকে। বড়ই মনোরম দেখতে।

চরক সংহিতা সহ অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকে এর উল্লেখ আছে। এই গাছটি বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত হয়ঃ-

১) ফোলায় – পাতা বেঁটে অল্প গরম করে ফোলায় লাগালে, ফোলা কমে যায়।

২) আঘাতজনিত ফোলায় – পাতা বেঁটে অল্প গরম করে লাগালে, ফোলা এবং ব্যাথা কমে যায়।

৩) রিউম্যাটিক বাতে – রেড়ির তেলের সঙ্গে পাতার রস মিশিয়ে পাক করে গাঁটে লাগাতে হয়।

৪) বিষাক্ত পোকার কামড়ে – পাতার রস লাগালে জ্বালা এবং ফোলা কমে যায়।

৫) টাইফয়েড জ্বরে – পাতার রস গরম করে, ছেঁকে নিয়ে জল মিশিয়ে খাওয়ানোর বিধি আছে।

৬) ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগে – পাতার রস অল্প গরম জলে মিশিয়ে গার্গল করা।

৭) একজিমা – একজিমা স্থানে পাতার রস মেশানো হয়।

৮) দাঁতের মাড়ি ফোলায় এই গাছের ব্যবহার রয়েছে

৯) দেহে ছত্রাকজনিত সংক্রমণে লাল চাকা চাকা দাগ নিরাময়ে এর পাতার রস ব্যবহার করা হয়।

১০) জ্বর ও কাশিতে এই গাছের মূল জলের সঙ্গে ফুটিয়ে ক্বাথও তৈরি করে ব্যবহার করা হয়।

১১) কাটা ছেঁড়া ও আঘাত প্রশমনে এই গাছের ব্যবহার রয়েছে।

শ্রীহস্তিনী বা হাতিশুঁড় গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Heliotropium indicum* এবং গাছটি বোরাজিনেসি পরিবারভুক্ত। *Heliotropium* শব্দের অর্থটি সুন্দর (*helios* –সূর্য *trope* – দিকে); এর অর্থ ফুলগুলি সূর্যের দিকে মুখ করে রয়েছে।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা এই গাছটির ভেষজগুণ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে এই গাছ থেকে নানা রোগের ঔষধ তৈরি হবে।

ঘি ঢালতেই যজ্ঞস্থলীতে আগুন

"হেই ঘুরিন্দর"?(জাদুকর)

"হ্যাঁ ওস্তাদ।"(প্রথম শাগরেদ)

"হেই মহিন্দর?"(জাদুকর)

"আছি ওস্তাদ।" (দ্বিতীয় শাগরেদ)

"বাবার অনারে যজ্ঞ হবে কি হবে না?"

"হবে ওস্তাদ।"(দুই শাগরেদ)

"যজ্ঞবেদি কোথায়?"(জাদুকর)

"এই আনছি ওস্তাদ"- বলেই দুজন দৌড়ে গিয়ে উইংসের পাশ থেকে একটা চতুষ্কোণ যজ্ঞবেদি এনে টেবিলের ওপর রাখল। যজ্ঞবেদিটা সুন্দরভাবে ছোটোছোটো কাঠ- বাঁশের টুকরো দিয়ে সাজানো। তাতে আবার কয়েকটা ফুলটুলও আছে।

"যজ্ঞবেদিতে আগুন জ্বলবে কীভাবে?"

"ঘি ঢালতে হবে ওস্তাদ। সঙ্গে আপনার অগ্নি- আহ্বান মন্ত্র।"

"ঘি কোথায়?"

"আনছি ওস্তাদ", বলেই একজন শাগরেদ ছুটে গিয়ে উইংসের পাশ থেকে একজোড়া কোশাকুশি এনে টেবিলের ওপর রাখল। ওটায় যে ঘি জাতীয় একটা কিছু তরল আছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আরম্ভ হল যাদুকর মন্ত্র, "হে বাবা কেম্যাজিকেশ্বর, হে বাবা কেম্যাজিকেশ্বর, তোমার মহিমা দেখাও।অগ্নিদেবকে যজ্ঞস্থলীতে আসার জন্যে আজ্ঞা দাও। হে অগ্নি তুমি সর্বগ্রাসী

হুতাশন, তুমি আঁধার বিনাশী সর্বপাপহর, তুমি দীপ্যমান তাপ উদ্রেককারী, তুমি আলোক বর্তিকা, তুমি যজ্ঞাধিকারী, আমার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি স্বরূপে প্রকাশিত হও", ইত্যাদি মন্ত্র জোরে জোরে বলছেন আর কুশিটা দিয়ে কোশা থেকে ঘি নিয়ে যজ্ঞস্তূপে ওপর থেকে ঢেলে যাচ্ছেন। ডম্বরু আর ঘণ্টার বাজনাও পূর্ণোদ্যমে চলছে।

আবারও মন্ত্র আরম্ভ, "O fire, O great energy, please appear, please appear, হে অগ্নিদেব, হে মহাশক্তি, তুমি এখানে আর্বিভূত হও, তুমি নিজেকে স্বরূপে প্রকাশ কর..."ইত্যাদি মন্ত্র পড়ছেন আর ক্রমাগত একটা ক্ষীণ ধারায় কুশিটা দিয়ে কোশা থেকে ঘি ঢেলে যাচ্ছেন।

কিছুসময়ের ভেতরেই যজ্ঞস্তূপটা থেকে প্রথমে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর জাদুকর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওইতো, প্রভু আসছেন, তাঁর আগমনবার্তা চলে এসেছে", বলতে বলতেই যজ্ঞস্তূপ থেকে ফরফরিয়ে প্রচুর আগুন বেরিয়ে আসতে থাকল।

রহস্যটা কোথায়?

এখানে একটা সাধারণ জারণ(Oxidation) বিক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

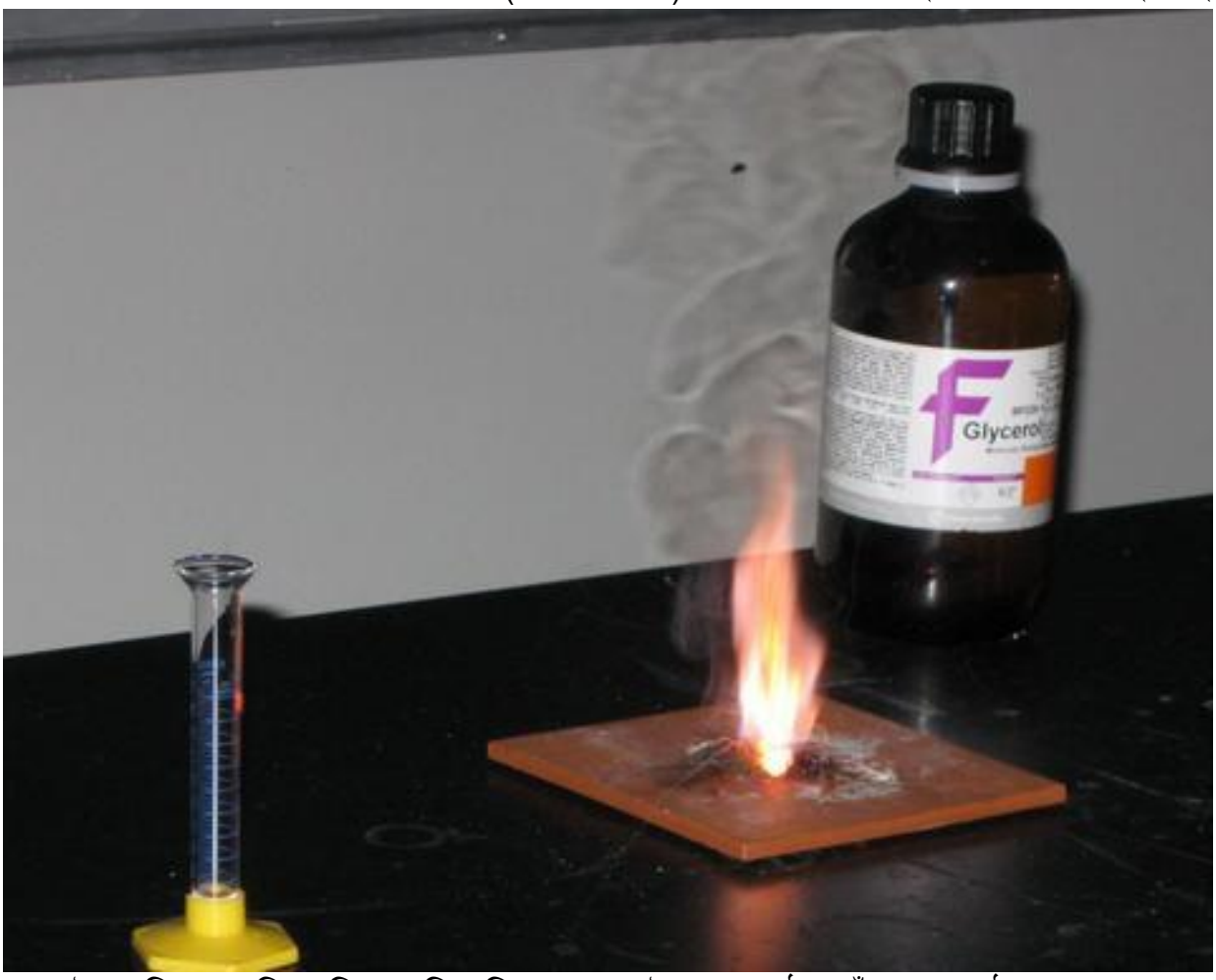

কোশাটায় ঘি নয়, ছিল বিশুদ্ধ গ্লিসারিন। যজ্ঞস্তূপটাতে কাঠের গুঁড়ো, কাঠের চোকলা, সরু

সরু পাটকাঠি, বাঁশ ইত্যাদির তলায় যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা রাখা। এই পারম্যাঙ্গানেট এক অতিশয় তীব্র জারক(Oxidising agent) । গ্লিসারিন এর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে জারিত হতে শুরু করে দেয়।এই জারণ বিক্রিয়াটা প্রচন্ড রকমের তাপবর্জী(Exothermic) । এই তাপে বাতাসে থাকা অক্সিজেনের সাহায্যে কাঠ-বাঁশ ইত্যাদিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।আগুন জ্বালার ক্ষেত্রে এসবের সঙ্গে গ্লিসারিনও ইন্ধনের কাজ করে থাকে।

গ্লিসারিন+$KMnO_4$ ⟶ জারিত দ্রব্য+তাপ

(কাঠ, বাঁশ, গ্লিসারিন) +O_2(বাতাস) +তাপ ⟶ আগুন

সাবধানতা

আগুন জ্বলার এক দেড় মিনিট পরই যজ্ঞবেদিটা হলঘর থেকে বের করে দেবে।

কাঠের গুঁড়ো, কাঠের চোকলা, কাঠখড়ি, বাঁশ ইত্যাদি শুকনো হতে হবে।

বিশুদ্ধ গ্লিসারিন লাগবে।

গুঁড়ো পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার না করে একটু ছোট-বড় দানাদার পারম্যাঙ্গানেট নিলে বিক্রিয়াটা অনেক মনোগ্রাহী হবে।

বিকল্প পদ্ধতি

এই কাজটা তোমরা আরেকভাবেও দেখাতে পার। একটা বড়ো কাঠের পিঁড়ির ওপরে মাটি দিয়ে একটা মস্ত পাহাড় বানিয়ে নাও। তারপর ওর মধ্যে এখানে সেখানে বেশ কয়েক জায়গায় আঙুল দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত করে ওটা শুকিয়ে নাও।এখন ওই গর্তগুলোয় প্রথমে একটু শুকনো কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ওর ওপর অল্প অল্প পারম্যাঙ্গানেট রেখে আলতো করে কাঠের চোকলা দিয়ে ঢেকে দিলেই তোমর যন্ত্র রেডি।

এখন স্টেজে পাহাড়টা এনে দর্শকদের বল যে এই পাহাড়টা দৈবশক্তিসম্পন্ন। এর ওপর বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়লেই এটা আগ্নেয়গিরিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর এখান সেখান থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকে। এই বলে একটা ঝাঁঝরির সাহায্যে পাহাড়ের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মতো করে গ্লিসারিন পড়তে দাও, তারপরই খেলা জমে যাবে।

আমি তো মাত্র দু'খানা পরামর্শ দিলাম। তোমরা নিজের মতো ভেবে আরও অনেক বিকল্প বের করতে পার।

বিনা ইলেকট্রিসিটিতে বাল্‌ব জ্বলে

"ওস্তাদ, প্রভুর সামনে একটা বাল্‌ব জ্বালাতে হবে।"

"বাল্‌ব জ্বালাবি! এখানে ইলেক্‌ট্রিসিটি কোথায়?"

"ইলেকট্রিক কারেন্ট লাগবে না গুরু।আপনার মন্ত্র আর কেম্যাজিকেশ্বরের কৃপা হলেই বাল্‌ব জ্বলবে।"

"শুধু মন্ত্র হলেই হবে? যন্ত্র কোথায়?"

"আনছি ওস্তাদ", বলেই এক শাগরেদ একটা পার্শ্বনলী থাকা কনিকেল ফ্লাস্ক এনে টেবিলের ওপর রাখলো। ফ্লাস্কের ভেতর যে অল্প পরিমাণে একটা বর্ণহীন তরল পদার্থ আছে সেটা দূর থেকে ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না।

"এটা কী?" (জাদুকর)

"বাল্‌বের বাইরের কাচের আবরণ।" (শাগরেদ)

"জ্বলবে কী?" (জাদুকর)

"এই আনছি গুরু", বলে দ্বিতীয় শাগরেদ তারের জালি লাগানো একটা কাচদন্ড জাদুকরের হাতে দিল। ওই কাচদন্ডের একটা মাথায় একটা এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের ছোট পাতলা তারের কুন্ডলী ফিউজ করে লাগানো আছে।

"এইটা দিয়ে বাল্‌ব জ্বলবে?" (জাদুকর)

"আপনি মন্ত্র গেয়ে তারের এই কুন্ডলীটা এর ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই কুন্ডলীটা জ্বলে দীপ্তিমান হয়ে আলো বিলানো শুরু করবে", বলে কনিকেল ফ্লাস্কটা দেখিয়ে দিল।

"ঠিক আছে, তা-হলে দেখাই যাক", বলে জাদুকর একদিকে তারের জালি আর অন্যদিকে তারের কুন্ডলী লাগানো কাচদন্ডটা হাতে নিয়ে একবার করে টেবিলের তলায় নামিয়ে দিচ্ছেন আর ওপরে ওঠাচ্ছেন, সঙ্গে চলছে তার "অংবং" করে মন্ত্র। একরকম করতে করতে হঠাৎই ওই কাচদন্ডটা ফ্লাস্কের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। তারের জালির জন্যে কাচদন্ডটা লম্বভাবে ফ্লাস্কের মুখে ঝুলে থাকল আর কুন্ডলীটা রইল ফ্লাস্কের ভেতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে তারের কুন্ডলীটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে শুরু করে আলো ছড়াচ্ছে।সম্পূর্ণ ফ্লাস্কযন্ত্রটাকে মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত বাল্‌ব।

এখানে কী ঘটছে?

এখানেও আসলে একটা জারণ বিক্রিয়াই সংঘটিত হচ্ছে। পার্শ্বনলীযুক্ত কনিকেল ফ্লাস্কটার ভেতর 15ml মিথানল (মিথাইল অ্যালকোহল) নেওয়া আছে, আর এটা ভালো করে লক্ষ না করলে চট করে নজরে আসে না। কাচদন্ডটার একটা মাথায় প্লাটিনামের পাতলা তারের কুন্ডলী পাকিয়ে ফিউজ করে আটকে দেওয়া হয়েছে। কাচদন্ডটার অন্যপ্রান্তে একটা তারের জালি এমনভাবে লাগানো আছে যাতে কুন্ডলীটা ওই তরলের ওপর দুই থেকে আড়াই সেন্টিমিটার উপরে ঝুলে থাকে।

জাদুকর যে দুই-তিনবার কাচদন্ডটা টেবিলের তলায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা ওই তারের কুন্ডলীটাকে একটা বার্নারে তপ্ত করে নেওয়ার জন্যে। এই জ্বলন্ত বার্নারটা টেবিলের পেছনে থাকায় দর্শকের কাছে অদৃশ্য ছিল। ওই তপ্ত কুন্ডলীটা যেইমাত্র ওই

ফ্লাস্কের ভেতরের তরলের ওপর নির্দিষ্ট উচ্চতায় ঝুললো অমনি মিথানলের ভাপ আর বাতাসে থাকা অক্সিজেন ওই প্লাটিনাম তারের ওপর বিক্রিয়া শুরু করে দিল। এখানে প্লাটিনাম অনুঘটকের কাজ করছে আর মিথানল(অ্যালকোহল) জারিত হয়ে মিথানেল-এ(অ্যালডিহাইড) পরিণত হচ্ছে। এই জারণ বিক্রিয়াটা সাংঘাতিক ধরনের তাপবর্জী(Exot her mi c) বিক্রিয়া। যেহেতু বিক্রিয়াটা তারের ওপরই সংঘটিত হচ্ছে, ফলে উদ্ভূত প্রায় সমস্ত তাপই তারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ওটাকে দীপ্তিমান করে তুলেছে। বিক্রিয়াটা আরম্ভ করার জন্যে তারের কুন্ডলীটাকে প্রথমে একটু গরম করে নেওয়া হয়েছিল।জালির ফাঁক দিয়ে মিথানল আর জলবাষ্প ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর অক্সিজেন নিয়ে বাতাস পার্শ্বনালী দিয়ে ফ্লাস্কের ভেতর ঢুকছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভেতরে মিথানল থাকবে ততক্ষণ ওই বাল্‌বটা জ্বলতে থাকবে।

এখানে তোমরা একটু মজাও করতে পার। জ্বলতে থাকা কাচদন্ডটা দশ-পনেরো সেকেন্ডের জন্যে বাইরে বের করে নিয়ে এসো, দেখবে কুন্ডলীটা নিভে গেছে। আবারও ঢুকিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠবে।

$$2CH_3OH + O_2(\text{বাতাস}) \xrightarrow[\text{অনুঘটক}]{\text{প্লাটিনাম}} 2HCHO + 2H_2O + \text{তাপ}$$

$$\text{প্লাটিনাম কুন্ডলী} + \text{তাপ} \longrightarrow \text{আলোক বিচ্ছুরণ}$$

সাবধানতা

এই ম্যাজিকটা দেখানোর আগে রিহার্সেল দিয়ে প্লাটিনাম তারের কুন্ডলীটার সঙ্গে ফ্লাস্কে থাকা মিথানলের সঠিক দূরত্বটা ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

বিশুদ্ধ মিথানল ব্যবহার করতে হবে। মিথানল উদ্বায়ী এবং খুবই দাহ্য। সাবধানে ব্যবহার করবে।

প্লাটিনাম তারের কুন্ডলীটা যাতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

আরম্ভের সময় ফ্লাস্কে থাকা সম্পূর্ণ ভাপটা দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। ভয় পেয়োনা, তোমাকে কিছু করতে হবে না।ওটা আপনা আপনিই নিভে গিয়ে তোমার উদ্দিষ্ট বিক্রিয়া আবারও ধীরে ধীরে শুরু করবে।

ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং
অনুবাদ পিয়ালী চক্রবর্তী

পেঁচা

এ এমন একটি পাখি যে খারাপ আর ভালো লক্ষণ এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আবার জনশ্রুতি এও বলে যে ‘খারাপ ভাগ্যের’জন্য পেঁচা দায়ী। ‘একমাত্র পেঁচারাই একলা থাকে’, অসামাজিক মানুষদের এমন বলা হয়, কেউ মাতাল হলেও তাকে পেঁচার সাথে তুলনা করা হয়। আবার বোকাসোকা, মাথামোটা লোকজনকেও ‘পেঁচার ছেলে’ বলা হয়। প্রাচীন প্রবাদে এমন বলা হয় যে ‘একটা পেঁচাই আর একটা পেঁচার মর্ম বোঝে’। বা ‘একটা ফিনিক্স কি বোঝে পেঁচাকে?’ এমন বলা হয়, পেঁচা সেদ্ধ খেয়ে নেশা হয়। এই যেমন বন্ধুরা যদি দেখে কেউ তার বউয়ের সাথে একটু বেশিই বিনয়ী ব্যবহার করছে, অমনি বলবে নিশ্চই বউ,বরকে পেঁচা সেদ্ধ খাইয়েছে। পেঁচার বহু প্রকারভেদ দেখা যায় ভারতে। আবার ইটালিতে ছোটো পেঁচা দেখতে পাওয়া যায় তারা নাকি গোধুলীবেলায় মৃদু মৃদু হাসে।

শ্রীলঙ্কায় বড়ো পেঁচার কান্নাকে খুব অশুভ ধরা হয়, যেন সে কোন মৃত্যুর ঘোষণা করছে। ভারতে পেঁচার কান্না মানেই, সে যেন কোন ভূতুড়ে খালি বাড়িতে বসে ডাকছে। কোন ভারতীয় কখনও পেঁচাকে মারেনা, সে শস্য- ফলের যতই ক্ষতি করুক। ইংরেজরা অবশ্য খেলার ছলে প্যাঁচা হত্যা করে থাকে।

পায়রা

পায়রা, প্রধানত মক্কার পাখি। হিন্দু, মুসলিম দুইয়েরই পছন্দের পাখি। হিন্দুদের তিন প্রধান দেবতার একজন, মহাদেব বেছে নিয়েছিলেন পায়রাকে, কপোতেশ্বরের অবতার হিসেবে। কাশ্মীরের কাছে ছোট একটি মন্দিরের পুরোহিত বলেছিলেন, যে মহাদেব নাকি মাঝে মাঝে জোড়া পায়রার রূপ ধারণ করেন আর উড়ে ছাদের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। যেসব জায়গায় হিন্দুদের জনসংখ্যা বেশি, সেখানে প্রতিদিন হিন্দু ব্যবসায়ী, দোকানদাররা নিয়মিত পায়রাদের খেতে দেন। কোন একজন পর্যটক যখন পায়রার ডানা ঝাপটানো শুনতে পান, তাঁর মনে হয় তিনি আছেন ভেনিস বা কনস্ট্যান্টিনোপলে। আবার আরেকটু উত্তর দিকে গেলে, কাবুলের গ্রামে প্রচুর পায়রা দেখা যায়। এরা আবার মাটির উর্বরতা বাড়াতেও সাহায্য করে।

উত্তর ভারতে প্রচুর মানুষ পায়রা পোষেন, বিশেষ করে মুসলমানরা। এঁরা নানারকম প্রজাতির পায়রা রাখেন, এদের মধ্যে বেশিরভাগ 'শিরাজী' আর ছোট পাখার মত লেজওয়ালা, আর প্রবালের রঙের মত পা যাদের, সেগুলো সাধারণত তামার শিকলে বাঁধা থাকে। এদের ওড়াটাও এমন হয় যে অন্যেরা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর প্রতিবেশী পাখিরা এসে এদের পালের সাথে মেশে।

একটি জনপ্রিয় প্রবাদে বলা হয় যে, গৃহবধূরা টিয়া পোষে, প্রেমিক-প্রেমিকারা পোষে মুনিয়া, আর চোরেরা পোষে পায়রা। আগেকার দিনে পায়রা যারা ওড়াত, তাদের কাজটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখা হতনা। কিন্তু চিরকালই পায়রা দূতের কাজ করে এসেছে। তবে সবসময়ই যে প্রেমপত্র আদান-প্রদান করেছে তা নয়। অনেক দুঃখের কাহিনীও রয়েছে পায়রা নিয়ে। এমন শোনা যায় এক হিন্দু রাজা একবার মুসলিম বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সাহসের সাথে তাদের মুখোমুখি হলেন। সসৈন্যে তাদের সাথে যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটি পায়রা। বলে গেলেন, তিনি হেরে গেলে, পায়রা উড়ে ফিরে আসবে প্রাসাদে এবং তাহলেই বোঝা যাবে যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে এবং তখন প্রাসাদের বাকিরা আগুনে আত্মাহুতি দেবে। কিন্তু রাজা যুদ্ধে জিতে গেলেন। শ্রান্ত,ক্লান্ত হয়ে তিনি এক নদীতে জল খেতে নেমেছেন, এমন সময় সেই পায়রা রওনা দিল প্রাসাদের দিকে। অনেক চেষ্টা করেও রাজা তাকে ফেরাতে পারলেন না। এরপর রাজা যখন প্রাসাদে ফিরলেন, তখন সবাই আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে ফেলেছে। রাজার কাছেও তখন আগুনে আত্মাহুতি দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

ভারতের শহরগুলোতে দেখা যায়, ছ'ফুট লম্বা বাঁশের খুঁটির ওপর হাল্কা বাঁশের জাফরি বানানো থাকে, পায়রা ধরার ফাঁদ হিসাবে। খুব ভোরবেলা পায়রা ওড়ানেওয়ালারা একটা টোপ ফেলে, একটা লাঠির মাথায় বস্তা বেঁধে, শিস দিতে থাকে। এই শুনে পায়রারা আকৃষ্ট হয়, একঝাঁক পায়রার গোল গোল হয়ে আকাশে ঘোরা, তারপর একসাথে এসে বসা, ভারি সুন্দর লাগে দেখতে, শুধু মনে হয় এর পিছনে ওই মানুষগুলোর দুরভিসন্ধি না থাকলেই হত।

কোকিল

ইংরেজরা কোকিলকে খুব আমুদে নবাগত আর বসন্তের অগ্রদূত হিসাবে ডাকে। কিন্তু শুধু বসন্তের জন্য নয়, কোকিলের গান এদেশে সবচেয়ে সুরেলা হিসাবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ কোকিলের গানে ক্লান্তিকর, তাতে একটা বা দুটো তীক্ষ্ণ সুরের অনুরণন ছাড়া বিশেষ কিছুই পান না। কিন্তু সাহিত্যে, কবিতায় কোকিলকেই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার কন্ঠের জন্য। সঙ্গীত শিল্পীর খুব ভাল পরিবেশনকেও কোকিলের সাথে তুলনা করা হয়। ইংরেজদের অবশ্য কোকিলের ওপর একটু হিংসে আছে। কারণ ভারতে গ্রীষ্মকালটা অনেক লম্বা, তাই অনেকটা সময় কোকিলকে শোনা যায়, সেই তুলনায় বিদেশে শুধু স্বল্পদৈর্ঘ্যের বসন্তকালে কোকিলকে দেখা যায়।

আর কাকের সাথে কোকিলের একেবারে আড়ি। কারণ- কোকিল, কাকের বাসা খুঁজে খুঁজেই তাতে ডিম পাড়ে, আর কাক নিজের বাচ্চা ভেবে তাকে বড় করে। তাই মাঝে মাঝেই কাকের দল, কোকিল দেখলে ঘিরে ফেলে। অবশ্য এই কাকের দল দেখলে লন্ডনের রাস্তার বাচ্চাদের কথাই মনে পড়ে। ওরাও রাস্তা ঘাটে কোন অপরিচিত ব্যাপার দেখলেই তা ঘিরে ফেলে।

ক্রমশ

পূর্ব হিমালয় বায়োডায়ভার্সিটি হট স্পটে অরুণাচল প্রদেশের বন

ভারতের বনাঞ্চল সংহিতা

পূর্ব হিমালয়ের বায়োডায়ভার্সিটি হটস্পটের সাধারণ চরিত্রের থেকে তার চরিত্র বেশ আলাদা তার পূর্বাংশে। এই পূর্বাংশ মূলত অরুণাচল প্রদেশের মধ্যেকার বন নিয়ে তৈরি। পুরো পূর্ব হিমালয় বায়ডায়ভার্সিটি হট স্পটের এই অংশেই মানুষের বাস সবচেয়ে কম। ফলে এখানে বন আর তার বৈচিত্র্যও পূর্ব হিমালয় বায়ডায়ভার্সিটি হট স্পটের অন্য এলাকার তুলনায় বেশি।

অরুণাচল প্রদেশের পুরো এলাকার ৯১.০৭% জমিতেই বনভূমি। তার মধ্যে মধ্যম ঘনত্বের বনই সবথেকে বেশি, গভীর ঘনত্বের বন ক্রমশ কমে যাচ্ছে ঝুম চাষের জন্য।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের বর্ণনানুসারে ষোল রকমের বন আছে এই রাজ্যে। এই সব বনকে দশটা গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। কারণ এখানে গাছেদের রকম- ফের অনেক। জীব

বিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলা যায় যে এই রাজ্যের বন উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই সব গাছেদের মধ্যে পনের শ গাছ সপুষ্পক প্রজাতির। তাছাড়া আছে প্রিমুলাস,

ভ্যান্ডা, লেডিস স্লিপার এবং আরও নানা ধরণের অর্কিড।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে এখানে দেখা যায় সায়াথিয়া নামে ট্রি- ফার্ন, পঞ্চাশ প্রজাতির রডোডেনড্রন, ম্যাগনো-লিয়া এবং অন্যান্য স-পুষ্পক উদ্ভিদ। উদ্ভিদ প্রজাতির সৃষ্টি প্রক্রিয়ার গবেষণা থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীতে কলা গাছের উৎপত্তি ও বিস্তার হয়েছিল এই এলাকা থেকেই।

অরুণাচল প্রদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে মোট দুটি জাতীয় উদ্যান আছে। দুটির এলাকার বিস্তার মোট ২৩০ বর্গ কিলোমিটার। তাছাড়া এগারটা অভয়ারণ্যও আছে যাদের মিলিত বিস্তার ৭৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। আছে বাঘ সংরক্ষণের বিশিষ্ট

দুটি বন। তার মধ্যে একটা হল বিখ্যাত নামধাপা টাইগার রিজার্ভ। নামধাপা অবস্থিত চ্যাংল্যাং জেলাতে। অন্যটি স্বল্প পরিচিত পাখুই। তবে অরুণাচল প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো পশ্চিম সিয়াং আর আপার সিয়াং জেলার ডিবং উপত্যকা। এখানে ৫১১২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ডিহং- ডিবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ।

এই এলাকার সবচেয়ে চমকপ্রদ আর গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো টাকিন বা মিশমি টাকিন। টাকিম আসলে হরিণ জাতীয় প্রাণী যা কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়।। ২৫০০ থেকে ৪০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে এদের বাস। এই এলাকাতে বাস করে ৪৫ প্রজাতির মথ আর প্রজাপতি, ছ রকমের বিষাক্ত সাপ আর নানান নির্বিষ সাপ।

এই এলাকায় সবমিলিয়ে ১৯৫টা প্রজাতির পাখি দেখা যায়। তাদের মধ্যে স্ক্যাটার্স মোনাল এবং ব্লিদস্ ট্র্যাগোপ্যান শুধুমাত্র পূর্ব হিমালয়ের একটা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না এদের। আবার সারা পৃথিবীতেই নিতান্ত অল্প সংখ্যায় যে পেল ক্যাপড পিজিয়ন পাওয়া যায় তার কিছু এই অঞ্চলেও পাওয়া যায়। এই এলাকায় চোখে পড়ার মতো অন্যান্য পাখির প্রজাতি হলো টেমিন্কস্ ট্র্যাগোপ্যান, নেপাল কুটিয়া, পেল ব্লু ফ্লাই ক্যাচার, নানা ধরণের ছাতারে আর পিপিট। এই এলাকার সব থেকে নিচু বনে বাস করে বাঘ। তবে চিতার বাস নিরক্ষীয় থেকে ট্রিলাইন আবহাওয়ায়, ক্লাউডেড লেপার্ডের বাস আর্দ্র বনে মাঝারি উচ্চতা থেকে স্নোলাইন আবহাওয়ার মধ্যে,

স্নো লেপার্ডের বাস ট্রিলাইনের ওপরে তুন্দ্রা ঘাসের এলাকায় যেখানে ব্লু শিপ থাকে। এই অঞ্চলের প্রাণীদের মধ্যে রেড পান্ডা পাওয়া যায় ভারতের সীমা পেরিয়ে চিনেও। এই এলাকার অনেক উচ্চতার বনে থাকে মাস্‌ক ডিয়ার। তাছাড়াও এই রাজ্যের বনে থাকে ব্ল্যাক বিয়ার ও অন্য নানা প্রজাতির ভালুক, ভোঁদর, শিয়াল। আর পাওয়া যায় অসমীয়া বাঁদর, কাঠবেড়ালি, ভামও।

বনের ডায়েরি

জোড়া বাঘের মুখে

রিশলু লাহিড়ী

(মধ্যভারতের বাসিন্দা, অভিজ্ঞ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার রিশলু লাহিড়ীর কলমে বাঘের মুখে পড়বার সত্যিগল্প)

ভোর ছটায় বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কের 'তালা' গেট থেকে এন্ট্রি নেবার পর আমাদের জিপসি গাড়িটি মন্থর গতিতে জঙ্গলের প্রায় সমস্ত রুট ঘুরে এখন পার্কের বাইরের দিকের পাথুরে রাস্তায় এসে পড়েছে। জিপে আমার সঙ্গে আছেন গাইড কামতাজি ও ড্রাইভার পিঙ্কু। দুজনেই খুবই অভিজ্ঞ। এঁদের দুজনের সঙ্গে আমি বহু বছর ধরে বন্যপ্রাণী বিশেষত বাঘ নিয়ে অনেক কাজ করেছি ।

এই পার্কটি মধ্য প্রদেশের উমরিয়ার কাছে বিন্ধ্য পর্বত মালার একাংশে ১০৫ বর্গকিমি জুড়ে অবস্থিত। এর চারপাশের বাফার জোন ছড়িয়ে রয়েছে ৪৩৭ বর্গকিমি জুড়ে। অপূর্ব সুন্দর এই জঙ্গলটির ভৌগোলিক রূপটিও বড়ো বিচিত্র। ঘন গাছগাছালির মাঝে মাঝে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সুদূরপ্রসারিত বড়ো বড়ো এলিফ্যান্ট গ্রাস পাহাড়ি হাওয়ায় দুলছে, আবার কোথাও একফালি খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে শাল, সুঁদরি, টিকের গুঁড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট গুহা যেখানে বাঘভালুক বাচ্চা নিয়ে বাসা বাঁধে যত দিন না তাদের শাবকগুলি বড় হচ্ছে। এখানে বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্যও দেখার মত। নানারকম পাখির সাথে সাথে দেখা যায় চিতল, শম্বর, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুওর, লেপার্ড, ভালুক, আর আছে সেই রহস্যময় বাঘ।

পার্কটিকে বেড় দিয়ে যে রাস্তাটিতে এখন আমরা চলছি তার একদিকে ঘন জঙ্গল আর অন্যদিকে পাথরে গড়া ছোটো একটা পাঁচিল। তার ওপারে বনবাসীদের এলাকা। দেখা যায় তাদের খেত খামার ও দূরে দূরে ছড়ানোছিটানো কুঁড়েঘরগুলি।

মে মাস। সকাল নটা বাজে। রোদ্দুরের তেজ গা পুড়িয়ে দিচ্ছে। শুকনো গরম হাওয়া বইছে থেকে থেকে। দুপুর নাগাদ লু এর আরো বাড়বে বই কমবে না। আমি বা আমার মত আরও যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ওপর কাজ করছেন বা জঙ্গল সম্বন্ধিত তথ্যচিত্র তৈরি করেন অথবা ভাল ছবি তুলতে চান তাঁরা সবাই গরমকালটাই বেছে নেন এইসব কাজের জন্য। এই সময়ে পাহাড়ের ওপরের জলাশয়গুলির বেশিরভাগই শুকিয়ে যায় এবং পশু পাখিরা জলের খোঁজে নিচে নেমে আসে। তাছাড়া টুরিস্টদের ভিড়ও কম হয়ে যায়। অথচ জঙ্গলের দুর্নিবার আকর্ষণ শীত গ্রীষ্ম সবই ভুলিয়ে দেয়!

চোখ কান সজাগ রেখে আমরা চলছি। পার্কের বাইরের সীমানার রাস্তাটিতে গতকাল বিকেলে বনকর্মীরা দুটি বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে। ছাপগুলো তখনও তাজা ছিল। মাঝে একবার দূরে একটা লঙ্গুরের অ্যালার্ম কল শোনা গিয়েছিল। বাঘ বা লেপার্ড দেখলে গাছের ওপর থেকে লঙ্গুর বা বাঁদররা খকখক করে সাবধানবাণী বা অ্যালার্ম কল দেয়। কিন্তু সেদিন কয়েকবারমাত্র কল দেবার পর সব চুপচাপ, থমথমে।

আধঘণ্টাটাক সেখানে অপেক্ষা করে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। আমাদের দৃষ্টি রাস্তার ওপর। ড্রাইভার পিঙ্কু হঠাৎ জিপটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে আঙুল তুলে ইশারা করল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটি বাঘ পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘদুটিকে ভাল করে দেখে বোঝা গেল তারা দুজনেই ফুলগ্রোন কাব। তারা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে পাঁচিলের ওপারে খেলায় মশগুল বাচ্চাগুলিকে। শরীর টানটান যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একটু অবাকই হয়ে গেলাম। মানুষ তো বাঘের স্বাভাবিক শিকার নয়! ছবি তুলব বলে ক্যামেরা তুলতে যাচ্ছি, গাইড কামতাজি হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘‘একেবারে নড়বেন না, আওয়াজ করবেন না এরা দুই ভাই আদমখোর।’’

আদমখোর (মানুষখেকো) শব্দটা শুনে গোটা শরীরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। অনেক বাঘ দেখেছি, কিন্তু আদমখোর দেখা এই প্রথম। গলা শুকিয়ে কাঠ, প্রতিটা রোমকূপ ভয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। অস্ত্র বলতে একটা লাঠিও নেই সঙ্গে। চারদিক খোলা জিপে আমরা খুব সহজ লভ্য শিকার ওদের জন্যে। একবার পিছন ফিরে দেখলেই হল। ততক্ষণে আর একটা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে। তাদেরকেও ইশারা ইঙ্গিতে এই খবরটা দেয়া হল।

এক একটা মিনিট কাটছে যেন এক একটা যুগ। আমরা না সামনে এগোতে পারছি না পিছোতে। চিন্তা করার ক্ষমতাটাও লোপ পেয়ে গেছে। এত বছর ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাজ করেছি, ছবি তুলেছি, কিন্তু আদমখোর এর দেখা এই প্রথম। তাছাড়া পার্ক কর্তৃপক্ষও এ সম্বন্ধে কোন নোটিশ দেন নি । সাধারণত কোন বাঘ ম্যান ইটার হয়ে গেলে পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয় যতদিন না বাঘটির কোন ব্যবস্থা করা যায় ।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না । নিশ্চয় বেশিক্ষণ নয় , কারণ বাঘ দুটি তখনও সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ আমাদের পাশের জিপের ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে লাল ধুলোর ঝড় তুলে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল। মুহূর্তে পিঙ্কুও গাড়ি ঘুরিয়ে সেই রাস্তাতেই চলল। পিছন ফিরে একবার লাল ধুলোর ফাঁকে দেখতে পেলাম বাঘ দুটি আমাদের পিছনে দৌড়চ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব দ্রুত কমছে তখন।

খানিক বাদেও, বাঘ ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল না দেখে সাহস করে পিছনপানে তাকিয়ে তাদের আর দেখতে পেলাম না। আসলে বাঘেরা একটানা পুরোদমে বেশিক্ষণ দৌড়তে পারে না বলে এ যাত্রা আমরা ভগবানের কৃপায় বেঁচে গেলাম।

গেট এ পৌঁছতে আমাদের অবস্থা দেখে রক্ষীরা ছুটে এসে জল খাইয়ে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে । একটু ধাতস্থ হবার পর ওদের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলাম । সঙ্গে সঙ্গে পার্ক অথরিটিদের কাছে খবর চলে গেল । তাঁরা এসে আমাদের কাছে সবিস্তারে সব শুনলেন এবং সবাইকার সঙ্গে একটা মিটিং নিয়ে পার্কটিকে কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখা মনস্থ করলেন । আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, দুটো বাঘ ম্যান ইটার হয়ে গেছে জেনেও তাঁরা টুরিস্ট এবং জন সাধারণকে এত বড় বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করেন নি এবং পার্কটি বন্ধ রাখার কোন আদেশ দেন নি কেন? আজ আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি । কিছু হয়ে গেলে তার দায়িত্ব কে নিতেন? তাতে তাঁরা জানালেন যে, বাঘ দুটি একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে হত্যা করেছে ঠিকই, কিন্তু দুটো হত্যাই কোর এরিয়াতে। এরা দুজন হয়তো কাঠ কাটতে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল ও ওই দুটি বাঘ সেখানে হাজির ছিল। খাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা ওদেরকে মারেনি। কারণ প্রথম শিকারকে মারার পর তাকে ছুঁয়েও দেখেনি ও দ্বিতীয়টিকে আংশিকভাবে খেয়েছে। কিন্তু একবার যখন নরমাংসের স্বাদ নিয়েছে এরা, তখন আর রিস্ক নেওয়া হবে না। এদেরকে ভুপালে এই রকম বাঘেদের রক্ষণাগারে পাঠাতে হবে । বোঝা গেল এই দুটি ব্যাঘ্রশাবক ভুপালের বাঘেদের জেলখানায় গোটা জীবন বন্দি থাকবে বিনা দোষে।

ফটোগ্রাফিঃ লেখক

বন্দি রাজপুত্র

রেবন্ত গোস্বামী

ভোর না হতেই দু'একটি কাক যেই উঠেছে ডেকে
রাজপুত্র শয্যা ছেড়ে উঠল ঘুমের থেকে।
রূপকথার এক স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন যেতে ভেঙে
বাইরে এসে দেখল কুমার পুবটা গেছে রেঙে।
ডাগর চোখে দেখল চেয়ে সোনার কাঠিটিকে
বদলে যেটা রূপ পেয়েছে মরচে পড়া শিকে।
ভোরের হাওয়ায় পড়ল মনে রাজারানির কথা-
রাজকুমারী বোনটি যে তার হারাল আজ কোথা!
রাজা যেতেন দোয়েল ডাকা খোলা হাওয়ার ভোরে
রাজকার্যে- সোনালি রঙ পাতার মুকুট পরে।
পান্নারঙা ঢেউগুলো সব যখন হবে সোনা,
লক্ষ্মীমায়ের পায়ের নূপুর গেলেই যাবে শোনা।
ছোট্টো কুঁড়ের রাজবাড়িতে ছড়িয়ে দিতেন রানি
সোনায় মোড়া নূপুরগুলি সারা উঠোনখানি।
রাজকুমারী এলোচুলে খাপরা নিয়ে হাতে
এক পা তুলে খেলত নেচে কিরণমালার সাথে।
রাজপুত্র দাওয়ায় বসে বইপত্তর খুলে
গুরুর দেওয়া পাঠগুলো সব পড়ত দুলে দুলে।
রূপকথাময় দিনগুলো সব রইল না আর শেষে-
রাজপুত্র বন্দি যে আজ হট্টমেলার দেশে!
কল্পলোকের শুকসারি নেই, দোয়েল শ্যামাপাখি
তারাও উধাও, হেথায় শুধু কাকের ডাকাডাকি।
কচলে দু'চোখ ছোট্টো হাতে লোহার কাঠি ধরে
রাজপুত্র উনুন থেকে ছাইগুলো বের করে।
প্রাতের ভ্রমণ করার পথে দেখতে পেল লোকে
রাজপুত্র টেবিল মোছে ঘুমজড়ানো চোখে।
গেলাস ধোয়া, জল চড়ানো, হুকুম শোনার খেলা
খদ্দের আর মালিক মিলে খেলায় সারা বে...
এমনি করে বন্দিশালার হাজার কাজের ভিড়ে
স্বপ্নপুরীর স্বপ্নগুলি হারায় ধীরে ধীরে।
তবুও যখন ঘুমপরীটি আসবে আবার রাতে
স্বপ্নখানি উঠবে ফুটে তার দু নয়নপাতে।

ইচ্ছেগানের সুরে

দেবাশিস বসু

ঢ্যাম্- কুড়া- কুড়্ ঢ্যাম্- কুড়া- কুড়্ কাঁই না- না- না বাজছে
খোকাখুকুর খুশির দুপুর নানান রঙে সাজছে
উলুক সুলুক গাঁয়ের মুলুক দোয়েল সুখে গাইছে
এতোল বেতোল গরম- শেতল চাতক বারি চাইছে
ফটিক জলে নাইছে....
শিউলি ঝরার সময় হল হালকা হাওয়া দিচ্ছে
মনের মধ্যে রংবেরঙের ইচ্ছে...ইচ্ছে...ইচ্ছে...
ভোমরা কেন গোমড়ামুখে, পেরজাপতি বলছে
নীল ঝিলমিল মেঘের খোকা কোথায় যেন চলছে
আকাশজুড়ে গানের সুরে প্রাণের ছবি আঁকছে
দিন ফুরালে চাঁদের বুড়ি মেঘের ভেলায় ডাকছে
খাতায় লিখে রাখছে...
কাশের রাশে সবুজ ঘাসে নতুন খবর নিচ্ছে
উথাল পাথাল চিত্ত চাতাল ইচ্ছে...ইচ্ছে...ইচ্ছে
বইয়ের পড়া থাক তোলা আজ পুজোর ছুটির বন্ধে
মা ডেকে কন লক্ষ্মীসোনা, এবার পড়ায় মন দে
ইলিক ঝিলিক পদ্মপুকুর জল থইথই হাসছে
শুনিয়ে বাণী শরৎরানি সবার কাছে আসছে
আলোর ঝালর ভাসছে...
এমন দিনে ভাব- ভাব- ভাব, নেই তো ঝগড়া বিচ্ছেদ
গানের সুরে হৃদয়পুরে ইচ্ছে...ইচ্ছে...ইচ্ছে

সূর্যমুখীর গল্প

রাকা দাশগুপ্ত

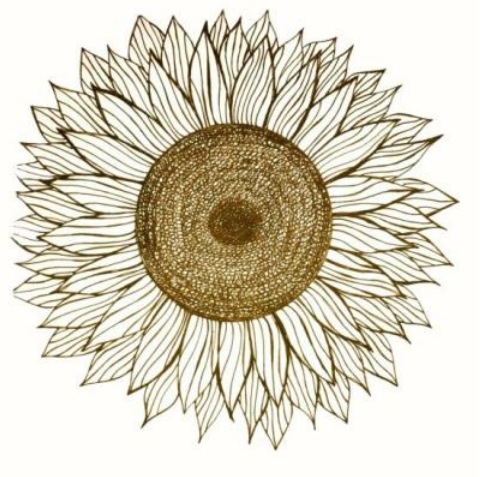

একটা ছোট ফুল
ঘুম ভেঙে সে যেই উঠেছে, অমনি হুলুস্থুল!
রোদ দিয়ে দাঁত ব্রাশ,
মধুর ওপর শিশির ঢেলে দিব্যি প্রাতঃরাশ।
তারপরে হই চই
“এবার আমায় সাজাও। আমার হলদে রিবন কই?”

হলদে রিবন খুঁজতে গিয়ে বাতাস গেল দূর
সে এক অচিনপুর।
সেইখানে সব পুঁতির নদী, চুমকি গাঁথা চর,
সুতোয় বোনা ঘর।
রংবেরং- এর নকশি কাঁথায় বিছিয়ে থাকা মাঠ
ইচ্ছেদীঘির ঘাট।

তার পাশে এক বাড়ি
আলোর সঙ্গে ভাব ছিল তার, মেঘের সাথে আড়ি।
জানলা নিপাট খোলা,
সকাল বিকেল দস্যি হাওয়ার উড়ন্ত চৌদোলা।
নীলচে রঙের ছাদ
টবের গাছে হলদে রিবন, তাদের কী আহ্লাদ!

একটা রিবন উড়িয়ে নিয়ে বাতাস এল ফিরে,
গাছগাছালির ভিড়ে।
হলদে রিবন পরিয়ে দিল ছোট্ট ফুলের চুলে।
ফুর্তিতে খুব দুলে
উঠল তখন ফুলকুমারী, রোদের দিকে চেয়ে
ঝলমলে গান গেয়ে।

সূর্যমুখীর ওড়না
সেদিন থেকেই হলদে রঙের। রিবনখানা ওর না?

মা দুর্গা

প্রকল্প ভট্টাচার্য

পুজোর ক'দিন দারুণ মজা! শুধুই খেলাধুলো,
নাচ গান আর আড্ডা (ভুলেও ছুঁচ্ছিনা বইগুলো!)
হরেক রকম নতুন পোশাক, নতুন আলো, হাসি,
পুজোর ক'দিন এমনভাবেই থাকতে ভালবাসি!

এবার পুজোয় মন দিয়েছি ঠাকুর দেখার দিকে,
দুর্গাঠাকুর কেমন করে মারছে অসুরটিকে!
সিঙ্গি কেমন ঘাড় মটকায় মোষ বেচারার, মাগো!
মায়ের হাতে অস্ত্র কতো, মুখে কেমন রাগও!

সারাটা দিন এই কথাটাই ঘুরছে কেবল মনে,
মা যদি হয় দয়াময়ী, মারছে কী কারণে!

আমার মা তো আদর করে, যা চাই তা দেয় হাতে,
দুর্গা মায়ের এ রূপ কেন অসুর ছেলের সাথে!

রাতের বেলা স্বপ্নে শুনি দুর্গা মায়ের গলা,
"অসুর নিধন সত্যি তো নয়, প্রতীকে সব বলা!
পুত্র হলে দুষ্টু ভীষণ, অবাধ্য সব কাজে,
মা- ই তাকে করবে শাসন দুর্গা মায়ের সাজে।

ঐ অসুরই বদলে গিয়ে আবার ভালো হ'লে,
মা- ই তাকে আদর করে আঁকড়ে নেবে কোলে!"
আমরা হলাম লক্ষ্মী ছেলে, শাস্তি পাব কেন?
তোমরা মা- কে ভক্তি কোরো, ভয় কোরো না যেন!!

কালবোশেখি

মনসুর আজিজ

কালবোশেখি
আসবে সে কি
ধুলির ঝড়ে
আকাশ নড়ে
গাছগাছালি
ভাঙবে সে কি
কালবোশেখি।

রুদ্র মাতম
চলছে খতম
কোরান, আজান
দাও তো বাজান
চারিদিকে
ঝড়ের ঢেঁকি
লণ্ডভণ্ড
করছে এ কী
কালবোশেখি।

মেঘের সেনা
দক্ষিণে যায়
কালো পোশাক
দিচ্ছে যে গায়

কুণ্ডলিপাক
টগবগিয়ে
বিজলি আলোয়
ঝলমলিয়ে
গুড়ুম গুড়ুম

দিচ্ছে যে ডাক
সিপাই সেনা
দিচ্ছে যে হাঁক
ঝড়ের নিধন
চলছে রে কি
কালবোশেখি।

কালবোশেখি
চলছে এ কী
গাছের ডালা
ঘরের চালা
সব একাকার
জন মানব
বলছে এ কী

কালবোশেখি

জেলের কথা

গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
(১৯১১-১৯৭১)

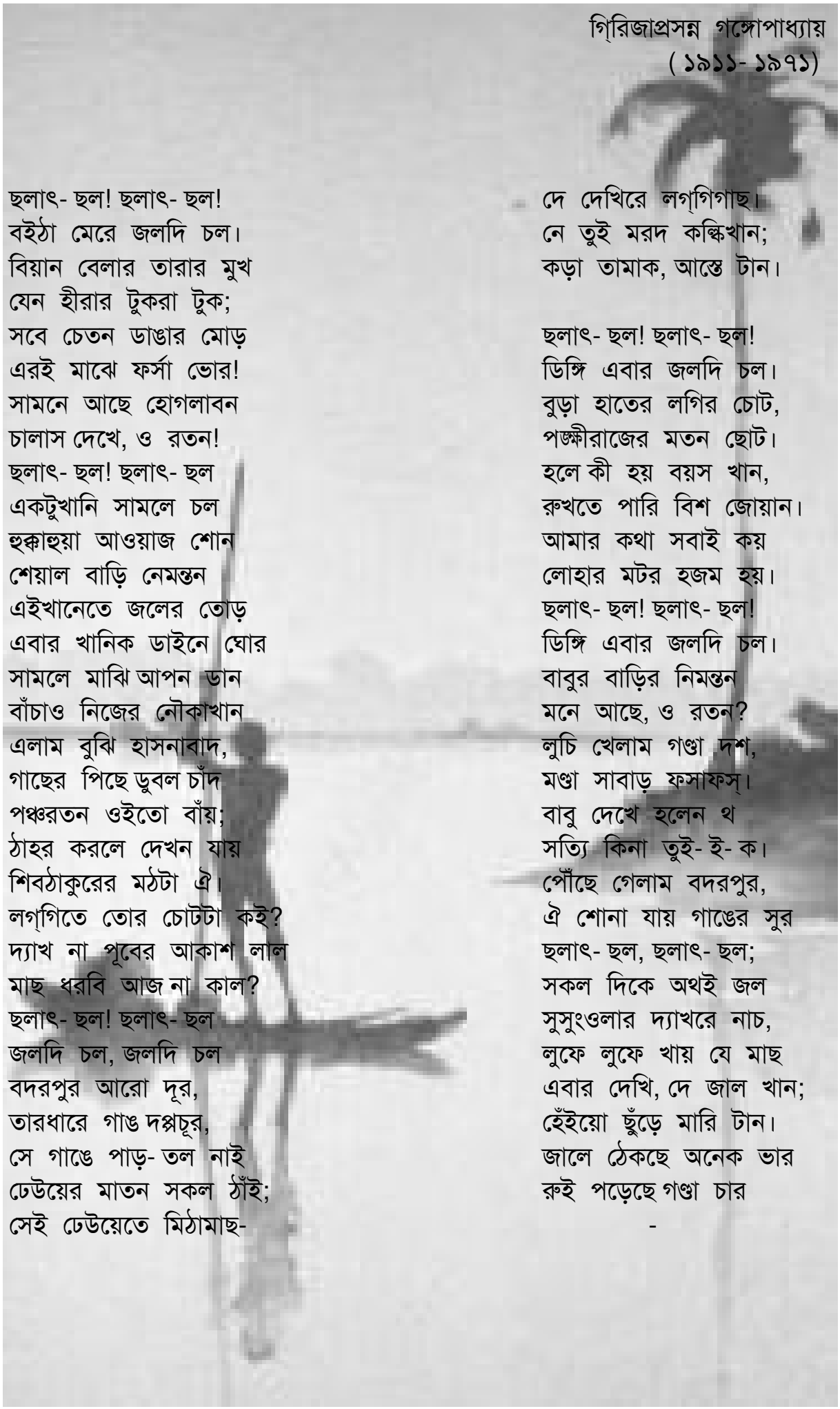

ছলাৎ- ছল! ছলাৎ- ছল!
বইঠা মেরে জলদি চল।
বিয়ান বেলার তারার মুখ
যেন হীরার টুকরা টুক;
সবে চেতন ডাঙার মোড়
এরই মাঝে ফর্সা ভোর!
সামনে আছে হোগলাবন
চালাস দেখে, ও রতন!
ছলাৎ- ছল! ছলাৎ- ছল
একটুখানি সামলে চল
হুক্কাহুয়া আওয়াজ শোন
শেয়াল বাড়ি নেমন্তন
এইখানেতে জলের তোড়
এবার খানিক ডাইনে ঘোর
সামলে মাঝি আপন ডান
বাঁচাও নিজের নৌকাখান
এলাম বুঝি হাসনাবাদ,
গাছের পিছে ডুবল চাঁদ
পঞ্চরতন ওইতো বাঁয়;
ঠাহর করলে দেখন যায়
শিবঠাকুরের মঠটা ঐ।
লগ্‌গিতে তোর চোটটা কই?
দ্যাখ না পূবের আকাশ লাল
মাছ ধরবি আজ না কাল?
ছলাৎ- ছল! ছলাৎ- ছল
জলদি চল, জলদি চল
বদরপুর আরো দূর,
তারধারে গাঙ দপ্পচূর,
সে গাঙে পাড়- তল নাই
ঢেউয়ের মাতন সকল ঠাঁই;
সেই ঢেউয়েতে মিঠামাছ-
দে দেখিরে লগ্‌গিগাছ।
নে তুই মরদ কল্কিখান;
কড়া তামাক, আস্তে টান।

ছলাৎ- ছল! ছলাৎ- ছল!
ডিঙ্গি এবার জলদি চল।
বুড়া হাতের লগির চোট,
পক্ষীরাজের মতন ছোট।
হলে কী হয় বয়স খান,
রুখতে পারি বিশ জোয়ান।
আমার কথা সবাই কয়
লোহার মটর হজম হয়।
ছলাৎ- ছল! ছলাৎ- ছল!
ডিঙ্গি এবার জলদি চল।
বাবুর বাড়ির নিমন্তন
মনে আছে, ও রতন?
লুচি খেলাম গণ্ডা দশ,
মণ্ডা সাবাড় ফসাফস্।
বাবু দেখে হলেন থ
সত্যি কিনা তুই- ই- ক।
পৌঁছে গেলাম বদরপুর,
ঐ শোনা যায় গাঙের সুর
ছলাৎ- ছল, ছলাৎ- ছল;
সকল দিকে অথই জল
সুসুংওলার দ্যাখরে নাচ,
লুফে লুফে খায় যে মাছ
এবার দেখি, দে জাল খান;
হেঁইয়ো ছুঁড়ে মারি টান।
জালে ঠেকছে অনেক ভার
রুই পড়েছে গণ্ডা চার
-

বৃষ্টি এলো

রুচিস্মিতা ঘোষ

বৃষ্টি এলো গুনগুনিয়ে
ঘুমপাড়ানি গানের মত
বৃষ্টি এলো বন- পাহাড়ে
জলপরীদের নাচের মত

ঝুম- ঝুম- ঝুম ঝুমুর ঝুমুর
বাজছে কেমন মধুর সুরে
পাখিরা সব ভিজিয়ে ডানা
যাচ্ছে উড়ে কোন সুদূরে

বৃষ্টি এবার ঝমঝমিয়ে
লক্ষ ফোঁটা ধারার মত
বৃষ্টি এবার ঢাক বাজিয়ে
দুগ্গা পুজোর রবের মত

দম- দমাদম দম- দমাদম
বাজছে কেমন বেদম স্বরে
কেউ পথে নেই কেউ ঘাটে নেই
সবাই বসে আছেই ঘরে

গুনগুনানি ঝমঝমানি
গানের সুরে মাতিয়ে রেখে
বাদল মেঘে হাত বাড়িয়ে
বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো।

দেশের বাড়ি

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

কেমন আছিস? হোয়াটস আপ ডুড? আমি অলওয়েজ ফ্যাব
এবার পুজোয় কী কিনলি? আইফোন না ট্যাব?
আমার কিন্তু দুটোই আছে, দুটোই ভীষণ কষ্টলি
জানিস আমার সমস্তটাই ব্র্যান্ডেড হয় মোস্টলি
শুনলাম তুই ঘুরতে যাচ্ছিস? দার্জিলিং না পুরী?
আমরা কিন্তু পুজোর সময় ইউরোপটাই ঘুরি
কোলকাতাতে বড্ড ক্রাউড, কোথাও নেইকো প্লেস
প্লেনে কিন্তু আমার ক্লাসটা অলওয়েজ বিজনেস
সে যাই হোক তোর কথা বল, শুনেছি আমি ঠিকই
পুজোয় নাকি তুই কিনেছিস একগাদা বার্ষিকী?
ঠিক শুনেছিস, পড়তে আমার ভাল লাগে যে ভারি
এবার পুজোয় যাচ্ছি আমি আমার দেশের বাড়ি
দেশের বাড়ি? টেল মি ডিয়ার, হোআটস দ্যাট বুলশিট?
মাম্মি বলে তোর বন্ধুর মাথায় ভরা ছিট!
দেশ মানে তো ভীষণ ডার্টি ন্যাস্টি কোনো গ্রাম
সেইখানেতে রাখলি শেষে হলিডে প্রোগ্রাম?
যাচ্ছি আমি কাছাকাছি নেইকো তাড়াতাড়ি
লালমাটির রাস্তা ধরে গ্রামটি যে তালসারি
সেথায় আছে মনসুর খাঁ সপ্তডিঙার মাঝি
আমার যত বায়না আছে সবটাতে সে রাজি
আমায় ডেকে বলল সে যে বুঝলে খোকাবাবু
নাহয় আমি এইবারেতে জ্বরের ঘোরে কাবু
দিচ্ছি কথা হাতটি রেখে তোমার মাথার পরে
আসছে বছর নিয়ে যাব জিন পরীদের ঘরে
ওই যে হোথায় ওই পারে ওই গহীন বনের ধারে
চুপিচুপি রাত বিরেতে ব্যাঙ্গমী ডিম পাড়ে
আমি হব রাজামশাই মনসুর খাঁ প্রজা
সত্যি মিথ্যে যাই হোক না দারুণ হবে মজা
বলছি তোকে বিশ্বাস কর নয়কো বাড়াবাড়ি
ওইখানেতে আজও চলে হাজার গরুর গাড়ি
ক্যাচর কোচর ক্যাচর কোচর বন্ধ হল কান
সে গাড়িরই একটি চালায় পল্টু গাড়োয়ান
পল্টু আবার দিনের শেষে জ্যোৎ চরাচরে
ঢোল বাজিয়ে একলা বসে আগমনী গান ধরে
সেই গানেরই এমন জাদু বলব কী ভাই তোকে
পশু পাখি বশ মেনে যায় অবাক যে হয় লোকে

ভাবিস নাকো মিছে কথা বলছি কী আর সাধে
মেঘরা এসে আলপনা দেয় মনসুর খাঁর ছাদে
বৃদ্ধ মাঝি সেই মেঘেতেই ডাকের টিকিট পুরে
শরতকালে ছড়িয়ে যে দেয় সারা আকাশ জুড়ে
এসব যাতা কী বলছিস? ভীষণ রকম ফানি
আমি তো ভাই টুর বলতে ইউরোপটাই জানি
ওখানেতে ঝকঝকে সব চকচকে পথঘাট
বাংলা টাংলা বলতে হয়না ওসব তো আনস্মার্ট
ইউরোপ কী অনেকটা দূর? অনেকটা পথ যাবি?
পুজোর সময় ওই দেশে কী কাশফুল বন পাবি?
তোর ঠাম্মি সকাল বেলায় শিউলি মালা গাঁথে
ওকেও নিবি ইউরোপে তে? যাচ্ছে নাকি সাথে?
কী যে বলিস আবোলতাবোল একটু তো হ স্টেডি
ওসব প্লেসে করবেটা কী ক্যাডাভ্যারাস লেডি!
জানিস রে ভাই গা ছমছম আমার দেশের গ্রামে
সন্ধে হওয়ার আগেই বুঝি ঝুপ করে রাত নামে
বালিশখানা শক্ত হাতে আঁকড়ে রাখি ধরে
ঠাম্মি আমায় গপ্পো শোনায় ফিসফিসানো স্বরে
পল্টু বলে ওই যে হোথায় ঘোষবাবুদের জলা
সেথায় আছে স্কন্ধকাটা মুন্ডু ছাড়া গলা
আরও আছে দিঘীর নিচে জলপরীদের সাঁকো
পুজোর ছুটি কখন ফুরোয় বুঝতে পারি নাকো
বন্ধু আসে মুখটি মলিন চোখের কোণে জল
মাম্মি বলেন, অ্যাটলিস্ট তুই ক্লাসটা মেনে চল
হাবিজাবি ছেলে ওসব ওদের সঙ্গে মিশে
কেরিয়ারটা জলাঞ্জলি দিবি কী তুই শেষে?
ছেলে বলে মাম্মি আমার তোমার সঙ্গে আড়ি!
আমার কেন নেইকো অমন ছোট্ট দেশের বাড়ি!

একটি পাখি

মঈন মুরসালিন

একটি পাখি গাছের ডালে
ডাকছিল
মাঝে মাঝেই রোদের আলো
মাখছিল
খোকনসোনা সেই ছবিটা
আঁকছিল।
হঠাৎ আবার এদিক সেদিক
উড়ছিল
খোকনসোনার চারদিকেতে
ঘুরছিল
ওই পাখিটির কণ্ঠে মধুর
সুর ছিল।

পুজো

আশুতোষ ভট্টাচার্য

মাউসে যেই ক্লিক করেছি
মেঘের ভেলা আকাশ জুড়ে
কাশফুল সব দোলায় মাথা
নদীর পাড়ে বাঁশির সুরে।।
শিউলি ফুলের গন্ধ পেলাম
শিশির ভেজা সাতসকালে
আবার এলো দুর্গাপুজো
ছেলেবেলা ঢাকের তালে।।
কাছে দূরের বন্ধু স্বজন
মায়ের কাছে আসুক ফিরে
আনন্দ দিন, দেবীর বোধন
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ভিড়ে।।

বুড়ো ও বালিশ গাছ

মীম নোশিন নাওয়াল খান

একটা আছে নরম বালিশ, তুলতুলে তার তুলো
মাথার নিচে দিয়ে তাকে ঘুমোয় মানুষগুলো।
“গুলো”তো নয় একটা মানুষ, লোকটা ভীষণ বুড়ো,
স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুমোয় একখানা দিন পুরো।
অ্যাত্তোটুকু খায় তুলো সে তো ভাঙলে পরে ঘুম,
খাওয়ার পরে আবার তেড়ে নাক ডাকে গুম গুম!
শব্দ শুনে প্রায় প্রতিদিন একটা করে কাক,
সটান ছোটে হাসপাতালে বাধিয়ে হার্ট অ্যাটাক।
বুড়ো একদিন তুলো খেতে পেল একটা বিচি
অমনি দূরে ছুঁড়ল তাকে, বলল, এমা! ছি ছি!
বীজটা থেকে পরের দিনই গাছ বেরুল শেষে,
‘শুভ সকাল’- ফুলগুলো তার বলল মিষ্টি হেসে।
বিকেল বেলায় বালিশ গাছে ধরলো বালিশ এক,
সাদা তুলোর নরম বালিশ, কী সুন্দর, দ্যাখ!
বুড়োর তখন খিদে পেলে বালিশ গাছের থেকে,
আনতো ছিঁড়ে একটা বালিশ মিষ্টি- পাকা দেখে।
একটু করে ছিঁড়ত তুলো পুরত সুখে মুখে,
চক্ষু বুঁজে চুষত তুলো থাকতো বুড়ো সুখে।

রাত

মহিম মাহফুজ

মশক মশায় ভাবছে কদিন ধরে
চিন্তাটা খুব মাথার ভেতর ঘোরে
দিন তো বুঝি- সূর্য যখন থাকে,
কিন্তু আবার রাত্রি বলে কাকে?
পেঁচা বলে, আমি যখন ডাকি।
বাদুড় বলে, এতই সহজ নাকি?
আমি যখন না দেখে পথ চলি
এসো না ভাই রাত্রি তাকেই বলি।
ওমনি তখন আসলো তেড়ে ঝিঁঝিঁ
বলে, আরে হতচ্ছাড়া পাজি!
অন্ধ দু'চোখ তবু কেমন করে,
রাত্রি দেখো দৃষ্টি ফেলে দূরে?
রাত্রি তোমার চোখের ভেতর আছে
তাই জোছনা তোমার কাছে মিছে।
রাত্রি মানেই অন্ধকারের ভয়?
জোছনা হলে তেমন কিছুই নয়।
দিনের শেষে চাঁদের আলোর বান
তারই সাথে মিষ্টি আমার গান
এমন মধুর সময়টাকে তবে,
কেমন করে রাত্রি বলা হবে?
বললো মশা, ঝিঁঝিঁ মহাশয়!
বলুন তবে রাত্রি কখন হয়?
খানিক পরে বললো ঝিঁঝিঁ পোকা
বুঝবি না তুই মূর্খ বোকাসোকা!
রাত্রি নিয়ে গবেষণা রাখ
সময়টাকে সরলরেখায় আঁক।

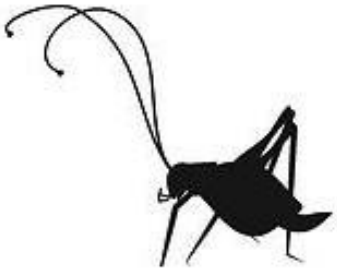

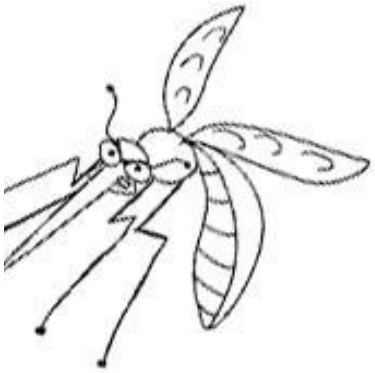

লুচি কেস

অমিতাভ প্রামাণিক

বালুচিস্তানে লুচির বাগানে একদিন করে হামলা
লুচি তাজা তাজা ও বেগুনভাজা সাঁটিয়েছি কয় গামলা।
পেটভরে খেয়ে হাতটাত চেটে
আর গোটাকয় ভরে দু পকেটে
বাড়ি ফিরে শুনি, ক্রুদ্ধ- বেগুনি, কে করে দিয়েছে মামলা।
আদালত থেকে বলে গেল হেঁকে, রুজু হয়ে গেল নোটিশও।
ব্যাটাদের রুচি নেই, যেন লুচি খেয়েছি লক্ষ- কোটি শো!
কিন্তু এরা তো কথা শুনছে না।
আদালত, সেও অজানা- অচেনা।
দিনক্ষণ দেখে শুনানির শুরু, উকিল চড়ালো শামলা।
জাজখানা ভারি খোট্টা- বিহারী, তবে মোটে কুৎসিৎ না।
বলে সব শুনে, চোরি কিয়া তুনে? লুচি? কব? কিঁউ? কিৎনা?
প্ল্যানমতো বলি, জজসাব, জানো,
লুচি কোথা? নেই ময়দা, ময়ানও।
ও তো পুরি, যদি লুচি বলো, তবে আমি সরকারী আমলা।
লুচির মতো না ছিলো না দ্যোতনা; না টেস্টে, নয় সাইজে।
যারা বড়ো লোভী, রাধাবল্লভী খায়, পুরাণের রায় যে!
আরো বড়ো যারা, মা বলে, খা তোরা
ছোলে দিয়ে, তারা হচ্ছে বাটোরা।
ছোট ছোটগুলো ফুচকা, লুচি না। জাজ ভাবে, ঠ্যালা সামলা!
বর্ণনা দিতে জাজ ইঙ্গিতে থাপ্পড় মেরে জঙ্ঘায়
বলে, ওহে বাদী, এই খাদ্যাদি পড়ে না লুচির সংজ্ঞায়।
আমি ভাবি, তবে ডিসমিস কেস।
জাজ তার রায় করলেন পেশ;
বললেন, বেটা, ঘর যা, বাপকো পুছকে জরা সা দাম লা।

প্রথম ধাঁধাঃ

এই ছবিটা যদি একটা ধাঁধার উত্তর হয় তাহলে ধাঁধাটা কী হবে বল?

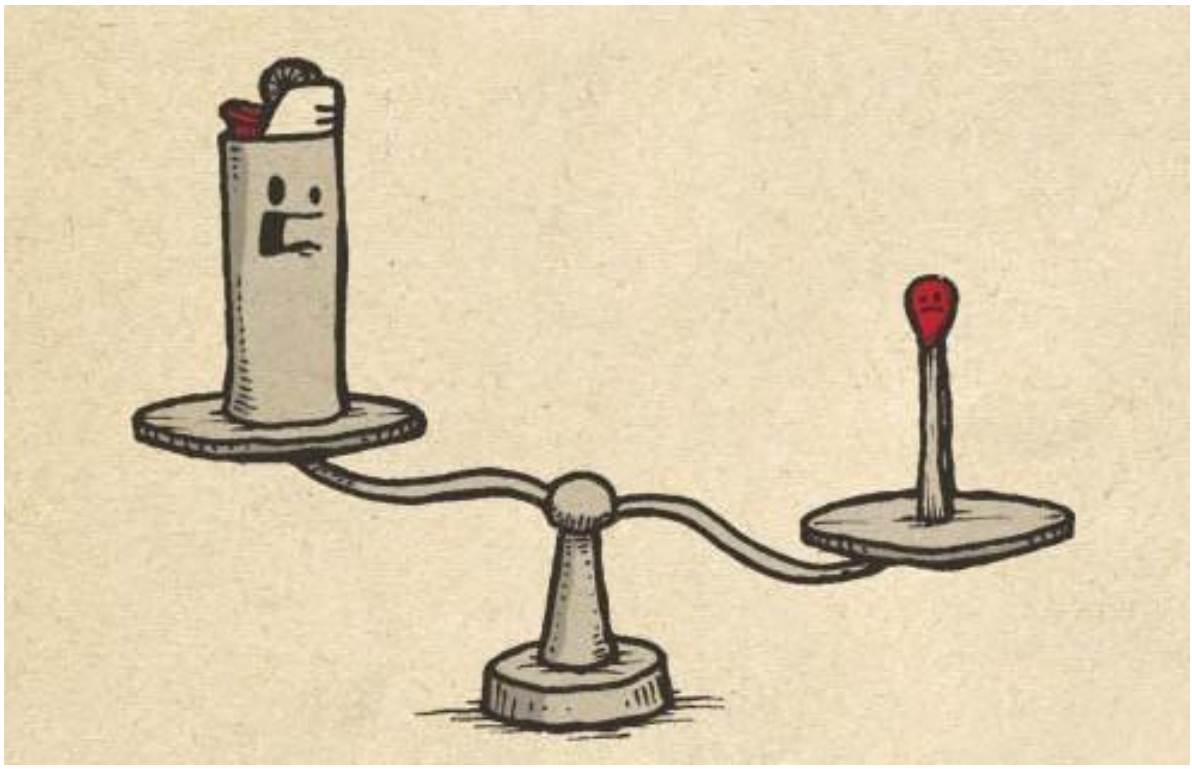

দ্বিতীয় ধাঁধা

আমায় দেখতে চাইবি যখন দেখতে পাবি না। যখন দেখবি তখন আর কিছু দেখতে পাবি না। প্রায়শই মিথ্যে বলি, তবু কখনো কখনো সত্যিও বলি। ডানা নেই তো কী হয়েছে, আমি চাইলে তুই উড়তে পারবি ঠিক।

তৃতীয় ধাঁধাঃ

নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটা সত্যি?

১। এই বাক্যগুলোর মধ্যে মিথ্যে বাক্যের সংখ্যা এক
২। এই বাক্যগুলোর মধ্যে মিথ্যে বাক্যের সংখ্যা দুই
৩। এই বাক্যগুলোর মধ্যে মিথ্যে বাক্যের সংখ্যা তিন
৪। এই বাক্যগুলোর মধ্যে মিথ্যে বাক্যের সংখ্যা চার

চতুর্থ ধাঁধা

গতবার সপ্তমী পুজোর সকালবেলার ঘটনা। পুজো করতে বসে দুধ কম পড়েছে। ঠাকুরমশাই মঞ্চ থেকে বেজায় চিৎকার করছেন। দেখে আমি বাঘাকে নিয়ে একটা ঘটি হাতে পাড়ার এক গয়লার বাড়ি গিয়ে বললাম, কাকা এক সের দুধ দাও দেখি। কাকা সবে তখন দুটো গাই দুয়ে উঠেছে। বালতি ভর্তি দুধ। তা থেকে এক সের দুধ মাপতে গিয়ে চিত্তির। দেখা গেল, দুটো পাত্র আছে সামনে। একটা তিনসেরি আর একটা পাঁচসেরি। দেখে বাঘা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওই দিয়েই ঠিক এক সের দুধ মেপে নিল। কীভাবে হল?

কুইজ

টিভিতে কার্টুন দেখ নাকি? সে নিয়ে বাড়িতে গন্ডগোল হয় নাকি?

তা এস দেখা যাক কেমন কার্টুন দেখ তুমি।

১। অগি কোন ধরণের প্রাণী?
২। অগির তিন আরশোলা বন্ধুর নাম কী কী?
৩। জ্যাক অগির কে হয়?
৪। বব কে?
৫। অগির বোনের নাম কী?
৬। সবচেয়ে লম্বা আরশোলার নাম কী?
৭। অগির নাক কী রঙের?
৮। অগি নামটা কার নাম থেকে নেয়া?
৯। পাশের বাড়ির সাদা সুন্দরী বেড়ালটার নাম কী?
১০। সুন্দরী বেড়ালের বাড়ির আরশোলানির নাম কী?

জানো কী

এইগুলো জোগাড় হয়েছে একটা ফেসবুকের পোস্ট থেকে

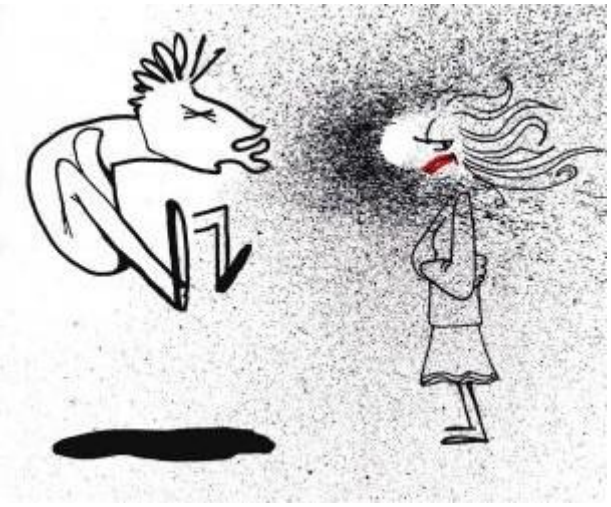

১। চোখ খোলা রেখে হাঁচি দেয়া যায় না আর হাঁচি দেবার সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য হৃৎপিন্ড থেমে যায়।

২। ফুটবল খেলার সময় একেকজন খেলোয়াড় সাধারণত নব্বই মিনিটের প্রতি খেলায় ৭ মাইল অবধি দৌড়োয়।

৩। প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২ হাজার!

৪। যখন আমরা কোনো কিছু ছুঁই, তখন ছোঁবার অনুভূতিটা ঘণ্টায় ১২৪ মাইল বেগে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

৫। ডান পাশের ফুসফুস বাঁপাশের চেয়ে বেশি বাতাস গ্রহণ করে।

৬। শরীরের পেছন দিক দিয়েও নিঃশ্বাস নিতে পারে কচ্ছপ।

৭। উইন্ডোজ এর আবিষ্কর্তা, কিন্তু মজার ব্যাপার হল, বিল গেটসের বাড়ির ডিজাইন কিন্তু করা হয়েছে উইন্ডোজ ব্যবহার না করা ম্যাকিনটস কম্পিউটার ব্যবহার করে।

৮। পোকাখেকো বাজপাখির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। আধামাইল দূর থেকেও একটা ফড়িংকে ঠিক ঠিক শনাক্ত করতে পারে।

৯।প্রাচীনকালে রোমান সৈন্যরা এক ধরনের বিশেষ পোশাক পরত। এখন সেটা সাহেবদের দেশে মেয়েদের পোশাক। পোশাকটার নাম স্কার্ট।

১০। একটা বোয়িং বিমানে ৪০০ -৪৭৪লাখ যন্ত্রাংশ আছে।

১১। বড় আকারের ক্যাঙারু এক লাফে পেরোতে পারে ৩০ ফুট।

১২। পাখি জগতে প্যাঁচাই কেবল চোখের উপরের পাতা পিটপিট করে। বাকি সব পাখি পিটপিট করে চোখের নিচের পাতা।

১৩। মধু খুব দ্রুত হজম হয়। কারণ আগেই একবার মৌমাছিরা হজম করে রাখে।

১৪। বিপদে পড়লে এস ও এস বা আপদকালীন বার্তা পাঠাবার নিয়ম আছে। প্রথম এস ও এস বার্তা পাঠিয়েছিল টাইটানিক।

১৫। প্রত্যেক মহাদেশেই রোম নামের শহর আছে, কেবল অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া।

১৬। আঙুলের মতো একজন মানুষের ঠোঁটের ছাপও অন্য মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৭। মিকি মাউসের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনি ইঁদুরকে মারাত্মক ভয় পেতেন।

১৮। বিড়ালের প্রতিটি কানে আছে ৩২টি করে পেশি।

১৯। সুস্থ দেহে রক্তের গতিবেগ ঘণ্টায় সাত মাইল।

২০। চোখের একটা পলক ফেলতে সময় লাগে শূন্য দশমিক চার সেকেন্ড।

২১। শিশু অবস্থায় কতখানি পথ হামা দিয়েছ জানো? প্রায় দেড় শ কিলোমিটার পথের সমান।

অবিশ্বাস্য

সাইবেরিয়ান অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া
চার থেকে ছলক্ষ বছরের পুরোনো এই ব্যাকটেরিয়ার বাস সাইবেরিয়ার পার্মাফ্রস্টে।এরা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম বাসিন্দা যারা এই এত বছর ধরে বেঁচে রয়েছে।

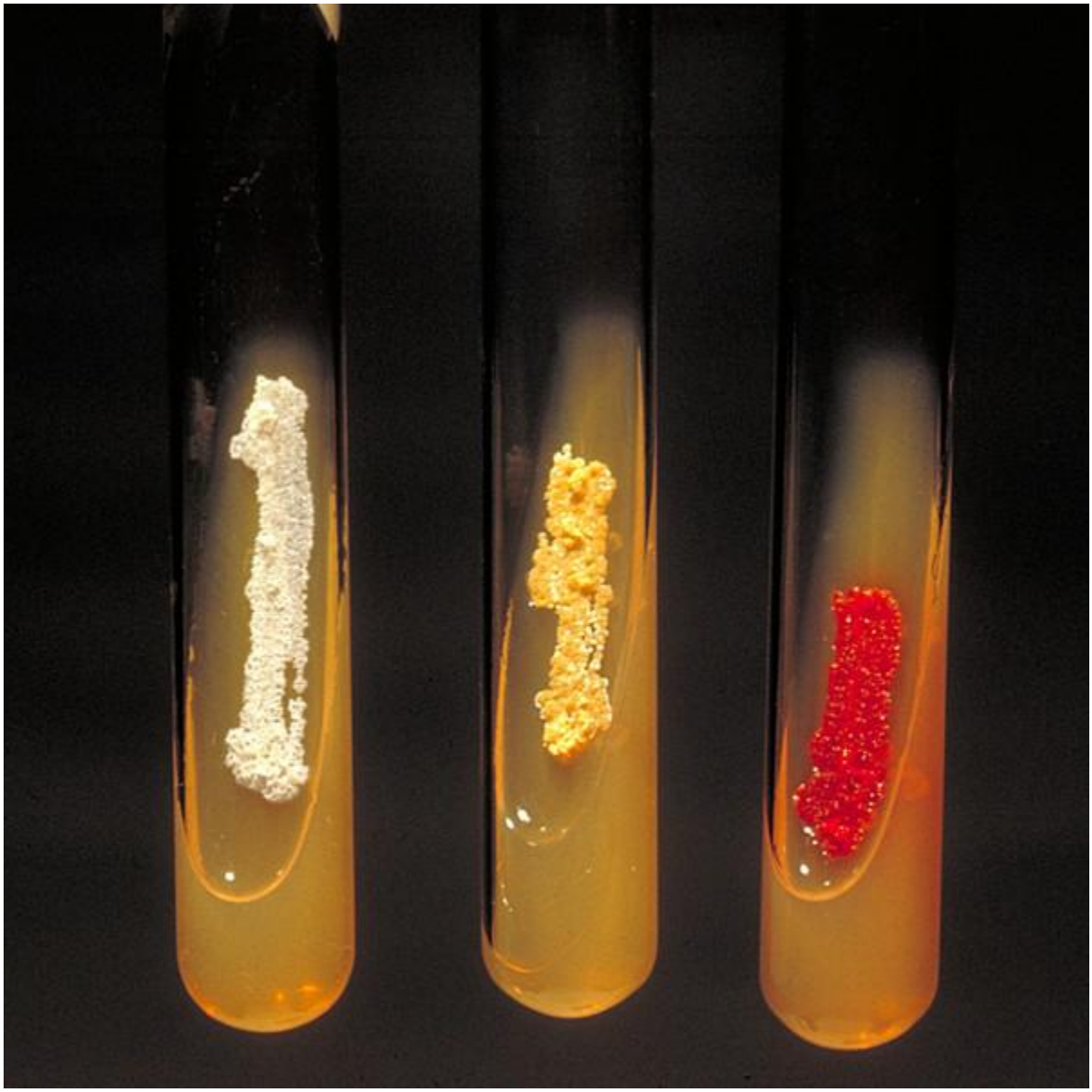

পাকিস্তানে এক জায়গায় বন্যা হওয়ায় সেখানকার বনজঙ্গলের সব মাকড়শারা গাছে চেপে গাছেদের এই দশা করেছে।

কীসের ফটো?

রামধনু রঙের বস্তুটা কী আন্দাজ করো দেখি

আশ্চর্য উলকি

ড্রুডল

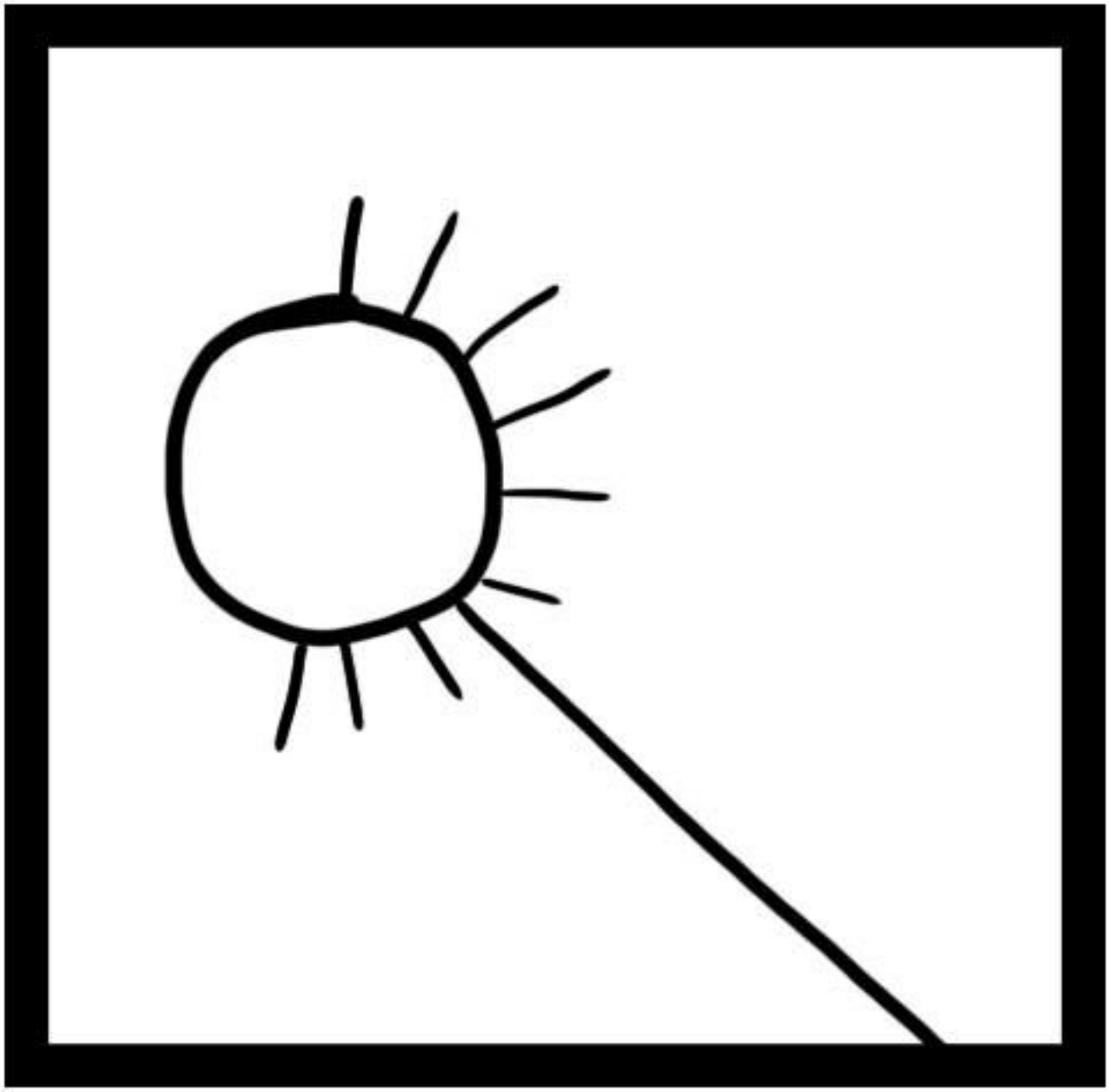

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধা

যদি প্রথমজন সাঁতারু হয় তাহলেও সে তোমার প্রশ্নের উত্তরে ‘‘হ্যাঁ’’ বলবে (কারণ সে সত্যবাদী) আর যদি সে সাঁতারু না হয় তাহলেও সে তোমার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলবে (কারণ সে মিথ্যেবাদী) তার মানে দ্বিতীয়জন যখন প্রথমজনের ব্যাপারে বলেছে ‘‘ও বলল, ‘হ্যাঁ’’’ তখন সে সত্যিকথা বলেছে। তার মানে দ্বিতীয়জন সত্যবাদী। অর্থাৎ সে সাঁতারু। তৃতীয়জন বলল যে দ্বিতীয় ও প্রথম দুজনেই মিথ্যে বলেছে। অথচ ওপরের যুক্তি দেখাচ্ছে দ্বিতীয়জন সত্যবাদী। তার মানে তৃতীয়জন মিথ্যেবাদী। তার মানে সে সাঁতারু নয়। তার মানে প্রথমজনও মিথ্যে বলছে না। তার মানে সেও সাঁতারু।

তার মানে প্রথম আর দ্বিতীয়জন সাঁতারু আর তৃতীয়জন সাঁতারু নয়।

দ্বিতীয় ধাঁধা

তুমি যেকোন একটা দরজাকে জিজ্ঞাসা করো, ‘‘যদি আমি অন্যদরজাকে সত্যবাদীর শহরের রাস্তা কোনটা জিজ্ঞাসা করি তাহলে সে কোন দরজাটা দেখাবে।

ধরো তুমি যে দরজাকে জিজ্ঞাসা করেছ সেটা সত্যবাদী। তার মানে অন্যটা মিথ্যেবাদী। সেক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নের উত্তরে সত্যবাদী দরজা, মিথ্যেবাদী দরজা যে দরজাটা দেখাবে (অর্থাৎ ভুল দরজাটা) সেইটেই দেখিয়ে দেবে।

আবার ধরো তুমি যে দরজাকে জিজ্ঞাসা করেছ সেটা মিথ্যেবাদী। তার মানে অন্যটা সত্যবাদী। সেক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যেবাদী দরজা, সত্যবাদী দরজা যে দরজাটা দেখাবে (অর্থাৎ ঠিক দরজাটা) সেইটের উল্টোটা (অর্থাৎ ভুল দরজাটা) দেখিয়ে দেবে।

অর্থাৎ দু ক্ষেত্রেই তারা যে দরজা দেখাবে তার উলটো দরজাটাই সঠিক পথ।

তৃতীয় ধাঁধা

যেকোন একটা দরজাকে জিজ্ঞাসা করো, ‘‘ ধরো, তোমাদের দুটো প্রশ্ন করা যায়। তাহলে আগের বার আমি যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করতাম যে সত্যবাদীর শহরের দরজা কোনটা তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কোন উত্তরটা দিতে?

ধরো তুমি সত্যবাদী দরজাকে জিজ্ঞাসা করেছ। তাহলে সে সবসময়েই সত্যবাদীর দরজাটাই দেখাবে। ধরো তুমি মিথ্যেবাদীকে জিজ্ঞাসা করেছ। তাহলে আগের বারে তার নিঃসন্দেহে ভুল দরজা দেখাবার কথা। অথচ এ প্রশ্নের উত্তরে সে যদি ভুল দরজাটা দেখিয়ে বলে আগেরবার

আমি এই দরজাটা দেখিয়েছিলাম, তাহলে তো সে সত্যবাদী হয়ে গেল। অতএব তাকে এইবারে মিথ্যে বলতে হলে সত্যি দরজাটা দেখিয়ে বলতে হবে এইটে। দুক্ষেত্রেই তাহলে দেখা যাচ্ছে তারা তোমায় সত্যি দরজাটা দেখিয়ে দেবে।

কুইজের উত্তর

১।স্পাইরাল,
২।ক্যানি মেজরি গ্যালাক্সি (আকাশগঙ্গা এই খুদে গ্যালাক্সিটাকে উপস্থিত গিলে খাচ্ছে),
৩।১০০০০ কোটির বেশি তারা,
৪।ডার্ক ম্যাটার(মহাবিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা একটা আনুমানিক বস্তু যা কিনা কোন ধরনের টেলিস্কোপেই ধরা পড়ে না। সাধারণ গ্রহনক্ষত্রদের ওপর এদের মহাকর্ষবলের ক্রিয়া থেকে এদের উপস্থিতির অনুমান করা হয়। মিল্কি ওয়ের মোট ভরের এগারো ভাগের মধ্যে দশ ভাগ হল ডার্ক ম্যাটার),
৫।স্যাজিটারিয়াস ‘এ’,
৬।আকাশগঙ্গার একটা দৃশ্যমান এলাকা যেখানে মহাজাগতিক ধুলো কম হওয়ায় গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করা যায়।
৭।প্রায় আঠাশ হাজার আলোকবর্ষ
৮।লোকাল গ্রুপ
৯।১৩২০ কোটি বছর
১০।ভার্গো সুপারক্লাস্টার

মগজ ধোলাই এর উত্তরঃ
১। জয়নগরের মোয়া ২। মাইক্রফট হোমস ৩। মাস্টারদা (সুর্য সেন) ৪। ছয় বার ৫। মুম্বইয়ের ডাব্বাওয়ালা ৬। সি ই এস সি ৭। রুমালি রুটি ৮। লাল ও হলুদ কার্ড ৯। ঝাড়খন্ডে মুক্তি মোর্চা ১০। ব্যোমকেশ বকশী

ড্রুডলের উত্তর
উলটপুরের গ্যাসবেলুন

কীসের ফটোঃ
চামচের হাতল

।৬।

২১১৮ খৃষ্টাব্দ

হাতের কমিউনিকেটরটা মৃদু টিঁ টিঁ করে শব্দ করে উঠল একবার। হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটার পর্দায় আঙুল ছোঁয়ালো জিষ্ণু।

"সাড়ে আটটা বাজে।" ঘড়ির পর্দায় প্রফেসর বোসের মুখে বিরক্তির স্পর্শ ছিল। জিষ্ণু একটু অস্বস্তিভরে মাথা নাড়ল, "শেষ হয় নি এখনো বাবা।"

শিডিউল অনুযায়ী আজ সন্ধে সাড়ে ছটার মধ্যে কনটেইনমেন্ট চেম্বার তৈরি থাকবার কথা জিষ্ণু। কা পোন যে কোন সময় এসে পৌঁছোবে। আর কতক্ষণ সময় নেবে তুমি?"

ঘড়ির ডায়াল থেকে প্রফেসর বোসের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিষ্ণুর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটু। বাবা একটু বুড়ো হয়ে গেছে। একটু বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে আজকাল।

উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের একটা জায়গা ছুঁলো জিষ্ণু। একখণ্ড টাইটানিয়াম টাইল নিঃশব্দে সরে গিয়ে একটা ফোকর তৈরি হয়ে গেল সেখানে। পায়ের নীচে সটান নেমে গেছে দানবিক যানটার অতিকায় দেহ। অনেক নীচে, গুহার মেঝের কাছে পিঁপড়ের সারের মতন মানুষজনের যাওয়া আসা। স্তূপাকৃতি টাইটানিয়াম আকরিক জমা হয়ে আছে কিছু দূরের ফার্নেসরুমের কাছে। সাতটা বছর! ওর মধ্যে ধীরে ধীরে তিলতিল করে সে গড়ে উঠতে দেখেছে এই অতিকায় দানব ক্ষেপণাস্ত্রকে। যত্ন করে শিখেছে তার কলাকৌশল। আর তারপর শিখতে শিখতে কখন যে নিজেই তার বাবার হাত থেকে একে গড়ে তোলবার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে তা সে নিজেই ভালো করে খেয়াল করে নি।

ঘুরে এসে ঘরটার মধ্যেকার অতিকায় ধাতব গহ্বরটার দিকে চোখ চালাল জিষ্ণু। দানবিক চৌম্বক কয়েলগুলো অমিত শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওর একেবারে কেন্দ্রস্থলে রাখা রয়েছে একটা ছোট্টো পাত্র। এই অতিকায় যানের প্রাণ ভোমরা আজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অ্যালার্ম সুইচটা একবার টিপে দিল সে। এখান থেকে দেখা না গেলেও হাজারবার দেখা দৃশ্যটা কেমন তা সে মনের চোখে দিব্যি দেখতে পায়। গোটা গুহাক্ষেত্রটার সমস্ত আলো নিভে যাচ্ছে আলার্মের শব্দ পাবার সঙ্গেসঙ্গে। কজর্মব্যস্ত বিরাট এলাকাটা ডুবে যাচ্ছে নিবিড় অন্ধকারে। স্বয়ংক্রিয় সুইচেরা একে একে পাতালনদীর ওপর তিন জায়গায় বসানো তিনটে অতিকায় টারবাইন থেকে জন্মানো বিপুল তড়িতশক্তিকে সংহত করছে তার পায়ের নীচে ঘুমিয়ে থাকা চৌম্বক কয়েলগুলোর মধ্যে।

কন্ট্রোল প্যানেলের লাল রঙের বড়ো সুইচটা এইবার চেপে ধরল জিষ্ণু। জেগে উঠেছে অতিকায় চৌম্বক কয়েলরা। মৃদু থরোথরো কাঁপুনি জেগেছে গোটা যানটিতেই। কয়েলের মধ্যে ছুটে চলা সুতীব্র তড়িৎপ্রবাহ তার কেন্দ্রস্থলে রাখা ছোট্টো ফাঁকা অঞ্চলটাকে ঘিরে গড়ে তুলছে নিশ্ছিদ্র চৌম্বক আবরণ। সেই বিদ্যুতের ছোঁয়ায় আয়নিত বাতাস চোম্বক কুন্ডলিগুলোকে ঘিরে একটা অপার্থিব প্রভা তৈরি করছিল।

ক্যালিব্রেটরে রিডিং আসা শুরু করছিল একে একে। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর যন্ত্রের মত আঙুলগুলো ঘোরাফেরা করে চলেছিল জিষ্ণুর। তড়িৎপ্রবাহের মান ও অভিমুখে বিভিন্ন সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়ে চৌম্বকক্ষেত্রের আবরণটিকে নিখুঁত করে না তোলা অবধি ওর কেন্দ্রটি তার ভয়াল জ্বালানিকে সঞ্চিত রাখবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে না।

কাজটা জটিল। সময়সাপেক্ষ। প্রায় এক কিলোগ্রাম প্রতিবস্তু সঞ্চিত থাকবে ওর ভেতরে আগামী আট বছর ধরে। চৌম্বক বন্দিশালার গঠনে এতটুকু ত্রুটি থেকে গেলে যে কোন মুহূর্তে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

সাতটা ইন্ডিকেটরের প্রত্যেকটা একে একে নির্ধারিত সবুজ চিহ্নগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেইদিকে সতর্ক চোখ রেখে হাতের ঘড়িটা সামনে তুলে এনে তাতে কয়েকটা সংকেতশব্দ উচ্চারণ করল জিষ্ণু। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তার ডায়ালটা কালো হয়ে গিয়ে কা পোনের হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠল সেখানে।

"খবর বলো।"

“মিশন সাকসেসফুল। খরচ হয়েছে মন্দ নয়। ছ হাজার মেট্রিক টন টাইটানিয়াম খরচ হয়েছে। আমি জীবনে- ”

তার কথা মাঝপথে কেটে দিয়ে জিষ্ণু বলল, “পুরো পরিমাণটা জোগাড় হয়েছে? কতক্ষণ লাগবে তোমার এসে পৌঁছোতে?”

হঠাৎ ঘড়ির মধ্যে থেকে কা পোনের মুখটা সরে গিয়ে সেইখানে তার যানের ভেতরটা ভেসে উঠল। আড়াল থেকে তার গলা ভেসে আসছিল- “টেম্পোরারি কনটেইনমেন্ট চেম্বারটা আমার গোটা জাহাজটাকে জুড়ে নিয়েছে। মাত্র এক কিলোগ্রাম জ্বালানির জন্য—”

“কতক্ষণ লাগবে তোমার পৌঁছোতে?” জিষ্ণু অসহিষ্ণু গলায় ফের প্রশ্ন করল। পর্দায় কা পোনের মুখটা ভেসে উঠেছে আবার। তার দিকে চোখ টিপে সে বলল, “তুমি একেবারে তোমার বাবার মত হয়ে দাঁড়াচ্ছ দিন দিন। শোনো ছোকরা, কা পোন মিষ্টি হাসির চাকর। ভুরু কোঁচকানো না কমালে গোটা রাতটা লেগে যাবে আসতে আসতে। আর একটুখানি হাসো যদি, তাহলে আর দু ঘন্টা। ভারত মহাসাগরের ওপরে আছি।”

কা পোনের চুলদাড়িতে দু একজটা সাদার ঝলক দেখা যায় আজকাল। চেহারাটা অবশ্য বিশেষ কিছু বদলায় নি। মুখের কঠিন দাগগুলো সামান্য নরম। জিষ্ণু জানে, কেবলমাত্র তার দিকে তাকালেই কা পোনের মুখের সে পাথুরে দাগগুলো এইটুকু নরম হয়ে ওঠে।

হেসে ফেলল জিষ্ণু। তারপর বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা। প্লিজ আংকল। শিগগির চলে এসো। এইবার হল তো?”

“হল মানে? আমার জিষ্ণু বেটা আমায় প্লিজ বলেছে। এইবার আমার বুড়ো ঘোড়া কেমন ছুট দেয় দেখো। ঘড়ি মিলিয়ে নাও। ঠিক দেড় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।”

“উঁহু, অত ব্যস্ত হতে হবে না। বাত্তিকলোয়ার কাস্টমস এলাকা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঢুকবে এসে বুঝতে পারছি। ওদের কাস্টমস ভেসেলগুলো কিন্তু সুপারসনিক। সেই সেবারে গাইডেন্স সিস্টেম আনবার সময় - মনে আছে?”

“ফুঃ। ওই একবারই ওরা কা পোনকে একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল। আর একবার লাগতে এসে দেখুক শুধু, আমার কার্তাং ভি এস দেখতেই পুরোনো মডেল। এমন ভেলকি দেখাব- যে বেটারা—”

সংযোগ কেটে যাবার মুখে কা পোনের সেই বিখ্যাত ঠোঁটচাপা হাসিটার শব্দ জিষ্ণুর কানে এসে পৌঁছোল ঠিক। মাসছয়েক আগের কথা। মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেমের জন্য দরকারি ইলেকট্রনিকসের একটা চালান উত্তর কোরিয়ান চোরাচালানকারীদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়ে এই এয়ারস্পেস দিয়ে আসবার পথেই শ্রীলংকার কাস্টমস ভেসেলের হাতে প্রায় ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছিল তার। কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল সে সে যাত্রা। ফিরে আসবার পর এ নিয়ে প্রফেসর বোসের কাছে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয় নি। সেই থেকে ওই এলাকার আইনরক্ষকদের ওপরে রেগে আছে কা পোন। ফের একটা কিছু হলে তার হাতে ওদের বিলক্ষণ দুঃখ যে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল তার সেই হাসিটার থেকে।

জিষ্ণু অবশ্য বেশ নিশ্চিন্তেই তার কাজে ফিরে গেল অবশ্য। এক ফাঁদে দুবার ধরা দেবে না কা পোন। এ প্রজেক্টের গুরুত্বও সে বোঝে। নিতান্ত নিরুপায় হলে তার ওপর নির্দেশ আছে গোটা যানটাকে উড়িয়ে দেবার। সে সম্ভাবনা যাতে না তৈরি হয় সেটা নিশ্চিত করবার মত বুদ্ধি আছে এই শৃগালধূর্ত মানুষটির।

কয়েক মিনিট বাদে রিডিংগুলো আরো একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে সামনের দেয়ালজোড়া পর্দাটাকে জাগিয়ে তুলল সে। প্রফেসর বোসের ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বটা ভাসছিল সেখানে। সামনে অন্য একটা পর্দায় ক্রমাগত বয়ে চলা সংখ্যার সারির দিকে চোখ রেখে মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি।

"বাবা- "

"কথা বোলো না। জাইরোটেলের নতুন রিডিং আসছে।" চাপা গলায় জবাব দিলেন প্রফেসর। জিষ্ণু চুপ করে গেল। গত প্রায় বছরদয়েক তার হাতে ওয়ার্কশপের সব দায়িত্ব দিয়ে প্রফেসর বোস নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছেন তাঁর জাইরোটেল অবজারভেটরি নিয়ে। সৌরজগতের পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে ভেসে চলা বিভিন্ন দেশের আলাদা আলাদা মহাকাশযানের ট্রান্সপন্ডার সংকেতকে এই জাইরোটেল যন্ত্রটা দিয়ে গোপনে ব্যবহার করে ক্রমাগত সংগ্রহ করে চলেছেন এগিয়ে আসা কালান্তক ধূমকেতুটার গতিবিধি। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলেছেন তার গতিপথ আর সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভাব্য গতিপথ। বড়ো সুক্ষ্মভাবে তার গতিপথ বদলে চলেছে সুইফট টাটল।। ক্ষেপণাস্ত্রের অনবোর্ড যন্ত্রগণকে সেই তথ্যগুলো ক্রমাগত সরবরাহ করে প্রফেসর বোস তার শেষ আঘাতের অভিমুখের নিখুঁত নির্ধারণের কাজটি করে চলেছেন একনিষ্ঠভাবে।

"পোর্ট খুলে দাও, মেইনফ্রেমে তথ্যগুলো পাঠাব এবারে।"

জিষ্ণু নিঃশব্দে একটা বোতাম টিপে ধরল। তারপর বলল, "ঘন্টাদেড়েকের মধ্যে কা পোন পৌঁছোচ্ছে। কনটেইনমেন্ট চেম্বার রেডি। তুমি কি আসবে?"

"দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছচ্ছি আমি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে বেরোতে হবে।"

"আ- আমায় - বেরোতে হবে—মানে?"

"কা পোন এসে পৌঁছোবার পর তোমাকে নিয়ে তাকে ফের উড়ে যেতে হবে। কমপক্ষে শ পাঁচেক মাইল দূরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেবে তোমরা। তোমাদের কাছ থেকে সংকেত পাবার পর আমি কনটেইনমেন্ট চেম্বারে জ্বালানী ভরা শুরু করব।"

"কিন্তু বাবা—"

“কোন কিন্তু নয় জিষ্ণু। এ ক্ষেপণাস্ত্রের জনক আমি। এর ভেতরে প্রতিবস্তু জ্বালানি ঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে এ গ্রহে এক আমি ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞ কারিগর নেই। এ কাজ আমি বিশ্বাস করে এমন কি তোমার হাতেও ছেড়ে দেব না। তৈরি হয়ে নাও- ”

“কিন্তু বাবা- ”

“আহ্! কোনো কিন্তু নয় এখন। কনটেইনমেন্ট চেম্বার প্রতিবস্তু সংরক্ষণের প্রযুক্তি এখনও অনুন্নত। কাজটা করতে গিয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অন্তত একজনকে বেঁচে থাকতে হবে ফের একে গড়ে তোলবার জন্য। কিন্তু আর নয়। তুমি কাজ কর। আমি কা পোকা পোনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তোমার কাছে আসছি----

ক্রমশ

চিত্ত ঘোষাল

সেদিন সকালটা ছিল ঝকঝকে। বেশ রোদ্দুর উঠেছে।

মামা বলল, "মনে হচ্ছে আজ বৃষ্টি- বাদলা হবে না। চল্, আজকেই পঞ্চাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

কান্না চেপে আমি বললাম "চলো।"

পঞ্চা যা যা খেতে ভালোবাসে সেদিন দুপুরে সব খেতে দেওয়া হল ওকে। তারপর বিকেল- বিকেল বেরিয়ে পড়লাম আমরা। মামা খেলা দেখানোর সরঞ্জামের থলে, ডুগডুগি সব সঙ্গে নিয়েছে। যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো সঙ্গে নিলে কেন মামা?"

"লোকে ভাববে আমরা খেলা দেখাতে বেরিয়েছি।"

কিন্তু কাল যখন বস্তির লোকেরা জানতে চাইবে পঞ্চা কোথায় তখন কী বলবে?"

"সে দেখা যাবে," মামা আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। চুপচাপ হাঁটতে থাকলাম আমরা। ছোটো শহর আমাদের। সন্ধে নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম শহরের শেষে। শহর এখান থেকেই একটু একটু করে গ্রাম হয়ে যাচ্ছে।

বড়ো রাস্তা, যার নাম হাইওয়ে, ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। থেকে থেকে আমার কান্না পাচ্ছে। মামা খানিকটা এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মুছছি। পঞ্চার গলার দড়িটা আমার হাতে। ও কি কিছু বুঝতে পারছে? কী জানি।

হাইওয়ের দু'পাশে খেত, দূরে দূরে গ্রাম। সাইকেলে করে, হেঁটে দু'চার জন লোককে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। তারা ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখছে। হুসহাস করে দূরপাল্লার বাস যাচ্ছে- আসছে থেকে থেকে।

আরো খানিকটা গিয়ে মামা দাঁড়িয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। এখন বেশ অন্ধকার। দূরে দূরে এক এক জায়গায় টিমটিমে কয়েকটা আলো। ওগুলো গ্রাম।

আমি পঞ্চাকে নিয়ে কাছে যেতে মামা বলল, "চল্, মাঠে নামব।"

রাস্তা খেত থেকে বেশ উঁচুতে। ঢাল বেয়ে আমরা নেমে গেলাম। দু'পাশে খেত। মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে মামা চলেছে। আমি পঞ্চাকে নিয়ে তার পিছু পিছু। আমি কথা বলছি না, বলতে পারছি না, ভীষণ কান্না পাচ্ছে আমার। মামাও চুপচাপ। বোধ হয়

অমাবস্যা। কুচকুচে অন্ধকার। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। একসময় মামা বলল, "দাঁড়া। পঞ্চার গলার দড়িটা খুলে দে। খুলেছিস? বেশ। শোন্, আমি ঠোঙায় করে অনেক বিস্কুট নিয়ে এসেছি। ঠোঙাটা ওর সামনে রাখব, যেই ও খেতে আরম্ভ করবে আমরা দৌড়োব হাইওয়ের দিকে। ...নে পঞ্চা, খা, বিস্কুট খা। দশা, পঞ্চা বিস্কুট খাচ্ছে, দৌড়ো, দৌড়ো..."

আমি অন্ধকারের মধ্যে একবার পঞ্চার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দৌড়তে লাগলাম মামার পিছু পিছু।

অনেক রাত করে ঘরে ফিরলাম আমরা। সারা রাস্তা আমরা একটাও কথা বলিনি। আমি মাঝে মাঝে শব্দ না করে কেঁদেছি। মামা কী করেছে জানি না। হাতমুখ ধুয়ে এসে মামা বলল, "আজ আর রান্না করব না দশা। মুড়ি- বাতাসা আছে ঘরে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

"আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। বলে এক গ্লাস জল খেয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।"

অন্যদিন আমি 'খাব না' বললে মামা একটা হইহই কান্ড বাঁধিয়ে দেয়। আজ কিন্তু সে কিছু বলল না। শুধু আমি শুয়ে পড়তে চুপচাপ আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

পরদিন সকালে হইহট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল আমার। উঠে দেখি মামারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে বসে আছে বিছানায়।

"কী হয়েছে মামা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বুঝতে পারছি না।"

ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মামা দরজা খুলে দিতে দেখি বস্তিরই কয়েকজন। দেবেনকাকু, ভোম্বলদা এরা সব। তারা বেশ উত্তেজিত, আবার বেশ খুশি-খুশিও।

"কী ব্যাপার?" মামা বলল।

"দেখবে এসো তোমাদের ভালুকের কান্ড," কে একজন বলল।

"অ্যাঁ!" চমকে গিয়ে মামার তো গাছ থেকে পড়ার অবস্থা। আমারও তা- ই। ঝটপট আমরা বেরিয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। হাবুল মন্ডলের বাড়ির সামনে বেজায় ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে দেবেনকাকুরা আমাদের নিয়ে গেল হাবুলের ঘরের পাশে। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা লোককে জাপটে ধরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে পঞ্চা। পাশে হাবুল মন্ডল এক ছড়া কলা হাতে পঞ্চাকে নিজে হাতে করে কলা খাওয়াচ্ছে। আমাদের হাবুলের মুখ হল ভারি লাজুক- লাজুক।

"কী ব্যাপার হাবুলদা?" মামা জিজ্ঞেস করল।

"আর বল কেন ভাই। এই ব্যাটা চোর আমার ঘরে সিঁধ দিচ্ছিল। তোমাদের ভালুক ওকে ধরেছে। কী উপকার যে করেছে..."

"তাই বলে ওকে অত কলা খাওয়াতে হবে? ওর স্বভাবই পরোপকার করা, সেই শিক্ষাই ও আমাদের কাছ থেকে পেয়েছে। আর কলা ওকে দিয়ো না হাবুলদা, তুমি বরং বাকিটা খেয়ে নাও।"

ভিড়ের মধ্যে কেউ খিক করে হেসে উঠল। হাবুল কটমট করে সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার মিইয়ে গেল। পরানদাদু এসে গেছে। সবাই জায়গা করে তাকে সামনে আসতে দিল।

"ব্যাপারটা কী?" দাদু জিজ্ঞেস করল।

সব শুনে তারপর বলল, "তা হইলে হাবুল, তুমি যারে তাড়াইতে চাইছিলা সেই হইল তোমার রক্ষাকর্তা। খাওয়াও, কলা খাওয়াইয়া পাপস্খালন করো।"

লজ্জায় হাবুলের কালো মুখ বেগুনি। হো হো করে সবার হাসি। পরানদাদু এবার মামাকে বলল, "কিন্তু নয়কড়ি, তুমি কি রাত্রে তোমার ভল্লুকরে ছাইড়া রাখ নাকি?"

"না জেঠু," মামা থতিয়ে থতিয়ে বানিয়ে বলল, "রাতে উঠে একবার কলতলায় গিয়েছিলাম। তখন হয়তো ফাঁকতালে বেরিয়ে পড়েছে। আমি ঘুমচোখে খেয়াল করতে পারিনি।"

দাদু পঞ্চার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল, মুখে মিটিমিটি হাসি, "ইয়ারে কয় বিয়ার হাগ্। দশা, কথাটার অর্থ জান কি?"

"না দাদু।"

অর্থ হইতাছে ভল্লুকের আলিঙ্গন। ধরলে সহজে ছাড়ে না।

সত্যিই তা- ই। কে জানে কখন থেকে চোরটাকে অমনি করে ধরে আছে। সে ব্যাটা পঞ্চার ঘাড়ে মাথা রেখে বোজা চোখ।

"মামা," আমি ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, "চোরটা মরে যায়নি তো?"

পাশ থেকে একজন হেসে উঠল, "আরে না। ঘুমোচ্ছে, ভালো গদি পেয়েছে না!"

দাদুকে জিজ্ঞেস করল মামা, "পঞ্চাকে বলব নাকি ওটাকে ছেড়ে দিতে?"

"ছাড়ব ক্যান? থাউক। পুলিশে খবর দেওয়া হইছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, থানায় লোক গেছে খবর দিতে," পাঁচ- সাত জন একসঙ্গে জানাল।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে, তারই মধ্যে আওয়াজ উঠল, "দারোগাবাবু এসে গেছে, দারোগাবাবু এসে গেছে... "

পুলিশরা সাধারণত বেশ মোটাসোটা হয়। ভালো খায়- দায় তো! দারোগাবাবু মানে থানার বড়োবাবু বড়ো পুলিশ, তাই মোটাও সে বেশি। ঘামতে ঘামতে হাঁপাতে হাঁপাতে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল নিয়ে সে সামনে এসে দাঁড়াল। দারোগাবাবু আমার পাশটিতে। তার গা থেকে বাসি লুচি আর বোঁদের গন্ধ আসছিল।

"এ যে অবিশ্বাস্য কান্ড হে," দারোগাবাবু বলল পঞ্চা আর তার বগলদাবা চোরকে দেখতে দেখতে, "তোমাদের লোকের কথা শুনে আমি তো প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারিনি। আরে! এ তো সেই কুখ্যাত সিঁধেল চোর জিতু চক্রবর্তী। ছি ছি। বামুনের ছেলে হয়ে শেষে কিনা সিঁধেল চোর!"

"ঠিকই আছে," পরানদাদু মন্তব্য করল, "ও সেরা চোর, চোর জাতের ব্রাহ্মণ।"

গলা ছেড়ে হাসি সবার।

"চোপ, চোপ," দারোগাবাবু ধমক দিল, "জান না আমি ও. সি. রাধেশ্যাম মুখুটি? আমার সামনে ভয়ে কেউ হাসে না? অ্যাই ব্যাটা জিতু, কোথায় চুরি করতে এসেছিলি?"

জিতু চোর চিঁ চিঁ করে বলল, "দারোগাবাবু, এই যে এই হাবুল মন্ডলের বাড়িতে। এখানে যে আপনি একটা ভালুককে ডিউটিতে রেখেছেন জানলে, সত্যি বলছি, আসতাম না। তিন- চার ঘণ্টা হয়ে গেল বড়বাবু, সেই যে ধরেছে আর ছাড়ে না।"

"অ্যাই হতভাগা," গর্জে উঠল দারোগাবাবু, "একদম বাজে কথা বলবি না। পুলিশে ভালুককে চাকরি দেবার নিয়ম নেই। থাকলে একে আমি কনস্টেবল করে নিতাম। হ্যাঁ ভাই ভালুক, চোরটাকে এবার ছেড়ে দাও। থানায় নিয়ে যাই।"

দারোগাবাবুর কথা কানেই তুলল না পঞ্চা। জিতু চোরকে বগলদাবা করে সে যেমনকে তেমন। দারোগাবাবু ভুরু কপালে তুলে বলল, "আরে! এ যে আমাকে পাত্তাই দেয় না! কার ভালুক এ?"

এক পা এগিয়ে মামা বলল, "আজ্ঞে আমার। ভালুক তো, কাকে কতটা গুরুত্ব দিতে হয় জানে না। এখন কি ছেড়ে দিতে বলব চোরটাকে?"

"হ্যাঁ।" তারপর একটা কনস্টেবলের ভুঁড়িতে খোঁচা দিল দারোগাবাবু, "অ্যাই ভ্যাবলা, দেখছিস কী? তুই আর ক্যাবলা ওই কোমরে দড়ি বাঁধ্, হাতে হাতকড়া লাগা।"

দুই কনস্টেবল ভ্যাবলা আর ক্যাবলা পঞ্চার কাছে যেতেই মামা বলল, "ছেড়ে দে পঞ্চা।" আর অমনি পঞ্চা জিতু চোরকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। দুই কনস্টেবল লেগে গেল চোরের কোমরে দড়ি বেঁধে হাতকড়া লাগাতে।

দারোগাবাবু হাসি- হাসি মুখে বলল পঞ্চাকে দেখিয়ে, "এর গায়ে কি নির্ভয়ে হাত দেওয়া যায়?"

মামা বা আমি কিছু বলার আগেই পরানদাদু আমাদের হয়ে উত্তর দিল, "হ, হ। নয়কড়ি কী দশা বইলা দিলে ও আপনেরে আলিঙ্গন কইরা আদরও করতে পারে।"

"না না," এক পা পেছিয়ে গেল দারোগাবাবু প্রথমটায়, "আলিঙ্গন করতে হবে না।" তারপর আবার এক পা এগিয়ে আস্তে আস্তে পঞ্চার পিঠে চাপড় মারতে লাগল, "ভেরি ভেরি গুড, ইউ আর আ ভেরি গুড বিয়ার।"

পঞ্চা নড়ে- চড়ে সামনের ডান পা- টা তুলে এগিয়ে ধরল দারোগাবাবুর দিকে।

"এ কী!" দারোগাবাবু অবাক।

"আপনি ইংরিজি বলেছেন তো," মামা বলল, "তাই ও আপনার সঙ্গে হ্যান্ড- লেগ- শেক করতে চায়।"

"হ্যান্ড- লেগ- শেক! সেটা কী?" দারোগাবাবুর জিজ্ঞাসা।

"হাতে হাতে হলে হ্যান্ডশেক। হাতে- পায়ে হলে হ্যান্ড- লেগ- শেক। শব্দটা আমার এই ভাগনে দশকড়ির আবিষ্কার," মামা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিল।

তখন দারোগাবাবু হাসতে হাসতে আবার "ইনটেলিজেন্ট, ভেরি ইনটেলিজেন্ট," বলতে বলতে পঞ্চার সঙ্গে হ্যান্ড- লেগ- শেক করতে লাগল।

এদিকে জিতু চোরকে বেঁধে- ছেদে ভ্যাবলা- ক্যাবলা রেডি। জিতু চোর কাঁদো- কাঁদো গলায় বলল, "বড়বাবু, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

পঞ্চার পা ছেড়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল দারোগাবাবু, "খাবে?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল জিতু।

"থানায় চলো, তারপর খাবে। আগে পিটুনি খাবে, তারপর..."

"তারপর," দারোগাবাবুর মুখ থেকে কথাটা তুলে নিল জিতু, "লুচি- বোঁদে খাওয়াবেন তো বড়বাবু?"

"অ্যাঁ! লুচি- বোঁদে খাবে! দারোগা যা খাবে, চোরও তা- ই খাবে! সাহস দেখেছ? তোকে দেব কচুরি আর আলুর ঘ্যাঁট। কচুরি কিন্তু গরম হবে না, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। অ্যাই, নিয়ে চল্ ব্যাটাকে থানায়।"

তারপর পঞ্চার দিকে তাকিয়ে 'থ্যাংক ইউ' বলে চলে গেল দারোগাবাবু। আমরা পঞ্চাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ঢুকে দোর দিতেই আমি বলে উঠলাম, "এ যে অবাক কান্ড!"

"হ্যাঁ, অবাক কান্ড একটা নয়, একাধিক। প্রথমত, আমরা কত দূরে নিয়ে গিয়ে আমরা পঞ্চাকে ছেড়ে দিয়ে এলাম, ও ফিরে এল কী করে?" মামা বলল।

"হ্যাঁ।"

"দ্বিতীয়ত, ও চোরটাকে ধরল কেন?"

"হ্যাঁ। সবটাই তোমার খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে, না মামা?"

"তা হচ্ছে। তবে কী জানিস, অনেক পাখি জন্তুজানোয়ারের পথ চেনার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে। ভালুকদেরও হয়তো সেই ক্ষমতা আছে।"

"তা- ই হবে। না হলে পঞ্চা ফিরে এল কী করে। কিন্তু মামা, জিতু চোরকে ও ধরতে গেলে কেন?"

"চোর চুরি এসব বোঝার কথা নয় পঞ্চার। আমার মনে হয় জিতুর হাবভাব ওর অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। জন্তুজানোয়ারেরও ইনট্যুইশন থাকে।"

"ইনট্যুইশন কাকে বলে মামা?"

"এক কথায় বোঝানো শক্ত। একটা ধারণা বা জ্ঞান, যা যুক্তি- তর্ক- চেষ্টা ছাড়াই আপসে মনে চলে আসে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা কঠিন শব্দ আছে বটে- স্বজ্ঞা। তা, সে যা হবার হল, কিন্তু দশা, আমাদের সমস্যা যে রয়েই গেল!"

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখি নরেনকাকু শম্ভুকাকু, সঙ্গে আরো ক'জন।

"এসো, ভেতরে এসো," মামা ডাকল।

"না ভাই, এখন আর ভেতরে যাবো না," নরেনকাকু বলল, "একটা কথা বলতে এলাম। রাতে যদি পঞ্চা মন্দিরের সামনের চাতালটায় শুয়ে থাকে তাহলে বস্তিতে আর চোরের উপদ্রব হবে না। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে..."

"সে তো খুব ভালো কথা," এক কথায় রাজি মামা, "রাতে খাইয়ে- দাইয়ে ওকে আমরা চাতালে শুইয়ে দিয়ে আসব।"

সবাই খুশি হয়ে চলে যেতে আমি বললাম, "রাতের জন্য একটা পাহারাদার রাখতে কত খরচ মামা?"

"মাসে দেড়- দু'হাজারের কমে হবে বলে মনে হয় না।"

"তাহলে পঞ্চার মাইনে মাসে অন্তত পাঁচশো কেন হবে না?"

"হওয়া উচিত," মামা হাসল, "কিন্তু বলবে কে? তুই? শোন্ দশা, এতে পঞ্চার কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। চাতালটা বেশ বড়ো। আরামে থাকবে। আর সবার এতে ভালো হলে আমাদেরও ভালো।"

সেইদিন থেকে রাতে পঞ্চার পাহারাদারি শুরু, বস্তিতেও চোর আসা বন্ধ।

আমাদের ছোট চাপা ঘরের চাইতে চাতালটা যে পঞ্চার বেশি পছন্দ তা ক'দিনেই বোঝা গেল। মাঝে মাঝেই ওখানে গিয়ে বসে থাকে। বাচ্চারা ওর সঙ্গে খেলা করে। এ রকম মিশুকে স্বভাবের মিষ্টি ভালুক কেউ দেখিনি সবাই স্বীকার করে। তবু একটু সাবধানতা তো ভালো। ও যখনই ঘর থেকে বেরোয় ওকে মুখ ঢাকার জালতি পরিয়ে দিই।

পঞ্চার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল খুব। কিন্তু আমাদের সমস্যা কিছু কমল না। আরো কিছুদিন গেল। বর্ষা নেমেছে খুব। আদ্দেক দিন বেরোতেই পারে না মামা। হাতের টাকাকড়ি সব প্রায় শেষ। মামা কোথা থেকে প্যাকেট- করা ঝুরিভাজা চানাচুর এইসব এনে বাড়ি বাড়ি ফিরি করে। তাতে তেমন কিছু হয় না। মামার শুকনো মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। একদিন মামা আমার হাতে একটা ছাপা কাগজ দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ্।"

বিচ্ছিরি ছাপা। বাজে কাগজ। তাতে লেখা -

ভালুক বিক্রি। ভালুক বিক্রি। ভালুক বিক্রি।

একটি অত্যন্ত ভদ্র সুশীল বুদ্ধিমান স্বাস্থ্যবান (ওজন আনুমানিক ১৫০ কেজি) ভালুক নিলামে বিক্রয় হইবে। তাহার ডাকনাম পঞ্চা। ভালো নাম পঞ্চানন দোসাদ। সে খেলা দেখাইতে অত্যন্ত পটু। খেলা দেখাইয়া রোজগারের জন্য বা বাড়িতে পোষ্য হিসাবে রাখিবার জন্য কিনিতে পারেন।

ক্রেতাকে ফাউ হিসেবে খেলা দেখানোর সরঞ্জাম দেওয়া হইবে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভালুকের খেলা দেখানো শিক্ষার সুবন্দোবস্তও আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পঞ্চানন শিশুদের বড়ো ভালোবাসে।

নিলামের স্থানঃ ধুকধুকিয়ার মাঠ। সময়ঃ রবিবার ১৯শে জুন সকাল ১০টা।

আমি কাগজটা মামার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "বিতিকিচ্ছি ছাপা।"

"বিনে পয়সায় একশো ছেপে দিল দুলু বড়াল। আর পয়সা খরচ করে ভালো ছেপেই বা কী হবে বল্? "

আমি উত্তর দিলাম না।

"বুঝেছি বুঝেছি," মামার মুখে করুণ হাসি, "তোর আসল রাগ তো পঞ্চাকে বেচে দিচ্ছি বলে। কিন্তু তুই বুঝদার ছেলে, বুঝিস তো সব।"

চটপট মনের রাগ-দুঃখ চেপে আমি বললাম, "আচ্ছা মামা, পঞ্চানন দোসাদ নামটা দিলে কেন?"

"আরে বুঝলি না, এ রকম একটা মানুষের মতো নাম দেখলে লোকের কৌতূহল হবে না? বেশি বেশি করে লোকে আসবে।"

"তা ঠিক।"

(আগামি সংখ্যায় সমাপ্য)

ডেটল সাবান

খদ্দেরঃ আপনার কাছে ডেটল সাবান আছে?
দোকানদারঃ আছে।
খদ্দেরঃ ভালো কোয়ালিটির তো?
দোকানদারঃ বাজারের সেরা জিনিস।
খদ্দেরঃ হাত ধুলে নোংরা যায় তো?
দোকানদারঃ এক্কেবারে জিরো ব্যাকটেরিয়া সার

খদ্দেরঃ বেশ বেশ। তাহলে একটা সাবান দিয়ে হাতদুটো ভালো করে ধুয়ে আমাকে দু কেজি আটা দিন দেখি।

এক্সারসাইজ

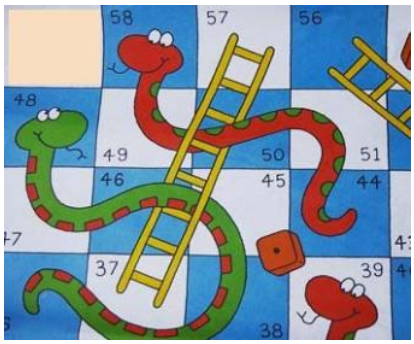

রোগিঃ আপনার কথামত রোজ সকালবেলা ঝাড়া দু ঘন্টা ওঠানামার এক্সারসাইজযুক্ত খেলা খেলে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু, তাও ওজন তো একটুও কমল না!
ডাক্তারঃ কোন খেলা খেলছেন বলুন তো?
রোগিঃ সাপ লুডো

এক্সাইড

খদ্দেরঃ টর্চে দুটো ব্যাটারি লাগিয়ে দিন
দোকানদারঃ এক্সাইড দিই?
খদ্দেরঃ বললাম তো দুটো। একদিকে লাগালে টর্চ জ্বলবে?

রচনা লেখা

টিউটরঃ রচনা না লিখলে আজ তোর খেলতে যাওয়া বারণ।
ছাত্র (মুখ ব্যাজার) দিন
টিউটরঃ লেখ তোমার দেখা একটি ক্রিকেট ম্যাচ
ছাত্রঃ একবার আমি বাবার সঙ্গে ইডেনগার্ডেনে ম্যাচ দেখিতে গেলাম। খেলা শুরু হইল। ধোনি ব্যাট হাতে নামিল। তাহার পর বৃষ্টি শুরু হইল। ম্যাচ বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইল।

টিউটরঃ ফাঁকিবাজি হচ্ছে? আরেকটা রচনা লেখ। তিনশো শব্দের হতে হবেঃ তোমার “প্রিয় প্রাকৃতিক দৃশ্য”
ছাত্রঃ আমাদের বাড়ির পাশে চুর্ণী নদী বহমান। আমি রোজ দুপুরবেলা খাটে শুইয়া তাহার দিকে দেখি এবং তাহাতে কি সুন্দর জল বহিয়া যায়—ঝরঝর(x২৭৯)

মডার্ন আর্ট

আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে শিল্পরসিক একখানা ছবি দেখে বেজায় বিরক্ত হয়েছেন। গ্যালারিমালিককে ডেকে বললেন, “এরকম কুরুচিকর, কুৎসিত ছবিকে মডার্ন আর্ট বলে চালাচ্ছেন, লজ্জা করে না?
গ্যালারিমালিক হাত কচলে বলেন, আই অ্যাম সরি স্যার। আমি লজ্জিত। এক্ষুণি সরিয়ে দিচ্ছে। ওরে ভোলা, আয়নাটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা বাপ।

ভাগ্যে থাকলে

সীতারামবাবু নতুন শহরে পোস্টিং নিয়ে এসেছেন। তাঁর বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, বাবা মা আর বারোটি ছেলেমেয়ে। উঠেছেন একশো তিন বছরের বুড়ীমাসীর বাড়ি। সেখানে দুটিমাত্র ঘর। একটিতে মাসী আর অন্যটিতে চোদ্দজন ঠাসাঠাসি। একটি বড়োসড়ো ভাড়াবাড়ির সন্ধানে ঘুরছেন তিনি। কিন্তু অতবড়ো পরিবারের কথা শুনে কেউ তাঁকে ভাড়া দিতে রাজি নয়।
দিনকয়েক এমন গোটা পঁচিশেক ব্যর্থ চেষ্টার পর দালাল আরো একটা বাড়ির খবর নিয়ে এলো মাসীর বাড়িতে। বড়োসড়ো বাড়ি। বড়োরাস্তার পাশেই। ভাড়াও বেশি নয়। আর ঠিক তক্ষুনি

ভেতরবাড়ি থেকে খবর এলো মাসী মারা গিয়েছেন। কিন্তু বাড়িভাড়ার সুযোগ ছাড়া চলে না। ওদিকে শ্মশানে যাবার তোড়জোড় চলেছে। অগত্যা রামবাবু বিমর্ষমুখে সেসব বাদ দিয়ে চললেন দালালের সাথে। কথা রইল, যদি সফল হন তাহলে তক্ষুনি বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ঠিকঠাক করবেন, আর ব্যর্থ হলে সেখান থেকে সোজা শ্মশানে চলে আসবেন।
দেখাশোনা হয়ে গেলে বাড়িওয়াল প্রশ্ন করলেন, "আপনার পরিবারে আর লোকজন?"
রামবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "আমায় নিয়ে পনেরোজন। সব শ্মশানে। একাই এসেছি। ভাড়া না পেলে এক্ষুনি আমিও শ্মশানেই-- "
বাড়িভাড়া পেতে আর কোন সমস্যা হয় নি রামবাবুর।

দুঃখের প্রতিকার

দিদিমণি- দুঃখ হলে কে কী করো?
রামঃ কাঁদি
শ্যামঃ চিল্লাই
যদুঃ ফ্রিজ খুলে মিষ্টি খাই
মধুঃ ইমেইল বক্স খুলে স্প্যাম ফোল্ডার দেখি।
দিদিমণিঃ অ্যাঁ? দুঃখু হলে স্প্যাম ফোল্ডার দেখো? কেন?
মধুঃ তাতে কম করে দশটা চিঠি থাকে যার প্রত্যেকটাতে বলে আমি এক কোটি ডলারের লটারি পেয়েছি। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

লকির বলিদান

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ষষ্ঠ শ্রেণী, এপিজে স্কুল সল্ট লেক

"রেডি?", একি জিজ্ঞাসা করল।
দূর থেকে ওই আগুন ভরা গ্রহটাকে দেখে বেশ ভাল লাগছিল।
"আরে! রোজ রোজ কি আমরা একটা সোলার সিস্টেম বানাই? রেডি কি না?"

আমি লকি। এই কাজে নতুন এসেছি। কাজটা হল গ্রহ তৈরি করে করে একটা সোলার সিস্টেম বানানো। এত মন লেগে গিয়েছিল আমার গ্রহটার দিকে যে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না।হুঁশ ফেরার পর একটা বেচারা মুখ করে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ রেডি!"

বলতেই আমাদের যানটার পাশ থেকে দুটো বড়ো ডান্ডা বেরিয়ে এল। তারপর ডান্ডা দুটোর সামনে একটা দানবিক ঘড়ি বেরিয়ে এল----

আসল গল্পটা শুরু করার আগে তোমাদের কিছু জিনিস বুঝিয়ে দি। আমাদের জাতির কোন নাম নেই। আমাদের নাম পাল্টাতে থাকে আর তার সাথে সাথে আমরাও। আমাদের কাজ হল আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা। তাই আমরা ধ্বংস হবার আগে আমাদের জাতিটা বজায় রাখার জন্য মহাকাশের অন্য কোথাও গিয়ে আর একটা জাতি বানাই। তৈরি জাতি আমাদের মতন না দেখতে হলে কী হবে, তাদের মাথায় একটা কথা থেকে যায়-- বেঁচে থাকার জন্য নতুন জাতি বানাতে হবে!

আমাদের জাতি বেঁচে থাকে চোদ্দ কোটি বছর! আমাদের এখনকার হোম প্ল্যানেটের অবস্থান হল বহুদূরে দুটো ব্ল্যাক হোলের মধ্যে একটা নেবুলাতে। একটা ব্ল্যাক হোল অন্যটার গ্র্যাভিটেশনাল টানকে প্রশমন করে আর তার মধ্যে আম রা থাকি।

"এবার মন দিয়ে শুনবে," একি বলল, "এই দুটো ডান্ডা হল রিয়েলিটি শুটার, এরা রিয়েলিটি রশ্মি ছুঁড়ে গ্রহ বানায়। আর ওই ঘড়িটা হল টাইম সাকার , ওটা গ্রহটার বানানোর গতিটাকে অনেকগুণ করে দেয় যাতে গ্রহটা ১০ কোটি বছরের বদলে এক কোটি বছরে তৈরি হয়ে যায়। এটা আমাদের তেরো নম্বর গ্রহ এই সোলার সিস্টেম-এর।চলো এবারে যন্ত্র চালিয়ে ঘুমোতে যাই।"

যন্ত্রগুলো চালিয়ে আমরা hyper sl eep এ চলে গেলাম। ৫০ লাখ বছরের পরে ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি একটা Al er t message এসেছে সরকার থেকে এক লাখ বছর আগে। আমাদের নেবুলার এক দিকের ব্ল্যাকহোলটা নাকি উধাও হয়ে গেছে! অন্য দিকের ব্ল্যাকহোলটা এখন আমাদের নেবুলাকে টানছে!

একি-কে ঘুম থেকে তুললাম। ওকে বললাম কী হয়েছে।

অনেকক্ষণ ভাবার পর, আমাদের একটা আইডিয়া এল। আমরা নেবুলার দিকে রওনা দিলাম। অনেক লম্বা রাস্তা পেরিয়ে আমাদের স্পেসস্টেশানটাতে পৌঁছুলাম। দেখি কেউ নেই!

এবার কী করব আমি ভাবলাম। একিকে জিজ্ঞাসাও করলাম, "নেবুলার আর কতক্ষণ আয়ু রয়েছে?"।

"৭৮ মিনিট!" উত্তর এল, "৭৮ মিনিট মাত্র।"

"তাতেও একটা চেষ্টা দেয়া যাক। আমরা নেবুলার প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের যান থেকে ফোন করে বললাম, "স্যার, আম রা , লকি আর একি, মিলে আমাদের নেবুলাটাকে জমিয়ে দেব একটা si ngl e moment i n t i me এ।" সময় না এগোলে তা ধ্বংসও হবে না।"

"কিন্তু তাহলে তো আমরা সময়ের মধ্যে একটা স্থির সময়ে হারিয়ে যাব, আর এর কারণে তোমাদের মধ্যে একজন কে তার জীবন দিতে হবে নির্দিষ্ট শক্তি তৈরি করবার জন্য।"

প্রধানমন্ত্রী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তখনই লাইনটা কেটে গেল। লকি, একিকে স্পেস স্টেশানে রেখে জাহাজ নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর তাদের পুরো জাহাজটাকে একটা

এনারজি ম্যানিপুলেটরে বিকশিত করে চারপাশের পুরো স্পেস থেকে এনার্জি সংগ্রহ করল। ম্যানিপুলেটর জাহাজের ইঞ্জিনের শক্তিকেও শুষে নিল। ইঞ্জিন থেমে যেতেই জাহাজটা সোজা ঢুকে গেল দানবিক ওই কালো ব্ল্যাকহোলটার ভেতরে। ফলে কিছুই হল না আর নেবুলাটাও জমে গেল না।

কিন্তু একটু পরে হঠাৎ একটুক্ষণের জন্য ব্ল্যাক হোলটার নড়াচড়া থেমে গেল। তারপর তার ভেতরে লকির যানটায় জমা শক্তিতে একটা বিশাল এক্সপ্লোশান হল।

ব্ল্যাক হোলটার মধ্যে থেকে একটা বিশাল আগুনের গোলা বের হল আর নেবুলাটাকে ৯০০০ লাইটিয়ার প্রতি ঘন্টার গতিতে একটা এমন ঠেলা মারল যে নেবুলাটা দূর মহাকাশে আবার দুটো অন্য ব্ল্যাক হোলের মধ্যে গিয়ে আটকে গেল।

ছুটন্ত আগুনের গোলার ভেতরে লকির জাহাজটা জ্বলতে জ্বলতে মহাকাশ পেরিয়ে ওদের বানানো নতুন সোলার সিস্টেমটার একদম মধ্যে গিয়ে থেমে গেল।

লকির সেই জ্বলন্ত জাহাজটা হল আমাদের সূর্য, আর সেই বিরাট ব্ল্যাক হোলটা আমাদের center of the milky way।

বৈজ্ঞানিকরা যতই বলুক সূর্য একটা তারা, আমি জানি, আসলে ওটা হল লকির জ্বলন্ত জাহাজটা।

ভূতের ডাক

উজান রায়- শুভশ্রী ভট্টাচার্য

বাড়িটায় এসে অবধি শিবুর সবকিছু কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল। রিকশা থেকে নেমে বিশাল সিংহ- দরজার দুদিকে থাবা গেড়ে বসে থাকা সিংহদুটো থেকে শুরু। তারা যে ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করে একটা থাবা তুলে বসে আছে, সেটা যেন আগে কোথায় দেখেছে বলে মনে হল।

সত্যিই আগে এসেছে কিনা দেখার জন্য শিবু ভাবল যে দেখি তো রান্নাঘরের পেছনে একটা আতা গাছ আছে কিনা। সেটাও মিলে গেল। সবই কেমন চেনা চেনা লাগছে।

বর্ধমানে এসে হঠাৎ এই জমিদারবাড়িটা খুব কম ভাড়ায় পাওয়া গেল। বিশাল বাড়ি। একেকটা ঘরে আজকালকার চার- পাঁচটা ঘর ঢুকে যাবে। একতলার বেশিরভাগ ঘরই তালাবন্ধ। এই বাড়ির মালিক কোলকাতা থেকে এলে হয়তো ব্যবহার হয়। বাড়ির ছাদে কয়েকটা পরি পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ছাদে যাওয়া বারণ। কেন কে জানে? বাগানের আউট হাউসে থাকে

মালি শালিক বুড়ো। সে- ই বাড়িটার দেখাশোনা করে।

শিবু আর ওর দাদা সোম একটা ঘরে থাকত। আর তার পাশের ঘরে থাকত ওদের বাবা, মা, দিদি আর বোন। একটা বিশাল উঠোনের ওপারে রান্নাঘর, বাথরুম এসব ছিল।

শিবু একদিন ছাদে ওঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল যে ছাদের দরজা তালা দিয়ে বন্ধ।

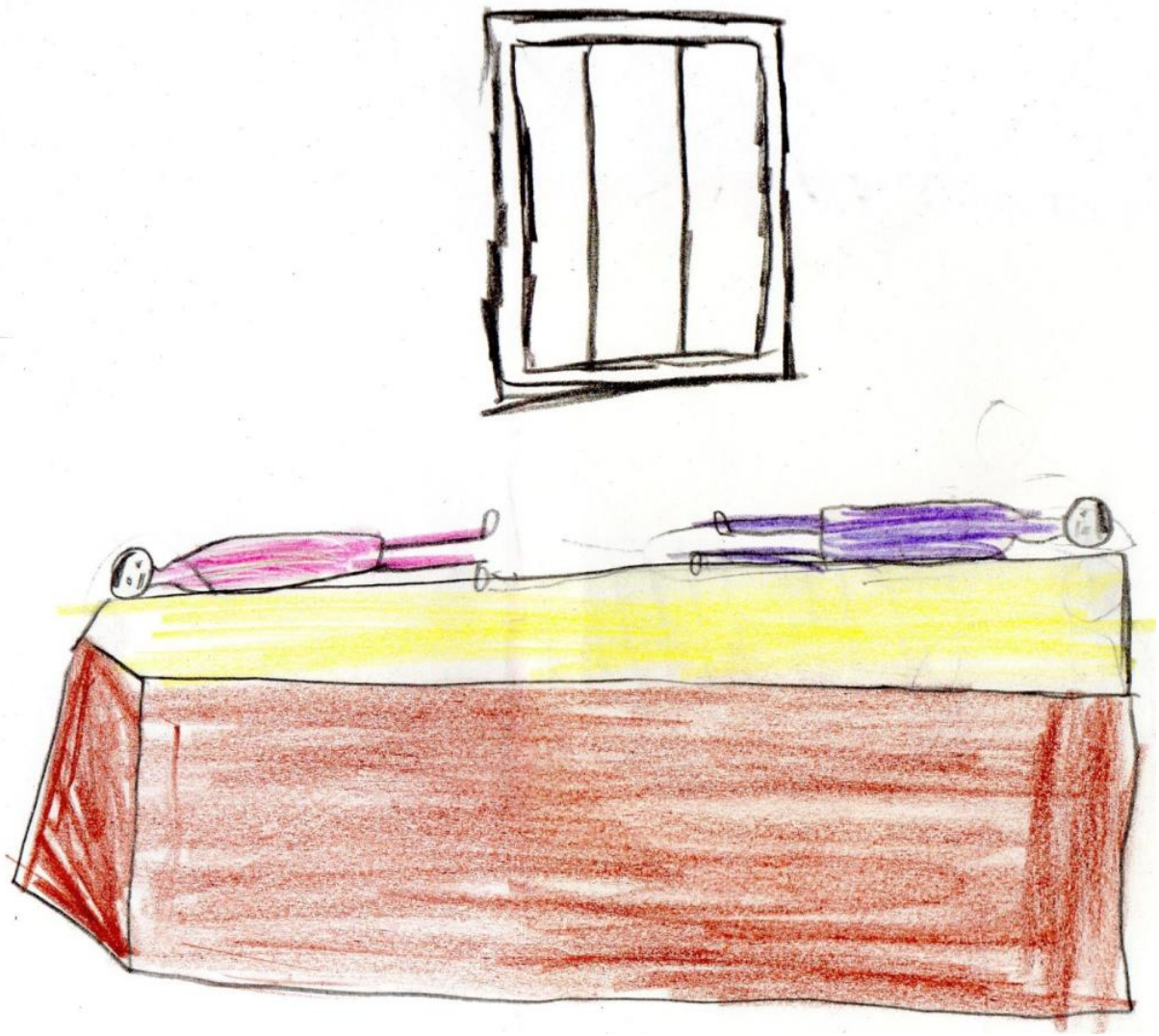

একদিন পূর্ণিমার রাতে শিবু আর সোম শুয়ে আছে। সোম নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু শিবুর কিছুতেই ঘুম আসছে না। কী রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে অনেক রকম শব্দ। পেঁচা ডাকছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। দূরে কোথাও একটা গান হচ্ছে। গানটা যেন খুব চেনা। শিবুর মনে হল পাশের ঘরে হয়তো মা রেডিও শুনছে। কিন্তু সারাদিন খাটা- খাটুনির পর বালিশে মাথা দেওয়া মাত্র তো মা ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে আজকে হল কী? সুরটা যেন ঠিক পাশের ঘর থেকে আসছেও না, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

হঠাৎ শিবুর বাথরুম পেল। উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে যেতে হত। শিবু বাইরে এসে দেখল চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। বাথরুমে ঢুকেও শিবুর মনে হল কেউ ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। বাড়িটার দিকে চোখ পড়াতে শিবু হঠাৎ যা দেখল তাতে তার লোম খাড়া হয়ে গেল।

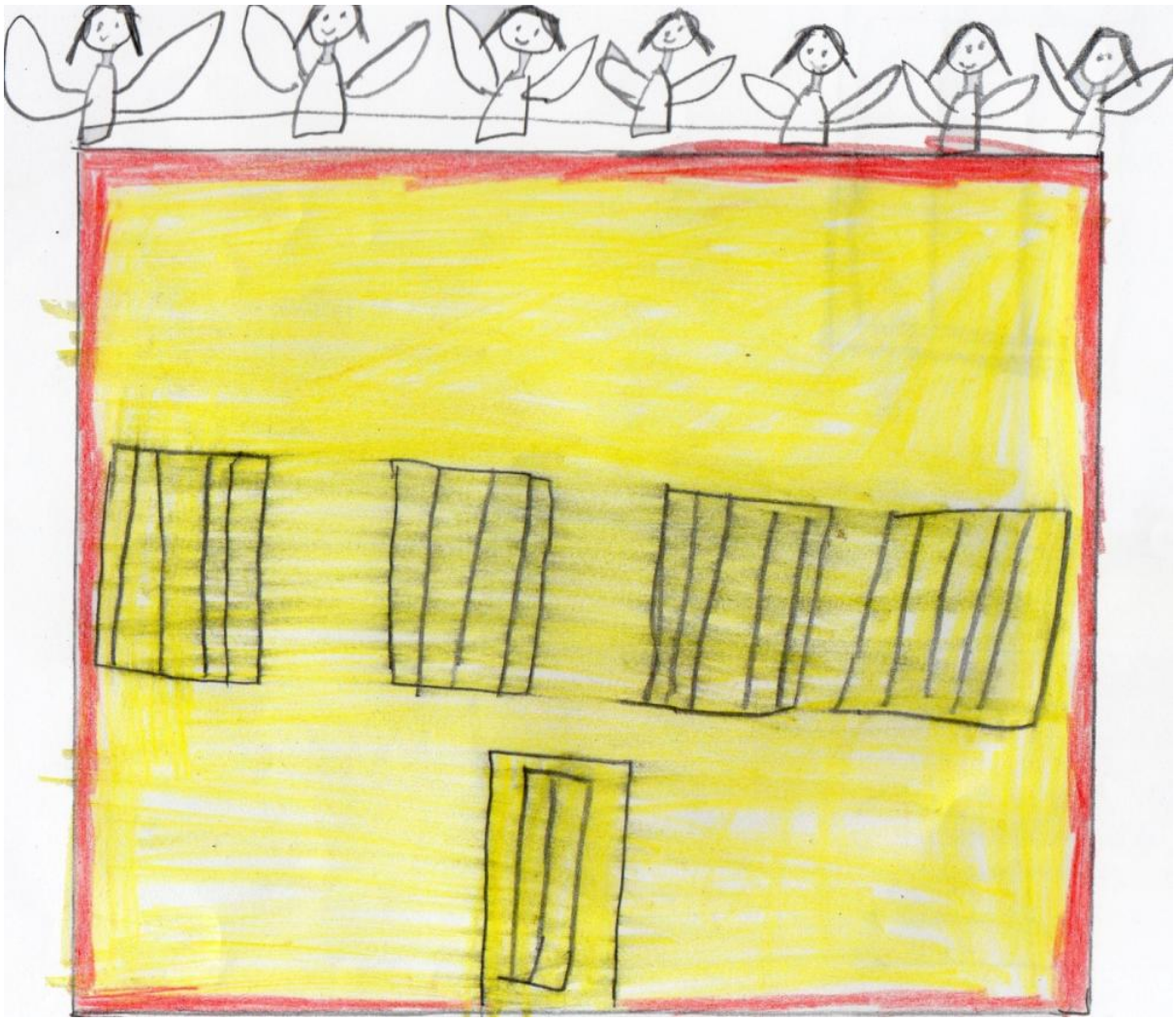

সে দেখতে পেল ছাদের ওপরে একটা কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। পরিগুলো একটা আরেকটার থেকে সমান দূরত্বে থাকার কথা। কিন্তু চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর পরির মাঝখানে ছাদের আলসেতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পরির মতই সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা, শিবুর দিকেই সোজা তাকিয়ে।

শিবু ভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে দেখল ভদ্রমহিলা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কয়েক মুহূর্ত শিবু যেন অবশ হয়ে গেল। ও বুঝতে পারছিল পালানো উচিত, কিন্তু পা সরছিল না। এমনকি চোখও সরাতে পারছিল না ওনার দিক থেকে।

কে উনি? কীভাবে ছাদে উঠলেন? এইসব প্রশ্ন তখন মাথায় এল না শিবুর। অন্ধের মত ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। অন্ধকারে সিঁড়িতে একটু বাদেই ভাগ্যিস হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে ওর হুঁশ ফিরল। অবাক হয়ে দেখল সে অত রাতে ছাদের দিকে চলেছে।

ছাদের দরজায় তালা দেওয়া, ছাদে ওঠা বারণ-- জানা সত্ত্বেও। তখনি প্রচণ্ড ভয়ে দৌড়ে এসে কোনমতে দাদার পাশে বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে ঠক- ঠক করে কাঁপতে লাগল।

দাদা জিজ্ঞেস করল, "কীরে? বাথরুম গেছিলি বুঝি?" শিবুর দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল, কোনমতে বলল, "হ্যাঁ।"

পরদিন সকালে শিবু দাদাকে সব বলল। কিন্তু কাউকে বলতে বারণ করল। সোম বলল, "শালিকদাদুকে জিজ্ঞেস করি চল।" শালিকদাদু সব শোনার পর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, "তুমি তাহলে আমাদের রানিমাকে দেখেছ। যেমন সুন্দর দেখতে ছিলেন তেমন গানের গলা। একটা ছেলেও হয়েছিল কোল আলো করে। কিন্তু এমনি কপাল ছেলেটা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে টাইফয়েড হয়ে মারা গেল। তারপর রানিমা ছেলের শোকে পাগল হয়ে গেলেন। এক পূর্ণিমার রাত্তিরে হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেলেন। এখনো মাঝে মাঝে পূর্ণিমার রাতে তাঁকে ছাদে গান গাইতে দেখা যায়।"

তারপর শালিকবুড়ো বলল, "চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। প্রথম দিনই তোমাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।" একটা ঘরের তালা খুলে একটা পুরনো ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে পুরনো ছবির অ্যালবাম বার করল সে। তার প্রথম পাতাটা খুলে বলল যে, এটা রানিমার ছেলের ছবি। শিবু চমকে উঠল। ছেলেটা হুবহু শিবুর মত দেখতে!

নচিকেতা ও সত্য

সংহিতা

পর্ব ১

শান্ত কিন্তু নির্ভীক স্বরে নচিকেতা বললেন, "একটা সন্দেহ আছে এই নিয়ে যে মৃত্যুর পর মানুষের কী হয়। কেউ বলেন যে মানুষ থাকে, কেউ বলেন যে মানুষ থাকে না। আমি আপনার থেকে মানুষের এই পরকাল সম্বন্ধেই জানতে চাই তৃতীয় বরে ।"

যম উত্তরে জানালেন, "প্রাচীনতম দেবতাদেরও এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। এ কথা জানা মোটেও সহজ নয়। বেশ অস্পষ্ট বিষয় এটা। নচিকেতা, তুমি অন্য কোনো বর চাও। আমাকে চাপ দিও না। আমার থেকে পরকালের জ্ঞানের বর চেয়ো না।"

নচিকেতা দমলেন না মোটেই। বরং বললেন, "হে মৃত্যুদেবতা, আপনি নিজেই বলছেন যে দেবতারাও এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন না আর এই বিষয়টাও মোটেই সহজবোধ্য নয়। এ বিষয়ে আপনার থেকে যোগ্যতর শিক্ষক আর কেউ হতেও পারে না। তাই পরকালের জ্ঞানের সমতুল বর আর কিছু হতেই পারে না।"

তর্ক গভীরতর হলো। যম বললেন, "শতায়ু সন্তান- সন্ততি চাও, গোসম্পদ চাও, হাতি চাও, সোনা চাও, ঘোড়া চাও। চরাচরব্যাপী ভূমির ওপর অধিকার চাও আর ইচ্ছামৃত্যু চাও যাতে যতগুলি খুশি বসন্ত পার করে তবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পার। যদি এর সমান কিছু চাও তো চাইতে পার অগাধ সম্পত্তির মালিকানা আর দীর্ঘায়ু কিংবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শাসনের অধিকার। নচিকেতা, আমি তোমাকে যা চাইবে তাই দিতে পারি। মরজগতে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যেমন স্বর্গের অপ্সরা আর তাদের রথে চড়ে তাদের নৃত্যগীতের বিনোদন, যা মরণশীল মানুষ পেতেই পারে না, তেমন কিছু তোমাকে দেব নাহয়। নচিকেতা, মৃত্যু নিয়ে কোনো প্রশ্ন কোরো না।"

নচিকেতা তাঁর প্রার্থনায় রইলেন অটল। বললেন, "হে মৃত্যুদেবতা, এই সবই নশ্বর। এ সবই মানুষের বোধকে দুর্বল করে দেয়। এমনকি দীর্ঘতম জীবনও অমরত্বের নিরিখে হ্রস্বতর। মানুষের সম্পদলিপ্সা অনন্ত, অনির্বাণ। তাছাড়া, আপনি অর্থাৎ মৃত্যু যখন সামনে উপস্থিত হন তখন কী ধনসম্পদ সঙ্গে রাখা যায়? আমরা মরণশীল মানুষেরা কী করেই বা অমরত্ব পাব আপনার অর্থাৎ মৃত্যুর রাজত্বে? নশ্বর পৃথিবীতে কোন মরণশীল মানুষই বা দীর্ঘজীবন উপভোগ করতে পারে যদি আপনার মতো অমোঘ অবিনশ্বর মৃত্যু স্বয়ং তাকে সৌন্দর্য আর ইন্দ্রিয়সুখের স্বরূপ বোঝান? হে মৃত্যুদেবতা, যা নিয়ে অপার সন্দেহ সেই পরকালের কথাই আপনি আমাকে বলুন।"

নচিকেতা অপ্রকাশিত সত্যকে জানার বর ছাড়া অন্য কোনো বর চাইলেনই না। যম তখন বললেন, "শুভ এক জিনিস, আর সহনীয় আরেক। এই দুটির ভিন্ন ভিন্ন পরিণতিই জীবনকে জড়িয়ে থাকে। যে শুভর সঙ্গে থাকে তার কল্যাণ হয়। আর যে সহনীয়কে আঁকড়ে ধরে সে জীবনের সত্য থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনে শুভ আর সহনীয় উপস্থিত হলে প্রাজ্ঞজনে দুটোকেই পরীক্ষা করে দেখেন, একটার সাথে অন্যটার তফাৎ করতে পারেন। আর শুভকেই বেছে নেন, সহনীয়কে নয়। কিন্তু নির্বোধে শরীরের আরামকে গুরুত্ব দেয় আর সহনীয় যা তাই বেছে নেয়। নচিকেতা প্রজ্ঞার বিকিরণে তুমি সহনীয় সব কিছুকে অস্বীকার করেছ। যে সম্পদের জন্য মরমানব প্রাণ দিতে পারে তুমি তা হেলায় পরিহার করেছ। অজ্ঞানতা আর প্রজ্ঞা দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য, দুটি চালিত হয় পরস্পরের বিপরীত দিকে। নচিকেতা, আমি বিশ্বাস করি তুমি প্রজ্ঞার সাধক কারণ বহু প্রলোভনেও তুমি জ্ঞানের পথ থেকে চ্যুত হও নি। নির্বোধে অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাস করে যদি নিজেকে জ্ঞানী আর শিক্ষিত মনে করে তবে তারা জীবনের জটিল চক্রে ঘুরতেই থাকে অনবরত, যেমন ঘটে এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখালে। চিন্তাশক্তিহীন অজ্ঞানের কাছে কখনও পরকালের সত্য উন্মোচিত হয় না। সম্পদের মোহ মায়ায় ভুলে 'এটাই জীবনের মোক্ষ' ভেবে সে নিরন্তর ঘুরে মরে আমার অর্থাৎ মৃত্যুর শাসনে। কেউ যার কথা প্রায় শুনতেই পায় না, কিংবা শুনতে পেলেও বুঝতে পারে না, ভাবে সেই বুঝি চমৎকার শিক্ষক, আসলে সেই চমৎকার যে উপযুক্ত শিক্ষক জ্ঞান দিলে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়। যেমন স্বল্পবোধ সম্পন্ন কেউ যতই চিন্তা করুন না কেন আত্মার যথাযথ স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কেবলমাত্র আত্মার অন্তর্লীন নিগূঢ়তার জন্যই জ্ঞানী কারুর সঙ্গ ছাড়া আত্মাকে জানা অসম্ভব। তর্কের দ্বারা একে জানা যায় না। একে কেবলমাত্র জানা যায় যদি কোনো প্রকৃত জ্ঞানী এর ব্যাখ্যা করেন। নচিকেতা, তুমি সেই আত্মাকে সম্যক বুঝেছ। তাই তুমি সত্যে অবিচল। তোমার মতো প্রশ্নকারী দুর্লভ।"

নচিকেতা বললেন, "পার্থিব ধন যে নশ্বর তা আমি জানি কারন নশ্বর মানুষ কখনই অবিনশ্বর কিছু পেতে পারে না। তাই নশ্বর উপচারে উৎসর্গে নচিকেতা যজ্ঞ করেও আমি মরণশীল, নশ্বরই থেকে গেছি।"

..... চলবে

পুরাতনী

শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

কুলদারঞ্জন রায়

সেকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ, গৌতমী নদীর তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ শিবের পরম ভক্ত- প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবের বন্দনা করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু শিবভক্ত ব্রাহ্মণের ঘরের ভিতরে তাহারা প্রবেশই করিতে পারিল না।

এদিকে, বিলম্ব দেখিয়া যম মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "সেই শ্বেত ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন? দূতেরাই বা কেন ফিরিয়া আসিতেছে না?বাস্তবিক, তুমি মৃত্যু তোমার কাজে এমন অনিয়ম হওয়া কখনই উচিত নয়।"

একথায় মৃত্যুর বড়ই রাগ হইল এবং তিনি নিজেই ব্রাহ্মণের কুটীরে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, যমদূতেরা ভয়ে ভয়ে কুটীরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- "এ কি! তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?"

দূতেরা বলিল- "স্বয়ং মহাদেব শ্বেত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেছেন, কাজেই আমরা তাহার দিকে চাহিতেও ভরসা পাইতেছি না।" মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকটে গেলেন।

কে মৃত্যু, কাহারাই বা তাঁহার দূত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই- তিনি একমনে মহাদেবেরই পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবের অনুচর দণ্ডী মৃত্যুকে পাশহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল- "তুমি এখানে কি দেখিতেছ?"

মৃত্যু বলিলেন- "আমি শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি। দণ্ডী বলিল- "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এ কথায় মৃত্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্বেত দ্বিজকে পাশ ছুড়িয়া মারিলেন। দণ্ডীও ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার হাতে ছিল মহাদেবের দণ্ড, সেই দণ্ড দিয়া মৃত্যুকে ধরাশায়ী করিল!

তখন যমদূতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া যমরাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইবামাত্র তিনিও মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। যমরাজার সৈন্যেরাও সাজিয়াগুজিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। শ্বেত ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়া সকলে উপস্থিত। দলবলসহ মহিষে চড়িয়া যমকে আসিতে দেখিয়া শিবের লোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সেখানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে অতি ভীষণ।

কার্ত্তিক তাঁহার শক্তি দিয়া যমের লোকদের কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অবশেষে যমরাজাকেও গুরুতররূপে আহত করিলেন। যমকে মরণাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ গিয়া সূর্য্যকে সংবাদ জানাইল। সূর্য্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মাও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে লইয়া, যমের নিকট গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, যম গঙ্গাতীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন।

যমকে মৃতপ্রায় দেখিয়া, দেবতাদের ত ভয় হইবার কথাই! তখন শিবকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন আর উপায় কি? সকল দেবতা মিলিয়া যোড়হস্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন- "তোমাদের পূজায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।"

দেবতারা বলিলেন- "প্রভু! এই যম ছাড়া সংসারের কাজই চলিতে পারে না। ইনি কোন অপরাধ করেন নাই। ইঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয়। অতএব আপনি সৈন্যগণ এবং বাহনসহ যমকে জীবিত করুন।"

তখন মহাদেব বলিলেন- "আমার ভক্তের মরণ হইবে না, এ কথায় যদি তোমরা সম্মত হও, তবে এখনই আমি যমকে বাঁচাইয়া দিব।" দেবতাগণ বলিলেন- "তাহা কি কখনও হয়? তাহা হইলে সংসারের সমস্ত লোকই যে অমর হইয়া যাইবে! " শিব বলিলেন- "সে কথা বলিলে চলিবে না। আমার ভক্তের কর্ত্তা আমি, তাহার উপর যম কোনদিন কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। তোমরা যদি একথা স্বীকার কর, তাহা হইলেই যমকে বাঁচাইব।"

দেবতারা তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন- "আচ্ছা প্রভু, তাহাই হইবে।" মহাদেবও তখন নন্দীকে বলিলেন- "নন্দী! গৌতমীর জল দিয়া যমকে বাঁচাইয়া দাও।"

মহাদেবের আদেশে নন্দী গৌতমীর জল আনিয়া, সকলের শিরে ছিটাইয়া দিবামাত্র যম সৈন্যগণের সহিত জীবিত হইলেন। সেদিন হইতে সংসারে ধার্ম্মিক এবং ভক্ত লোকদিগকে দেখিলেই যম তাঁহার শাসনদণ্ড নামাইয়া, ভয়ে দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়েন।

বিস্মৃত বাঙালি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

উমা ভট্টাচার্য

ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীর। সেই কাশ্মীর উনিশ শতকেও এখনকার মত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম আর শৈবধর্মের সমন্বয় ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দিকে কাশ্মীরের কোন নির্ভুল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমানাও ছিল না, ছিল না কোন রাজনৈতিক সমন্বয়। বিশাল কাশ্মীর এলাকায় ছিল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, উপেক্ষিত অরাজক এলাকা।

কাশ্মীরের প্রভূত উন্নতি শুরু হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। মহারাজ গুলাব সিংয়ের মৃত্যুর পর পুত্র রণবীর সিং রাজা হবার পর থেকে। ওই বছরই ব্রিটিশ সরকার কাশ্মীরের উন্নতির জন্য কলকাতার একজন সুশিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিককে কাশ্মীরে পাঠাতে মনস্থ করলেন। কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত, প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ও বিচারক নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে কাশ্মীর সরকারে নিয়োগ করার সুপারিশ করলেন।

রণবীর সিং সঙ্গেসঙ্গেই সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এবং নিজের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা ও উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করলেন। তখন থেকেই আধুনিক কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুরু হল।

কাশ্মীরি শাল, পশমের জিনিস ও কাশ্মীরি রেশমের কথা সবাই জানে। মোগল আমল থেকেই এই শিল্প অবলুপ্ত হতে থাকে। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই সময় বিশেষ করে উন্নতি হয়েছিল কাশ্মীরের রেশম শিল্পের।

কাশ্মীরের ওপর শুরু থেকেই ইংরেজদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সুন্দর কাশ্মীরের চারদিকেই ছিল নানা দুর্ধর্ষ পার্বত্য উপজাতির বাস। রাশিয়া আর চিনের নজর ছিল কাশ্মীরের ওপর। কাশ্মীরকে নিজেদের দখলে রাখার জন্য তাই ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম বহু কষ্ট করে কাশ্মীর উপত্যকার জরিপ করিয়ে একটি কল্পিত সীমারেখা আঁকার চেষ্টা করেছিল। সেই সময়ে কাশ্মীরকে একতাবদ্ধ করতে প্রথম চেষ্টা করছিলেন কাশ্মীর অঞ্চলের দুর্ধর্ষ রাজা গুলাব সিং। তিনি রাজা ছিলেন না। ‘রাজা’ ছিল তাঁর

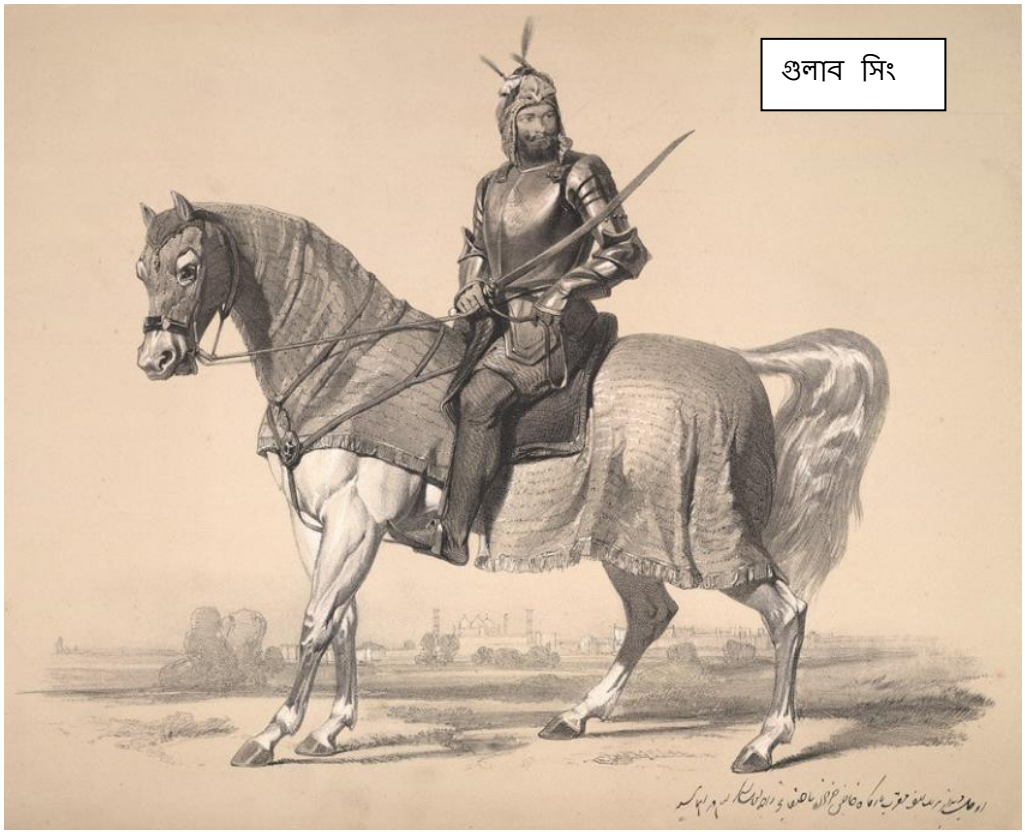

গুলাব সিং

উপাধি। ২৫ বছর ধরে কাশ্মীরের নানা এলাকা জয় করে নিজের আয়ত্তে আনার পরে তিনি রাজা হলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ সেনাপতি জোরাওয়ার সিংয়ের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীরের সুদূর এলাকাগুলিকে জয় করে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা শুরু করেন। ১৮৩৪ সালে জয় করেন লাদাখ, ১৮৪০ সালে জয় করলেন বালতিস্তান, ১৮৫১ সালে জয় করলেন পার্বত্য চিলাস এলাকা। ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহ, সংঘর্ষ, অশান্তি বন্ধ হল তাঁর ছত্রছায়ায়।

গুলাব সিংয়ের ৪০ বছরের শাসনকালে সুযোগসন্ধানী ব্রিটিশ সরকার সব কাজেই গুলাব সিংকে সমর্থন করে গেছেন। এক রাজার অধীনে আসার পর ব্রিটিশ শাসক উত্তর কাশ্মীরের সীমানা রক্ষার জন্য আর বিদেশীদের অনুপ্রবেশ রুখবার জন্য ১৮৮৯ সালে 'গিলগিট এজেন্সি' স্থাপন করেন ও একটি দুর্গ স্থাপন করেন।

রণবীর সিং

ব্রিটিশ সরকারের অন্তরে ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে নিরঙ্কুশ রাখা আর অপরিসীম সম্ভাবনাময় স্বর্গসম সুন্দর কাশ্মীরের ওপর দখল রাখা। সেজন্য দরকার ছিল কাশ্মীরে একটি বলিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন। ১৮৭০ সালে রণবীর সিং রাজা হলে কাশ্মীরের উন্নয়নের ব্যাপারে তৎপর ব্রিটিশ সরকার নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে পাঠালেন কাশ্মীরে।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত প্রগতিশীল পরিবারের সন্তান, ও কলকাতায় আদালতের বিচারপতি। তিনি কাশ্মীর সরকারের অধীনে কাজ শুরু করার পর প্রথমেই কাশ্মীরের মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হলেন। আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র, কারিগরি বিদ্যার কলেজ, পূর্তদফতর, কৃষিদপ্তর, উদ্ভিদবিদ্যা পঠনের কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করলেন। কাশ্মীরে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, হাসপাতাল স্থাপন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনও হল তাঁর উদ্যোগেই।

শিক্ষার প্রসারের আর উন্নতির জন্য, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত করার জন্য, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে কাশ্মীরি ছাত্রদের পরিচিত করানোর জন্য তিনি একটি 'অনুবাদ কেন্দ্র' স্থাপন করলেন শ্রীনগরে। সেখানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার, ও ইংরিজি ভাষায় লেখা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি সব প্রয়োজনীয় বইপত্র কাশ্মীরি ভাষাতে অনুবাদ করাতে লাগলেন। এককথায় মধ্যযুগীয় অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ মলিন অবস্থা থেকে কাশ্মীরকে নিয়ে এলেন শিক্ষার আলোকদীপ্ত, সুস্থ সামাজিক পরিবেশে। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য স্থাপন করেছিলেন 'মাহুরা পাওয়ার হাউস'। কাশ্মীরে শিক্ষকের অভাব দূর করতে কলকাতা থেকে বহু বাঙালি পরিবার, শিক্ষক, বিজ্ঞানীদের নিয়ে গেলেন কাশ্মীরে।

এরপর তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কাশ্মীরে অবলুপ্তপ্রায় রেশম শিল্পের পুনরুজ্জীবন।অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত পশম শিল্পের পাশাপাশি রেশম শিল্পের উন্নতির দিকে নজর দিলেন।

মধ্যযুগের শিল্প-সংস্কৃতির নামকরা কেন্দ্র বুখারা থেকে উপহার পাওয়া গুটিপোকার ডিম থেকে অতীতের কাশ্মীরে রেশম শিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল, আর প্রভূত নামডাক হয়েছিল। পরে এই শিল্পের অবলুপ্তিতে অনেক কারিগর পরিবার কর্মহীন হয়েছিলেন। তিনি

শিল্পটিকে উজ্জীবিত করতে প্রথমেই ধুঁকতে থাকা শিল্পটিকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে কাশ্মীর রাজের একচেটিয়া অধিকারে আনলেন ১৮৭১ সালে। বিচারপতির কাজের সঙ্গে এই দপ্তরটির দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি। বাঙলার উন্নত তাঁত আর রেশম শিল্পের কথা তাঁর মনে ছিলই। বাঙালি হিসাবে তিনি সেই শিল্পকে কাশ্মীরেও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। বাঙলার তাঁতশিল্পী আর রেশম শিল্পীদের নিয়ে গেলেন কাশ্মীরে। মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া থেকে বাইশজন রেশমগুটি বিশেষজ্ঞকে ডেকে নিলেন কাশ্মীরে।

রণবীর সিং-এর সভায় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (মাথায় অন্যরকম পাগড়ি)

এই বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানেই গুটিপোকার বিজ্ঞান সম্মত চাষ, গুটি প্রতিপালন, গুটি থেকে রেশমসুতো নিষ্কাশন প্রভৃতি কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগলো আর কারিগরদের দ্বারা চলল বস্ত্র বয়নের কাজ। কাশ্মীরে রেশম শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হল তাঁর হাত ধরে। কর্মসংস্থান বাড়ল।

এই সময়ই বহু বাঙালি পরিবার কাশ্মীরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। কাশ্মীরে একটি বিশাল বাঙালি এলাকা গড়ে উঠেছিল। যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় কাশ্মীরের জনজীবনে ও অর্থনীতিতে বিপুল উন্নতি সংস্কার হয়েছিল, তিনি কাশ্মীরকে শুধু নিজের কর্মস্থল ভাবেন নি, ভেবেছিলেন অখণ্ড বিশাল ভারত ভূখণ্ডেরই দেহাংশ। দেহের একটি দুর্বল অঙ্গ যেমন একটি মানুষকে সম্পূর্ণ হতে দেয়না, তেমনি দেশের একটি অংশ দুর্বল হলেও দেশেরই ক্ষতি। এই মহামূল্য কথাটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাইতো নিজের রাজ্য, ঘরবাড়ি, পরিজন ছেড়ে সুদূর কাশ্মীরে গিয়েও সেখানকার এত উন্নতি করেছিলেন! দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ছিল বলেই তিনি বিপ্লবী না হয়েও দেশেরই সেবা করে গেছেন। আজ আমরা বাঙালিরা, এমনকি কলকাতাও কি তাঁকে মনে রেখেছে? জয়ঢাকের পূজা সংখ্যায়, 'স্মরণীয় যাঁরা' পর্বে তাঁর কথা লিখে সামান্য শ্রদ্ধা জানালাম।

সংযোজন

কাশ্মীরে রেশম শিল্প কী করে এসেছিল সে এক মজার ঘটনা! প্রাচীন ভারতের এলাকার মধ্যে ছিল উত্তরে বর্তমান কাশ্মীর ছাড়া খোটান, কাশগড়, ব্যাকট্রিয়া, পূর্ব দিকে চিনের কিছু অংশ, তিব্বত পর্যন্ত। ছিল নানা জাতি, নানা উপজাতির বাস। বিশাল সিন্ধুর অববাহিকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল ভারতঃ সিন্ধুস্থান বা হিন্দুস্থান। অবাধ যাতায়াত চলত সবগুলি

অঞ্চলের মধ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান, বিবাহ, আবার যুদ্ধবিগ্রহও চলত এই বিশাল অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে। কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। যেখানে যার অধিকার সেখানেই তিনি সর্বেসর্বা। ছিল শুধু কারাকোরাম বা কৃষ্ণগিরি, পীরপঞ্জাল, হিন্দুকুশ, সুলেমান পর্বতের দুর্গম বেড়া, আর ছিল অনেক গিরিপথ। সেই পথেই আলেকজাণ্ডারের পর থেকে অনেকেই এসেছেন ভারত অভিযানে। এরই দক্ষিণে, ভারতের মূল ভূখণ্ডের উত্তরে ছিল কাশ্মীর। পাঠানরা যখন প্রবলশক্তি, সেই সময়ে কাশ্মীরে আসে রেশম শিল্প। তার আগে ভেড়া ইত্যাদি পশুপালন আর এদের গা থেকে পাওয়া পশমই ছিল সাধারণ মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়।

সেই সময় প্রতিবেশী অঞ্চল বুখারার শাসক মীর্জা হায়দর, কাশ্মীরের এক শাসককে কোন উৎসব উপলক্ষে নানা উপহারের সঙ্গে এক ছটাক গুটিপোকার ডিম পাঠিয়েছিলেন। কাশ্মীরের শাসক তো উপহার পেয়ে অবাক। অবাক হবারই কথা। কিন্তু মীর্জা হায়দার এই জিনিসটির ব্যবহার কীভাবে করতে হবে, কী কাজে. লাগবে সব জানিয়ে একটি চিঠি লিখে একজন কারিগরকেও পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে হয়েছিল কাশ্মীরে রেশম শিল্পের পত্তন ও প্রসার। পরে মোগল আমল থেকে এই শিল্পের অবনতি শুরু হয়, আর দুরানী রাজত্বে একেবারে শেষাবস্থা হয়েছিল। কাশ্মীরে এ শিল্পের আবার পূণর্জন্ম হয়েছিল বাঙালি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে।

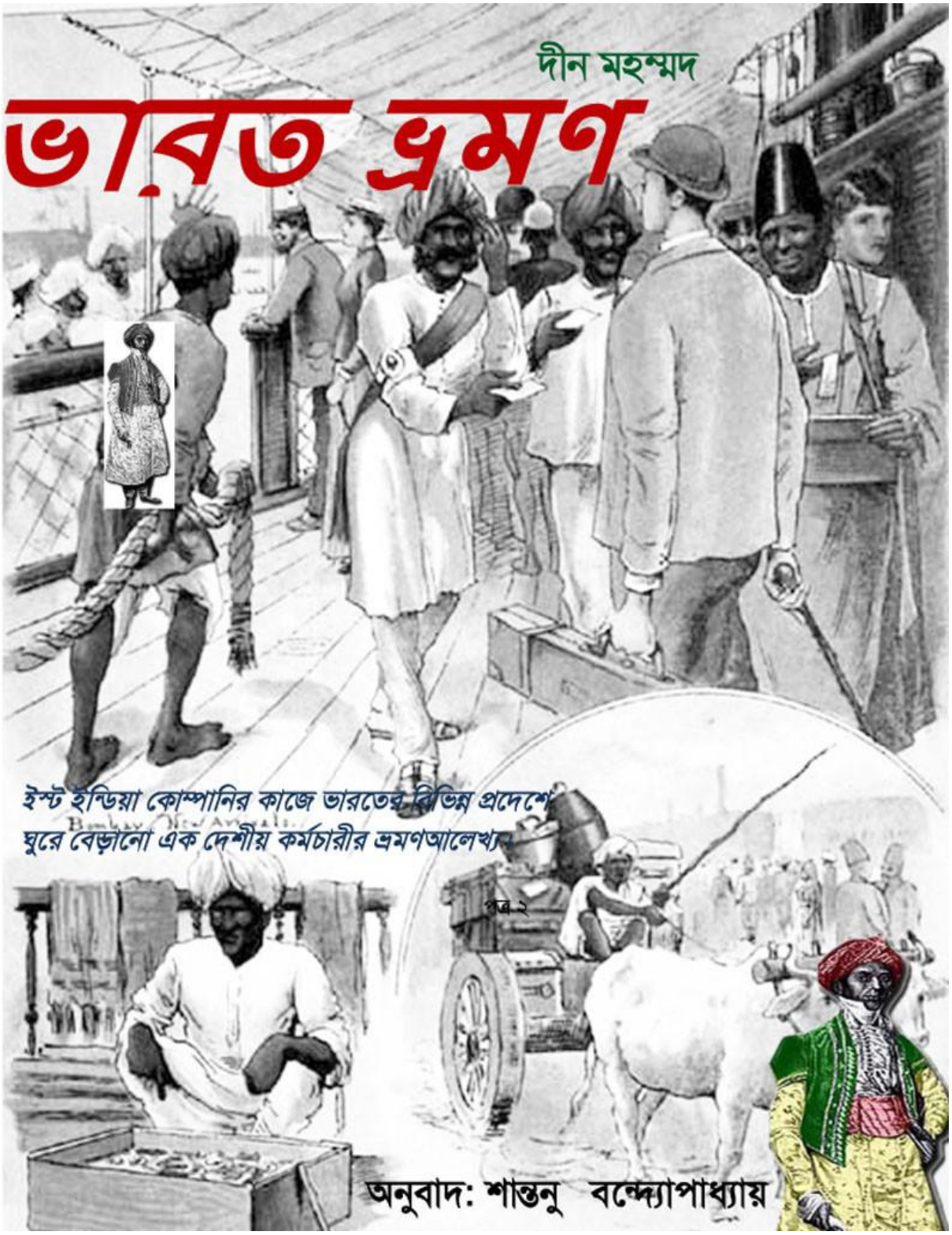

পত্র ১৬

কলকাতায় সৈন্যদলের যে অংশটা আমরা ছেড়ে এসেছিলাম সেটা বহরমপুরে এসে গেল। আমরা বহরমপুর ছাড়ার আগেই। আর তার পরপরই গোটা পল্টন, হুকুম হল, দেনাপুর রওনা হবার। ১৭৭৫ সাল নাগাদ পৌঁছলাম সেখানে। এই বাংলায় মোট তিনটে পল্টন ছিল। সকলেরই উর্দি ছিল একই রকম, গাঢ় লাল রঙের। প্রথম দলের পোশাকে নীল রঙের,

দ্বিতীয়ের কালো আর তৃতীয়ের হলদে রঙের ছোঁয়া। প্রতিটা সৈন্যদলেই একদল ইউরোপীয়, ছয় রেজিমেন্ট অর্থাৎ বারো ব্যাটালিয়ান দেশীয় সেপাই, তিন কম্পানি ইউরোপীয় গোলন্দাজ, পাঁচ কম্পানি দেশীয় গোলন্দাজ, আর দুই কম্পানি পদাতিক সেনা রয়েছে। এক রেজিমেন্ট সেপাই মানে দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য। এক এক ব্যাটেলিয়ানে ৫০০ করে সৈন্য মানে পাঁচ কম্পানি সৈনিক। প্রত্যেক কম্পানিতে রয়েছে একজন ক্যাপটেন, দুজন লেফট্যানেন্ট, তার চেয়ে একধাপ নীচে আরও তিন এনসাইন অফিসার, একজন সার্জেন্ট মেজর। সকলেই ইউরোপীয়। দেশীয় সেপাইদের পদ ছিল এরকম; একজন সর্দার, পাঁচ সুবেদার, দশজন জমাদার, তিরিশজন হাবিলদার, তিরিশজন হোমালদার*, পাঁচ জয়ঢাক বাদক, পাঁচ বাঁশিওয়ালা আর পাঁচজন শিঙাবাহক।
এই নামগুলো আপনার বুঝতে অসুবিধে হবে ভেবে আমি ব্যাপারটা আরেকবার এইভাবে সাজিয়ে লিখলাম,

ক্যাপটেন = সর্দার, লেফট্যানেন্ট = সুবেদার, এনসাইন = জমাদার, হাবিলদার = সার্জেন্ট, হোমালদার = একধাপ নীচের অফিসার, সেপাই = ভাড়াটে সৈন্য, ড্রামার = জয়ঢাক বাজিয়ে, ফাইফ = বাঁশিওয়ালা আর ট্রাম্পেট বাজিয়ে = শিঙাবাহক।

সেপাইদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে। বাইরে থেকে দেখে আলাদা করার উপায় নেই। শুধুমাত্র হিন্দুরা কপালে আর গালে চন্দনের তিলক কাটে। দুজনেরই পরনে মসলিনের শার্ট, লাল কোট, মাথায় পাগড়ি, কাঁধে একটা ভাঁজকরা কাপড়, আর হাফপ্যান্ট। কাঁধের চাদর আর পাগড়ি, মূলত মসলিনের এবং নীল রঙের। পাগড়িগুলি বেশ আঁটোসাঁটো। গড়নে স্কটিশ টুপির কাছাকাছি বলা যায়, শুধু সামনেটা সমান। যার ওপর রুপোর ঘের- লাগানো ব্যাজ লাগায় সৈনিকেরা। মধ্যিখানে অবশ্যই একখানা তারা। পাগড়িতে তার দিয়ে বানানো আরও সব অলঙ্কারের মতো লাগানো থাকে। গলায় দু তিন থাক কাঠের তৈরি মালা। বাঁ কাঁধে একটা ঢাল। অফিসারেরা রুপোর বা কাচের বোতাম লাগান, গাঢ় লাল রঙের কোট পড়েন, তার দলের ইউনিফর্মের সাথে মিলিয়ে। বিশহাতি লম্বা নীল রঙের উত্তরীয় আর পাগড়ি, লম্বা পাজামা, বড়ো জুতো আর বাঁ কাঁধে ঢাল।

সেপাইরা সাধারণনত অস্ত্রশস্ত্র চালাতে সিদ্ধহস্ত এবং যথেষ্ট নিয়মানুবর্তী। ইয়োরোপীয়রা সংখ্যায় অল্প। দেশীয় সেপাইরাই মূল শক্তিটা জোগায়। প্রায়শই এরা বলিষ্ঠতা আর কার্যকারীতার প্রমাণ দিয়ে থাকে। এই চিঠির সাথে আমি হিন্দি আর পার্শি শব্দের ইংরিজি অর্থগুলির একটা তালিকা দিলাম। কেননা এদেশে, ইওরোপে, এই শব্দগুলোর সাথে অধিকাংশ মানুষই পরিচিত নন।

আমদানি - বাইরে (দেশ) থেকে আনা। আরজি – আবেদন জানানো। আসামী - নানান ধরনের ব্যবসায়ী *(অসম প্রদেশের ব্যবসায়ী মানুষ - অনুবাদক)* ভাং – একধরনের উদ্ভিদ যা মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাজার – জিনিসপত্র কেনাবেচার জায়গা। বাদশা – রাজা। বাদশাজাদি – রানি। বেগম – রাজকন্যা। বিটেল – পানপাতা। ব্রাহ্মিন – পুরোহিত। বক্সিয়ার

– তলোয়ারধারি পদাতিক সৈনিক। বন্দর - শুল্ক আদায়গৃহ। খান – সম্মানীয় পদবী। গাজি – যাজক। মোহরছাপ – মোঘল বাদশাদের সিলমোহর। ছত্রী – ভ্রমণকারিদের জন্য ছাউনি। চৌথ – এক চতুর্থাংশ অথবা সৈন্যবাহিনীর আদায়ী খাজনা। চৌকি – পাইক বা পাহারাদার। কাফ্রি – আফ্রিকান নিগ্রো সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের সৈনিকের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুলি মালবাহক। ক্রোশ – দু মাইল। কসিদ – রানার বা ডাকহরকরা। কাওল – মাপ করে দেওয়ার আদেশ। দারোগা – শুল্ক আদায়কারী। ডাকাত – লুটেরা। সর্বস্ব কেড়ে নেয় যে। দেওয়ান – রাজার খাজাঞ্চি। দেওয়ানি – রাজস্ব বা কর আদায় দেখভালকারী। ডুলি – বহনযোগ্য কেদারা, মূলত মেয়েদের জন্য ব্যবহৃত। দামোদর – পূর্বভারতের একটি নদী। দরবার – মোঘলদের রাজসভা বা বিচারসভা। দস্তক – আদেশনামা। ফরমান – রাজ আদেশ বা হুকুম। ফৌজদার – স্থানীয় শাসক, সেনা অফিসার অথবা মালিক যে ভাড়া দেয়। হিন্দু – একজন সাধারণ ভারতীয় মানুষ। গোমস্তা – দালাল। গঞ্জ – শস্যবাজার। কাহার – পালকিবাহক। ছ্যাকরাগাড়ি – বলদে টানা গাড়ি। হরকরা – গুপ্তচর। জায়গীর – সম্মান জানানোর জন্য অথবা অবসরভাতা হিসেবে প্রদত্ত এলাকা বা জেলাবিশেষ। (ঠুঁটো) জগন্নাথ – অকর্মন্য। জমাদার – পতাকাবাহক। কিলাদার – কেল্লার অধিনায়ক। কিস্তিবন্দী – রাজস্ব প্রদানের সময়সীমা। লাখটাকা – ১২৫০০ স্টার্লিং। মন – ৭০- ৮০ পাউন্ড, সুরাটপ্রদেশে ৩৭ পাউন্ড। মুন্সি – পার্শি সহকারী। মৌলানা – মুসলমান পাদ্রী। মুহুরি – মুসাবিদা করার লোক। মুচলেকা - বাধ্যতামূলক দস্তখত। মসনদ – ভারতীয় রাজপুত্রের সিংহাসন। মুর্শিদাবাদ – বাংলার রাজধানি শহর। নবাব – সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তা। নায়েব – রাজ্যপালের সহকারী। ওমরাহ – মোঘল দরবারের প্রথম সারির অমাত্য ও পারিষদগন। ধান- চাল উৎপন্ন হয় যা থেকে, একধরনের খাদ্যশস্য। ধানজমি – ধানগাছ লাগানো চাষের জমি। প্যাগোডা – ভারতীয় মন্দির। প্যাগোডা – ভারতীয় স্বর্নমুদ্রা, চল্লিশ পাউন্ডের কাছাকাছি। পালকি – একধরনের মনুষ্যবাহিত যান। পার্শি – সূর্যের উপাসক। পতমার – বার্তাবাহক। পিওন – লম্বা তলোয়ারবাহী পদাতিক সৈন্য। পরগনা – কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। পরোয়ানা – আদেশপত্র, পাত্তাহ (?) – দুর্গের চারপাশ ঘিরে অবস্থিত শহর। পোদ্দার – মুদ্রা বিনিময়কারী। পলিগর *(পালাইয়াক্কারার বা পালেয়াগারা- এর ইংরিজি অপভ্রংশ- অনুবাদক)* – আঠারো শতকে, দক্ষিণ ভারতের জেলার অধিকর্তার পদ। পানসি – রক্ষীনৌকো। পাট্টা – দানপত্র, রাজা – হিন্দুদের সর্বোচ্চ খেতাব, মহারাজ। রায় রায়ান – খেতাব, রাজার রাজস্ব গ্রহণকারী (*রাজার রাজা খেতাব - অনুবাদক*)। রফতানি – অন্যত্র (দেশে) মালপত্র পাঠানোর প্রক্রিয়া। টাকা – রুপোর মুদ্রা , বারো পাউন্ডের সমান। সনদ – মোঘল সাম্রাজ্যে সুবাদার বা নবাবের পাঠানো আদেশ। সর্দার – অশ্বদলের দায়িত্বে থাকা অফিসার। সেপাই – ভারতীয় পদাতিক ভাড়াটে সৈনিক। শ্রফ – মহাজন। সরকার - দেশ পরিচালকবৃন্দ অথবা রাজকর্মচারীদের প্রচলিত ডাকনাম। শিরোপা – সাম্মানিক হিসেবে প্রাপ্ত একধরণের উষ্ণীষ। সুবা – দক্ষিনের বা বাংলার ভাইসরয়, ট্যাঙ্ক – পুকুর বা জলাশয়। টঙ্কা – সুরাতে মোঘলদের নৌবহর রাখার বিনিময় রাজস্ব। টাঁকশাল – মুদ্রা ছাপার জায়গা। তেলেঙ্গা – কর্নাটকি দেশ। তেলিঙ্গা – কর্নাটকি সৈনিক। টমটম – বড়ো ঢোলকবাদ্য বা ড্রাম বিশেষ। টোপাসে – পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত

পদাতিক সৈনিক, টুপি পরিহিত বলে সম্ভবত এমন নাম। টুনকা - কোম্পানিকে দেয়া জমির অধিকার। তোষাখানা – পোষাক রাখার জায়গা। জেনানা – মহিলামহল। উকীল - নবাবের রাজসভায় ইংরেজ প্রতিনিধি। উজিরি – উজির হবার সম্মতি প্রদান। জমিন – মাটি। জমিদারি – ব্যক্তিগত জমি থেকে খাজনা আদায়কারির কাজ।

আগের সংখ্যায় ১১ নং পত্র অবধি প্রকশিত হয়েছিল। ১২,১৩, ১৪ ও ১৫ নং পত্র প্রধানত বড়োদের জন্য। সেগুলি জয়ঢাকে অন্তর্ভূক্ত হল না। উৎসাহী পাঠক www.padokkhep.wordpress.org সাইটের "প্রবন্ধ নিবন্ধ" সে চিঠিগুলির অনবাদ দেখতে পাবেন।

ক্রমশ

।২৪।

পরদিন বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খানের কাছে গিয়ে আমি বললাম, "নবাবকে কেন সঙ্গে এনেছি সেটা আশা করি অনুমান করতে পারছ।"

বদ্রীনাথ জবাব দিল, "সে তো বুঝতেই পেরেছি। কিন্তু কাজটা করবে কীভাবে? রাস্তায় ধরলে তো ব্যাটা মরবার আগে আমাদের বেশ কটাকে কেটে ফেলবে। আমার এখনই মরবার কোন ইচ্ছে নেই।"

"ভালো বলেছ। ওসব ঝুঁকি আমিও নিতে রাজি নই। তবে সুযোগ খুঁজছি একটা। মনে হয় পেয়েও যাবো খুব শিগগির," আমি বললাম।

"কিন্তু করবে কীভাবে?"

"বলছি। নবাব গত দুদিন ধরেই বলছে, ভালো একটা নদীটদী পেলে তার জলে ভাঙের শরবত বানিয়ে খাবে। দুদিন ধরে ভালো জলের অভাবে ভাং না খেয়ে তার অবস্থা কাহিল। আমি যা খবর নিয়েছি তাতে কাল আমরা একটা ভালো জলওয়ালা নদী পাব। সেখানে ওর দাসী মেয়েটা যদি ভাং ঘুঁটতে বসে, তাহলে ও ঘোড়া থেকে নামবেই। তখন একটা সুযোগ পেলে ব্যাটাকে ধরা যেতে পারে। কী বলো?"

সরফরাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে, "কোন সমস্যা হবে না মীরসাহেব। ব্যাটা যদি একবার বসে পড়ে তাহলে ওর অস্ত্রশস্ত্র আর কোন কাজে আসবে না।"

বদ্রীনাথ কী যেন ভাবছিল। খানিক বাদে বলে, "লোকটা নবাব। সাধারণ কোন বুনিজ নয়। মারলে পরে অন্য বিপদ হয়ে যেতে পারে। আমি বলি, একে যেতে দাও মীরসাহেব। কোন ক্ষতি কোরো না।"

"তোমার কাছে এমন কথা আমি আশা করিনি বদ্রীনাথ," আমি চিৎকার করে উঠলাম, "আরে নবাব হোক আর যাই হোক, মানুষ তো বটে! মানছি, আমাদের বাপঠাকুর্দা কখনো নবাব মারেনি। কিন্তু তাতে সমস্যাটা কোথায়? আর সবজি খানের মত এমন একটা বীরকে মারতে পারলে আমাদের নামডাকটা কেমন হবে বুঝতে পারছ?"

"বাপঠাকুর্দা কেউ এমন কাজ করেনি সেটাই তো আমার চিন্তার কথা। ভবানী কিন্তু নিয়মভাঙা কাজ হলে অসন্তুষ্ট হন।"

"ঠিক আছে, এ ব্যাপারে ভবানীর সংকেত কী সেটা গুণেটুনে দেখে নাও। সংকেত যদি শুভ হয়, তাহলে ইনশাল্লা, সবজি খানের শিকার আমি করবই।"

বদ্রীনাথ হাসল, "এইবারে একেবারে ঠগির ব্যাটা ঠগির মত কথা বলেছ মীরসাহেব। আমি যা করার করছি। ভবানীর সংকেত যদি শুভ হয় তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

সেদিন সন্ধেবেলায় বদ্রীনাথ এসে একগাল হেসে বলে, "সব ঠিক আছে। ভবানী দারুণ শুভ সংকেত পাঠিয়েছেন।"

শুনে আমি সোল্লাসে বললাম, "মা অ্যাদ্দিন আমাদের যা সৌভাগ্য দান করে এলেন এ যাত্রায় তার পরে তোমরা যে কেন এত সন্দেহ করছিলে কে জানে। এখন শোন, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে গেলে সেই নদীটা পাব। জল নাকি খুব ভালো তার। দুপাড়েই গভীর জঙ্গলও আছে। ওখানেই কাজটা সেরে ফেলব। লুগাই পাঠিয়ে দিই কবর খোঁড়ার জন্য। কী বল?"

"দরকার হবে না," বদ্রীনাথ বলে উঠলো, "জঙ্গল যা গভীর বলছ তাতে মেরে সেখানে ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আর গর্ত যদি করতেই হয় তাহলে বালি খুঁড়ে গর্ত বানাতে সময় বেশি লাগবে না। দলের বাকি লোকগুলোকে কে কে মারবে সে'সব তো ভাগবাঁটোয়ারা আমাদের আগেই হয়ে গেছে। আমি তো মারব ওই যে লোকটা নবাবের জেমাদার বলে নিজেকে ওইটাকে। বাকিদের জন্যও লোক ঠিক হয়েছে। নবাবকে আমি তোমার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তবে একটা কথা। এর সঙ্গে একলা লাগতে যেও না। চারপাঁচজন মিলে ধরাটাই ঠিক হবে।"

"উঁহু, বেশি লোক লাগবে না আমার। শুধু সরফরাজ খানকে সঙ্গে নেব। ওতেই হয়ে যাবে।"

"ভালো। সরফরাজ খান তাহলে শামসিয়ার কাজটা করবে। পাকড়ে ধরতে ও বেশ ওস্তাদ।"

রাতের মধ্যে পরামর্শ করে সব ঠিকঠাক করে নিয়ে সকালবেলা আমরা বেশ খুশি খুশি ভাব নিয়ে রওনা দিলাম। সে দিনও যথারীতি দলের আগে আগে ঘোড়ায় চেপে আমি আর নবাবসাহেব চললাম।

চলতে চলতে নবাব বলেন, "কী ভীষণ বাজে রাস্তা মীরসাহেব। তিনদিন হয়ে গেল, ভাং ঘোঁটবার মত ভালো জলের একটা পুকুর বা নালা পড়ল না রাস্তায়!"

"একটু ধৈর্য ধরুন খোদাবন্দ," আমি ভরসা দিয়ে বললাম, "সামনে এগিয়ে দেখি, কোথাও না কোথাও ভালো একটা জলের জায়গা মিলবেই। পেয়ে গেলেই আমরা ঘন্টাখানেকের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিয়ে নেব। সঙ্গে কিছু ভালো খেজুর আছে। সেই খেয়ে একটু জলটল খেয়ে নেব।"

নবাবেরও বোঝা গেল বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আমার কথা শুনে বলেন, "বেশ বেশ, আমিও কটা খেজুর খাব তাহলে। এই পাহাড়ি হাওয়ায় খিদেটা একটু বেশিই পাচ্ছে আজকাল আমার।"

বেশ কয়েক ক্রোশ যাবার পর গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে শোনা সেই ছোট্টো নদীটার দেখা মিলল। সেদিকে দেখিয়ে আমি বললাম, "ওই দেখুন খোদাবন্দ।

জলটা কেমন চকচক করছে দেখেছেন? এ জল ভালো না হয়ে যায় না। চলুন গিয়ে ওখানে বসা যাক।"

নদীর ধারে গিয়ে ঘোড়ার জিনের ওপরের কম্বলগুলো নামিয়ে এনে তাই পেতে বসা গেল। নবাবের দাসী ততক্ষণে এসে ওঁর ভাং ঘুঁটতে বসে গেছে। দলের বাকি লোকজনও এসে ছড়িয়েছিটিয়ে বসে গল্পগাছা করছে। আড়চোখে তাকিয়ে আমি একবার দেখে নিলাম, সবাই নিঃশব্দে তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যেই। এমনভাবে ভাগ হয়ে গিয়ে বসেছে যে নবাবের একেকজন সেপাইয়ের কাছে আমাদের তিনটে করে লোক রয়েছে।

আজিমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবার দরকার ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, "সামনের রাস্তাটা ভালো আছে। তুমি বরং গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাও। আমরা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে তোমাদের ধরে ফেলব।"

আজিমা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের রাস্তা শেষ হবে কবে গো? সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেল যে চলতে চলতে।"

বললাম, "আর দুএকদিন কষ্ট করো। কোন একটা শহরে এসে পৌঁছোলেই আমি তোমার জন্য একটা ডুলির বন্দোবস্ত করে দেবো। তখন আর এত কষ্ট হবে না দেখো।"

আজিমা রওনা হয়ে গেলে আমি নবাবের কাছে ফিরে এসে দেখি তাঁর নেশাটা জমে উঠতে শুরু করেছে। হাতে ভাঙের ঘটি নিয়ে বসে তিনি বাবার সঙ্গে গল্পগাছা করছিলেন। আমায় আসতে দেখে বলেন, "এই যে মীরসাহেব, তোমার বাবাকে আমি একটু ভাং খেয়ে দেখতে কতবার অনুরোধ করলাম। উনি শুধু বলেন, এই তেতো রস ওনার সহ্য হয় না। তা তুমি একটু চেখে দেখবে নাকি? স্বর্গীয় জিনিস হে! দুঢোঁক খেলে ঠান্ডা টান্ডা সব পালাবে দেখো। ভাঙের শরবত বানানোয় আমার এই কুরিনা মেয়েটার জুড়ি তুমি পাবে না হে হিন্দুস্তানে! "

বলতে বলতে ভাঙের ঘটিতে চুমুক মেরে নবাবসাহেব গান ধরলেন, "পিয়ালা পিয়া, তো ম্যায়নে পিয়া, ফির কিসিকো ক্যা, " তারপর উড়ুতে চাপড় মেরে বলেন, "আরে দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে সবজি খান সবজি খায়, কিন্তু লড়াইটাও লড়তে জানে! আহা মীরসাহেব, এখন যদি দুটো সুন্দরী মেয়েতে মিলে খানকয় গজল শোনাত তাহলে সাক্ষাৎ স্বর্গ নেমে আসত এই জঙ্গলে হে! "

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে বললাম, "একটা বড়োসড়ো গ্রাম পেলে সেখান থেকে কটা নাচনেওয়ালি ভাড়া করে সঙ্গে নিয়ে নেবো, কী বলেন হুজুর?"

"আহা দারুণ, দারুণ। কী ভালো কথা শোনালে হে, " ভাঙের নেশা জমে গিয়ে নবাবসাহেবের কথা তখন জড়িয়ে আসছে। একটু বাদে হঠাৎ বলেন, "আহা কী কথা শোনালে, নাচনেওয়ালি ঘুঙুর পায়ে এই যে, এইরকম করে নাচবে, দেখো দেখো- - "

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে বেতালা নাচ জুড়ে দিলেন নবাবসাহেব। দেখে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। খানিক নেচেটেচে আবার বসে পড়লেন নবাব। বসে পড়েই ফের

হাঁক, "কুরিনা, আরো সবজি আন্। ঘুম ঘুম পাচ্ছে যে। ঘুমটা কাটাতে হবে। জলদি আন্।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে ঝিরনি দিয়ে দিলাম, "ফজিল খান, হুঁকো আনো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকেও দু টান দিও হে! শরবতের সঙ্গে জমবে ভালো- - "

আমি রুমাল হাতে নবাবের পেছন দিকে গিয়ে সরফরাজ খানকে ইশারায় বললাম নবাবকে চেপে ধরতে।

"আরে, নবাবসাহেব, দেখুন দেখুন, " বলতে বলতে সরফরাজ খান তাঁর ডানহাতটা গিয়ে চেপে ধরল সঙ্গে সঙ্গে।

"ব্যাটা নফর, তোর এত সাহস, একজন নবাবকে ছুঁয়ে দিলি? তুই- - "

বলে সবজি খান চিৎকার করে উঠেছিলো, কিন্তু তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি তার গলায় রুমালটা পরিয়ে টেনে ধরলাম। সরফরাজখান হাতদুটো ধরে রইল আর বাবা তাঁর পা দুটো ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। নবাবের গলা থেকে ঘড় ঘড় করে আওয়াজ বের হতে লাগল। তারপর তাঁর শরীরটা খানিক ছটফট করে একেবারে থেমে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে শতেক জওয়ানের প্রাণ নেয়া সবজি খান আমার রুমালের টানে প্রাণ দিলেন।

নবাবের গা থেকে সরফরজ খান তাঁর অস্ত্রশস্ত্রগুলো খুলে নিচ্ছে এমনসময় পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠলো। নবাবের দাসী কুরিনার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। সে উল্টো মুখ করে বসে ভাঙ ঘুঁটছিলো। কিচ্ছু খেয়াল করে

নি। হঠাৎ পেছনে ফিরে সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে ছুটে এসে নবাবের শরীরটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল। দাসী হলে কী হয়, নবাবকে সে সত্যি ভালোবাসত। কাঁদে আর বলে, "এ হতে পারেনা। ওঃ মাগো, চোখদুটো কেমন ঠেলে বের হয়ে আসছে, ওঠো নবাব, উঠে বসো—ও মা, এ নড়েনা কেন? কথা বলে না কেন?"

এই বলে সে বুক চাপড়ে এমন কাঁদতে শুরু করল যে সেখানে থাকা যায় না। আমি চাপা গলায় বললাম, "কে আছিস? মেয়েটার কষ্টের শেষ কর। আমি মেয়েদের গায়ে হাত দিই না।"

সরফরাজ খান মেয়েটাকে একদৃষ্টে দেখছিলো। কুরিনাকে দেখতে ভারি সুন্দর। খানিক তাকে দেখে নিয়ে সে বলল, "মেয়েটা ভালো। একে বাঁচবার একটা সুযোগ দেয়া যাক।" এই বলে তার কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরে সজোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সরফরাজ বলে, "এই শোন, ন্যাকামো বন্ধ কর। আমার বউবাচ্চা নেই। আমায় বিয়ে করবি কিনা বল? রাজি থাকলে আমার সঙ্গে আয়, নাহলে প্রাণে বাঁচবি না। একটা মরা নিয়ে এত আদিখ্যেতা কীসের? ছিলি তো এর দাসী! "

মেয়েটা নীচু গলায় বলল, "ওসব বোলো না গো! আমি ওনার দাসী ছিলাম। আমায় তোমরা ওঁর সঙ্গেই যেতে দাও।"

"শোন বোকা মেয়ে, " সরফরাজ খান আর একবার চেষ্টা করল, "এই সবার সামনে আমি কথা দিচ্ছি তোকে আমি সুখের সংসার দেব। কথা শোন, নইলে আমার এক ইশারায় প্রাণটা খোয়াবি। ভালো চাস তো উঠে গিয়ে আমার ঘোড়ায় বোস। যে চলে গেছে তাকে ভুলে যা।"

"ভুলে যাব? আমার মালিককে আমি ভুলে যাব? কেমন করে ভুলব? আমায় তোমরা মেরে ফেল গো। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাই।"

"বোকা মেয়ে, আমার কথা শোন- - "

উত্তরে সে মেয়ে ফের নবাবের শরীরটাকে শক্ত করে চেপে ধরল।

আমার রাগ হচ্ছিল খুব। চারপাশে দাঁড়ানো লোকজনকে ধমক দিয়ে বললাম, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা না দেখে শরীরটা তুলে নিয়ে যা তাড়াতাড়ি।"

শুনে লুগাইরা এগিয়ে এসে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে শরীরটাকে

উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

দুজন লোক মেয়েটাকে দুদিক থেকে ধরে রেখেছিল। তাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে সে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

"নাও, এবার তোমার মেয়ে তুমি নিয়ে যাও," আমি সরফরাজ খানের দিকে চেয়ে বললাম, "তবে হ্যাঁ এ যেন বেশি চিৎকার চ্যাঁচামেচি না করে। কী করে ঠান্ডা রাখবে সে তোমার মাথাব্যথা।"

কিন্তু সে মেয়েকে বশে রাখে এমন ক্ষমতা সরফরাজ খানেরও ছিল না। চিৎকার চ্যাঁচামেচি ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সে সরফরাজ খানকে অস্থির করে দিল একেবারে। একদিকে সরফরাজ খান, অন্যদিকে দলের আরেকটা লোক মিলে তাকে ঘোড়ার ওপর ধরে রেখেছে, আমি পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে তাকে বোঝাতে বোঝাতে চলেছি যে নিজের ভাগ্যকে মেনে নেয়াই তার পক্ষে মঙ্গল, আর সে মেয়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে ঘোড়া থেকে নেমে পড়বার জন্য কসরৎ করে যাচ্ছে, এইভাবে আধক্রোশ রাস্তা যাবার পর বাবা এসে বলল, "এসব হচ্ছে কী? সরফরাজ খান, তোমার মত একটা মরদ, ওই একটা ফর্সা চামড়ার মেয়ে দেখে একেবারে গলে গেলে? এখন রাস্তায় যদি লোকজন এসে পড়ে? তাদের সামনে তো

ও মেয়ে চিৎকার করে সব বলে দেবে! তখন কী পরিণতি হবে বুঝতে পারছ? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।"

ঘোড়ার অন্যপাশে যে লোকটা মেয়েটার একদিক ধরে রেখেছিল, সে- ও বিরক্ত হয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, "আমার দ্বারাও আর এ কাজ হবে না। তোমার মেয়ে তুমি বুঝে নাও সরফরাজ খান।"

সরফরাজ খান এইবার বেজায় রেগে গিয়ে খাপশুদ্ধ তলোয়ারটা দিয়ে মেয়েটার মুখে ভীষণ জোরে একটা ঘা দিয়ে বলে, "চুপ কর শয়তানী, একেবারে চুপ।"

আঘাতটা এত জোরে দিয়েছিল সরফরাজ খান যে তাতে মেয়েটার গালের চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়ে গেল। দেখে বাবা বলে, "হল তো? যে সুন্দর মুখ দেখে এত ঝামেলা পোয়ালে সেই সুন্দর মুখটাই তো নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে আর ঝামেলা বাড়াও কেন?"

"চিৎকার তো বন্ধ হয়েছে।" এই বলে সরফরাজ খান ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে সামনে চলতে লাগলো।

বেশিক্ষণ অবশ্য মেয়েটাকে ঠাণ্ডা রাখা গেল না। মার খেয়ে একটু থতমত খেয়ে থেমে গিয়েছিল সে। খানিকদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ ঝিমখাওয়া ভাবটা কেটে গেল তার। গাল থেকে গড়িয়ে আসা রক্তটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে রক্তটার দিকে একঝলক করুণ চোখে তাকিয়েই সে এক লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

"লাগামটা কেউ ধর তো, মেয়েটাকে তুলে বসাই," বলে সরফরাজ খান মেয়েটাকে তুলতে যেতে সে এমন চিৎকার আর হাত পা ছোঁড়া শুরু করল যে তাকে তুলে বসাবার কোন উপায় থাকল না। সরফরাজ খান তখন তলোয়ার বের করে তার মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরতে সে আরো জোরে চিৎকার করে বলে, "মার্ মার, শয়তানের দল, এক ঘা মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিস, এবার আরেকটা ঘা দে, আমার সব দুঃখের শেষ হয়ে যাক। কী হল, মারবি না আমায়?" বলতে বলতে সে সরফরাজ খানের মুখে এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিল।

"নাঃ। এভাবে হবেনা। শুধুশুধুই চেষ্টা করলাম এতক্ষণ," বলতে বলতে তলোয়ারটাকে খাপে ভরে ফেলে সরফরাজ খান রুমাল বের করে মেয়েটার গলায় ছুঁড়ে দিয়ে মরণটান দিল একটা। সামান্য ছটফট করে মেয়েটা ঢলে পড়ল। রুমালটা খুলে নিয়ে সরফরাজ একটু দুঃখী গলায় বলল, "এমনটা না হলেই ভালো হত। কিন্তু কী আর করব, মেয়েটার কপাল!"

কয়েকজন লুগাই মিলে তাড়াতাড়ি এসে মেয়েটার শরীরটা নিয়ে পথের পাশের একটা ঘনমতন ঝোপের মধ্যে নিয়ে গুঁজে দিতে আমরা তাড়াতাড়ি সে জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়ে আজিমার গাড়ির নাগাল পেলাম আমরা।

এই ঘটনাটার পর থেকে সরফরাজ খান কেমন যেন বদলে গেল। সেই হাসিখুশি, দুঃসাহসী মানুষটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলত

না বিশেষ। একা একাই থাকত। কেউ সে নিয়ে কিছু বললে দুঃখী দুঃখী মুখে একটু হাসত শুধু। সারাটা জীবনে শয়ে শয়ে মানুষ মেরেছে সে। তার শিকারের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু সেদিন ওই একটা তুচ্ছ দাসী মেয়ের মৃত্যু তাকে কেন যে এমন বদলে দিল কে জানে! গ্রামে ফেরার পর নিজের ভাগটা বুঝে নিয়ে সঙ্গেসঙ্গে সেটা দলের গরিব লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গায়ে ছাই মেখে একটা কৌপিণ সম্বল করে ফকিরি নিয়ে সে বের হয়ে পড়ল দুনিয়ার পথে। অনেক বছর পরে আমি খবর পেয়েছিলাম, জঙ্গলের মধ্যে যেখানটাতে সে মেয়েটাকে মেরেছিলো সেইখানে একটা ছোট্ট আশ্রম বানিয়ে সে থাকত। সেই বুনো এলাকায় কোন পথিক গিয়ে পড়লে তার যথাসাধ্য সাহায্য করত। বনের পশু ছাড়া তার আর কোন সঙ্গীসাথী সেখানে ছিল বলে মনে হয় না। গ্রাম ছেড়ে যাবার পর সরফরাজ খানকে আমি আর কখনো দেখিনি। তবে দলের অনেকেই খুব আক্ষেপ করত তাকে হারিয়ে। আমাদের দলে তার অভাব কোনদিন পূরণ হয়নি।

এর পর থেকে, গ্রামে ফেরা অবধি আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি সেবার আমাদের। গ্রামে ফেরবার পর ঠগিসমাজে আমার খুব নামডাক হয়েছিলো। বাবা সেই অভিযানের পর ঠগিজীবন থেকে অবসর নেয়ায় আমাকেই সবাই পরবর্তী নেতা হিসেবে মেনে নিল। আজিমার সঙ্গে আমি সুখে সংসার পাতলাম।

আমরা ফিরে আসবার মাসদুয়েক পরে হুসেনের দলটাও ফিরে এলো। সবার লুটের মাল একত্র করে দেখা গেল প্রায় এক লক্ষ টাকা রোজগার হয়েছে সে বছরের অভিযানে। আমাদের ভাগে যা টাকা এসেছিলো তাতে বছরদুয়েক বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল আমাদের। এর মধ্যে দু একবার ছোটখাটো অভিযানে বের হবার ইচ্ছে হলেও বাবা আমায় কিছুতেই ছাড়তে রাজি হয়নি। বলে ঘরে যতদিন টাকাপয়সা রয়েছে ততদিন সাধ করে বিপদ ঘাড়ে করতে যাবার কোন দরকার নেই।

ইতিমধ্যে আমার একটা ছেলে হয়েছে। যে সময়টার কথা এবার বলব তখন আজিমার আরো একবার ছেলেপুলে হবে। আগের অভিযানের পর পরপর দু বছর কেটে গিয়ে তিন বছর চলছে তখন। ঘরে বসে থেকে থেকে আমার তখন অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। বদ্রীনাথ আর দলের অন্যান্য অনেকে তখন আমায় বারবার অনুরোধ করে চলেছে, একটা বড়ো দল নিয়ে বাংলা মুল্লুকের দিকটা অভিযানে বের হবার জন্য। ও মুল্লুকে ভালো রোজগারের সুযোগ আছে।

কিন্তু বাবা আমায় যেতে দিলে তবে তো! তার কেবলই মনে হচ্ছিল কোন একটা বিপদ হতে পারে সেই অভিযানে। বাস্তবে তাই হয়েওছিল। বেশ বড়ো একটা দল নির্ধারিত সময়ে গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল সেবার। রওনা দেবার আগে ভবানীর সংকেত যাচাই করে নেয়া হয়েছিল। তাতে খুব অশুভ কিছু না দেখালেও একেবারে খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু রওনা হবার কিছুদিনের মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি বেধে দলটা ভেঙে গেল। ছোট ছোট দল হয়ে তারা নানা দিকে চলে গেল শিকারের খোঁজে। কিছুকাল পরে ফিরেও এলো সব। রোজগারপাতি তাদের সেবার বিশেষ কিছু হয়নি। শুধু একটা দলের কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি আর। বদ্রীনাথ, ছজন

বাছা বাছা লোক নিয়ে বাংলা মুল্লুকের দিকে গিয়েছিল। তাদের দলটা যেন হাওয়ায় উবে গেল একেবারে।

বহুকাল পরে আমি তাদের পরিণতির কথা জানতে পেরেছিলাম। কলকাতায় পৌঁছে দলটা বেশ ভালোরকমই আয় রোজগার করছিল, কিন্তু সেসব টাকা নানান বাজে খরচায় উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে তারা যখন ফেরার পথ ধরল তখন সকলেরই প্রায় হাত খালি।

বেনারসের কাছে পৌঁছে যখন একেবারে উপোস করবার দশা হয়েছে তখন একটা তীর্থযাত্রীর দলকে তারা নিকেশ করে। কিন্তু তাড়াহুড়োয় তারা শরীরগুলোকে ঠিকঠাক মাটিতে পোঁতে নি। এদের মধ্যে একটা লোক বেঁচে যায়। তার মুখে সব খবর শুনে বদ্রীনাথদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছে যে লুটের মাল ছিলো সেগুলোকেও চিহ্নিত করে সেই বেঁচে যাওয়া পথিক। বদ্রীনাথদের গোটা দলটাকে ফাঁসিতে লটকে দেয়া হয়েছিল।

বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খান দুজনেই এইভাবে চলে গেল। বাবা তখন অবসর নিয়েছে। হুসেনও বয়সের ভারে আর নতুন কাজে লাগবার অবস্থায় নেই। আমি তখন পীর খান আর মোতিরামকে কাছে টেনে নিলাম। দুজনেই তখন আমার মতোই জেমাদার পদে উঠেছে। সৎ আর কর্মঠ মানুষ হিসেবে দলে দুজনেরই নামডাকও হয়েছে। পরের বছরের অভিযানের সব ছক কষা হল আমাদের এই তিনজনে মিলে। পঞ্চাশজন কমবয়েসি দক্ষ ছেলেকে নিয়ে আমাদের দল তৈরি হল।

সে বছর দশেরার পরদিন আমরা গ্রামের কাছেই একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে একত্র হলাম। এ জায়গাটা থেকে শুরু হওয়া কোন অভিযানই নাকি সে অবধি বিফল হয় নি। ভারি সুন্দর লাগছিল চারপাশটা। ক্ষেতে ক্ষেতে জোয়ারের ফসল ফলেছে। চারপাশ সবুজ রঙে ভরপুর। চারপাশে পাখির ডাক। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। জমায়েতে গুরুজন হিসেবে আমার বাবা আর হুসেনও হাজির ছিল। নিয়মমাফিক ভবানীর পুজোটুজো সেরে সংকেত নেয়া হল। দেখা গেল ভবানী খুব খুশি। দারুণ শুভ সব সংকেত পাওয়া গেল সেবার। আমার যদিও এসব সংস্কারে কোনকালেই বিশ্বাস ছিল না, তবু দলের সবার ওতে বেশ উৎসাহ বেড়ে গেল দেখে আমিও বেশ খুশিই হলাম।

তার পর বাবা সবাইকে ডেকে বলল যে বয়স বাড়ার ফলে বাবা বা হুসেন আর অভিযানে যাবে না। তার বদলে সে বছরে সবাই যেন আমাকে বাবার প্রতিনিধি হিসেবে দলনেতা বলে মেনে নেয়। এর আগের বছরের ব্যর্থ অভিযানের নজির দেখিয়ে বাবা আরও বলল, কেউ যেন দলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি না করে। তাতে ভবানী অসন্তুষ্ট হন, আর তার ফলে দলের ওপর দুর্ভাগ্যও নেমে আসে।

বাবার কথা শেষ হলে দলের সবাই ভবানীর নামে শপথ করে আমাকে তাদের নতুন নেতা বলে মেনে নিল।

আমার পরিকল্পনা ছিল, আমরা দক্ষিণের দিকে রওনা হয়ে জব্বলপুর বা নাগপুর অবধি গিয়ে তারপর অবস্থা বুঝে পুবমুখে বা পশ্চিমমুখে ঘুরে দেশে ফিরে আসব। পথে খান্দেশ এলাকাটা ঘুরে নেবো বলে ঠিক করেছিলাম। ও অঞ্চলটা

ঠগিদের বিশেষ যাতায়াত নেই। কিন্তু খবর পেয়েছিলাম বম্বের ব্যবসায়ীরা মালবের আফিম কেনবার জন্য ও অঞ্চল দিয়ে অনেক টাকাপয়সা পাঠায় নিয়মিত। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে আমরা সেই তিনবছর আগের মতই প্রচুর লুটের মাল নিয়ে ফিরতে পারবো এবারেও।

ক্রমশ

সীমান্তের অন্তরালে

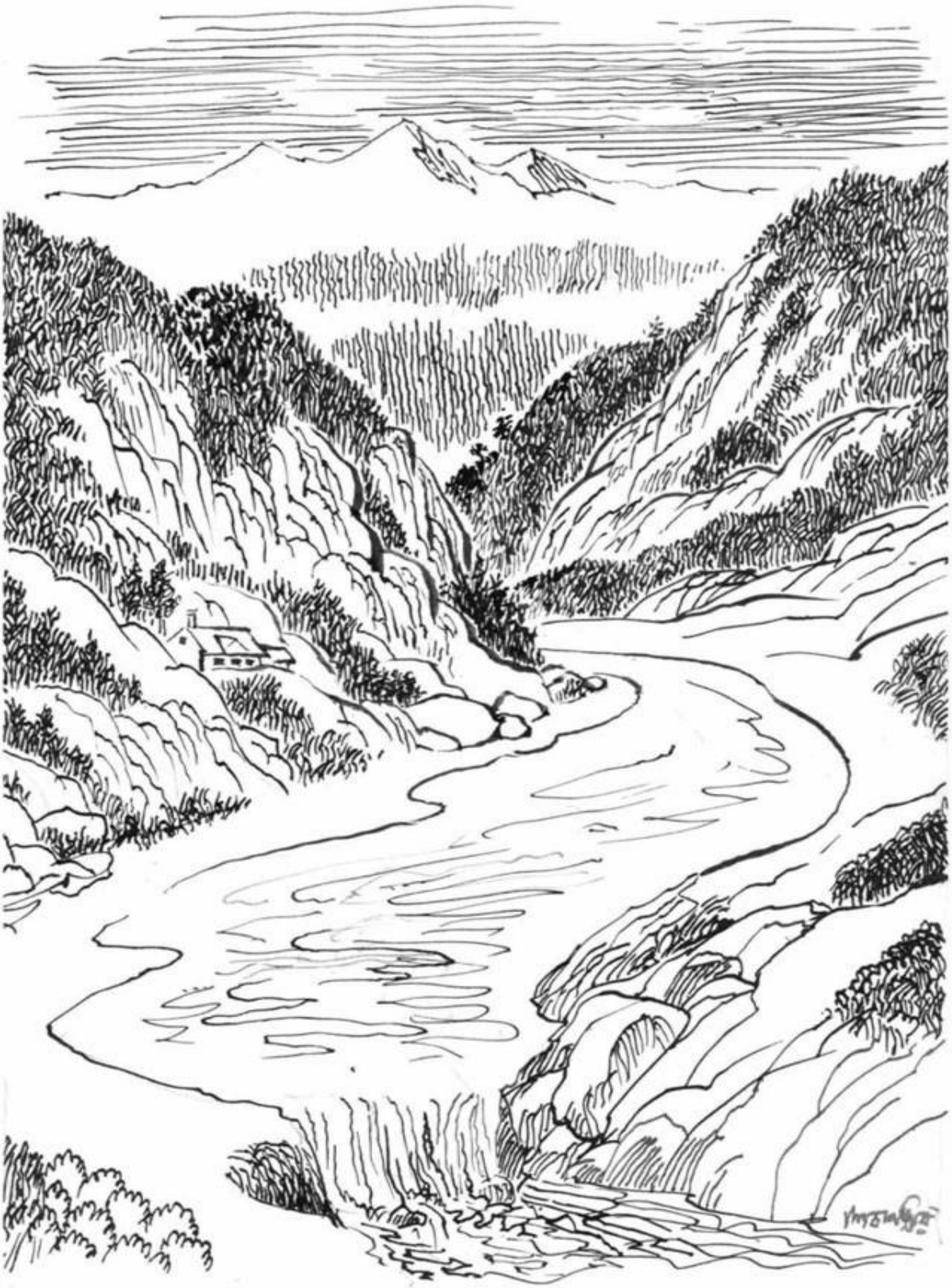

সমরেন্দ্রনাথ ল

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

ইংরাজ আর রাশিয়ার সম্বন্ধ চিরকালই নেউল আর সাপের মত। ইংলন্ডেশ্বরের মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্ন ভারতবর্ষের ওপর রাশিয়ার জারের লোভ ছিল কিনা জানা নাই, কিন্তু তাদের ওপর বাটপাড়ি হয়ে যেতে পারে এই ভয়টা ব্রিটিশের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ নৌবহরকে টপকে সমুদ্রপথ দিয়ে এসে কেউ যে ব্রিটিশের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে সম্ভাবনা তখন মোটেই ছিল না , কিন্তু শক্তিমান রুশ সম্রাটের পক্ষে স্থলপথে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারত আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল না। সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে নিজেদের আয়ত্ত্বের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু আফগানিস্তানকে নিজেদের আয়ত্ত্বে রাখতে হলে উত্তরপশ্চিম সীমান্তবাসী পাখতুনদের দাবিয়ে রাখা যে অপরিহার্য সেটা ইংরাজ বুঝতে পারলেন প্রথম অ্যাংলো- আফগান যুদ্ধের সময়। তাই তাঁরা গোটা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিজেদের সামরিক ঘাঁটির জাল বিছিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে ফেললেন তখনই। ব্রিটিশ সরকার যে সব ঘাঁটি গড়ে তুললেন, খাইবার, ওয়াজিরিস্তান , মালাকান্দ ও থাল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সব ঘাঁটিগুলিতে ব্রিটিশের বিউগল বেজে উঠল আর তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল পাখতুনিস্তানের সমস্ত পাহাড় আর উপত্যকায়।

কিন্তু তাঁদের শাসনের গণ্ডি ঘাঁটিগুলির চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকার পাখতুনদের দিতে চাইলেন সুশাসন, পুলিশ, রুজি- রোজগারের ব্যবস্থা। কিন্তু বিনিময়ে যা চাইলেন, পাখতুনরা তা দিতে রাজি হল না। পাখতুন নিজের প্রাণ দিতে পারে অবহেলে, কিন্তু নিজের স্বাধীনতা সে কারুর হাতে সমর্পণ করতে রাজি নয়। আফগানিস্তানের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কৃষ্টি, ভাষা ও ভাবগত; এরা আফগান নৃপতিকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় কিন্তু আফগানরাজের প্রত্যক্ষ শাসন এরা কোনও দিন মেনে নেয় নি। যখনই এদের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছে, তখনই এরা রুখে দাঁড়িয়েছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক এলফিন্সটন এদের সম্বন্ধে বলেছেন "They resisted attacks from the king of Persia & Cabul,& retained their turbulent independence undiminished to the present day"

তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত ঘাঁটিগুলিতে ব্রিটিশ সরকার পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার ফৌজ, কামান বাহিনী আর প্রচুর যুদ্ধোপকরণ, রসদ প্রভৃতি এনে বোঝাই করলেন গোটা পাখতুনিস্তান নিজেদের সম্পূর্ণ অধিকারে আনবার জন্য। কিন্তু পাখতুনরা ব্রিটিশের এই রণসম্ভার দেখে ভয় পেয়ে নতিস্বীকার করলনা। ১৮৪৯ সালে বাজৌড় আর সোমান্দ এলাকার আফ্রিদি পাখতুনরা দশ হাজার লোকের একটি লশকর নিয়ে মালাকান্দের ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করল। ওয়াজিরি পাখতুনরাও নিজেদের এলাকায় ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করলো।

১৮৪৯ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত লড়াই চলল, মালাকান্দ, কোহাট, থাল আর দরগাইতে। এই সব ঘাঁটিগুলিতে ব্রিটিশের প্রচুর সৈন্য আর রসদ থাকা সত্ত্বেও তারা আফ্রিদি আর ওয়াজিরিদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ভারতবর্ষ থেকে একটি বড় সৈন্যবাহিনী পাঠানো হল অবস্থা আয়ত্ত্বে আনবার জন্য। বাছা বাছা সমরবিদ অফিসারদের যথা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হজসন, কর্নেল বয়লো ইত্যাদিদের পাঠানো হল এই বাহিনীর সঙ্গে। ব্রিটিশ সামরিক অফিসাররা ১৮৪৯- ১৮৫২ সালের পাখতুনিস্তানের যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন যে তাঁদের কাছে ছিল আধুনিক (তখনকার দিনের) উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণ আর হাতিয়ার, বৃহৎ কামান আর কামানের গাড়ি টানবার জন্য হাতি।

পাখতুনদের কাছে ছিল শুধু ঢাল আর তলোয়ার আর সামান্য কিছু পুরানো ধরনের গাদা বন্দুক। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই দলের পর দল তাদের ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে ব্রিটিশের মাসকেট আর কামানের গোলা অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ বরণ করে নিয়েছিল, আত্মসমর্পণ করেনি।

১৮৫২ সালের তিরাহ যুদ্ধের পটভূমি দরগাই এর কাছে সাদ্দা ফোর্ট (ব্রিটিশ ঘাঁটি), এই ফোর্ট থেকে পায়ে হাঁটা রাস্তা দিয়ে মাইলচারেক দূরে বাদামা মিলিশিয়া আউটপোস্ট। পায়ে হাঁটা সরু পথটি চলে গেছে দু সারি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ি পথটি এতই বিপজ্জনক যে পাহাড়গুলির মাথায় সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলাতেও সৈন্যসামন্ত পর্যন্ত চলাচল করতে সাহস পায়না সে পথ দিয়ে।

সরকারি একটা কাজে বাদামায় যাবার প্রয়োজন হল একদিন। সেই সময় আবার তিরাহ- এর আফ্রিদিদের সঙ্গে গভর্নমেন্টের মনোমালিন্য চলছিল , যা প্রায় সবসময়েই চলে থাকে। আমার দেহরক্ষী বলতে ছিল শুধু আমার দুজন খাসাদার ইব্রাহিম খানার নজিব গুল। কিন্তু চাকরি রক্ষার ব্যাপার যেখানে, সেখানে প্রাণের অত মায়া করলে চলেনা। দিনক্ষণ স্থির করে সাদ্দা ফোর্টে আমাদের এক সহকর্মী রশিদ খান কে অনুরোধ জানালাম বাদামায় খবরটা পাঠিয়ে দিতে।

রাস্তায় ছাপরি আর মান্দুরির মাঝে একটা ছোটখাটো ওয়াজিরি লশকরের অবস্থিতির গুজব শুনে ছাপরিতে অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। রাস্তা নিরাপদ খবর পাবার পর যখন সাদ্দার পথে রওনা হলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে, কাজেই সাদ্দা ফোর্টে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। বাদামায় যেতে হলে সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছোন যাবে না। বাদামা থেকে আমাদের মিস্ত্রি খালিম গুল এসেছিল আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তার মতে ও'সময়ে বাদামায় যাতায়াত করা মোটেই নিরাপদ নয়। কাজেই সেই রাতটার জন্য সাদ্দায় থেকে গেলাম রশিদ খান এর বাড়িতেই।

পাখতুনদের দেশে সশস্ত্র না হয়ে কেউ ঘরের বাইরে যায়না। আমাদের খালিম গুলও তার রাইফেল, কার্তুজের বেল্ট আর ছোরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম , কারণ আমার দুই খাসাদারের মধ্যে শুধু নজিব গুলই সঙ্গে এসেছিলো। তাছাড়া খালিম গুল আমাকে ভরসা দিল যে পরদিন তার গ্রামের লোকেরা বেলা দশটা নাগাদ দু'পাশের পাহাড়ের মাথায় উঠে পাহারা দেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য।

বন্ধু রশিদ খানের বাড়িটা সাদ্দা ফোর্ট থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে। পাথরের তৈরি দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় তাঁর অফিস আর দোতলায় তাঁর বাসস্থান। পাশেই এক

পাখতুনের ছোট্টো গোস্ত রুটির দোকান। সেখানে মুর্গি রোস্ট, নান রুটি আর সবুজ চা তৈরি হয়। একটা আস্ত মুর্গি রোস্ট চার আনা আর এক ফুট ব্যাস, আধ ইঞ্চি পুরু নান রুটি দু আনা করে। রশিদ খান দম্পতি সাধারণত রাতের খাবারটা দোকান থেকে আনিয়ে নেন। আমার জন্যে বাড়তি আধখানা মুর্গি আর একখানা নান রুটি আনিয়ে নিলেন। তার সঙ্গে আধ সেরটাক আঙ্গুর। সেই দোকানের মুর্গি রোস্টের কথা মনে হলে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার জিভে জল এসে যায়।

সাদ্দা জায়গাটির বিশেষত্ব নাই কিছুই, সেই গাছপালাবিহীন পাহাড় যা পাখতুনিস্তানের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে। উপরন্তু পাহাড়গুলি সাদ্দার এত কাছ ঘেঁসে চলেছে যে যেদিকেই চোখ যায় কয়েক শ গজ গিয়েই দৃষ্টি হোঁচট খায় কোনও একটা পাহাড়ের গায়। রশিদ খান সাহেবের বাড়ির দেওয়াল সুদৃঢ় পাথরের তৈরি আর কবাটগুলিও খুব পুরু আর মজবুত কাঠের , কিন্তু তবুও রাতের বেলায় ঘুম হলনা। কে জানে হঠাৎ যদি আফ্রিদিদের খেয়াল হয় রশিদ খানের বাড়িতে হানা দিতে তাহলে সাদ্দা ফোর্টের মিলিশিয়া সেপাইরা ইউ, দোয়া, দ্রে করতে করতে যতক্ষণে এসে পৌছবে ততক্ষণে আমাদের দফা শেষ।

সকাল বেলা রশিদ সাহেবের ‘গুড মর্নিং’ শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

শুনে বললাম, "কিন্তু রশিদ সাহেব, আপনাদের দেশে গুড মর্নিং কথাটা একেবারে বেখাপ্পা শোনায়। বরং 'স্তূড়িমাসে' 'খোয়ার মাসে' মানায় ভাল।"

উনি বললেন, "কেন? আপনাদের দেশের প্রভাত কি আরও সুন্দর? লাহোর, রাওলপিণ্ডির প্রভাতও আমার ভাল লাগেনা। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠেই শুনি যত সব হইহল্লা- "

"না আমি লাহোর বা রাওলপিণ্ডির কথা বলছি না। কোনও বড়ো শহরের প্রভাত সুন্দর হতে পারেনা। বাংলাদেশ , বিহার, ইউ পি প্রভৃতি জায়গার ছোটো ছোটো শহর বা গ্রামগুলির প্রভাত সত্যই সুন্দর। একটা দু লাইনের ছড়াতেই ফুটে ওঠে— পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি কতই ফুটিল।"

খান সাহেব বললেন, "ছড়াটার মানে বলুন তর্জমা করে।"

"ঠিক তর্জমা করার জন্য যতটা ভাষাজ্ঞান আবশ্যক, আমার তা নেই, মানেটা বলার চেষ্টা করতে পারি মাত্র – 'পরিন্দে গা রহে হ্যাঁয় এ্যায়লান ইয়ে সুবহকা, গুলশন মে আয়ী বাহার ফুল অউর কলিওঁকা।' ঠিক ভাবটা প্রকাশ করতে পারলাম না।"

"ঠিক আছে। ভাবটা আমি ঠিকই অনুভব করতে পেরেছি। খৎকা মজনু ভাঁপ লেতে হ্যাঁয় লিফাফা দেখ কর। অর্থাৎ লেফেফার চেহারা দেখেই চিঠিতে কী লেখা আছে আন্দাজ করে নিতে পারি। প্রভাতটা আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই সুন্দর।"

বেলা দশটা নাগাদ রশিদ খানের শুভেচ্ছা "খুদা আপকো বা খইরিয়ত ওয়াপস লে আওয়ে" নিয়ে বাদামার দিকে রওনা হলাম। সাদ্দা ফোর্ট থেকে খবর পেলাম যে বাদামার পথ অন্তত দু মাইল পরিষ্কার আছে, অর্থাৎ কোনও পাখতুন উপজাতি লশকর দু'মাইলের মধ্যে নাই। তার পরের খবর ফোর্টের ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাওয়া গেল না। অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে গেলাম।

দু সারি পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট গিরিবর্ত্মের মুখে পৌঁছে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কী জানি এই গিরিবর্ত্মের ভিতর কোন বিপদ আছে কিনা! খালিম গুল ভরসা দিল যে তার গ্রামের লোক দু ধারে পাহাড়ের ওপর পৌঁছে গেছে। যদিও তাদের দেখা যাচ্ছেনা , কিন্তু লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়গুলির মাথায় এখানে সেখানে তাদের রাইফেলের নল সূর্যের আলোয় ঝক ঝক করছে। আমি অবশ্য কোনও রাইফেলের নল দেখতে পেলাম না, কিন্তু ওই অদৃশ্য নলগুলির ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায়ই বা কী?

গিরিবর্ত্মটা পার হয়ে বাদামায় পৌঁছলাম। গ্রামখানি খুব ছোট। মাত্র খানবিশেক বাড়ি। বড়ো বড়ো গ্রামগুলির মত এখানেও একখানা বেশ বড়ো মিনার। পালা করে গ্রামের দুজন লোক এই মিনারে বসে থাকে রাইফেল নিয়ে, শত্রুর আচমকা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। গ্রামের খানিকটা নীচে একটি ছোটো পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের একটি পাম্পহাউস। জল পাম্প করা হয় হাইড্রলিক র‍্যাম দিয়ে। মাইলখানেক দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় মিলিশিয়া পোস্টে জল সরবরাহ করা হয় পাম্পহাউস থেকে। খালিম গুল আমাকে জানাল যে মিলিশিয়া পোস্টটি মাঝে মাঝে হাত বদল হয়, তবে জলাভাবের অভিযোগ বছরখানেকের মধ্যে পাওয়া যায় নি, কাজেই ধরে নিতে হবে যে জল ওখানে ঠিকই পৌঁছোচ্ছে। মিলিশিয়া পোস্ট মাঝেমাঝে হাত বদল হয়, কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম না। খালিম গুল সহজ কথায় বুঝিয়ে দিল, "মানে পোস্টটি কোনও দিন ইংরাজের অধিকারে আর

কোনও দিন আফ্রিদি পাখতুনদের কব্জায় থাকে, এই আর কি। ধরুন কোনও দিন হয়তো ইংরাজের মিলিশিয়া দিব্য আরাম করে বসে আছে পোস্টে, হঠাৎ আফ্রিদিরা এসে লড়াই করে পোস্টটি কেড়ে নিল। আবার কখনো কখনো মিলিশিয়ার সেপাইরাই হয়তো ইংরাজের দলত্যাগ ঘোষণা করে নিজেরাই পোস্টটার মালিক হয়ে বসে। হাজার হোক মিলিশিয়ার সেপাইরাও তো পাখতুন।''

জিজ্ঞাসা করলাম যে আজ মিলিশিয়া পোস্টটি কাদের অধিকারে আছে? খালিম গুল বলল, ''তা ঠিক বলতে পারব না, তবে যদি সঠিক জানতে ইচ্ছা করেন তবে চলুন আমার সঙ্গে পোস্টে গিয়ে দেখে আসি। পোস্টটি যদি আজ ইংরাজের অধিকারে না থাকে তাহলে পাহাড় চূড়া পর্যন্ত আর কষ্ট করে উঠতে হবে না। তার আগেই রাইফেলের গুলিতে লুটিয়ে পড়তে হবে।''

আমি বললাম, ''থাক আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। পাম্প যখন ঠিক চলছে তখন জলও ওখানে ঠিকই পৌঁছোচ্ছে ধরে নিতে হবে। সে জলটা কারা খাচ্ছে তা না হয় নাই বা দেখলাম।''

ক্রমশ

বইটা কিনেছিলাম গত বইমেলায়। দেখে সন্দেশের রাহুল মজুমদার বললেন, "এই একজন লেখক দেখলাম, যিনি চেষ্টা করলেও কোনোদিন বাজে লেখা লিখতে পারবেন না।" কোনও লেখক সত্যি সত্যি নিজে থেকে বাজে লেখার চেষ্টা করেন কিনা, সেটা অবিশ্যি রাহুলদাকে জিগ্যেস করা হয় নি! তবে অরুণিমা রায়চৌধুরীর ব্যাপারে রাহুলদার কথাটা একেবারে সত্যি।

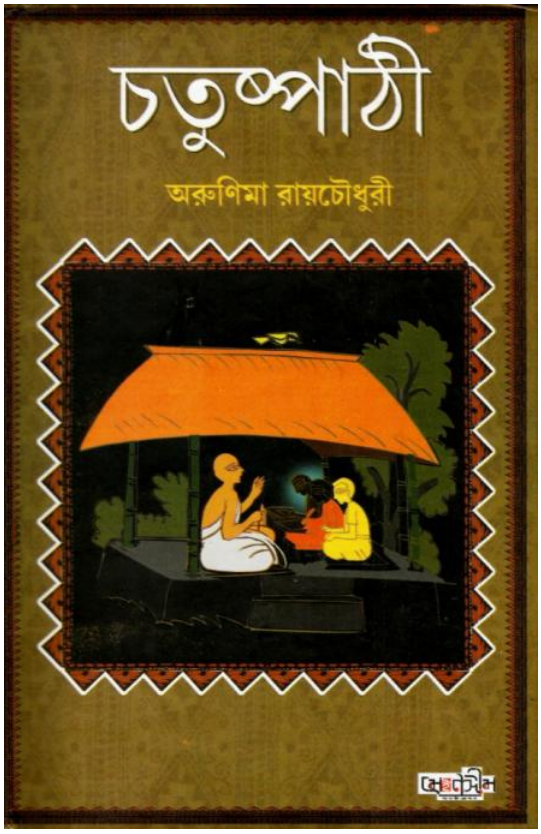

বই: চতুষ্পাঠী
লেখক: অরুণিমা রায়চৌধুরী
প্রকাশক: মেইনস্ট্রিম পাবলিকেশন
১২ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
mainstreampublication@gmail.com
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৯৬; দাম: ৮০ টাকা

সন্দেশে অরুণিমা রায়চৌধুরীর অনেক গল্প পড়েছি ও মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর বই 'বংশীধর বাগাল' আর 'বন- পাহাড়ের রাজা' পড়ে খুব ভালো লেগেছিল। ছোট্টদের জন্য লেখা তাঁর বই 'কাক হরিণ আর শেয়াল'ও পড়েছি। এবারে পড়লাম 'চতুষ্পাঠী'।

বইটির প্রথমেই আছে 'চতুষ্পাঠী' নামে একটি ছোট ঐতিহাসিক উপন্যাস। তারপর আছে দশটি ছোট গল্প। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে আছে, পাহাড়ের কোলে অরণ্যসংকুল এক ছোট্ট রাজ্য করঙ্কের কথা। সেখানে এক উদার আচার্যের টোল বা চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শবর সব জাতি একসাথে শিক্ষালাভ করত। আচার্যের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে কেমন করে শবরেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করল, সে গল্প একটানে পড়ে ফেলতে হয়।

গল্পগুলির বেশির ভাগই বাংলার গ্রামগঞ্জ জলাজঙ্গলের গরীব মানুষদের নিয়ে লেখা। অযোধ্যা পাহাড়ের একরত্তি দুঃখী মেয়ে পুনিয়া, পুরুলিয়ার কিশোর মানিক শবর, দুই গরীব ভাইবোন বিনু আর পূর্ণিমা, অন্ধ ছেলে মংলু – এদের নিয়ে গল্প। আছে চোর বনমালী পাড়ুই আর জগু ডাকাতের গল্পও।

আমার তো সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'ডুবো মানুষ' গল্পটা। খুব ভালো লেগেছে 'আয়ীবুড়ি', 'বনমালী পাড়ুই', 'মানিক শবর', 'পুণ্যি' আর 'চোখের আলোয়'। অন্যরকম গল্পও কিছু আছে বৈকি! যেমন সিংহের গল্প 'উজালা' বা কলকাতার ছেলে রঞ্জুর বাড়িবদলের গল্প।

মোট কথা সব গল্পই ভালো। তবে 'কেশকলাপ' গল্পটা এ বইয়ে সংকলন করাটা মোটেই ঠিক হয়নি। ওটা ঠিক ছোটদের গল্প নয়, আর অন্য গল্পগুলির সাথেও একেবারেই খাপ খায়নি।

বইটিতে ছাপার ভুল- টুল একেবারেই নেই; প্রচ্ছদ ভালো, অলঙ্করণও বেশ, কিন্তু প্রচ্ছদ বা ছবিগুলি কে এঁকেছেন সে কথা কোথাও লেখা নেই।

অরুণিমা রায়চৌধুরীর ভাষা তরতরে, পড়তে কোথাও কোনও হোঁচট লাগে না। তাঁর গল্পের পৃথিবীও বহুবর্ণ, নানা রঙের চরিত্র সেখানে। শুধু ভালো ভালো লোকজন আর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য গেঁথে তার গল্পমালা গড়া নয়। বাস্তবের এই পৃথিবীর মতোই তাঁর গল্পের জগতেও আনন্দের সাথে হাত ধরাধরি করে আছে দুঃখকষ্ট, একই লোকের ভেতরে দোষত্রুটির সাথে সহাবস্থান করে সদগুণ। দেখার চোখ আছে তাঁর। রাহুলদা ঠিকই বলেন। অবিশ্যি এমনি এমনি কী আর উনি এত পুরস্কার- টুরস্কার পেয়েছেন!

তাপস মৌলিক

পুরোনো বই

রিভিউ করলেনঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুরে বেড়ানোর গল্পকথা, সেও আবার ছোটদের মত করে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে- এমন বই হাতে পেলে ছোটরা তরতর করে পড়ে ফেলবেই। এমনিই একটা বই নতুন করে ছেপেছে সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩ সালে।এই ৮৭ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম রাখা হয়েছে ১২৫/ - লেখক হলেন পরিমল গোস্বামী; সহযাত্রী শ্রী বিভূতিভূষণের স্মরণে বইটির নামও রেখেছেন লেখক "বনপথের পাঁচালি।" ১৯৭৪ সালে যদিও এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল "রূপা" থেকে; তার প্রচ্ছদের ছবিও দেওয়া হয়েছে; নতুন করে বইটি সাজিয়েছেন শ্রী সৌরিশ মিত্র।

উৎসর্গে আছে তিনটি বিখ্যাত নাম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণকুমার রায় ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। এঁরা সবাই মিলে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এই বেড়ানো- কাণ্ডের সূচনা হয়েছিল "বঙ্গশ্রী" মাসিক পত্রিকার দপ্তরে। কে না আসতেন সেখানে! ৫০ দশকের সাহিত্যের সব তারাদেরই ভিড় ছিল সেখানে।

আর কী ফাটাফাটি আড্ডা- ঝগড়া, তর্ক, মারামারি, বন্ধুত্ব! হ্যাঁ মারামারি শুনে যেন অবাক হয়ো না। লেখকের ভাষায় "নিখিলচন্দ্র দাস এলে বিপর্যয় ঘটত...তাঁকে হাসিয়ে দিলে তিনি হাসতে হাসতে সবাইকে মারতেন...বেশি ঘনিষ্ঠদের বেশি মারতেন।"

সেটা ১৯৩৩ সালের কথা। লেখক তখন ৩৬, বিভূতিবাবু ৪০, একদিন বিভূতিবাবু এসে হন্তদন্ত হয়ে বললেন "পরিমলবাবু আমায় চট করে ফোটোগ্রাফিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? এখুনি দরকার। "

এমন আশ্চর্য ছেলেমানুষী আবদার হয়ত একমাত্র বিভূতিভূষণকেই মানায় কারণ সেদিনই তারা ট্রেনে উঠবেন উড়িষ্যার বিক্রমখোলে এক প্রাচীন শিলালিপির সন্ধানে। পরিমলবাবুও ঝুলে পড়লেন ঐ দলে। শেখানোর চেয়ে একজন ফটোগ্রাফার থাকার অনুমতি জোগাড় হয়ে গেল।

দলপতি বিভূতিভূষণ "কখনো রাগ করতেন না। তাঁর পোশাকআশাক ছিল এলোমেলো। শহুরে চাল তিনি ভালোবাসতেন না।"

তিনি ডিক্রি জারি করলেন- খাবার দাবার নিয়ে পথের ভার বাড়ানো কোনোমতেই চলবে না। তবু পরিমলবাবুরা লুকিয়ে মাখন, রুটি, মার্মালেড ভরলেন ব্যাগে। এবার ট্রেনে উঠে শুরু হল মজা।

অনেকদূর যাবার পর "সিনি" স্টেশনে ঘুম ভেঙে উঠেই বিভূতিবাবু বলছেন

"এখানকার হাওয়া অতি সাংঘাতিক।"

"কেন! ঠাণ্ডা লাগল নাকি?"

"ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডা লাগেনি। আগুন লেগেছে।"

"কোথায়?"

"পাকস্থলীতে। প্রমোদবাবু ব্যাগে কিছু থাকে তো বার করুন, অবিলম্বে।"

এই পর্যন্ত পড়ে হাসতে হাসতে অস্থির হবে পাঠক। এরপর এরকম ঘটনা আগে ঘটতে থাকবে। কাহিনী গড়াবে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস পরিবেশনের বর্ণনা ধরে।

প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণকে বইয়ের ছত্রে ছত্রে ধরা আছে। ট্রেন থেকে বাইরের প্রকৃতি দেখে "হঠাৎ বিভূতিবাবু চড়া সুরে কীর্তন গাইতে আরম্ভ করলেন...উন্মাদের মত আসন থেকে উঠে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'পরিমলবাবু খেপে যান...তা ছাড়া কোন আর উপায় নেই।' "

দ্বিতীয় অভিযান "হাতি খেদা।" আরেক অভিজ্ঞতা। খেলার ধারাভাষ্যের মত বর্ণনায় আমরাও লেখকের সঙ্গে চড়ে পড়ি ট্রেনে, বাসে, ট্রেকার, গরুর গাড়িতে। এবার অন্য দুজন বন্ধু সঙ্গী। হাতিখেদা কী? কী করে বুনো হাতি ধরা পড়ে সেই দেখতে এবার গন্তব্য জয়ন্তী। এই জয়ন্তীর এক আশ্চর্য বর্ণনা লেখকের কলমে এভাবে ফুটেছে-

"আধঘন্টার মধ্যে সেখানে জমে গেল অনেকগুলো ছোটো মেঘশিশু...সমস্ত মেঘ কুয়াশা হয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল, দেখতে দেখতে সমস্ত কুয়াশা ঘন নীল হয়ে গেল...যেন বিরাট পিচকিরি দিয়ে নীলের গুঁড়ো স্প্রে করে দিয়েছে...সুধাংশু বিজ্ঞানী কিন্তু সে হঠাৎ বিজ্ঞান ভুলে নীলার গান গাইতে লাগলো..."

আবার একজায়গায় রসিক লেখক কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রথম সূর্যোদয়ের বর্ণনা দিতে দিতে একসময় লিখছেন "দুপুরে যখন ভাত খেতে বসলাম তখন সে চালের সুগন্ধ, মাংসের অপূর্ব স্বাদ এ সব ভুলিয়ে দিল। মনে হল কীসের কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

ছোটদের মনের মত লেখা, প্রকৃতিবর্ণনা বা অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে কোথাও ভার বাড়ানো নেই। বন আর বন্যপ্রাণকে ভালোবাসার নজির বই জুড়ে। যখন লেখেন হাতিখেদা নিয়ে "আগাগোড়া সবটাই একটা অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা...এদের আটক করে বন্য স্বভাব ভুলিয়ে ক্রীতদাস বানানো...মানুষ এদের কিনে নিয়ে নিজের কাজে লাগাবে"-

এখানটা পড়ে একটা শিশুমন কিছুতো ভাবনার রসদ পাবে। হয়ত বেড়াতে গিয়ে হাতি চড়ে আনন্দ করার মানেও একটু ভাববে। এভাবে সহজে বন্ধন আর মুক্তির কথা পড়ে নিতে পারবে।

বাইরে বেরোলে যে কত কিছু জানা যায়, সেই প্রকৃতিপাঠের সূচনা করেছেন এই বইতে। শেষদিকে আছে এক মজার ছড়া। পরশুরামের। সবমিলিয়ে বইটা ভারি চমৎকার।

"চাঁদের জয় হোক
পরোপকারী ভদ্রলোক
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লন্ঠনের কাজ করে রাতে
সূর্য্যিকে নমস্কার
এ দেবতা মহা ফাঁকিদার
চোপর রাতে দেখা নেই মোটে
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে"

দীপক গোস্বামী

আগের সংখ্যায় ব্যবহারের ভুলে অন্যের বাড়ির ঘাস কাটা সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম। অন্যের বাড়ির ঘাস কাটা তো খুব একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার নয়, যদি না সেই ঘাস নিজের কোনও কাজে লাগে। আর তৃণভোজী ছাড়া কারই বা ঘাসের প্রয়োজন ! কিন্তু আমরা যারা বইবাতিক নিয়ে চর্চা করতে এসেছি তাদের এবার প্রয়োজন হবে। কারণ প্রাচীনকালে বই তৈরির জন্য লেখার উপাদানের সঙ্গে এই ঘাস (তৃণ)-এর ব্যবহার জড়িয়ে আছে। এবারে আমাদের গালগল্পে সেটাও একটু জেনে নেওয়া যাবে।

যেহেতু লেখাটার নাম 'বইবাতিক', আর তোমাদের সংগ্রহটাও বইয়েরই, তাই আমাদের মূল লক্ষ্যও বই। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে সংগ্রহ মানেই বই-এর সংগ্রহ নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ পুরোনো টিকিট (পোস্টাল স্টাম্প) জমাও, কেউ বিখ্যাত লোকের সই (অটোগ্রাফ), কেউ বা নানা জায়গার দেশলাইয়ের বাক্স। এগুলো সবই মূল্যবান সংগ্রহ, কিন্তু বারবার ব্যবহার করা যায় না। পুরোনো টিকিট বা দেশলাই কী করে অনেকবার ব্যবহার করবে? অবশ্য ব্যবহার করা যায় এমন সংগ্রহও অনেক আছে। ধর, গ্রামাফোন রেকর্ড, অডিও ক্যাসেট বা অডিও সি.ডি-র সংগ্রহ, বিভিন্ন সিনেমার ডি.ভি.ডি-র সংগ্রহ – এগুলো তো বারবার ব্যবহারযোগ্য। রেকর্ড বা সি.ডি বারবার শোনা যায়, ডি.ভ.ডি-ও অনেকবার দেখা যায়। তাই বই নিয়ে আলোচনা আমাদের
উদ্দেশ্য হলেও কখনোসখনো এই সব সংগ্রহের কথাও এসে পড়তে পারে। অর্থাৎ সংগ্রহ ব্যাপারটা একটু বড়ো হয়ে গেল।

ভয় পেয়োনা, আমাদের মূল আলোচনা বই নিয়েই, যা তোমাদের খুবই চেনা জানা। 'চেনাজানা'কথাটা লিখেই আবার সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। ক্লাসে মাস্টারমশায় একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা কোন মহাদেশে ?' ছেলেটি করুণ মুখে বলল, 'জানি না স্যার।' মাস্টারমশায় অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! তাহলে কেনিয়া ?' ছাত্রটির একই জবাব, 'জানি না স্যার।' মাস্টারমশায় হতাশ হয়ে বললেন, 'এ্যাটলাস খুলে দেখে নিও।' ছেলেটি মাথা চুলকে বলল, 'সেটাও কোথায় জানি না স্যার।'

এটা হয়ত নেহাতই মজার গল্প। তোমরা মোটেই সে রকম নও। তাই তো বই-এর খবর শুধু ঠিকঠাক জানাই নয়, সেগুলোকে সাজিয়ে রাখার নিয়ম জানতেও আমরা এসেছি। তারও আগে ছোট্ট আর একটা কাজ আছে – জেনে নেয়া এগুলো আমরা কেন করব এবং করলে তার নীতিটা কী হবে ?

তোমরা যে কাজই করো না কেন, তার তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই যে স্কুল থেকে ফিরেই বল নিয়ে মাঠের দিকে দৌড় দেওয়া, তারও একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। খেলতে ভাল লাগা একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা খেলা এক ধরণের শরীর-চর্চা এবং তা সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। শরীর-চর্চারও কিছু নিয়ম-নীতি আছে, যা জেনে বা না-জেনে সবাইকে মেনে চলতে হয়।

তাহলে আমরা যে আমাদের বাড়ির কম হোক বা বেশি–বই-এর সংগ্রহটা সাজিয়ে তুলব, তার নীতিটা কী হবে ? এ ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী (আমাদের গর্বের কথা তিনি একজন ভারতীয়!) ড. শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন (১৮৯২-১৯৭২) অনেক ভাবনাচিন্তা করে আজ থেকে পঁচাশি বছর আগে পাঁচটি নীতি (সূত্রও বলা যায়) তৈরি করেছিলেন। এগুলোকে বলা হয় golden rule। এরপর থেকে তোমরা এখানে বই নিয়ে যা কিছু কথা বলবে, দেখ সেগুলো এই পাঁচটা সূত্রকে কোথাও না কোথাও ছুঁয়ে যাবে। আমাদের সংগ্রহকে ঠিকঠাক পরিচালনা করতে এমন কোনও কাজ নেই, যা এই পাঁচটা সূত্রের কোনও একটি দিয়ে সমাধান করা যায় না।

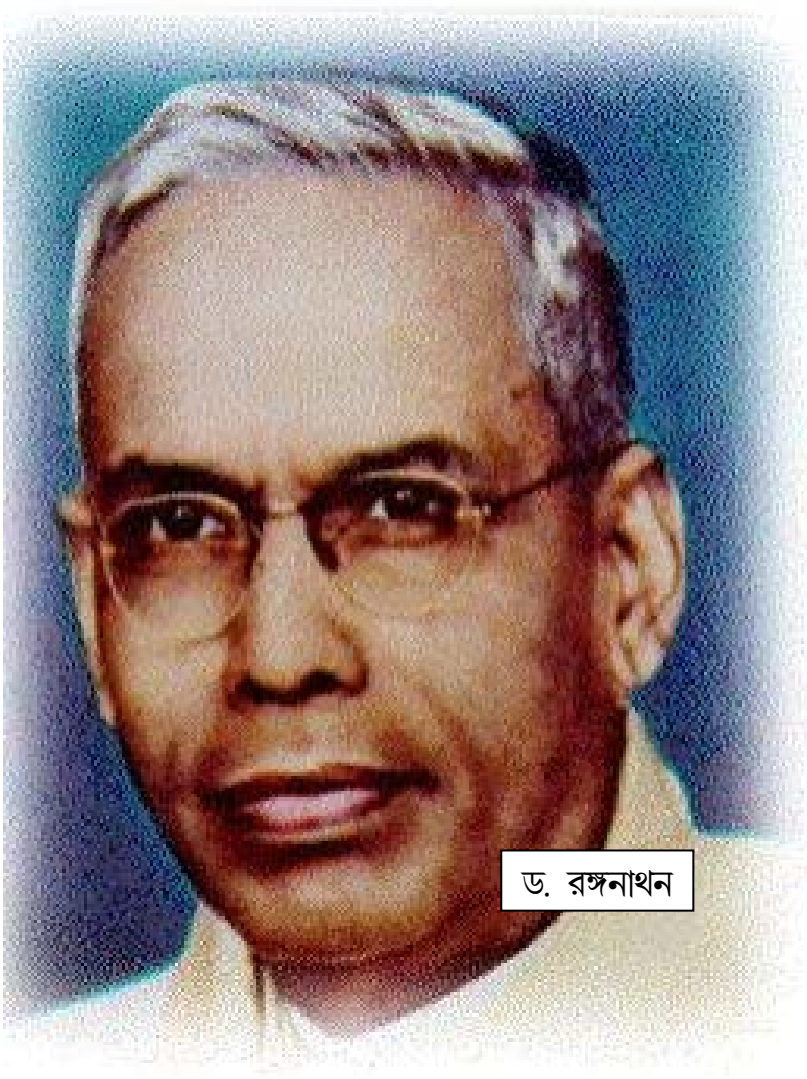
ড. রঙ্গনাথন

সেই হিসাবে প্রথম সূত্রটা হচ্ছে – “বই ব্যবহারের জন্য।” নীতিটিতির মত ভারী ভারী শব্দের পর এইরকম একটা নিরামিষ বাক্যের জন্য হতাশ হচ্ছ বোধহয়। বলতেই পার, এ আর নতুন কথা কী ? বই তো আমরা ব্যবহারই করি, বই দিয়ে তো আম পাড়ি না।

সেটা সত্যি, তবে ব্যবহারেরও তো রকমফের আছে। বুল্টুর কথাই ধরা যাক। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর বুল্টুর ব্যাগ খালি করতে গিয়ে মা তো অবাক, ‘একী বুল্টু, তোমার ইতিহাস বই এ রকম ছেঁড়া কেন?’ বুল্টু অবলীলায় বলল, ‘আজ ক্লাসে স্যার বলছিলেন মা যে বই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করা উচিত। তাই তো আমি ক্লাসের পরেই ইতিহাসের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেললাম।’ হতে পারে বুল্টু ছেলেটি ব্যতিক্রম। কিন্তু তা হলেও বই যে ব্যবহারের জন্য এ কথা কি আমরা সবসময় মনে রেখেছি? তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আজ থেকে সাত শ’ বছর আগেও ইউরোপের বিভিন্ন চার্চে যেসব লাইব্রেরি ছিল, সেখানে বইগুলো লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। চুরি যাবার ভয়ে বই তো বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হতই না, এমন কি অনেক জায়গায় যাঁরা পড়তে আসতেন তাদেরও লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজায় তালা আটকে তবে বই পড়তে দেওয়া হত। কেউ বই ব্যবহার না করলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতেন। হাতে লেখা

বইগুলোকে যক্ষের ধনের মত আগলে রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা লাইব্রেরি করতেন। তোমাদের মধ্যে যারা 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দি ফিলোসাফার'স স্টোন' দেখেছ, তারাও নিশ্চয় শিকলে বাঁধা বই লক্ষ করেছ। অত পেছনে যাবার দরকার কী? আজকের দিনেও এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে, যাদের সংরক্ষণাগার (ইংরেজিতে – 'আরকাইভ') বলা হয়। সেখানে কিছু বিশেষ পাণ্ডুলিপি পড়তে গেলে বেশ কয়েকদিন আগে দরখাস্ত করতে হয়। সেগুলো থাকে লোহার আলমারিতে। দুটো চাবি দিয়ে সেই আলমারি খুলতে হয়, যার মধ্যে একটা চাবি থাকে গ্রন্থাগারের প্রধানের কাছে এবং অন্যটা

সেই জেলার প্রধান, অর্থাৎ জেলাশাসকের কাছে। নির্দিষ্ট দিনে দুই প্রধানের প্রতিনিধি চাবি এনে আলমারি খোলেন। মূল পাণ্ডুলিপিটি বের করে দিয়ে তাঁরা সেই ঘরেই অপেক্ষা করেন পড়া হয়ে গেলে সেটি আবার ঠিক জায়গায় রেখে তালা দিয়ে যাবেন বলে। সমস্ত ব্যাপারটা যতই কঠোর হোক, পাণ্ডুলিপিগুলো এতই অমূল্য যে তাদের নিরাপত্তার কারণেই এতটা করতে হয়।

শিকল দিয়ে বাঁধা বই-এর সংগ্রহ

অক্ষর সাজিয়ে লেখা আবিষ্কারের পর লেখার উপাদান হিসাবে প্রাচীন কাল থেকে পাথর, ইঁট, সীসা, পিতল, হাতির দাঁত, গাছের ছাল, গাছের পাতা, জীবজন্তুর চামড়া - কত কী-ই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উপাদানই ব্যবহারের আগে তৈরি করে নিতে হত। আর উপাদানের রকম হিসাবে তৈরি করার পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তারপর এল কাগজ। কাগজের প্রথম যুগে (যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও আগের হাজার বছরে) যে কাগজ ব্যবহার করা হত, তার উপাদান ছিল এক ধরণের তৃণ। ঐতিহাসিকদের মতে প্যাপিরাস নামে তৃণর মূলদেশ থেকে তৈরি কাগজই সবচেয়ে প্রাচীন। আট থেকে বারো ফুট লম্বা এই তৃণ মিশর, সিরিয়া বা সিসিলি দ্বীপে জন্মাতো। এর থেকে যে কাগজ তৈরি হত তার নাম পেপিরি। তোমাদের নিশ্চয়ই ইংরেজি 'পেপার'-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

এ দেশেও ছাপাখানা আসার আগে ছিল হাতে লেখা বই, যাকে পাণ্ডুলিপি (ইংরেজিতে ম্যানিউস্ক্রিপ্ট) বলা হয়। আমাদের দেশে পাণ্ডুলিপি ('পুথি') লেখা হত কোথাও ভুর্জপত্রে, কোথাও তালপাতায়, কোথাও তুলট কাগজে। অবশ্য লেখার আগে সেগুলোকে লেখার মতো করে তৈরি করে নিতে হত। সরু সরু লম্বা তালপাতাকে ঠিক মতো কেটে নিয়ে দু'ধারে লেখা হত। পাতাগুলোর

মাঝখানে একটা ফুটো করে দড়ি গলিয়ে দেওয়া হত এবং পাতাগুলোকে ওপরে ও নীচে কাঠের পাটার মাঝে রেখে গিঁট (গ্রন্থি) দিতে হত। এই গ্রন্থি থেকেই বই বোঝাতে 'গ্রন্থ' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন হাতে লিখে কোনও বই-এর একটা কপি তৈরি করতে কত দিন লাগত, ভাবো তো ! কারণ লিপিকাররা (যাঁরা বই-এর কপি তৈরি করতেন) তো শুধু লেখকের বক্তব্যটাই লিখতেন না, প্রতি পাতার চার ধারে ছবি আঁকতেন, অসাধারণ নকশা করতেন।

এত খাটাখাটুনি করে বইটার একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হত। ফলে কেউই সহজে সে সব বই অন্যদের ব্যবহার করতে দিতে চাইতেন না। যদি নষ্ট হয়ে যায়!

তালপাতার পুথি

অবশ্য শুধু পাণ্ডুলিপি কেন, ছাপা বই-এর যুগেও এমন অনেকে আছেন যাঁদের সংগ্রহে বই যতটা দেখাবার, ততটা পড়বার নয়। এঁরা বই কেনেন, আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু পড়েন না। পড়ার ইচ্ছা বা সময়ই নেই। শুধু অন্যদের দেখান যে তাঁরা কতটা শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান। তোমরা হয়ত কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'যথাস্থান' কবিতাটা পড়েছ। এঁদের উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

'পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহগনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা,'

কিন্তু এঁরা তো ব্যতিক্রম। বই পড়া এবং পড়ানোর মত লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট। তাই সেই শিকল দিয়ে আটকে রাখা বই, পাণ্ডুলিপি আর পুথির যুগ পার হয়ে আজ আমরা যে সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে যে সংগ্রহের বই যত বেশি ব্যবহার করা হবে ততই তার গৌরব। কারণ 'বই ব্যবহারের জন্য'। সেই কথা মনে রেখেই ডিজিটাল জগতের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি বা দুর্লভ বই ব্যবহার এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। এসবের যে কোনও পাতার রঙিন স্ক্যান করা ছবি কম্পিউটারেই দেখা যেতে পারে, রঙিন প্রতিলিপি (প্রিন্ট আউট)-ও নেওয়া যেতে পারে।

তবে 'বই ব্যবহারের জন্য' কথাটা তো শুধু মুখে বললেই হবে না, আমাদের সব কাজের মধ্যেই তার প্রমাণ থাকা দরকার। তোমার বাড়ির সংগ্রহটাই ধরা যাক। বেশি নয়, হয়ত সেখানে মাত্র

শ' প াঁচেক বই আছে। দুটো বা তিনটে পুরো মাপের আলমারিতে সেগুলো রাখা আছে। মনে করা যাক, তোমার বাড়ি একটু পুরোনোপন্থী। বন্ধুবান্ধবদের সচরাচর বাইরের বসবার ঘরে বা খুব বেশি হলে তার পাশে তোমার পড়ার ঘর পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়। সেখানে জায়গা না পেয়ে যদি তুমি তোমার সংগ্রহটা বাড়ির ভেতরের দিকে কোন ঘরে রাখ, তবে তোমার বন্ধুরা তা নিয়মিত ব্যবহার করবে কী করে ? তাই বইপত্র এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে সহজে পৌঁছনো যায়।

তোমাদের শহরেও নিশ্চয়ই সাধারণ গ্রন্থাগার, সরকারি বা বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে। অনেক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও আছে। সেগুলো যাদের জন্য করা হয়েছে, তাদের বাড়ির কাছাকাছি হলেই ভাল। তাহলেই সেখানকার পাঠকেরা সেই সব গ্রন্থাগারের বই বেশি ব্যবহার করতে পারবে।

তোমরা নিশ্চয়ই কোলকাতায় ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশানাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া)-র নাম শুনেছ। চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে কেউ কেউ হয়ত জাতীয় গ্রন্থাগারে ঘুরেও এসেছ। স্বাধীনতার আগে এই গ্রন্থাগারের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, তারও আগে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার এই বিশাল সংগ্রহের নাম দিলেন –ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া (বর্তমানে বই-এর সংখ্যা বাইশ লক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশি) এবং ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল তিরিশ একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরের বাসভবন আলিপুরের বেলভেডিয়ারে। সেই সময় এই বিশাল বাড়ি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের বইপত্র রাখার পক্ষে যত ভালই হোক না কেন, জায়গাটা তো তখন শহরের এক প্রান্তে। এই গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠকরাও তাই দাবি করেছিলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য সবাইকে এত দূরে আসতে হলে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে ভাল হয়, যদি রাজ্যপালের বর্তমান বাসস্থান এসপ্ল্যানেড ইস্টের 'গর্ভনর হাউস'-এই জাতীয় গ্রন্থাগার হয়। সেখানে জায়গাও অনেক বেশি এবং শহরের মাঝখানে হওয়ার জন্য সবার আসতেও সুবিধা হবে। অবশ্য তা হয় নি। সে অন্য গল্প।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার

আমরা আবার প্রথম নীতিতে ফিরে আসি – "বই ব্যবহারের জন্য।" এই ব্যবহারের জন্য সহজে সংগ্রহে পৌঁছনোই যথেষ্ট নয়, ব্যবহারের সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার বন্ধুদের বলো যে দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত তোমার সংগ্রহ ব্যবহার করা যাবে–কেউ আসবে কি ? তখন তো

তারা সব স্কুলের ক্লাসে। সেই কারণে বইপত্র ব্যবহারের সময়টাও যারা ব্যবহার করবে তাদের সুবিধামত হওয়া দরকার।

শুধু কি সময় ? ব্যবহারের জন্যই আসবাবপত্রের কথাটাও মনে রাখা দরকার নয় কি ? বাড়িতে পড়ে আছে বলে তুমি এমন এক উঁচু বুক-শেলফে কিছু বই রাখলে, যার ওপরের দুটো তাকে তোমাদের কারোই হাত পৌঁছয় না। চেয়ার টুল ইত্যাদি এনে সে সব বইগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ফলে এইসব তাকের বই-এর ব্যবহার নিঃসন্দেহে কম হবে। কোনও বড় লাইব্রেরির ছোটদের বিভাগে গিয়ে দেখ সব আসবাবপত্রই নীচু নীচু। নীচু চেয়ার, নীচু টেবিল, নীচু বুক-শেলফ। ছোট ছোট ছেলেরা কারো সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে তাক থেকে বইপত্র নিয়ে এসে
পড়ছে বা ছবি দেখছে, আবার ইচ্ছে হলে তাকে রেখেও আসছে।

একই ভাবে সকলের সঙ্গে তোমার ব্যবহারও সংগ্রহের বই-এর ব্যবহারে প্রভাব ফেলবে। তোমার মিষ্টি ব্যবহারেই তো বন্ধুরা বারবার আসে, বিভিন্ন বই সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়, সংগ্রহের ব্যবহার হয়। সেই তুমি যখন সংগ্রহ দেখা শোনার ভার তোমার মেজকাকার ওপর দিয়ে এক মাসের জন্য শিমুলতলা বেড়াতে গেলে, তখন কী হল? মেজকাকা তো এমনিতেই বদরাগী, তার ওপর কথায় কথায় ধমকানোর অভ্যাস। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে এমন ধমক দেন যে তোমার বন্ধুরা বই ব্যবহার করবে কি, তোমাদের বাড়ি আসতেই ভয় পেত। ঝাড়া একটি মাস বোধহয় সংগ্রহের সব বই প্রতীক্ষা করেছে–কবে তুমি ফিরে আসবে, আর তারপর তোমার বন্ধুরা আবার তাদের ঘাঁটাঘাঁটি করবে।

ছোটদের গ্রন্থাগারে বই-এর তাক

আমরাও ছোটবেলায় দেখেছি, লাইব্রেরি-ক্লাসে নীহাররঞ্জন গুপ্তের ডিটেকটিভ বই চাইলে স্যাররা জোর করে বিদ্যাসাগর বা রামমোহন রায়ের জীবনী ধরিয়ে দিতেন। কি মুশকিল বলতো? এর ফলে কিরিটি রায়ের গোয়েন্দাগিরিও জানা হোত না, রামমোহন রায়েও মন বসত না। যারা
পড়বে তাদের পড়ার স্বাধীনতা না থাকলে বই-এর ব্যবহার বাড়বে কী করে ?

সব শেষে, আজকের দিনে বই-এর ব্যবহার বাড়ানোর আর একটা কার্যকরী উপায় হচ্ছে প্রচার। এই ব্যাপক বিজ্ঞাপনের যুগে তোমাকেও তো তোমার বইগুলো সম্পর্কে লোকেদের জানাতে হবে। ধর, তুমি এবারের জন্মদিনে বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ভেঁপু', সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু', লীলা মজুমদারের 'পদীপিসির বর্মীবাক্স' আর রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' উপহার পেয়েছ। তাছাড়াও উপহারের টাকায় আরো ছ'খানা ভালো ভালো বই কিনেছ। এগুলো যদি স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের না বল এবং তাদের না জানাও যে তোমার পড়া হয়ে গেলে তারাও এগুলো পড়তে পারে, তবে বইগুলোর ব্যবহার বাড়বে কী করে ? নতুন বইগুলো সম্পর্কে তোমার সংগ্রহের পাশে একটা নোটিশও ঝুলিয়ে দিতে পার। এরপর যারা পড়বে, তাদের বইগুলো ভাল লাগলে
মুখে মুখে প্রচার তো হবেই।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে 'বই ব্যবহারের জন্য' কথাটা ছোট হলেও এটাকে সত্যি করে তুলতে গেলে অনেক পরিশ্রমের দরকার। পরিশ্রম অন্য নীতিগুলোর রূপায়ণেও আছে। কিন্তু এত পরিশ্রম তো এক দিনে সহ্য হবে না! তাই আপাতত এই পর্যন্ত। দ্বিতীয় নীতিটা সামনের সংখ্যায় দেখা যাবে।

ক্রমশ

বিশ্বের জানালা

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের রানি- ভেনিস

উমা ভট্টাচার্য

ভেনিসিয়ান পর্যটক মার্কপোলোর কল্যাণে সবাই প্রায় জানে ভেনিসের নাম। ভেনিসের অনেক নাম- খালের শহর, জলের শহর। সবচেয়ে আদরের নামটি অ্যাড্রিয়াটিকের রানি। সত্যিই রানি। ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে উত্তরদিকে বাড়িয়ে থাকা সাগরবাহু 'অ্যাড্রিয়াটিক সাগর'- এর সরু মাথায় কাছে অবস্থিত ভেনিস এক আশ্চর্য নগরী- ইউরোপের সবচেয়ে রোমান্টিক শহর।

ইটালির ভেনিটো অঞ্চলে প্রায় ৪১৭. ৫৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে অবস্থিত এক জলময় নগরী- এক রাজধানী শহর। জলের মধ্যে ভেসে থাকা ১১৮ টি ছোট ছোট দ্বীপ, ১৭৭ টি খাল আর এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য ৪০৯ টি সেতু নিয়ে গড়ে ওঠা এক আশ্চর্য শহর। এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাওয়া হচ্ছে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাবার মত ব্যাপার। যেতে সেতু পার হতে হয়। জলের মধ্যে থেকে গেঁথে তোলা সব বাড়ি। বাড়িগুলির সামনেই জলের রাস্তা। বাড়িতে ঢুকতে গেলে বা দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে গেলে যেতে হবে এদেশের সেই প্রাচীন দেশীয় সরু সরু আর লম্বাটে নৌকো 'গন্ডোলা' চেপে। কোনও রাস্তা নেই, গাড়ি নেই। ইউরোপের একমাত্র মোটরগাড়িহীন, ধোঁয়াহীন শহর যেখানে এই

একবিংশ শতাব্দীতেও নেই কোন গাড়ি, বাস, ট্রাক। নেই কোন হাঁটা পথ বা যানবাহনের রাস্তা। গন্ডোলা চড়ে যেতে যেতে দেখা যাবে অনেক - অনেক কেন প্রায় সব বাড়ির সামনেই বেঁধে রাখা আছে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট নৌকো, স্পিড বোট বা গন্ডোলা।

ভেনিস বা ভেনিসিয়া আসলে সাগরের বুকে ভেসে থাকা একটি দ্বীপময় লেগুন। স্থাপত্যশিল্পের জন্য এ শহর পৃথিবী বিখ্যাত। ইটালির মূল ভুখণ্ড থেকে একটি বিশাল চওড়া ক্যানেল, যাকে বলে গ্র্যাণ্ড ক্যানেল , সেইটিই এ শহরের প্রধান জলসড়ক। ভেনিসে ঢোকার পরে গ্র্যান্ড ক্যানেল উল্টো করে লেখা বিরাট একটি ইংরেজি 'এস' অক্ষরের আকার নিয়ে ভেনিসের প্রধান জেলাগুলির মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। এটি প্রায় ৩৮০০ মিটার দীর্ঘ আর ৩০ থেকে ৯০ মিটার চওড়া। গড় গভীরতা ৫ মিটারের মত। সেই পথে চলে প্রমোদভ্রমণ, ছোটে 'ভেপোরেট্টি' বা জল বাস, ভাড়া পাওয়া যায় প্রাইভেট ওয়াটার ট্যাক্সি কিংবা স্পিড বোট। সে পথ ধরে গিয়ে পৌঁছোনো যায় ভেনিসের রিয়ালটো সেতুতে। জলপথে দুপাশে দেখা যায়

বিভিন্ন দ্বীপে গড়ে ওঠা নানা সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য। প্রায় ১৭০ টির মত বড়ো বড়ো বাড়ি আছে, আছে পুরনো বন্দর, নানা বড়ো বড়ো অফিস ও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান। বাড়িগুলির কারুকার্য আর স্থাপত্য দেখলেই মনে হয় যেন সেগুলি সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা করার জন্য তৈরি।

ইটালিয়ান ভাষায় ডিউককে বলে ডগি, ইংরেজি বানানে হল DOGE[ল্যাটিন শব্দ DUX মানে হল লিডার বা প্রধান শাসক, DUX ইংরেজিতে হল DUKE, কিন্তু ইটালির ভাষাতে সেটা দাঁড়ালো DOGE তে। রিয়ালটো সেতু থেকে দেখা যায় ডগিজ্ হাউস, মানে ডিউকের প্রাসা। দেখা যায় সেণ্ট মার্ক বাসিলিকা, মাদার মেরির নামে উৎসর্গীকৃত বিশাল আকৃতির ডোম সমন্বিত মেরীজ্ চার্চ, আরও কত কী! স্থাপত্যগুলির সৌন্দর্য, বিশালত্ব, কারুকার্য, পাথরে খোদাই করা সিংহমূর্তি, দেবশিশু বা দেবদূতের মূর্তি, কিংবা চিন্তাবিদ, শিল্পী, বীর ও মনিষীদের মূর্তি দেখলে

মনে হয় যেন জীবন্ত, যেন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা। দোকানে দোকানে আছে অপূর্ব সব মুখোশের সম্ভার, পাথরের পুতুল, মূর্তি, দামি পাথরের গয়না।

সেন্ট মার্ক বাসিলিকা স্কোয়ারে আছে প্রাচীন গির্জা, ঘড়িঘর, শপিং মল। সে জায়গাটা পেরিয়ে মূল শহরে ঢুকতে গেলে চড়তে হবে গণ্ডোলা।

ডোরাকাটা জার্সি গায়ে গণ্ডোলিয়ানরা নিয়ে যাবে শহর দেখাতে। এ গলি, সে গলির বদলে এ খাল সে খাল বেয়ে চলতে হবে। অনেকে জন্মদিন বা বিয়ের উৎসবও করেন গণ্ডোলা চেপে। সেতুর তলা দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় গণ্ডোলা নিয়ে পার হয়ে যাবে মাথার দিকে উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে থাকা গণ্ডোলার মাঝি ।

সুদূর অতীতে লেগুনের জলা জমিতে বাস করত জেলেরা। মাছ ধরা আর অন্য জিনিস আনতে সমুদ্রের দিকে যাওয়া ছিল তাদের জীবিকার উপায়। ছিল জলদস্যুদের উৎপাত। পরবর্তী কালে হুন ও জার্মানদের ক্রমাগত আক্রমণে ইটালির মূল ভূখণ্ড থেকে দলে দলে বাস্তুহারা মানুষ আসতে থাকে এই লেগুনে। ক্রমে এই বাস্তুহারা নবাগতরাই ভেনিসে গড়ে তোলে বসতির জন্য সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে ভেনিসিয়ানরা গড়ে তোলে এক স্বশাসিত শাসন ব্যবস্থা। নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এরা নৌশক্তিতে প্রবল হয়ে ওঠে আর অ্যাড্রিয়াটিক সাগর বেয়ে ভূমধ্যসাগরের পথে নৌ বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে। যদিও সমুদ্রতল থেকে মাত্র ফুটখানেক উঁচু ভেনিসের স্থলভাগ এবং সামুদ্রিক জোয়ারের সময় খালগুলির জলস্তর খানিকটা করে উঠেই যায়,

কিন্তু তবু সমুদ্র একে গ্রাস করতে পারে না, কারণ 'লিডো' নামে এক খণ্ড দীর্ঘ ও সামান্য উঁচু ভুখণ্ড ভেনিসকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ থেকে সুরক্ষিত রাখে।

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের মাথার দিকে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থানের জন্যই সামুদ্রিক বাণিজ্যে এত উন্নতি করেছিল ভেনিসিয়ানরা। অন্যান্য অসুবিধাগুলি দূর করে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছেছিল ভেনিস। একটা সময় প্রায় ৩৬০০০ নাবিক আর ৩৩০০ জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপর বাণিজ্যিক দখলদারি চালিয়ে গেছে ভেনিস।

আরো কিছু তথ্য

জলবায়ু

উপ নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ ভেনিসের জলবায়ু আর্দ্র প্রকৃতির। শীতকাল সহনীয় আর অসম্ভব উষ্ণ গ্রীষ্মকাল।

শিক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই উন্নত। বর্তমানেও উচ্চশিক্ষার এক প্রধান আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ভেনিস। সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে "ভেনিস ইন্সস্টিটিউট, ইউনিভারসিটি এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেণ্টার। " ১৯৯৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সান সারভোলো দ্বীপে।

খেলাধুলো

ফুটবল আর বাস্কেটবলই এখানকার প্রধান ও প্রিয় খেলা।

উৎসব

মুখোশ উৎসব এখানকার বিখ্যাত উৎসব।

উপগ্রহ চিত্রটি গুগল আর্থ থেকে সংগৃহীত। বাকি ফটোগ্রাফিঃ লেখক

দাঁড়কাকের বিয়ে

মহাশ্বেতা

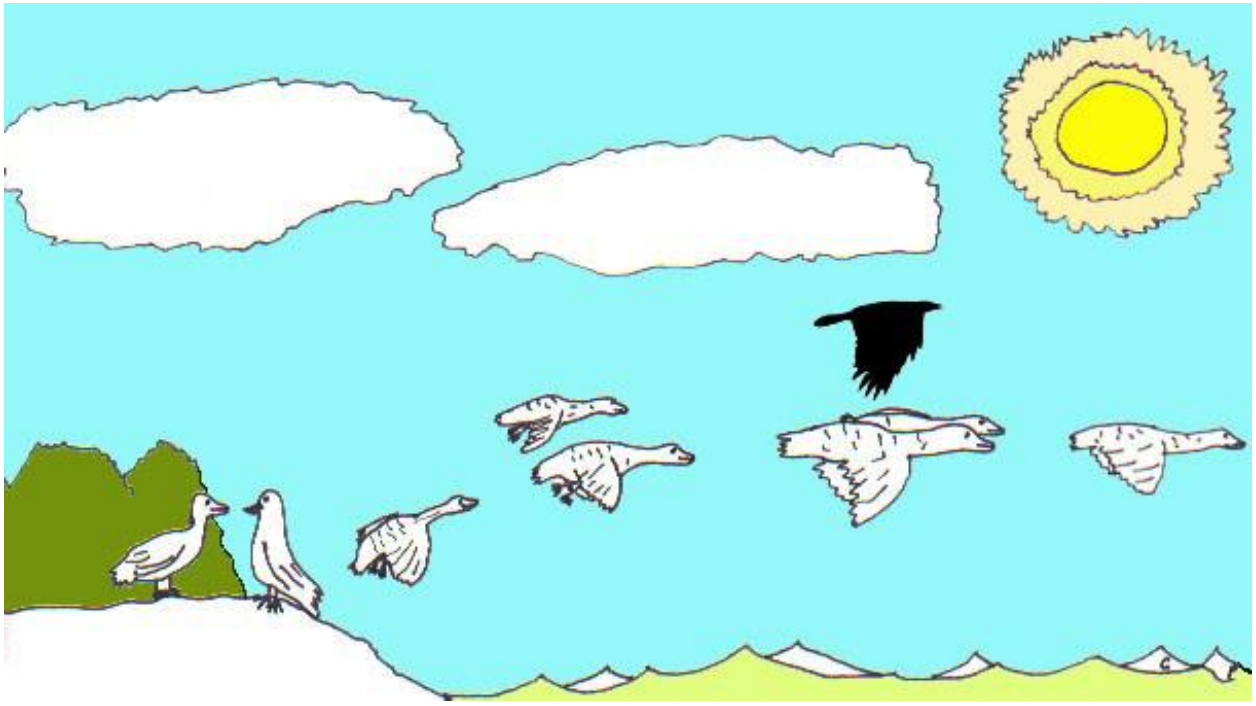

একবার একটা ছোট্ট চড়াই পাখির বর হারিয়ে যাওয়ার পর সে কাঁদছিল প্রচন্ড। তাকে বড়ো ভালবাসত সে। প্রতিদিন সে একগাদা করে পোকামাকড় জোগাড় করে এসে বউকে খাওয়াতো কিনা!

সে এক জায়গায় বসে অঝোরে কাঁদছিল এমন সময় একটা দাঁড়কাক তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর প্রশ্ন করল, "কাঁদছ কেন?"

চড়াই উত্তর দিল, "আমার সোয়ামির জন্য কাঁদছি গো! উড়তে উড়তে কোতায় চলে গেল গো! আমার জন্য কত ভাল ভাল পোকা ধরে আনতো সে গো! ও মা গো! আমার এবার কী হবে গো!"

দাঁড়কাকের মনে মনে বিয়ে করার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না। তাই এই সুযোগ দেখে সে বলল "আরে কেঁদ না! সারাক্ষণ যারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়ায় তারা কাঁদলে মোটেই ভাল দেখায় না। তুমি এক কাজ কর না, এই আমাকেই বিয়ে করে ফেল! দেখ আমায় কী সুন্দর দেখতে? আমার কপালটা কী বড়ো, কত লম্বা দাড়ি আছে দেখ! আবার, ঠোঁটটাও কী বড়ো। আমার বিশাল পাখনার তলায় তুমি আরামে ঘুমোতে পারবে, আর আমি যেসব মাংসের ছিঁটেফোঁটা পাই, তুমিও তার ভাগ পাবে। তাই বলি, সময় থাকতে আমায় বিয়েটা করে ফেল।"

“আ মোলো যা! তোমায় আমি বিয়ে করব কেন হে? কী উল্টোপাল্টা কথা সব! বলে কিনা লম্বা দাড়ি, বিরাট পাখনা! ওসব পোষাবে না আমার ভাই।”

তাই শুনে দাঁড়কাক একটু দুঃখ পেয়েই উড়ে চলে গেল অন্য কোথাও বউ খুঁজতে। উড়তে উড়তে সে একসময় পৌঁছোল রাজহংসীদের ডেরায়। কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছোল, তখন তারা দল বেঁধে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নিয়েছিল। সে দেখেশুনে দুজনকে পছন্দ করে নিয়ে বলল, “ওই বোকা চড়াইটা তো আমার কথা শুনল না। তোমরা কি শুনবে? আমায় বিয়ে করবে?”

তার উত্তরে তারা বলল, “কিন্তু আমরা তো এই কিছুদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব অনেক দূরের দেশে।”

“আমিও তাহলে যাব তোমাদের সাথে।” দাঁড়কাক বলল।

“কিন্তু একটা কথা মাথায় রেখো। আমাদের সাথে যেতে হলে সাঁতার জানতে হবে আর জলের ওপর ভাসতেও জানতে হবে। কারণ সমুদ্রের বিরাট সব এলাকার ওপর দিয়ে আমাদের উড়ে যেতে হবে। আর সেই জলটা হবে একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। আর বরফের চাঁইও থাকবে বিরাট বিরাট। কী? পারবে তো?”

“আরে পারব না কেন? এসব কে না পারে? আমি তো এসব তোমাদের জন্মের আগে থেকেই করছি বলতে পার।”

বিয়ে তো হয়ে গেল। তার কিছুদিন পরে তারা সবাই আকাশপথে রওনা দিল। কিন্তু অল্পসময় উড়েই দাঁড়কাক প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হবে না? বুনো হাঁসের তুলনায় তার শরীরও ছোট, ডানাও ছোট। ও’রকম লম্বা রাস্তা সে উড়ে যেতে পারে নাকি? সে হাঁফাতে হাঁফাতে কোনরকমে তার দুই রাজহংসী বউকে বলল, “একটু বসব কোথাও, ওগো একটু আরাম করব, চোখ দুটো বুজব। তোমরাও আমার পাশে পাশে বসে থাক।”

এই বলতেই দুই বউ মিলে তাকে নামিয়ে আনল, তারপর জলের ওপর নিজেরা ভেসে থেকে তাদের পিঠে দাঁড়কাককে শুইয়ে দিল। কাক অঘোরে ঘুমোতে লাগল। বউহংসীরা জলের ওপর ভেসে রইল আর বাকি দলটা উড়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে যখন দুই রাজহংসী দেখল তাদের বন্ধুবান্ধবেরা তাদের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, অথচ দাঁড়কাকের আর ঘুম থেকে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তারা পিঠ থেকে কাককে জলের ওপর নামিয়ে রেখে মানে মানে কেটে পড়ল। উড়ে গিয়ে আবার দলে যোগ দিয়ে চিরতরে চলে গেল তারা।

এদিকে জলে পড়া মাত্র দাঁড়কাক জেগে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, “একী! এ আবার কী? শোয়ার জায়গা কই আমার?” এই বলে খানিকক্ষণ সমুদ্রের জলে ভেসে থাকার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা না পে্রে সে সেই জলেই ডুবে গিয়ে মরে গেল। তার শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের তলায়, আর তার আত্মাটা হয়ে গেল কালো সমুদ্র শামুক। তাই এই শামুকদের এখনও ‘সমুদ্রের দাঁড়কাক’ বলা হয়।

Eskimo Folk-Tales, by Knud Rasmussen, [1921], থেকে অনুদিত

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

আমরা কলকাতার বনেদি পরিবারের কথা বলেছিলাম। তেমনই এক দৃষ্টান্ত গোকুল মিত্রের বাড়ি। সামান্য লবণ যা গরিব লোকেরা খায়, অন্য শ্রেণীর মানুষও খায় তাই নিয়ে ব্যাবসা করে লাখপতি হওয়া সম্ভব হয়েছিল বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। চিৎপুরের কুলচন্দ্র মিত্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিং পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার পরিবর্তে বন্ধক রাখলেন রাজবাড়ির মদনমোহন বিগ্রহ। সেই কারণে বাগবাজার- চিৎপুর এলাকাতে এক জায়গার নাম হচ্ছে মদনমোহনতলা। সেই পাড়াতেই গোকুল চন্দ্র মিত্রের বাড়ি।

আড়াইশো বৎসর আগে লোকমুখে বাগবাজারের নাম ছিল বারুদখানা। স্কট নামক সাহেব এই জায়গায় কেল্লা ও বারুদ কারখানা বানিয়েছিল। সিরাজদৌল্লা সেই খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তা ধ্বংস করে দেবার আদেশ দেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই আদেশ অমান্য করায় সিরাজ প্রচুর সৈন্য এনে কাশীপুরে তাঁবু ফেলেন। বাগবাজারে প্রিন্স গার্ডেনে যুদ্ধ হয়। তখন কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, বনমালী সরকার, গোকুলচন্দ্র মিত্র ও রাজা নবকৃষ্ণ নিজেদের ধনদৌলত রক্ষা করতে বড়ো বড়ো গাছ কেটে চিৎপুর রোডে পথ অবরোধ করেন। সিরাজের সৈন্য রা তাই চিৎপুর দিয়ে কলকাতায় প্রবেশ করতে পারেনি।

নীলচাষীদের শোচনীয় অবস্থার ইতিহাস লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু লবণ যারা উৎপাদন করত সেই মালুঙ্গিদের দুর্দশা কেউ লিখে রাখেনি। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের উপকূল লবণ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মালুঙ্গিরা ঠিকাদার ও ব্যবসাদারের কাছ থেকে দাদন নিত। এর দরুন ঠিকাদাররা যে দাম বেঁধে দিত সেই দামেই তারা লবণ দিতে বাধ্য থাকত। ব্যবসায়ীরা সেই লবণ বিক্রি করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিল।

লবণ ঘিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ব্যাবসাদার, ঠিকাদার সকলে মিলে কূটকৌশল করেছিল। মুনাফা কোম্পানির কর্মচারী ও বেনিয়ারা পকেটস্থ করে নিত। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন গভর্নর। তিনি লবণের কাজ- কারবার কোম্পানির একচেটিয়া করে দিলেন। তারপরে তারা বাঁধা দামে লবণ দিত কোম্পানিকে।

এর পরের বৎসর থেকেই করমণ্ডল উপকূল থেকে লবণ আমদানি শুরু হল। কারণ বাংলার লবণ থেকে নানা কৌশলে সাহেব কর্মচারী ও বেনিয়াদের পকেটে যে প্রচুর মুনাফার টাকা জমা পরত, করমণ্ডল থেকে লবণে তার বেশি হেরফের হবেনা, এই ছিল উদ্দেশ্য।

গোকুল মিত্রের বাড়ি চিনতে পারা যায় ১৬১ আপার সারকেলে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি

অনুসরণ করে। এখন সেখানে কবওয়েব অফ হিসট্রি, মাকড়সার স্থান।

গোকুল মিত্রের ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় লটারি কমিটি তৈরি হয় রাস্তা বানানো, পুকুর তৈরি ইত্যাদি উন্নয়ন কাজের জন্য। চাঁদনী চক উঠেছিল গোকুল মিত্রের ভাগ্যে। একটি ছড়া আছে- "মদনমোহন দয়ায় পেলেন বাজার চাঁদনী।"

কিন্তু জাতীয়তাবোধের অভাব ও ব্যক্তিগত অর্থচিন্তা এতই প্রবল ছিল যে আমাদের অর্থনীতির যারা শিরদাঁড়া সেই কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য উৎপাদনকারীদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই অবহেলা ও প্রবঞ্চনার করুণ পরিণতি আমাদের বাংলায় প্রকটভাবে দেখতে পাচ্ছি। বাংলার শিল্পের বিশেষ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই।

রাধানাথ বসু মল্লিকের বাড়ি

১৮২৪ সালে কলকাতার মেসার্স বিচক্যাম্প অ্যান্ড কোম্পানিতে এক বাঙালি যুবক মাসিক ১২ টাকা মাইনেতে যোগ দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যুবকের অসাধারণ কর্মকুশলতা ও দূরদৃষ্টি সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল।পাঁচ বছর পরে রাধানাথ বসু ওই বিদেশী কোম্পানির একমাত্র

ভারতীয় পরিচালক ও অংশীদার হলেন। এর পরবর্তী সময়ে গঙ্গার তীরে জমি কিনে হুগলী ডকইয়ার্ড তিনি পত্তন করেছিলেন।

"স্যার উইলিয়াম ওয়ালেস" নামে ২০০ টনের জাহাজ কিনে বসলেন। সে সময়ে জাহাজের দাম পড়েছিল ১০ হাজার টাকা। সেই কারণে তিনি বাংলার শিল্পায়নের পথীকৃত। রাধানাথ চেয়েছিলেন ইংরেজ বণিকদের মতন সম্পূর্ণ নিজের পরিচালনায় একটি বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলবেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থে ১৮৩৮ সালে বিচক্যাম্প ও থমাস্ উইলিয়াম তিনগাটের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করেন ডকইয়ার্ড।

সেকালে কলকাতা বন্দরে বহু জাহাজ আসত কিন্তু মেরামতের জন্য কোন জাহাজঘাট ছিল না। তাঁর বন্ধু ও প্রাক্তন সহকর্মী স্যামুয়েল রিডের সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগে হুগলী ডকইয়ার্ডের জন্ম দেন তিনি।

রাধানাথ বসু মল্লিকের বাড়ি

বসু পরিবারের সপ্তদশ পুরুষ রঘুনাথ ছিলেন বাংলা নবাবের দেওয়ান। তাঁর কাজে দক্ষতার জন্য তাঁকে মল্লিক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। রঘুনাথের বংশধর রাধানাথ ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। প্রথম দিকে সামান্য অর্থাগম সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সঞ্চয়ী। এইভাবে বাংলার ১২৩৩ সালে কলকাতার আরপুলি গ্রামে সামান্য জমি কিনে বসত বাড়ি হল। ক্রমে আরো জমি কিনে অট্টালিকা বানান। ১৮৩০ সালে রাধানাথ গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। এই পরিবারের লোকজন ছিল গুণী, উন্নতমনা ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন। শ্রী গোপাল তাঁর ছোটোছেলে। দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষাপ্রচারের জন্য নিজের সম্পত্তি থেকে আলাদা করে ট্রাস্টিদের দিয়ে দেন।

হুগলি ডক হওয়ার পরে রাধানাথ মিত্র দুটি বৎসর বেঁচেছিলেন। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। সেই পরিবার ছিল দেশের উন্নতিকামী। লবণ চাষ করে মালুঙ্গিদের অত্যাচার করে অথবা নীল চাষিদের দুর্দশার ভাগীদার হয়নি তারা। প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই বংশের রাজা সুবোধ মল্লিক, তিনি নিজের সম্পূর্ণ সম্পত্তি দেশের উদ্দেশ্যে ছেড়ে স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাড়ির সংলগ্ন উইলিংটন স্কোয়ারে এই মানুষটির স্মারক ও দক্ষিণ কলকাতার এক রাস্তা তাঁর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাবেক কলকাতার গরিমা এইখানে।

বেলগাছিয়া ভিলা

বেলগাছিয়া রোডে "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ঠাকুর দুই লাখ টাকা মূল্যে তাঁর বিখ্যাত বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন। লবণ মহলের দেওয়ানি ও নানা ব্যাবসা- বাণিজ্যের সূত্রে তিনি বিত্তশালী ও প্রতাপান্বিত। এই বাগানবাড়িতে তিনি সেকালের দেশি- বিদেশি উচ্চপদস্থ লোকেদের আমন্ত্রণ করে বিলাসবহুল পার্টি দিতেন। সেই সময় সংবাদপত্রে তার বিস্তারিত বর্ণনা থাকত।

সেই বাগানবাড়িতে মোতিঝিল নামে একটি সুন্দর খাল ছিল। সেখানে নীল ও লাল রঙের পদ্ম ফুল ফুটে থাকত। বাগানে ছিল ফুলের মেলা। সেকালের ইউরোপীয় আসবাব, ছবি ও ভাস্কর্য সাজানো বৈঠকখানা ছিল। বৈঠকখানার পিছনে মার্বেলের ফোয়ারা। ঝিলের মাঝখানে দ্বীপ।সেখানে ছিল "সামার হাউস"; কাঠ ও লোহার সেতু দিয়ে সামার হাউসে যাতায়াত করা যেত।

বেলগাছিয়া ভিলা

১৮৫৬ সালে সেই বাগানবাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কিনলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। একজন বিদেশি ৫৩হাজার টাকা দিতে রাজি ছিল। কিন্তু ৫৪ হাজার টাকায় বাগানবাড়ি কিনে নিলেন সিংহরা। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ও কলকাতা পাইকপাড়ার বনেদি পরিবার এই সিংহরা। এই বংশের পুত্রবধূ রীতা সিংহ দেশের প্রথম সারির রাইফেল সুটার।এই বংশের গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান। ভেনেশিয়ান কাটগ্লাসের ঝাড়বাতি, টেবিল, পোর্সেলিনের ফুলদানি, হাতির দাঁতের শিল্পসামগ্রী আছে। দেওয়ালে তিসিয়ান, রুবেন্স, রাফায়েলের ছবির প্রতিলিপি আছে। চারটে আলসেশিয়ান নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াত সারা বাড়িতে।

এই বাড়িতে বাংলা মাস হিসাবে কাজ করে সেরেস্তা। খাতালেখা, হিসেব, দলিল দস্তাবেজ সব বাংলা ভাষায় চর্চা করা হয়।

পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক বাড়ি

ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ির কথা সবাই জানেন। কিন্তু কলকাতার রাস্তার দিনে দুপুরে

জেব্রায় টানা গাড়ি আমরা জানি কি? পাথুরিয়াঘাটার যদু মল্লিকের ছোট ছেলের ট্রটিং গাড়ি টানতো জেব্রা।

১৯৩৫ সালের ঘটনা। ঘোড়া যে তার ছিল না তা নয়। জাতকুল বিচারে কুলীন নয়। জোড়া ঘোড়া তার আস্তাবলে বাঁধা থাকত। এছাড়া আলিপুরে চিড়িয়াখানা থেকে ছয় হাজার টাকায় দুটি জেব্রা কিনে গাড়ি টানার ট্রেনিং দিয়েছিলেন। দেখতে লোকের ভিড় কেমন হয়েছিল? কলকাতায় "স্টেটসম্যান" পত্রিকায় সেদিন সংবাদ বেরিয়েছিল।

অর্থপ্রাচুর্যের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে রোলস্ রয়েস কিনেছিলেন। তিনি মল্লিকা নামে এক বজরা ও মন্মথ নামে মোটরলঞ্চ চড়ে গঙ্গা বিহার করতেন। বড়োছেলে রাসবিহারীর বিবাহতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কেল্লার বাজনা নিয়ে শোভাযাত্রা করেছিলেন। এই শোভাযাত্রায় খোলা তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার, ৩৬টি পুলিশ ঘোড়সওয়ার, চারটি ঘোড়ায় টানা দুটি গাড়ির কনসার্ট পার্টি ও ১৬টি ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল। সেদিন আমাদের শহরে এটি একটি সাড়া জাগানো ঘটনা।

যদু মল্লিকের বড় ছেলে রায় বাহাদুর অনাথনাথ মল্লিকের এক মাত্র ছেলে প্রদ্যুম্নকুমার কিনে নিয়েছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাপতেহাটার বাড়ি, শ্যাম মল্লিকের ৮৪ আপার চিৎপুর

রোডের বাড়ি ও আপার চিৎপুর রোডের হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের বাড়ি। তাঁর ৩৫টি মোটরগাড়ি, ১০টি রোলস্ রয়েস ছিল। এর মধ্যে দুটি গাড়ির বডি ছিল অ্যালমুনিয়াম ও পিতলের। এমনটা সচরাচর হয় না।

অত্যধিক খরচের ফলে তাঁকে ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি থেকে ধার নিতে হয়েছিল।এবং ঋণের দায়ে কলকাতা ছেড়ে মধুপুরের প্রাসাদোপম "মার্বল হল"- এ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিত্তহীন হয়ে স্ত্রীকে গুলি করে নিজে আত্মহত্যা করেন।

ঊষা মেহতা

উমা ভট্টাচার্য

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ। কুখ্যাত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন চলছে। নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, গান্ধীজির ডাকে দলে দলে সাধারণ মানুষ পথে নামছেন মিছিল করে। সবারই মুখে এক স্লোগান- 'সাইমন গো ব্যাক'।

গুজরাটে তখন প্রতিবাদীর সংখ্যা অগুনতি। সেখানকার সুরাট শহরে একদিন সকালে দেখা গেল বড়োদের একটি প্রতিবাদ মিছিল চলেছে। সেই মিছিলের শেষে,একটু তফাতে আর একটি ক্ষুদে মিছিল আসছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের একটি দল, হাতে তেরঙ্গা পতাকা, মুখে কচি গলায় স্লোগান 'সাইমন গো ব্যাক'। তাদের নেতা একটি আট কি নয় বছর বয়সী ছোট মেয়ে, চলেছে মিছিলে সবার আগে।

হঠাৎ গোরা পল্টন তেড়ে এল, পতাকা হাতে একটি মেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। পুলিশ তাদের মিছিল ভেঙে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

সুরাতের খেরার একটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী, এই ক্ষুদে দলের নেতা মেয়েটি কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। তার নেতৃত্বে শিশুরা অভিভাবকদের কাছে এই ঘটনা জানাল। শিশুদের অভিভাবকেরা অনেকেই গান্ধীবাদী ছিলেন, ছোটদের মুখে পুলিশের তাড়া দিয়ে পতাকা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার কথা শুনে রেগে গিয়ে তাঁরা আবার শিশুদের মিছিলে পাঠাবেন ঠিক করলেন। তবে এবার তাদের হাতে আর পতাকা দিলেন না। এবার তেরঙ্গা কাপড় দিয়ে জামা তৈরি করে, তাই পরিয়ে তাদের মিছিলে পাঠালেন। এক একটি পতাকাই যেন হাঁটছিল মিছিলে। তেরঙ্গা মিছিলের শিশুরা দৃপ্তকণ্ঠে বলতে বলতে চলল, "পুলিশ তুমি যতই করো, উঁচাও লাঠি, ব্যাটন ধরো, পারবে নাকো পতাকা মোদের

কাড়তে”।(Policemen, you can Weild your sticks & your batons, but you cannot bring down our flags”.) এই অভিনব মিছিল দেখে পুলিশও বোধ হয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

এখানেই থেমে ছিলনা মেয়েটি আর তার দল। তারা বড়োদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মদের দোকানে পিকেটিং করতেও যেত পড়াশোনার পরে।

কিছুদিনের মধ্যেই বাবার কানে এল মেয়ের কীর্তিকলাপের কথা। বাবাও হয়ত আর সব শহরবাসীর মতই দেশভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাধা ছিল, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজের অধীনে কর্মরত একজন বিচারক। মেয়ের আচরণে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন জেনে বাবা বাধ্য হয়েই তাঁকে বারণ করলেন। বাবার বিপদ হতে পারে জেনে মেয়ে কিছুদিন প্রকাশ্যে কাজ বন্ধ রাখল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বাধাও দূর হল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবা অবসর নিলেন। তখন মেয়েটির বয়স দশ বছর মাত্র। তখনই তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও উৎসুক।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের পরিবার চলে গেলেন বোম্বাই। বোম্বাই তখনো মুম্বাই হয়নি। এবার তাঁর পক্ষে দেশের কাজ করা অনেক সহজ হয়ে গেল। পড়াশোনার সাথে সাথেই দেশের কাজে পুরোপুরি অংশ নেবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি আর অন্য কিছু ছেলেমেয়ে মিলে নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনামা ও বিভিন্ন বিষয়ে নানা ছাপা কাগজ, লিফলেট ইত্যাদি গোপনে জনগণের মধ্যে বিলি করতেন। যাঁরা জেলে ছিলেন তাঁদের পরিবারের লোকজনদের সাথে দেখা করতেন,তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া দরকারি খবর বা নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশমূলক চিঠিপত্র সংগ্রহ করতেন। লোক মারফৎ সেগুলি যে কোন উপায়ে বন্দী বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। ছোট বলে তাঁদের কেউ বিশেষ সন্দেহও করত না। সেই সুযোগে তিনি পুরোমাত্রায় কংগ্রেসের খবরাখবর রাখতে শুরু করলেন ও নেতাদের কাছে নির্ভরযোগ্য কর্মী হয়ে উঠলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আজীবন কংগ্রেসের কর্মী থাকবেন, সংসার করবেন না। খুব কম বয়স থেকেই তিনি সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজির জীবনধারাকে গ্রহণ করেন। ১২/১৩ বছরের মেয়েটি খাদির পোশাক পরতে শুরু করলেন, বিলাসিতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন জীবন থেকে। গান্ধীজির জীবনদর্শনই হল তাঁর জীবনদর্শন,যা তিনি সারা জীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন।

পড়াশোনা কিন্তু ছেড়ে দেননি। মধ্যমানের ছাত্রী হলেও ভারুচের চন্দরামজি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকে ভালো ফল করলেন। ক্লাসের প্রথম পঁচিশজন ছাত্রীর মধ্যে তাঁর নামটি স্থান পেল। দেশের কাজের পাশাপাশি কলেজের পড়া চলল। ১৯৩৯ সালে বম্বের উইলসন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হলেন।

২২ বছর বয়স থেকে কংগ্রেসের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। তখন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। কংগ্রেস ও গান্ধীজির ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট শুরু হবে ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’। ওইদিন বোম্বাই শহরের ‘গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক ময়দান’- পরবর্তীকালের মুম্বাই ‘আগস্ট ক্রান্তি ময়দান’ থেকে মিছিল শুরু হবে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঘোষণার পরেই তৎপর ব্রিটিশ পুলিশ ধরপাকড় শুরু করল। আট আগস্ট গান্ধীজি প্রমুখ অন্যান্য বড়ো নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। নেতাদের গোপন নির্দেশানুসারে নির্দিষ্ট দিনে জমায়েত পরিচালনার ভার পড়ল জুনিয়ার গ্রুপের কংগ্রেস কর্মীদের ওপর। সেদিনই নেতৃপদে অলিখিত অভিষেক হয়ে গেল তাঁর। সমবেত জনতার সামনে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন তিনি, ও তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বম্বেতে ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’- এর সূচনা করলেন। এবার থেকে তিনি হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা- ঊষা মেহেতা ।

এই সময়েই তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন। তা হল কংগ্রেসের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও গোপন একটা বেতারকেন্দ্র স্থাপন। ঊষা মেহেতা- ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিলকারিণী সেই ছোট্ট প্রতিবাদী মেয়েটি, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই অভাবনীয় কাজটি করলেন। ১৪ই আগস্ট থেকে চালু করলেন, ‘সিক্রেট কংগ্রেস রেডিও’র কাজকর্ম। এই অসামরিক গোপন রেডিওর সাহায্যে গোপনে ইংরেজবিরোধী প্রচার চালানো, নেতা, সাধারণ কর্মী

ও দেশের অন্যান্য প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও নানা সিদ্ধান্ত বিষয়ে অবহিত থাকার কাজ চলল অতি সন্তর্পণে।

১৪ই আগস্ট সেই বেতারে ভেসে এল তাঁর কন্ঠস্বর, "আমি ভারতের কোনও এক জায়গার কোনও এক অবস্থান থেকে ৪২.৩৪ মিটার বেতার তরঙ্গে চালিত 'কংগ্রেস রেডিও' থেকে বলছি....."

এই রেডিওর মাধ্যমে গান্ধীজির নির্দেশ গ্রহণ ও রেকর্ড করা হত প্রচারের জন্য। সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হত, তাঁদের নির্দেশ, উপদেশ রেকর্ড করা হত ও পরিকল্পনার বিষয়ে জানা যেত। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রায় রোজই প্রচারকেন্দ্রের জায়গা বদল করা হত।

এর ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের কাজ চালানো অনেকটা সহজ হয়ে গেল। ইংরেজ পুলিশের মতে যেগুলি ছিল নিষিদ্ধ খবর সেগুলিই বিনা বাধায় জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার করা সহজ হয়েছিল, সারা দেশে আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল অতি সহজেই।

অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিশ বেতার কেন্দ্রের সন্ধান পেল তিন মাস পর- ১২ই নভেম্বর। বেতারকেন্দ্রের উদ্যোক্তাসহ সকল সদস্যই গ্রেপ্তার হলেন। ঊষা মেহেতাও গ্রেপ্তার হলেন।

ভারতীয় পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সি আই ডি তাঁকে ছ'মাস ধরে জেরা করে। কিন্তু পুরো জিজ্ঞাসা পর্বে তিনি জেরার উত্তরে একটিও কথা বলেননি। ছ'মাস জেলের একটি সেলে একাকী আটক থেকেও তাঁর মনোবল ছিল অটুট। কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে বিদেশে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়া হবে এইরকম নানা প্রলোভন দেখানো হয়েছে, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বাক। এমনকি বিচারের দিনগুলিতেও তিনি প্রশ্নের উত্তরে নির্বাক থেকেছেন। নিজেকে বাঁচাবার জন্যও তিনি কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি । ফল হল চার বছরের জেল।পুণের ইয়ারাভেদা জেলে তাঁকে রাখা হয়েছিল।

জেলে থাকাকালীন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য বম্বের জে জে হসপিটালে আনা হয়েছিল, তাও ২৪ ঘণ্টা চারজন সশস্ত্র পুলিশের পাহারায়।একটু সুস্থ হলে আবার তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের নির্দেশক্রমে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে । পরবর্তীকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তটি ছিল সিক্রেট কংগ্রেস রেডিওর কাজ শুরু করা আর সবচেয়ে তিক্ত আর দুঃখের মুহূর্তটি ছিল যখন জানলাম যে,একজন ভারতীয় টেকনিশিয়ানের বিশ্বাসঘাতকতায় এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জায়গাটির সন্ধান পেয়ে গেল ইংরেজ পুলিশ। আমরা সবাই ধরা পড়লাম। দেশের অনেক ক্ষতি হল।"

তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে এর পরে ইচ্ছে থাকলেও তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্ত কাজ থেকে দূরে থেকেছেন। আমৃত্যু লেখালেখির মাধ্যমে সামাজিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। পরে আরও পড়াশোনা করেছেন, গান্ধীজির রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতাদর্শ নিয়ে গবেষণা করে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি পেয়েছেন। ইংরিজি ও গুজরাটি ভাষায় অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বই লিখেছেন। ছাত্রী হিসাবে, লেকচারার হিসাবে,প্রফেসর হিসাবে, গবেষণা সহায়ক হিসাবে,সর্বোপরি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিভিকস্ ও পলিটিক্স' বিভাগের প্রধান হিসাবে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে অবসর নেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ভারতীয় বিদ্যাভবন, গান্ধী শান্তিসংস্থা যোজনা, গান্ধী স্মারক নিধি ট্রাস্ট প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে তাঁর আজীবন যোগ ছিল।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেন ভারত সরকার। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়।

স্মরণীয় সহযোগীরা

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে ঊষা মেহতাই প্রথম নাগরিক যিনি কংগ্রেসের বিপ্লবী কাজকর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি সফল অসামরিক 'গোপন বেতারকেন্দ্র' স্থাপনের মত দুঃসাহসী কাজটি করেছিলেন। এ কাজে তিনি যাঁদের সহকারী নির্বাচন করেছিলেন ও যাঁদের অকৃপণ সহযোগিতায় এই কাজটি করতে পেরেছিলেন তাঁদের নাম না করলে অন্যায় হবে। এই বেতারকেন্দ্রের বাস্তবায়নে যাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগ ছিল তিনি ছিলেন শিকাগো রেডিওর মালিক নানকা মোতওয়ানি- যিনি সমস্ত যন্ত্রপাতি আর টেকনিশিয়ান যুগিয়েছিলেন। সহযোগী ছিলেন বিঠ্ঠলভাই জাভেরি,চন্দ্রকান্ত জাভেরি,বাবুভাই ঠক্কর ।যাঁরা মানসিক সমর্থন যুগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া,অচ্যুৎ রাও পট্টবর্ধন,পুরুষোত্তম টিকমদাস।

শেষে একটি কথা জানাই যে দিল্লীর এসকর্ট হাসপাতালের ডিরেক্টর ও নামকরা অ্যানাস্থেটিস্ট ডাঃ যতীন মেহেতা, আর বিখ্যাত চিত্রপরিচালক কেতন মেহেতার পিসিমা ছিলেন ঊষা মেহেতা।

দেশ ও মানুষ

রুটি ব্যাঙ্কার

উমা ভট্টাচার্য

আমরা এবারের দেশ ও মানুষ পর্বে জানবো আমাদের ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশের কিছু সাধারণ মানুষের কথা, যাঁরা সাধারণ,দীনদরিদ্র,নিরন্ন,অভুক্ত মানুষের কথা শুধুই ভাবেনই নি,বাস্তবে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিচ্ছেন। দেশের সরকারের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে ভারতের কোন অঞ্চলেই আজ পর্যন্ত নিরন্ন মানুষের সংখ্যা নির্মূল করা যায়নি, সেখানে দাঁড়িয়ে এঁদের কাজ দেখলে বলতেই হবে আঞ্চলিকভাবে হলেও এঁরা সেটা করতে পেরেছেন। সেখানকার অভুক্ত, পথবাসী,বস্তিবাসী, স্টেশনবাসী, সব খাদ্যহীন মানুষের মুখে প্রতিদিন কিছু খাদ্য জোগাচ্ছেন।

আমরা সকলেই টাকা রাখার ব্যাঙ্ক, রক্ত রাখার ব্যাঙ্ক, আই ব্যাঙ্ক এরকম নানা ব্যাঙ্কের কথা শুনেছি। কিন্তু 'রুটি ব্যাঙ্ক'- র কথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুনিনি। হ্যাঁ, এই নামেই একটি ব্যাঙ্ক খুলেছেন বুন্দেলখণ্ডের এক অনগ্রসর অঞ্চল 'মাহোবা'- র কাজপাগল ,সমাজসচেতন কিছু ছেলেমেয়ে। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী দল, যাঁদের উদ্দেশ্য এলাকার অভুক্ত মানুষের জন্য দৈনন্দিন সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

‘রুটি ব্যাঙ্ক'এ রুটি সংগ্রহ করে জমা করা হয়, আর সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিতরণ করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবী দলে আছেন পাঁচজন বর্ষীয়ান মানুষ আর চল্লিশজন যুবকযুবতী। এই দলের প্রধান হাজি সুদ্দানের কথা থেকে জানা গেছে যে, তাঁরা কোন ফেলে দেবার মত উদ্বৃত্ত খাবার বা বাসি খাবার নেন না।

দলের সদস্যরা সচ্ছল মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদন করেছিলেন যে, তাঁরা যদি প্রতিদিন অন্তত দুটি করে টাটকা রুটি আর একটু সবজি তাদের দেন তবে খুব উপকার হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলার পর প্রায় সব পরিবারই রাজি হয়। তারপর থেকে শুরু হয়ে যায় এই রুটি সংগ্রহ অভিযান। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে চালু হয়েছে এই রুটি ব্যাঙ্ক ।

দলের সদস্যরা এদের কাজের এলাকাটিকে আটটি টুকরোয় ভাগ করেছে। সকাল থেকেই রুটি ব্যাঙ্কের সদস্যদের মধ্যে সংগ্রহকারীদের দল নিজের নিজের নির্দিষ্ট এলাকার বাড়িগুলি থেকে রুটি, সবজি সংগ্রহ করে আনে। সেগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভাঁড়ারে রাখা হয়। বিতরণকারী দলের সদস্যরা সঙ্গেসঙ্গেই সেখান থেকে খাবার নিয়ে নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকায় চলে যান, সেই খাবার বিতরণ করতে। ক্রমাগত সংগৃহীত খাবার আসতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বিলি হতে চলে যায়। যন্ত্রের মত এক সুশৃংখল পদ্ধতিতে পুরো কাজটি হয়ে চলে, যতক্ষণ না তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের হাতে খাবার পৌঁছোয়।

প্রথমে এঁদের কাজ শুরু হয়েছিল ভিখারি, গৃহহীন, পথবাসী, পঙ্গু অসহায় মানুষ ,আর স্টেশনচত্বরে বসবাসকারী অভুক্ত মানুষদের হাতে খাবার তুলে দেওয়া দিয়ে। আজ মাহোবার অনেকটা এলাকায় এঁদের কাজ চলছে। বর্তমানে এঁদের খাদ্য প্রাপকদের তালিকায় আছেন হাসপাতালের রোগীরা যাঁদের বাড়ি থেকে খাবার আসে না, হাসপাতালের রোগীদের অপেক্ষমাণ দরিদ্র আত্মীয়েরা, অ্যাটেনডেনটদের মধ্যে যাঁরা দুঃস্থ তাঁরা, এছাড়া নতুন যে কোনও দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষেরা। কত মানুষ যে এই রুটি ব্যাঙ্কের ফলে উপকৃত হচ্ছেন তার হিসাব নেই।

মানুষ যে রুটি ব্যাঙ্কের সদস্যদের দেবদূতের মত ভাবছেন ,তা বোঝা গেছে রামপ্রকাশ নামে একজন টিবি আক্রান্ত প্রায় অকর্মণ্য মানুষের কথায় - "এঁরা ঈশ্বর, ঈশ্বরই এসেছেন এঁদের বেশে। আমার তো দেবার মত কিছু নেই,তাই এঁদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করি"।

বর্তমানে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এঁদের সাহায্য করতে চাইছে,এঁদের কাজের এলাকা বাড়াতে বলছে। কিন্তু এঁদের বক্তব্য, যে সদস্যরা আছেন তাঁরা এলাকায় সংগৃহীত খাদ্য তালিকাভুক্ত মানুষদের মধ্যে ঠিকঠাক বিতরণ করতে পারছেন। এর থেকে বেশি করতে গেলে বিশৃঙ্খলা হতে পারে। তাঁদের সীমিতসংখ্যক সদস্য দিয়ে এলাকার তালিকাভুক্ত মানুষদের সঠিকভাবে খাদ্য বিতরণ করায় বিশৃংখলা দেখা দেবে। সংগৃহীত খাদ্যের অপচয় হতে পারে, যেটা তাঁদের নীতি নয়। যে কাজ তাঁরা আরম্ভ করেছেন সেটুকুই তাঁরা সুষ্ঠুভাবে করে যেতে চান। এমনই অভিমত তারা পাটকরের, যাঁর 'মস্তিষ্ক - প্রকল্প 'এই 'রুটি ব্যাঙ্ক'।

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার সব মানুষের 'খাদ্যের অধিকার' সারা দেশে বাস্তবায়িত করা যায়নি কিছু মানুষের স্বার্থপরতায় আর আমাদের মত নাগরিকদের উদাসীনতায়। বুন্দেলখন্ডি সমাজের প্রেরণায় মাহোবাতে যাঁরা এই অভিনব ও উপযোগী কাজটি করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্মান জানাই আর ভাবতে চেষ্টা করি আমরাও এরকম কিছু করতে পারি কিনা!

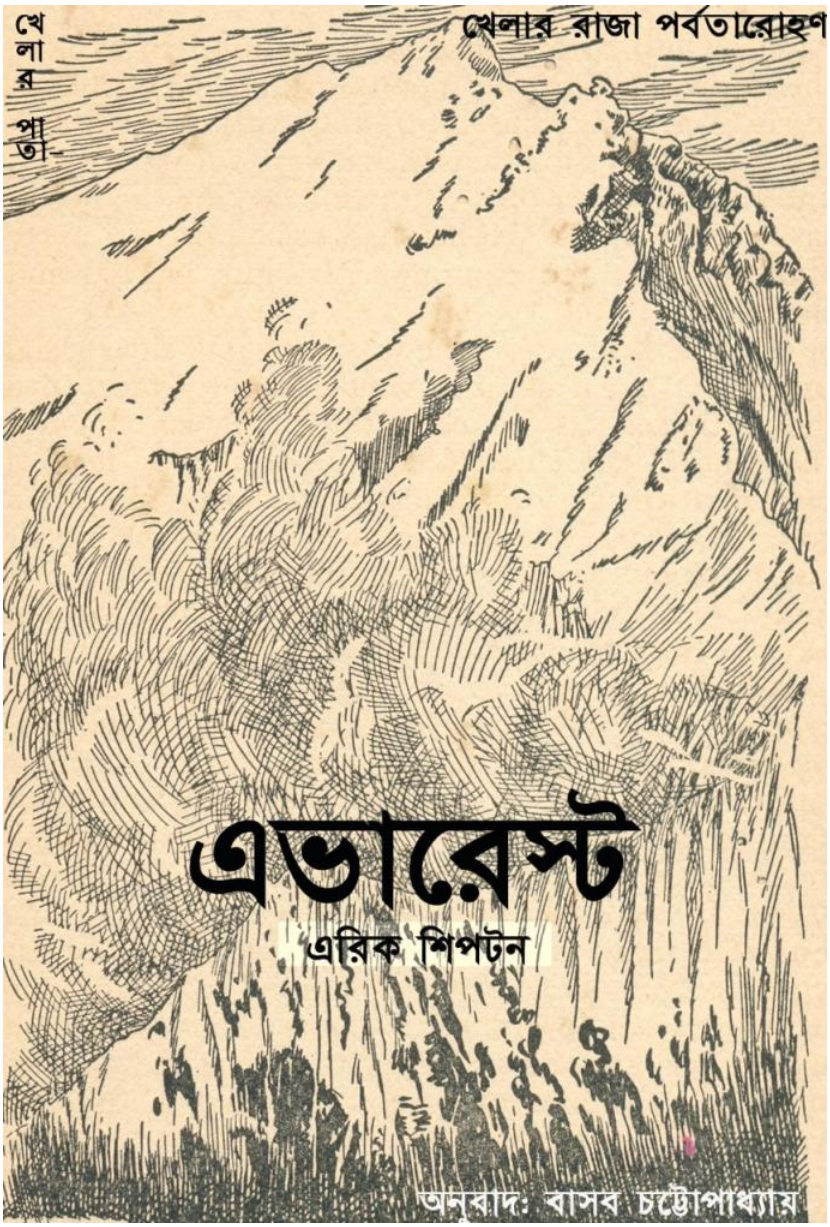

নরম সূর্যালোকের উত্তাপ গায়ে মেখে বসে আছি। লক্ষ করছি স্মাইথ অগ্রসর হচ্ছেন দূরের স্ল্যাবটির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের দিকে। সবচেয়ে ভালো লাগছে স্মাইথ এখনও আমার কাছে দৃশ্যমান। সেই মুহূর্তে মনে হল স্মাইথকে এভাবে খেয়াল না করে ষষ্ঠ শিবিরে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ফিরে চললাম শিবিরের দিকে কারণ দূর থেকে দেখে আমিও অগ্রসর হতে পারি মনে করে স্মাইথ আমার জন্য অকারণ অপেক্ষা করতে পারেন।

তখন ১টা ৩০। স্মাইথ ফিরে এলেন। তিনি গ্রেট কুলিয়ার পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু চারিদিকের নতুন বরফের আচ্ছাদনের বাধা কাটিয়ে আর এগোনো সম্ভব হল না। আগের দল যতদূর পৌঁছতে পেরেছিলেন ঠিক সেই উচ্চতা থেকে তাঁকে বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হল। নির্ণয় করা সেই স্থানের উচ্চতা ২৮,১০০ ফুট। থিওডোলাইটের সাহায্যে নীচে থেকে এভারেস্টের উত্তরগাত্রের শৃঙ্গগুলির প্রকৃত অবস্থান এবং উচ্চতা নির্ণয়ের সিদ্ধান্তে আসা যেভাবে সম্ভব, সেভাবে কোনো উচ্চতায় পৌঁছে অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটারের সাহায্যে তার উচ্চতা নির্ণয়ের পাঠ ততটা সঠিক নাও হতে পারে।

অপরিসীম পরিশ্রমে স্মাইথ তখন অবসন্ন। সিদ্ধান্ত নিলেন সেদিন নীচের শিবিরের দিকে তিনি অগ্রসর হবেন না। বিশ্রাম নেবেন সে রাতে এই শিবিরে। অন্যদিকে হতভাগ্য বার্নিকে উৎকন্ঠা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে চললাম পঞ্চম শিবিরের দিকে। সিদ্ধান্ত হল বিশ্রামের পরের দিন স্মাইথ নর্থকলের দিকে নেমে আসবেন। তাঁবুতে তাঁর জন্য দুটি স্লিপিং ব্যাগ রেখে আমি ফিরে এলাম।

তখন ২টা ৩০। ষষ্ঠ শিবির থেকে সামান্য এগিয়েই মেঘচক্রব্যূহে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। চারিদিকে মেঘ ব্যতীত কোন কিছুই আর দৃশ্যমান নয়। শিবিরের নীচের দিকে বিপজ্জনক পথকে এড়িয়ে আমি উত্তর- পূর্ব গাত্র বরাবর আড়াআড়ি চলতে থাকলাম। আগের দল এভাবেই এই পথ অতিক্রম করেছিলেন। সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করার পর খাড়াইয়ের মাত্রা অনেকটাই কমে গেল, যে পথ দিয়ে নিরাপদে সহজে এগিয়ে যাওয়া যায়। পুণরায় সেই উত্তর- পূর্ব গাত্রের নিরাপদ ঢালই ধীরে ধীরে ৯০° মাত্রার ভয়ংকর তুষারাচ্ছাদিত খাড়াই প্রাচীরে পরিণত হল। আরোহণ করতে করতে পাহাড়ের গা থেকে এগিয়ে আসা বরফের টুকরোয় সামান্য একটি বিন্দুতে কিছুক্ষণ ঝুলে থেকেই অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক জায়গায় সরে এলাম।

এইবার শুরু হল প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। এভারেস্টের এই ঝোড়ো হাওয়া সম্পর্কে পূর্বে আমার কোন ধারণা ছিল না। এভারেস্ট ঝড়ের বৈশিষ্ট্য অতর্কিত, দীর্ঘায়িত এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো অনেক উচ্চতা পর্যন্ত গুঁড়ো বরফে ছেয়ে যাওয়া এক বিপজ্জনক অবস্থা। প্রবল ঝঞ্ঝায় বাঁচার জন্য পর্বতে চলতে থাকল মানুষ- প্রকৃতির অসম লড়াই। অনুভব করলাম আর এক মূহুর্ত এই ঝোড়ো বাতাসে স্থির থাকা সম্ভব নয়। পাথুরে দেওয়ালটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে গুটিসুটি মেরে কোনরকমে বসে রইলাম।

সৌভাগ্যবশত খানিক বাদে সেই ঝোড়ো বাতাসের বেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকল। এইবারে ফের এগোনোর পরিকল্পনা করলাম।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ এই অসম লড়াইয়ে আমি তখন দিশাহারা। ঘন মেঘের চাদরে কোনদিকে এগোব তা নির্দিষ্ট করা অসম্ভব হয়ে উঠল। যদি আমি উত্তর- পূর্ব শৈলশিরায় না পৌঁছতে পারি তাহলে নীচে নামা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমি বসে পড়লাম। অসহায় অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। ভাবতে থাকলাম দার্শনিকতার অন্তিম উচ্চতায় পৌঁছাতে হলে এমনই বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার প্রয়োজন এবং তা একমাত্র সম্ভব হিমালয়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানে এমনই বিপদসংকুল একাকি অবস্থায়। মনের গতিবিধি তখন সবরকম কঠিন আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অবস্থা। সমস্ত জাগতিক আশা- আকাঙ্খা থেকে অনেক দূরবর্তী একটি শান্ত মূহুর্ত। অনুভব করলাম অদ্ভুত না- অপ্রীতিকর, না- উত্তেজক মুহুর্ত এবং অবসন্নতার মধ্যে তুরীয় আনন্দ, যা মনকে নিয়ে চলেছিল এক গহন নির্জন পথে।

আমি কতক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম, এই মুহুর্তে আমার কিছুই মনে নেই। শুধু সামনে দেখা যাচ্ছিল, চারিদিকে কুয়াশার মতো তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় মাথা উঁচু করে ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা শিখর দন্ডায়মান। এমন দৃশ্য আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। হঠাৎ যেন সেই কুয়াশার দেওয়াল থেকে একটি ছোট জানালা খুলে গেল, দূর থেকে উত্তর দিকের দেয়াল যেন ঝোড়ো সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত পাথুরে শৃঙ্গের মতো ধরা দিল আমার চোখে।

ঝড়ের প্রকোপ থেকে পরিত্রাণের পর ১৯২৪- এ যে স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করেছিলাম, সেই একই স্থানে ষষ্ঠ শিবির স্থাপন করলাম।

তারপর পঞ্চম শিবিরের দিকে যাত্রা। বাকি অভিযাত্রী দল পঞ্চম শিবিরের উদ্দেশ্যে নেমে গেছে যে সেইটা আমায় স্বস্তি দিচ্ছিল। সর্পিল পথে মাটি ঘষে ঘষে, পাথুরে পথে প্রতি মূহুর্তে ধাক্কা

খেতে খেতে ভারসাম্য সামলে সামলে নীচে নামতে থাকলাম। বাতাসের তখনকার উন্মাদনা আমার সেই মূহুর্তের মানসিক অবস্থার সাথে একইরকম ছিল।

বার্নি (ফোটো থেকে করা স্কেচ)

শিবিরে পৌঁছেই দেখলাম দুর্বল শারীরিক অবস্থাতেও অভিযাত্রী বার্নি জল ফুটিয়ে বোধহয় চা বানাচ্ছিলেন। নর্থকলের মত উচ্চ হিমালয়ে দলের সমস্ত অভিযাত্রীদের অপেক্ষা বেশি দিন অতিবাহিত করেছিলেন এই অভিযাত্রী, বিনিময়ে পায়ের পাতায় পেয়েছিলেন তুষারক্ষতের যন্ত্রণা। অথচ শৃঙ্গারোহণে বিন্দুমাত্র উচ্চাশা না থাকা সত্ত্বেও উত্তেজনায় দীর্ঘরাত্রি একাকি যাপনের অভ্যাস তাঁর ছিল। উপলব্ধি করলাম তাঁর তৈরি ফুটন্ত চায়ের থেকেও অধিক উষ্ণ এক উৎফুল্লতা তাঁকে বেঁচে থাকার যেন শক্তি যোগাচ্ছে। পাহাড়ে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ঝোড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে অন্য তাঁবুতে স্লিপিং ব্যাগ আনতে চললাম। চারিদিকে তখন বরফ আর বরফ। তাঁবুও তুষারাচ্ছাদিত। ঠান্ডায় আঙুলগুলি একে অপরের সাথে জুড়ে গেছে। বার্নির সাথে স্লিপিং ব্যাগের অর্ধেক অংশ ব্যবহার করে বরফে আবৃত সেই তাঁবুতে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনের শব্দে এক ভয়াবহ রাত কাটালাম দুজনে।

সূর্য ওঠার সাথে সাথে নর্থ কলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। কয়েক ঘন্টা পূর্বেই সেখানে অভিযাত্রী স্মাইথ পৌঁছেছিলেন।

পুরো দল অভিযানে অব্যাহতি দিয়ে হিমবাহ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মূল শিবিরে পৌঁছলেন। সপ্তাহখানেকের বিশ্রামের পর পুনরায় তৃতীয় শিবিরে ফিরে এলাম পূর্ণোদ্যমে নতুন পদক্ষেপের প্রত্যাশায়। কিন্তু বর্ষার মরসুম শুরু হয়ে যাওয়ায় নর্থ কলের ঢাল তখন ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে। নতুন বরফকণায় আচ্ছাদিত এভারেস্ট শীর্ষের শেষ ২০০০ ফুট আরোহণ তখন প্রায় অসম্ভব।

ক্রমশ

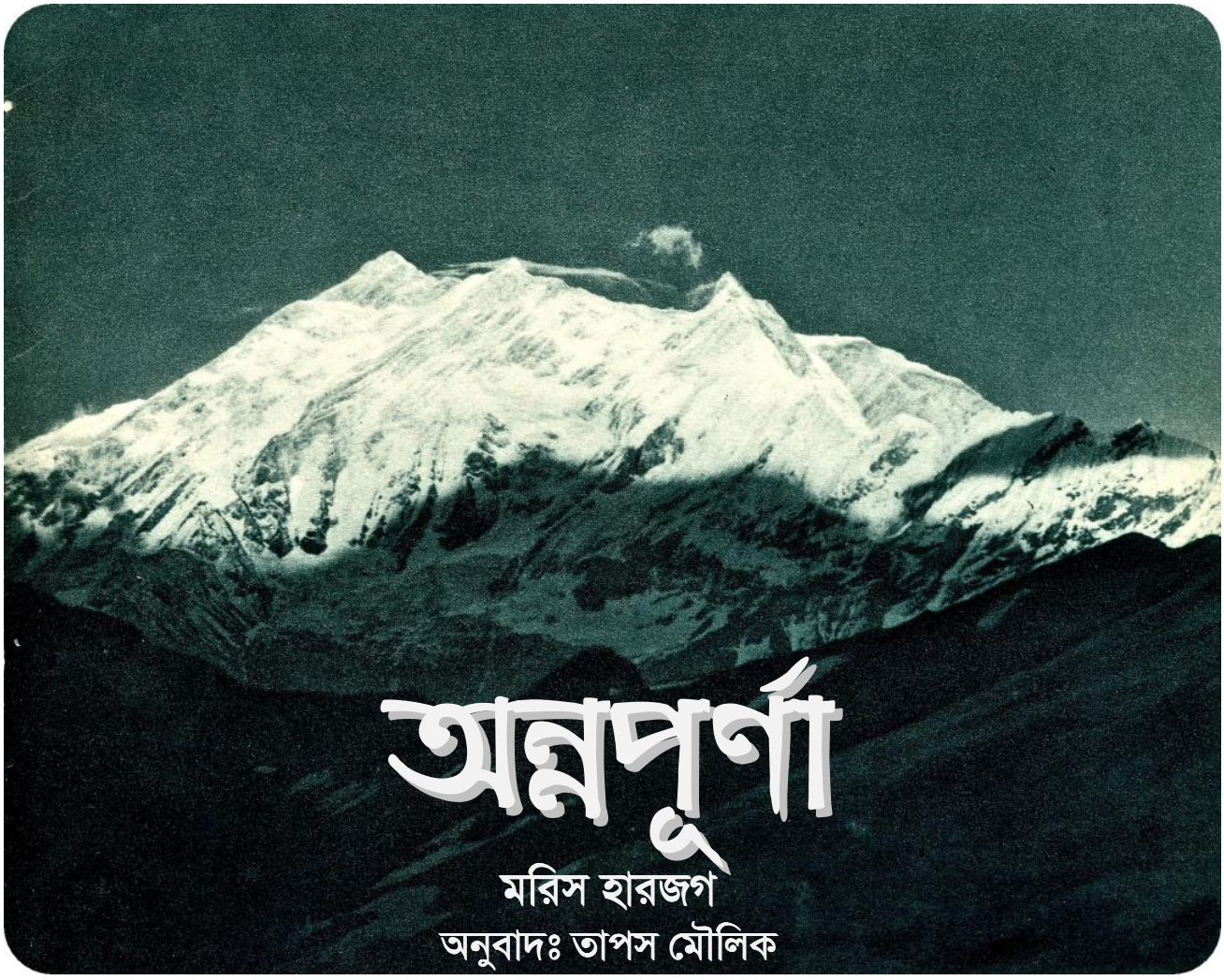

অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবারে পঞ্চম পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৫০ মিরিস্তি খোলার গিরিখাত ধরে এগিয়ে দেখা অন্নপূর্ণা

ফোটোঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

৫

অন্নপূর্ণার খোঁজে

"অডট, তাড়াতাড়ি করো, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে।"

সকাল থেকে ল্যাচেনাল আর টেরের নানারকম ডাক্তারি পরীক্ষা করছে অডট। নাক, কান, গলা, বুক, পেট সবকিছুর প্রায় বিশ রকমের নিয়মমাফিক চেক আপ। এর মধ্যে ফ্ল্যাক টেস্ট বলে একটা পরীক্ষা ছিল, যেটা আমাদের সবারই বিলক্ষণ মনে আছে। একটা নলের মধ্যে ফুঁ দিয়ে চার সেন্টিমিটার পারদের সমান বায়ুচাপ ধরে রাখতে হবে। পরীক্ষাগুলো সবই খালি পেটে করতে হত। আর কোনও অনুসন্ধানপর্ব থেকে সদ্য ফিরলে এমন খিদে হত, যে জলখাবার না খেয়ে বসে থাকতে থাকতে অডটকে শাপশাপান্ত করতেই ইচ্ছে করত।

টেরের চেক আপ চলছে। ল্যাচেনালের হয়ে গেছে। সে একটা প্লেটে একগাদা সসেজ নিয়ে এসে টেরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছে। টেরে মাঝেমাঝেই টেরিয়ে টেরিয়ে ল্যাচেনালের

প্লেটের দিকে তাকাচ্ছিল, শেষে আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই ল্যাচেনাল, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও তো এক্ষুনি! ব্যাটা শুওরের মত সসেজ খাচ্ছে!"

"শাট আপ। একদম চুপ। এরকম চ্যাঁচালে টেস্টের রেজাল্ট কি ঠিক আসে? ফের প্রথম থেকে করতে হবে কিন্তু," অডট এক ধমক দিল টেরেকে। ওর কোনও মায়াদয়া নেই।

আমি একটু সংশয়ে ছিলাম, অডটের বোধহয় ডাক্তারির চেয়ে পাহাড় চড়াতেই বেশি উৎসাহ দেখব। আমার চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। অডট দেখলাম পর্বতাভিযাত্রী আর ডাক্তারের এক নিখুঁত যুগলবন্দী। দলের সবার স্বাস্থ্য, ফিটনেস, কে কতটা উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে – সে সব বিষয়ে অডট নিয়মিত আমায় ওয়াকিবহাল রাখত। আহা, সব পর্বতাভিযানেই যেন এরকম একজন অডট থাকে।

এদিকে আমি, আইজ্যাক আর রেবুফত মানাংভোটের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। মিরিস্তি খোলা ধরে অন্নপূর্ণার রাস্তা বেশ ঝামেলার আছে। মানাংভোটের দিক থেকে বরং সোজা হওয়ার কথা।

"টিলম্যানকে আমাদের শুভেচ্ছা জানিও," খাওয়া শেষ করে ল্যাচেনাল মজা করে বলল। টিলম্যানের নাম হিমালয় পর্বতাভিযানের সঙ্গে জড়িত সবাই জানে। সেই টিলম্যান যিনি এখনও পর্যন্ত মানুষের জয় করা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবীতে (২৫,৬৪৫ ফিট) উঠেছিলেন। ফ্রান্স থেকে রওনা হওয়ার সময় আমরা খবর পেয়েছিলাম টিলম্যান এবার ওই মানাংভোটের আশেপাশেই অনুসন্ধান চালাতে আসছেন। তবে তাঁর দলবল নেহাতই ছোট বলে শুনেছিলাম; তাতে আমার মনে হয়েছিল মানাসলু (আরেক আটহাজারি শৃঙ্গ, ২৬৬৪০ ফিট) বা অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে ওঠার সম্ভাব্য রুট খুঁজে বার করার জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানোই তাঁর উদ্দেশ্য। পর্বতাভিযাত্রীরা অবশ্য নিজেদের পরিকল্পনা আগেভাগে রাষ্ট্র করতে খুব একটা পছন্দ করে না। তবে দু'দুটো অভিযান যদি একই অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে ওঠার জন্য একসঙ্গে চেষ্টা করে, সেটা খুবই আশ্চর্যের হবে।

তুকুচার সুন্দরী

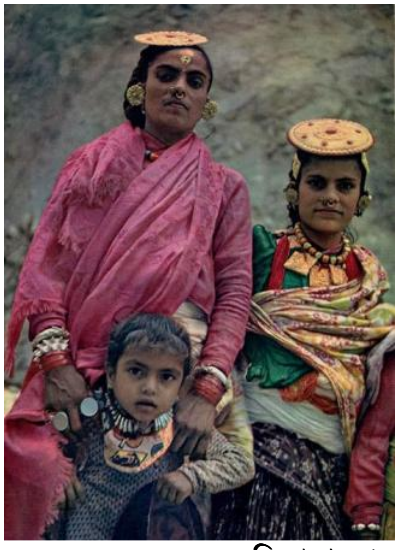

মুক্তিনাথের পথে চলা হিন্দু তীর্থযাত্রীরা

ছবিঃ মার্সেল আইজ্যাক

তিনিগাঁওয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রাখার জন্য ফুথারকে আগেই বেরিয়ে গেল। আট দিনের রসদ নিয়ে বেরোচ্ছি আমরা। আর এই ক'দিন, যখন আমরা থাকব না, ধৌলাগিরির পূর্ব হিমবাহ ধরে ওঠার একটা চেষ্টা করতে অডট আর টেরে যথেষ্ট সময় পাবে। অবশ্য কোজি আর শ্যাজ ওই রাস্তাতেই গেছে; ওরা যদি সফল হয় তবে তো কথাই নেই। দু'দিন বিশ্রাম পেয়ে অনেক কাজের কাজ হয়েছে; ফ্রান্সে চিঠি পাঠাতে পেরেছি, অভিযানের হিসেবপত্র ঠিকঠাক করা গেছে, আর বেসক্যাম্প যাতে মসৃণভাবে চলে সে দিকেও নজর দেওয়া গেছে। তবে হাতপা গুটিয়ে ক্যাম্পে বসে থাকতে কি আর ভালো লাগে? ফের পথে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম তাই।

তিব্বত যাবার রাস্তা ধরে সারি দিয়ে ব্যবসায়ীদের বড় বড় দল চলেছে, নুন আর চাল নিয়ে যাচ্ছে তারা। আমাদের চলার পথে মারফা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম পড়ল। বাড়িগুলোর মাথায় মাথায় বৌদ্ধদের পবিত্র পতাকা পতপত করে উড়ছে। গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার মাঝে পরপর কয়েকটা পাথরের দেওয়াল পড়ল, তাদের গায়ে পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্র খোদাই করা – 'ওম মণিপদ্মে হুম'। বৌদ্ধদের ধর্মীয় রীতি হল সবসময় এরকম দেওয়ালের বাঁদিক দিয়ে যাওয়া। ওদের রীতিকে সম্মান জানাতে আমরাও তাই করলাম। তুকুচার থেকে মারফায় তিব্বতির সংখ্যা বেশি। গ্রামে ঢুকতেই কচিকাঁচার দল ও গ্রামের লোকজন সোৎসাহে আমাদের ঘিরে ধরল, ওদের মুক্তহস্তে 'মিঠাই' বিতরণ করা হল। এতে আমাদের দলটা সম্বন্ধে মারফার বাসিন্দাদের ভালো ধারণা তৈরি হওয়া উচিত। সেটা হয়েওছিল। পরে দরকারের সময় এ গ্রাম থেকে অনেক কুলি পাওয়া গেছিল।

তিব্বত পথযাত্রীরা **ছবিঃ মার্সেল আইজ্যাক**

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসছিল। ক্রমশ আমরা যেন এক রুক্ষ জনহীন পার্বত্য মরুভূমির দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। চারপাশে হলদেটে পাহাড়ের গা, শুকনো স্বচ্ছ আবহাওয়া। বোঝাই যাচ্ছিল আমরা ক্রমশ তিব্বতের দিকে এগিয়ে চলেছি, যদিও সীমান্ত এখান থেকে ঝাড়া একদিনের পথ।

সন্ধ্যেবেলা তিনিগাঁও পৌঁছলাম। তিনিগাঁও ছন্নছাড়া একটা গ্রাম। গ্রামের আদিম এবং অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বাসিন্দারা সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর আমাদের ঘিরে ধরে হৈহল্লা করতে করতে গ্রামের একমাত্র মোটামুটি ভদ্রস্থ বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে ফুথারকে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। দেখি এরমধ্যেই সে বেশ গুছিয়ে বসেছে। গ্রামের মহিলারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, আর সে শান্তভাবে তাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে। বাড়িটা এ গ্রামের

প্রধানের বাড়ি, এ পথে চলা ব্যবসায়ীদের দলের জন্য সরাইখানা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গ্রামপ্রধান বেশ ঝানু ব্যবসায়ী, গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তিনি কমদামে ব্যবসায়ীদের থেকে কেনেন, আর তারপর গ্রামে বিক্রি করেন।

পরদিন সকালে অন্ধকার থাকতেই আংথারকে আমাদের জলখাবার দিয়ে দিল। পরিষ্কার আকাশে তখনও কয়েকটা তারা মিটিমিটি করছে। দূরে, আবছা অন্ধকারের মাঝে একা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ধৌলাগিরির মাথায় সূর্যের আলো সবে এসে পড়েছে। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

তিনিগাঁওয়ের সেই শিকারি, যে বলেছিল তিলিচো পাস নিয়ে যাবে আমাদের, আজ বলল, পাসটা ভালই চিনি বটে, তবে ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে তা বলতে পারব না। পিঠের মালপত্রের ভারে কুঁজো হয়ে আমরা সারি দিয়ে রওনা দিলাম। শেরপা হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছে আংথারকে, ফুথারকে আর পানসি; এছাড়াও বেশ কয়েকজন তিব্বতি কুলি নেওয়া হয়েছে। ওরা যাতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে সে জন্য সব্বাইকে বুটজোড়া দিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু দেখা গেল বুটজোড়ার পাছে কোনও ক্ষতি হয় সে আশঙ্কায় ওরা সবাই পায়ে না পরে ঘাড়ের দু'পাশে দুটো বুট ঝুলিয়ে রওনা দিল। বরফে পৌঁছে অবশ্য সেগুলো ঠিক জায়গায় পরা হয়েছিল।

বেশ কয়েকঘন্টা হাঁটার পর সেই শিকারিকে তিলিচো পাসের ব্যাপারে আর অত নিশ্চিত বোধ হল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কিন্তু দেখা গেল তিলিচো পাস ঠিক কোথায় সে জানে না। বোঝা গেল, সে আসলে কোনও শিকারিই নয়, নেহাতই সাধারণ একজন গোচারক, পাহাড়ে ইয়াক চরায়। এদিকের পাহাড়ে গরু চরানোর জন্য যে বুগিয়ালগুলি আছে, ও শুধু সেগুলির রাস্তাই চেনে। যতই রাস্তা ওপরদিকে ওঠে, ততই তার বোলচাল কমতে থাকে। শেষে দেখা গেল সে সানন্দে আমাদের অনুসরণ করে পেছন পেছন হাঁটছে। এভাবেই তিলিচো পাস পৌঁছলাম।

এখানে আমাদের জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছিল। ম্যাপ অনুযায়ী পাসের ওদিকে একটা গভীর উপত্যকা থাকার কথা যা মানাংভোটের দিকে নেমে গেছে। ডানদিকে অন্নপূর্ণা কোথায়? এ যে দেখি চিরতুষারের রাজ্যে পৌঁছে গেছি! চারদিকের বরফ আর ঝকঝকে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে থাকা অগুনতি তুষারাবৃত শৃঙ্গ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। দেখা গেল, ডানদিকে অন্নপূর্ণার বদলে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র তুষারশৃঙ্গের সমন্বয়ে গড়া এক দানবাকৃতি প্রাচীর, যার বেশ কটা শৃঙ্গের উচ্চতা ২৩০০০ ফিটের ওপরে। সামনে কোনও গভীর উপত্যকা নেই, আছে একটা বিস্তৃত বেসিন, কড়াইয়ের মত একটা অবতল অঞ্চল, তার কেন্দ্রে আয়তাকার বিশাল এক বরফজমা হ্রদ। পুরো অঞ্চলটাই তুষারে ঢাকা, তাই হ্রদটা ঠিক কতটা জায়গা জুড়ে আছে বোঝা গেল না। আর বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের পাথুরে গা সোজা নেমে গেছে সেই দুধসাদা হ্রদের বুকে।

তিলিচো হ্রদ **ছবিঃ উইকিপিডিয়া**

"কিন্তু সে হতচ্ছাড়া অন্নপূর্ণা গেল কোথায়?", আইজ্যাক বলল।

"ডানদিকে ওই সুন্দর তিনকোণা শৃঙ্গটা দেখ, দূরে। আমি নিশ্চিত অন্নপূর্ণা ওর পেছনে।"

"আমি অতটা নিশ্চিত হতে পারছি না," বলল আইজ্যাক।

"আমিও না," রেবুফত যোগ করল।

"আর তিলিচো পাসটাই বা কোনদিকে?", আইজ্যাকের প্রশ্ন।

"এই বেসিনটার ওপাশেই হবে। হ্রদটা পেরোতে হবে আর কি! ওপারে গেলে নিশ্চয়ই মানাংভোট উপত্যকার দেখা মিলবে।"

"হুমমম, না দেখে এ ব্যাপারেও মোটেই নিশ্চিত হতে পারছি না।"

যাই হোক না কেন, আমাদের ওই তুষারহ্রদের দিকেই নামতে হবে। এক ঘণ্টা পর হ্রদের কিনারায় পৌঁছে গেলাম। পানসি দুপুরের খানা তৈরি করতে বসল, আর ওদিকে আমাদের আলাপ আলোচনাও চলল।

"কান্ডটা দেখেছ একবার! ম্যাপে কোনও হ্রদের চিহ্নই নেই। অথচ এ হ্রদটা অন্তত চার মাইল লম্বা তো হবেই!"

"আরে দূর! ম্যাপের কথা ছাড়ো। ওই যে ডানদিকে অতগুলো উঁচু উঁচু তুষারশৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছ, ওগুলো ম্যাপে দেখানো আছে নাকি?"

"হ্রদের জলটা কোনদিকে নামছে বলো তো?"

"কোথাও নামছে বলে মনে হচ্ছে না। দেখছ না, জায়গাটা একটা ফানেলের মত? চারপাশের জল এসে হ্রদে জমছে শুধু।"

"আমি বলছি শোনো, এই হ্রদের জলটাই মানাংভোটের দিকে নামছে, উপত্যকা ধরে।"

দেখা গেল প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা মতামত আছে, আর সেটা সে জোরগলায় প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাকুল। আসল সমস্যাটা হল হ্রদের ওপারে কী করে পৌঁছনো যায়। মালপত্র কাঁধে তুলে আমরা হ্রদের বাঁ তীরের পাথুরে জায়গা ধরে এগোতে শুরু করলাম। একটু পরেই পাড়টা এত খাড়াই হয়ে উঠল যে বাধ্য হয়ে বরফজমা হ্রদের আয়নার মত মসৃণ বুকে নেমে আসতে হল। কুলিদের ব্যাপারটা ঠিক সাহসে কুলোলো না, ভয়ে দাঁড়িয়ে গেল তারা। কেউ কেউ বলল এখান থেকেই ফিরে যাবে। তখন আমি কোমরে একটা নাইলনের দড়ি বাঁধলাম, দড়ির একদিক ধরা রইল আইজ্যাকের হাতে, সে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়তে লাগল, আর আমি হ্রদের বুকে তীর থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ ভেতরে এগিয়ে গেলাম। সেখানে লাফালাম, ঝাঁপালাম, নাচলাম, আইস অ্যাক্স দিয়ে দমাদ্দম ঠুকে হ্রদের বরফের চাদর ভাঙার বৃথা চেষ্টা করলাম, তারপর হাঁক পাড়লাম, "চলে এসো ভাইসব, কোনও ভয় নেই, এই বরফের চাদর ভেঙে জলে পড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, পাথরের মত শক্ত।"

তাও সাবধানের মার নেই বলে আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে রোপ আপ করে নিলাম, লম্বা দড়িতে পঁচিশ ফিট অন্তর অন্তর একেকজনের কোমর বাঁধা থাকল। কুলিদের মাথায় ঢুকল না যে এটা আমরা সবার নিরাপত্তার জন্যই করছি, ওদের আপত্তি এতে ওদের একসাথে দল বেঁধে চলার অসুবিধে। প্রথম দলটার একেবারে সামনে আমি রওনা দিলাম, প্রথমেই হ্রদের ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেলাম যাতে ওপারে পৌঁছনোর আগে আর ওই পাথুরে পাড়ে না উঠতে হয়। আমার পেছনে পেছনে, মালের ভারে ন্যুব্জ কুলিরা খানিক ইতস্তত করে একে একে হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল। তারপর ভয়ে ভয়ে এমনভাবে হ্রদের বুকে পা রাখল যেন জলেই নামছে, বিড়বিড় করে প্রার্থনামন্ত্র জপ করতে করতে নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ওরা ঠিক সেই সেই জায়গায় পা ফেলে এগোতে লাগল যেখানে যেখানে আমি পা ফেলেছি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলল, নিরাপদেই ওপারে পৌঁছে গেলাম। আর এরপর থেকে কুলিরা কেউ আমাদের ছেড়ে ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে প্রকাশ করে নি, কেননা ফিরে যেতে হলে তো একা একা ওই বরফজমা হ্রদের ওপর দিয়েই ফিরে যেতে হবে!

ওপারে পৌঁছে, হ্রদের ঢালু পাড় বেয়ে উঠে, অবশেষে একটা পাসে পৌঁছনো গেল। সকালে এরকমটাই আন্দাজ করেছিলাম আমরা। প্রায় ১৬,৪০০ ফিট উচ্চতার এ পাসটার নাম রাখা হল পূর্ব তিলিচো পাস, আর সকালে যেটা পেরিয়ে হ্রদের বুকে নেমেছিলাম সেটা পশ্চিম তিলিচো।

আমি যেরকম আন্দাজ করেছিলাম, এদিকে হ্রদের জল বেরোনোর কোনও মুখ নেই। পাসের ওপর পৌঁছনোর পর মানাংভোটের দিকে নেমে যাওয়া গভীর এক উপত্যকা ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে খুলে গেল। দূরত্ব আন্দাজ করতে এখানেও আমাদের ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম পাসের নিচে বেশ বড়সড় চওড়া একটা উপত্যকা বা বেসিন থাকবে, আর সেখানে মানাংভোট দেখতে পাব। বাস্তবে ব্যাপার যা দেখলাম তা বহুগুণ জটিল। পাসের ওধারে ছোট ছোট আলগা নুড়িপাথর ভর্তি অঞ্চল বা মোরেন (moraine) বেশ খাড়াই ঢালে মাইলের পর মাইল নেমে গেছে। ঢালের শেষে নুড়িপাথরের একটা উঁচু স্তূপ উপত্যকার মুখের দিক, মানে আমাদের কাছাকাছি যে দিক, সে দিকটা আড়াল করে রেখেছে। আমাদের ডানদিকে যে বিশাল তুষারশৃঙ্গগুলির প্রাচীর, তার নিচ দিয়ে উপত্যকা ধরে বয়ে চলেছে মার্সিয়ান্দি খোলা নদী, যার উৎপত্তি তিলিচো পাসে বলে জানতাম। এদিক থেকে নিচের ওই উপত্যকায় নামার একমাত্র রাস্তা হল নুড়িপাথরের স্তূপটার একপাশে একটা সরু নালার মত জায়গা। দূরে, স্তূপটার আড়ালে থাকা অংশটার পরে অবশ্য মার্সিয়ান্দি খোলার সঙ্কীর্ণ গিরিখাত ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। সেদিকে ধূসর পাথর ও নুড়িবিছানো মোরেন অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে সেদিকে কিছু সবুজের ছোঁয়া আছে, ছোট ছোট কিছু চাষের খেত দেখা যাচ্ছে।

ডানদিকে, সেই দানবীয় তুষারপ্রাচীরের শেষে পরপর আরও কতগুলি তুষারশৃঙ্গ, তিলিচো হ্রদ থেকে যেগুলো দেখেছিলাম এগুলো তাদের চেয়েও সুন্দর ও সম্ভ্রম জাগানো। বাঁদিকে হলদেটে পাথুরে পর্বতগাত্রের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে মুক্তিনাথ হিমালয়ের বেশ কয়েকটা প্রায় ২০,০০০ ফিট উঁচু শৃঙ্গ। আর আমাদের পেছনে বরফজমা দুধসাদা তিলিচো হ্রদ। ভালো জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি বলতে হবে! অতঃপর কী করণীয় সে ব্যাপারে আমাদের আলোচনা শুরু হল।

আইজ্যাকের মতে ডানদিকের ওই তুষারপ্রাচীরের অগুনতি শৃঙ্গগুলির মধ্যে অন্নপূর্ণা নেই, ম্যাপে এ ব্যাপারটাও ভুল দেখানো আছে। ‘‘হতচ্ছাড়া এই মেঘগুলো একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির, উঁচু উঁচু শৃঙ্গগুলো তো মেঘের জন্য দেখাই যাচ্ছে না! যা চোখে দেখতে পাচ্ছি না তাই নিয়ে আলোচনা করি কী করে?’’ বলল সে।

‘‘এই তো একটু আগেই একঝলক দেখা গেল,’’ বললাম আমি, ‘‘ম্যাপে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে, মানছি আমি। কিন্তু ২৬,০০০ ফিটের চেয়েও উঁচু এতবড় একটা শৃঙ্গের অবস্থান ভুল দেখানো থাকবে? এতটা ভুল করবে কি?’’

‘‘তার মানে তুমি বলতে চাও অন্নপূর্ণা ওই তুষারপ্রাচীরের শৃঙ্গগুলির মধ্যেই আছে?’’

‘‘অবশ্যই, ওই সুন্দর ত্রিকোণ শৃঙ্গটার পেছনেই হবে, বলেছিলাম তো!’’

‘‘আমি চ্যালেঞ্জ করছি, নেই। আমি বলছি ওই গোটা তুষারপ্রাচীরটাই ম্যাপে দেখানো নেই।’’

‘‘দূর, কী যে বলো! একটা বারো মাইলেরও বেশি লম্বা তুষারপ্রাচীর, যার মধ্যে প্রায় পনেরোটা ২৩,০০০ ফিটের চেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে, সেটা ম্যাপে দেখানো থাকবে না?’’

‘‘মাত্র পনেরোটা? কী বলছ তুমি!’’ আইজ্যাক প্রতিবাদ করল।

‘‘ঠিক আছে, পনেরোটার বেশিই হল না হয়,’’ বললাম আমি, ‘‘কিন্তু, তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, ম্যাপে যে এই লম্বা উঁচু গিরিশিরাটা দেখানো আছে, যেটা সোজা অন্নপূর্ণার চূড়ায় উঠে গেছে, আর আমাদের চোখের সামনে যে তুষারপ্রাচীরটা দেখতে পাচ্ছি, এ দুটো এক নয়? তাহলে তো এরকম আরেকটা গিরিশিরা থাকা উচিত, তাই না?’’

‘‘তাই মনে হচ্ছে।’’ আইজ্যাক ম্যাপে দেখানো অন্নপূর্ণার অবস্থান আর বিভিন্ন দিক থেকে তার দূরত্ব নিয়ে চটপট কী সব হিসেবনিকেশ করে বলল, তার মতে অন্নপূর্ণা ওই তুষারপ্রাচীরের শৃঙ্গগুলির

মধ্যে থাকতেই পারে না। ওর যুক্তি শুনে আশঙ্কায় আমার হাত- পা কাঁপছিল, কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হল না। অন্নপূর্ণা তাহলে গেল কোথায়? এতবড় একটা শৃঙ্গ বেমালুম উধাও হয়ে যাবে নাকি! কিছুক্ষণ ভেবে শেষমেশ বললাম, "ঠিক আছে, চলো এখানে থাকা যাক আজ। এখানেই তাঁবু ফেলা হোক।"

"বেশ, তবে তাই হোক," বলল আইজ্যাক।

"তুমি এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকো। কাল থাকো, পরশু থাকো, বসে বসে যতখুশি হিসেব করো, দূরবীন দিয়ে দেখো, সেক্সট্যান্ট দিয়ে রিডিং নাও। নিয়ে তোমার বক্তব্য প্রমাণ করো দেখি।"

"কোনও আপত্তি নেই। আমি এখানে যতদিন বলবে থাকতে রাজি। কিন্তু তুমি আর রেবুফত কী করবে?"

"আমরা মানাংভোট নেমে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত মানাংভোট পৌঁছনোমাত্র অন্নপূর্ণার দর্শন পাওয়া যাবে।"

"হা হা, ওদিকে খুব একটা সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। যাও! তবে আমার কথা যদি বলো, আমি এখানে ঘাঁটি গেড়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করব।"

"বেশ তো, থাকো না যদ্দিন খুশি। আমরা ফুথারকে আর পানসিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কুলিদের আর তোমার জন্য মানাংভোট থেকে সাম্পা কিনে আনব, যাতে অনেকদিন থাকতে পারো।"

"যাও। আমার শুভেচ্ছা রইল। হয়তো টিলম্যানের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে!"

পরদিন ভোরবেলা আমি আর রেবুফত হালকা রুকস্যাক পিঠে রওনা দিলাম। মালপত্র বেশি নিলাম না যাতে মানাংভোট থেকে যতটা পারি রসদ নিয়ে ফিরতে পারি। নুড়িপাথরের ঢাল ধরে হুড়মুড় করে নামতে শুরু করলাম আমরা। আমাদের নামার তোড়ে আলগা নুড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে রীতিমতন নুড়িপাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পাথরে পাথরে লাফিয়ে স্রোতস্বিনী মার্সিয়ান্দি খোলার গতিপথ ধরে দ্রুত নিচে নামতে নামতে দেখলাম, সেই ত্রিকোণ শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা একটা ঝুলন্ত হিমবাহ থেকে মার্সিয়ান্দি খোলার জন্ম। যত নিচে নামতে লাগলাম ততই বুঝতে পারলাম খোলা উপত্যকায় পৌঁছনর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো স্তূপ আর পাহাড়গুলো কতটা উঁচু উঁচু। খুব শীঘ্রই সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হলাম নদীর এই পার ধরে এগোনো আর সম্ভব নয়। নদীটা পেরোতে হবে। নদীখাতে নেমে এলাম সবাই। রেবুফত মুহূর্তের মধ্যে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। জুতোটা ভেজাব? আইস অ্যাক্সটা নদীর ওইখানে গেঁথে ওটাকে যদি একটা পোলের মত ব্যবহার করি...পোলভল্ট দিয়ে একটা পা ওই পাথরটার ওপর...তারপর লাফ দিয়ে ওই পাথরটায়...প্রথম পাথরটা অবশ্য নড়বড়ে হতে পারে...দেখাই যাক না...এক...দুই – পোলভল্টটা জমল না ঠিক, আইস অ্যাক্সটা কাত হয়ে গেল, পাথরটা গড়িয়ে গেল, আর আমি ঝপাস করে পড়লাম নদীর বরফঠান্ডা জলে।

তিলিচো পাসের ওপর থেকে নদীখাত বরাবর নুড়িপাথরের যে বড় বড় ঢালগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো এবার সামনে পড়ল আমাদের। আলগা নুড়িপাথরের এরকম ঢাল বেয়ে ওঠা ভীষণ কষ্টকর। ঢালগুলো নুড়িদের যথাস্থানে ধরে রাখার পক্ষে বেশিই খাড়াই, একটু বেশি নাড়াচাড়া পড়লেই নুড়ির ধ্বস নামা শুরু হবে একেবারে। আমাদের অনেক পেছনে তিলিচো পাস দেখা যাচ্ছিল, যেখানে এই কয়েক ঘন্টা আগেও ছিলাম।

পাথরের নুড়িগুলো সব একই সাইজের, যেন বড় বড় ফুটোওয়ালা কোনও দৈত্যাকার চালুনি দিয়ে সেগুলোকে ছাঁকা হয়েছে। অতিকষ্টে নুড়ির ঢালগুলো পেরিয়ে উপত্যকার চওড়া মুখটায় পৌঁছে দেখি আমাদের সামনে সরু নালার মত শক্ত মাটির এক খাড়া চড়াই।

"এ যে দেখছি সিঁড়ির মত ধাপ কেটে কেটে উঠতে হবে এবারে," ধাঁধায় পড়ে গিয়ে বললাম।

"ঢালটা বরফের হলে বরং সুবিধে হত," বলল রেবুফত।

শেরপারা সমস্যাটাকে কীভাবে সামলায় দেখা যাক। আইস অ্যাক্স হাতে ফুথারকে ঢালের দিকে সটান এগিয়ে গেল। তারপর নিখুঁতভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে ঝটপট ধাপ কাটতে কাটতে উঠে চলল। পানসিও পেছন পেছন অনায়াসে উঠে গেল। ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু করার রইল না।

খাড়াইটার ওপরে ঘাসের ঢাল পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু উঠে দেখি সামনে আরেকটা একই রকম শক্ত মাটির খাড়াই, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা... শেষমেশ ঘাসের সবুজ সহজ ঢালে পৌঁছনোর আগে আমাদের ঝাড়া একঘণ্টা ধরে ধাপ কেটে কেটে উঠতে হল। ঘাসের ঢাল থেকে নদীর বুকে নেমে আসতে হলে ফের সেই আলগা নুড়ি পাথরের ঢাল। বাচ্চাদের স্লিপ বেয়ে নামার মত সড়সড় করে বিস্তর ধুলোবালির মেঘ উড়িয়ে আমরা আবার নদীখাতে নেমে এলাম। এভাবে, অবশেষে মার্সিয়ান্দি খোলার সঙ্কীর্ণ গিরিখাত পেরিয়ে উপত্যকার চওড়া মুখটায় পৌঁছনো গেল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। নদীর ধারে বসে চটপট লাঞ্চ সেরে নিলাম আমরা। এর পর নদীর তীর ধরে এগোনো। সেটাও কিছু কম ঝকমারি নয়। মাঝে মাঝেই ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে বেশ কয়েক'শ ফিট চড়াই ভেঙে উঠতে হচ্ছিল আমাদের।

তুকুচা উপত্যকার থেকে এ অঞ্চলটা একেবারে ভিন্ন জগত। এখানে অনেক গরম, গাছপালাও অনেক বেশি। মাঝে মাঝেই ফুলে ভরা গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চারপাশের পরিবেশ অত রুক্ষ নয়, তুকুচার চাইতে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ। মানুষের যাতায়াত আছে এ অঞ্চলে। বিভিন্ন দিক থেকে সরু সরু পায়ে চলা শুঁড়িপথ এসে মিলে কিছুক্ষণ পরেই মোটামুটি একটা রাস্তা তৈরি হল। মানাংভোট তখনও অনেক দূর। আমাদের সাথে কোনও তাঁবু নেই, খাবারদাবারও যৎসামান্য, তাই যে করেই হোক সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছতেই হবে মানাংভোটে।

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই একটা ঢালের পেছনে হঠাৎ এক বসতির দেখা পেলাম। খাংসার নামে ছোট্ট একটা গ্রাম, ঢোকার মুখে পাথর দিয়ে সাজানো স্তূপ বা চোরতেনের ওপর বৌদ্ধদের পবিত্র পতাকা উড়ছে। নোংরা, ছন্নছাড়া বাচ্চার দল আমাদের দেখে দৌড়ে এল। এই প্রথম ওরা সাদা মানুষ দেখল, আর আমাদের তুষারপর্বত থেকে নেমে আসা দেবদূত মনে করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমরা যে ওই পর্বতশ্রেণীর ওপার থেকে আসছি সেটা ওদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ও পর্বতশ্রেণীর পেছনে যে কিছু থাকা সম্ভব তাই এরা জানে না! দেখা গেল এখানকার লোকজন শুধু থোরাং পাস পেরিয়ে তীর্থযাত্রীদের মুক্তিনাথ যাবার রাস্তাটাই চেনে।

পানসি এখানকার গ্রামপ্রধান বা সুবা কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করল। দুর্গন্ধযুক্ত অলিগলির ভেতর দিয়ে সোরগোল করতে করতে চলা একটা মিছিলের পেছন পেছন আমরা গ্রামের ভেতর ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে সুবা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখেমুখে কিন্তু অবাক হবার কোনও লক্ষণই দেখলাম না। স্বাভাবিক, কেননা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গৌতম বুদ্ধ এঁদের শিখিয়েছেন জগতের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখি হয়েও কীভাবে নির্লিপ্ত থাকতে হয়। আমি সুবাকে বললাম, 'আমরা কিছু সাম্পা কিনতে চাই, আমাদের কুলিরা ওই পাহাড়ের মাথায় বসে আছে।' সুবা তারস্বরে প্রায় বিলাপের সুরে বলতে শুরু করলেন, 'খাংসার অত্যন্ত গরীব একটা গ্রাম, বিক্রি করার মত এক ছটাক সাম্পাও আমাদের উদ্বৃত্ত নেই, এক মুঠো চালও না, মুরগির তো কথাই নেই। আপনারা মানাংভোটে যান, মাত্র এক ঘন্টার রাস্তা। ওখানে সব পাবেন।'

মনে হল মানাংভোট নিশ্চয়ই এক সব পেয়েছির দেশ। অযথা সময় নষ্ট না করে, গরম আর ক্ষুধাতৃষ্ণা উপেক্ষা করে ফের রওনা দিলাম আমরা। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েই দেখি, রাস্তার ওপর ইয়াকের একটা সম্পূর্ণ কঙ্কাল পড়ে আছে। ইয়াক এদের কাছে খুব পবিত্র এক প্রাণী, এই পবিত্র কঙ্কাল সরানোর কথা এরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। হয়তো কঙ্কালটা মাসের পর মাস এখানে পড়ে

আছে, আরও বহু বহুদিন থাকবে, যতদিন না সম্পূর্ণ ধুলোয় মিশে যায়। এরা রাস্তাটাকেই বাধ্য হয়ে বাঁদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গায়ে ধাপকাটা কয়েকপ্রস্থ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা ফের নদীর ধারে উপস্থিত হলাম। তারপর নদীর তীরের রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম।

"বড়াসাহিব, ঐ যে মানাংভোট," হঠাৎ পানসি বলল।

শহরটা তিব্বতের প্রাচীন শহরগুলির মত খাড়া পাথুরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বাড়ি তৈরি করে গড়ে উঠেছে। নদীখাত থেকে ওপরে তাকালে বাড়িগুলির দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, সব মিলিয়ে মনে হয় পাহাড়ের মাথায় একটা দুর্গ। নদী পার হওয়ার জন্য একটা কাঠের পাটাতন দেখে বোঝা গেল আমরা আবার সভ্য জগতে ফিরে এসেছি।

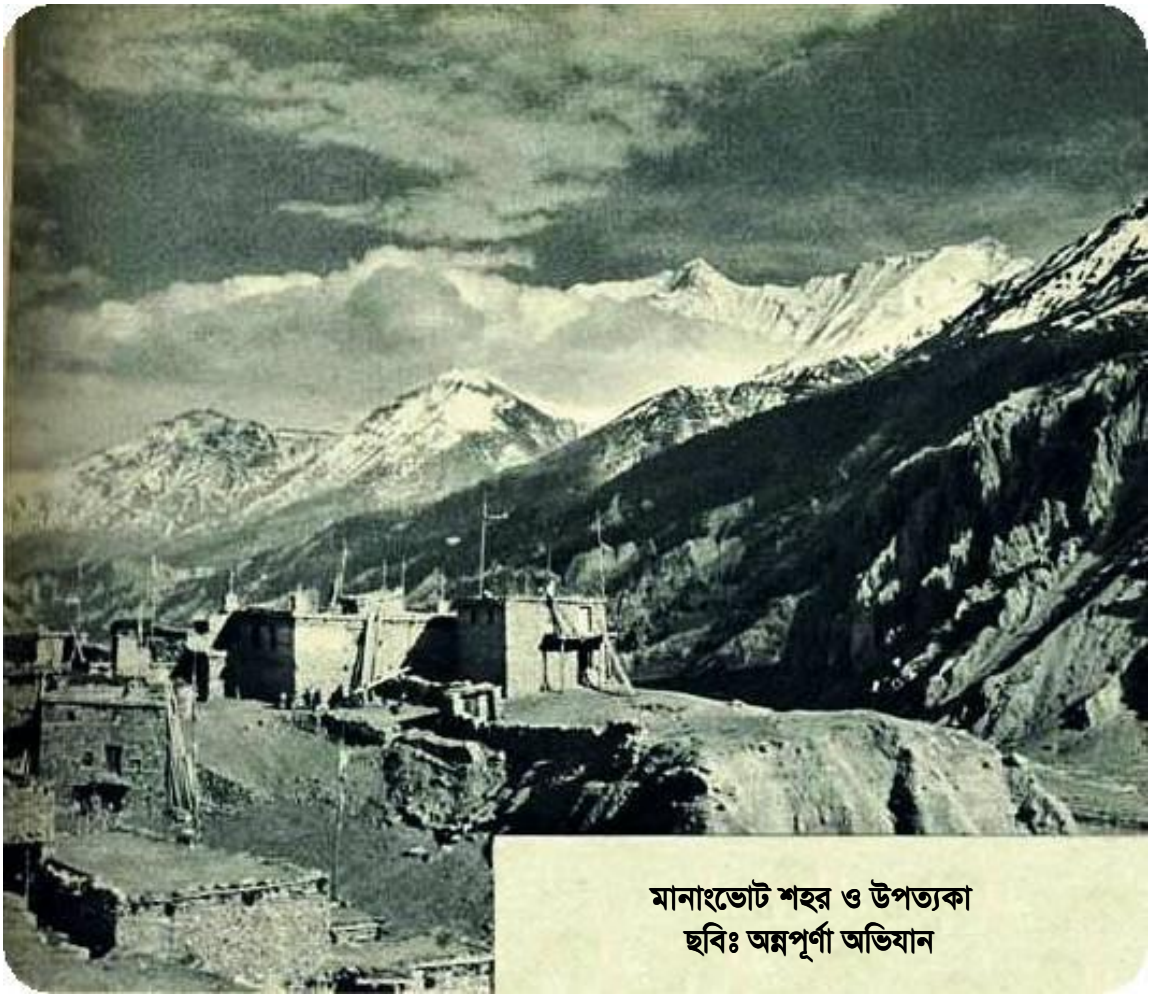

মানাংভোট শহর ও উপত্যকা
ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

সরু সরু বহু গলিপথ পেরিয়ে শহরটার কেন্দ্রে পৌঁছে দেখি সেখানে একটা প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা বিশাল পাথরের দেওয়াল, যার গায়ে প্রার্থনামন্ত্র লেখা আর অনেক জপযন্ত্র বসানো। শহরের বাসিন্দারা আমাদের দেখার জন্য চারপাশের গলিপথ থেকে হুড়োহুড়ি করে এসে উপস্থিত হল। প্রথমে এল বাচ্চার দঙ্গল, সেই একইরকম ছন্নছাড়া তাদের চেহারা; হাতে অদ্ভুতদর্শন একটা পুরনো জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে এসে পৌঁছলেন এক বুড়িমা; তারপর এল কমবয়সী যুবকদের দল – তাদের বেশিরভাগেরই খুব সুন্দর চেহারা, আর তুকুচার লোকেদের থেকে এদের মুখশ্রী অন্য ধরনের।

এখানে সকলেই বৌদ্ধ। আমাদের ঘিরে ধরে ওরা সবাই চিৎকার করে কিছু বলছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবে ঘাবড়াবার কোনও কারণ ছিল না। কেননা এতদিনে বুঝে গেছি, এদেশে সামান্য 'সুপ্রভাত' বলতে হলেও প্রত্যেকে গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে লম্বা একটা বক্তৃতা দেওয়া খুব জরুরি মনে করে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে কথাবার্তা চলার পর একজন শহরের প্রধান বা সুবার

খোঁজে গেল। ইতিমধ্যে একটা গুদামঘরের তিনতলায় পানসি আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করে এসেছে। মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো একটা সিঁড়ি বেয়ে সেখানে গিয়ে উঠলাম। রুকস্যাক ঘরে রেখে আমি আর রেবুফত শহরের সেই কেন্দ্রীয় চত্বরে ফিরে এলাম।

নানারকম জল্পনাকল্পনা করতে করতে লোকজন ফের আমাদের ঘিরে এল, "আমেরিকান?"

"না, ফ্রেঞ্চ।"

"অ্যাঁ, কী? ফে...ফেঞ্চ?"

"হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ।"

যেন সমস্ত জল্পনার অবসান হয়ে গেছে এই ভাবে সবাই একে অন্যের দিকে চেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ও আচ্ছা, আমেরিকান। বেশ বেশ। তখনই বুঝেছিলাম!"

"না না, আমেরিকান নয়। আমেরিকানরা আলাদা। যেমন ইংরেজ হয়, যেমন আমেরিকান হয়, সেরকম ফ্রেঞ্চও হয়। আমরা ফ্রেঞ্চ।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই, তার মানে তোমরা আমেরিকানই হলে!"

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশদের গুর্খা রেজিমেন্টে কাজ করেছেন, সাহেবদের দেখেছেন। তবে ওঁদের নিজেদের এ শহরে আমরাই প্রথম সাদা আদমি এলাম।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, অন্নপূর্ণার ব্যাপারে এঁদের কেউ কিছুই জানেন না। একটা ২৬,০০০ ফিটের চেয়েও উঁচু পর্বতশৃঙ্গের ব্যাপারে সে অঞ্চলের একটা শহরে কেউ কিচ্ছু জানবেন না, সেটা তো হয় না! যদি দূরের ঐ পর্বতশ্রেণী বরাবর অন্নপূর্ণা আরও দূরেও কোথাও থাকে, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্তত এঁদের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। হয়তো এখানে অন্নপূর্ণার নাম অন্য কিছু, অন্য কোনও দেবদেবীর নামে তাঁকে ডাকা হয়!

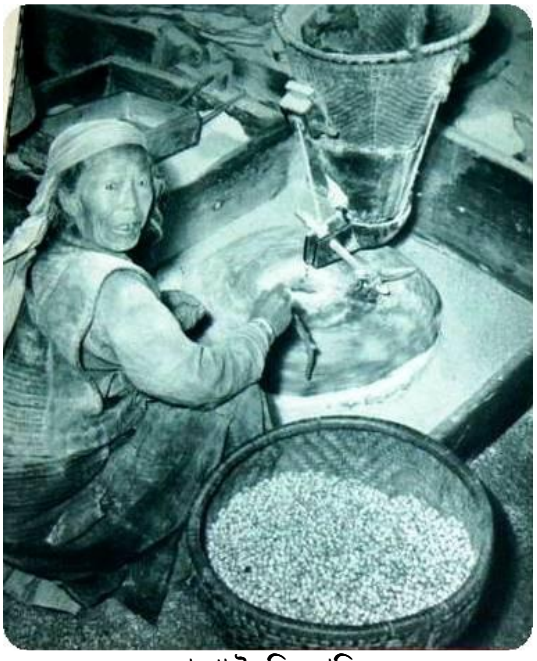

সাম্পা তৈরির চাক্কি

মানাংভোটের এক বাসিন্দা

ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তখনই সে মানাংভোটের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকা চমৎকার সেই ত্রিকোণ শৃঙ্গটার পেছনে মুখ লুকিয়েছে। পানসিকে দিয়ে শহরের বাসিন্দাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানা গেল ত্রিকোণ শৃঙ্গটার নাম গঙ্গাপূর্ণা, আর ওর বাঁদিকে পরপর দুটো শৃঙ্গ হল চোঙ্গোর আর সেপচিয়া। কৌতূহল নিরসনের পর অবশেষে শহরটা একটু শান্ত হয়েছে। আমি আর রেবুফত শহরের সরু সরু অলিগলির গোলকধাঁধায় কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। আস্তানায় ফিরে আসার পর আমাদের শেরপারা হতাশভাবে জানাল মানাংভোট থেকে রসদ সংগ্রহ করা খুবই মুশকিল হবে, দেশটা বড়ই গরীব।

তখনই এখানকার সুবাও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বৃদ্ধ মানুষ, লম্বা দাড়ি, খুবই সাধারণ পোশাকআশাক, বেশ বুদ্ধিমান দেখতে। সরাসরি কাজের কথায় আসা গেল। সুবা অনেক বাহানা দেখিয়ে জানালেন মাত্র দশ কিলো সাম্পা ছাড়া আর কিছুই উনি দিতে পারবেন না; চাল, দুধ, মুরগি কিচ্ছু না। সাম্পা ছাড়া শুধু চারটে ছোট্ট ছোট্ট মুরগির ডিম পাওয়া গেল। তিলিচো পাসের ওপর বসে থাকা আমাদের কুলিদের পক্ষে এ রসদ তো যৎসামান্য! গুরুতর ব্যাপার। ঠিক করলাম কাল সকালেই ফুথারকেকে সমস্ত রসদ সঙ্গে দিয়ে তিলিচোয় ফেরত পাঠিয়ে দেব।

তাড়াতাড়ি আইজ্যাককে একটা চিঠি লিখলাম।

প্রিয় আইজ্যাক,

ফুথারকের হাতে এ চিঠি পাঠাচ্ছি। মানাংভোটে যা কিছু সামান্য রসদ সংগ্রহ করতে পেরেছি ওর সঙ্গে পাঠালাম। তিলিচো থেকে মানাংভোট বিরাট লম্বা রাস্তা। যা বুঝলাম বলি এবার।

আমাদের দেখা সেই সুন্দর ত্রিকোণ শৃঙ্গটার নাম গঙ্গাপূর্ণা। ওর পরে একই শ্রেণীতে ২৩০০০ ফিটের চেয়ে উঁচু যে আরেকটা তুষারশৃঙ্গ আছে তার নাম চোঙ্গোর। এরপর পর্বতশ্রেণীটা ক্রমশ নিচু হতে হতে উপত্যকায় দুটো নদীর সঙ্গমস্থলে নেমে এসেছে। সেখানে মার্সিয়ান্দি খোলার সঙ্গে এসে মিশেছে চৌন্দিকিউ বলে আরেকটা নদী। জায়গাটা এখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূর, চিন্দি নামে এক ছোট্ট গ্রাম আছে সেখানে। মানাংভোট থেকে চৌন্দিকিউএর ডানতীরে আরেকটা উঁচু পর্বতশৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, ওটার নাম সেপচিয়া।

কিন্তু অন্নপূর্ণা কোথায়? সেটা এখনও রহস্য। এখানে কেউ অন্নপূর্ণার কথা জানে না।

<u>পরিকল্পনাঃ</u> আমি, রেবুফত আর পানসি চিন্দিতে যাচ্ছি অন্নপূর্ণা কোথায় সে ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখতে। যদি পাই, তবে অন্নপূর্ণার কাছে পৌঁছনোর সম্ভাব্য রাস্তাগুলি খতিয়ে দেখব, তারপর মুক্তিনাথ হয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তুকুচা ফিরে যাব (কেননা তিলিচো হয়ে ফেরার থেকে মুক্তিনাথ হয়ে ফিরলে একদিন বাঁচবে)। যদি দেখি, এদিক দিয়ে কিছু সম্ভব নয়, তিলিচো থেকে আমাদের সেই বিশাল তুষারপ্রাচীরের দিকেই এগিয়ে দেখতে হবে, তাহলে ১২ তারিখ তিলিচোর ক্যাম্পে ফিরব। আমরা যদি না ফিরি, তোমরা ১৩ই সকালে ক্যাম্প গুটিয়ে তুকুচা ফিরে যেও।

এখন এটুকুই, মরিস।

মরিস হারজগ ছবিঃ কিস্টোন, ফ্রান্স

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

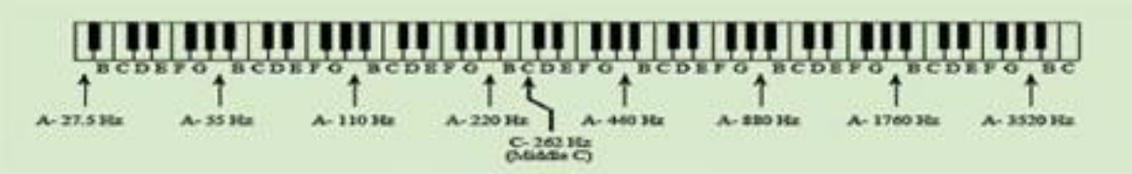

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

মহালয়ায় রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি মন দিয়ে শুনেছ যারা, এই বিবরণ তাদের সবারই জানা। যারা সেভাবে শোন নি, তারাও একবার পড়ে রাখতে পার, জিকে বা কুইজ- এ কাজে লাগবে মনে করে।

মার্কেণ্ডয় পুরাণে আছে মহিষাসুর স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সাঙ্গপাঙ্গো নিয়ে স্বর্গে গ্যাঁট হয়ে বসলে, দেবতারা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা মহাদেবকে বলে কয়ে, সাথে অন্যান্য দেবতাদের জুটিয়ে নিয়ে হাজির হলেন বিষ্ণুর কাছে।

কোন পুরুষ মহিষাসুরকে মারতে পারবে না বলে বিষ্ণু দেবতাদের পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক দেবতা নিজ নিজ তেজ বা শক্তি একত্র করে একটি নারীমূর্তি সৃষ্টি করবেন। বরাহ পুরাণ মতে যে যে দেবতার তেজ থেকে এই নারী মূর্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরি হল, তা হল– মহাদেবের তেজে মুখ, যমের তেজে চুল, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে বক্ষদেশ, ইন্দ্রের তেজে কোমর, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পা, সূর্যের তেজে পায়ের আঙুল, বসুদের তেজে হাতের আঙুল, কুবেরের তেজে নাক, প্রজাপতির তেজে দাঁত, অগ্নির তেজে চোখ, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূ, বায়ুর তেজে কান। এইসব তেজের সাথে অন্যান্য দেবতাদের তেজ মিলে সৃষ্টি হলো দুর্গার।

এরপর দেবতারা তাঁকে পোশাক ও অস্ত্র দান করলেন। মহাদেব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, জলদেবতা বরুণ দিলেন শঙ্খ ও পাশ, অগ্নি দিলেন শক্তি, বায়ু দিলেন ধনুক ও বাণভরা তূণীর, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, ঐরাবত দিলেন ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য দিলেন রশ্মি, কালখড়্গ ও নির্মল চর্ম, ক্ষিরোদ সাগর দিলেন অক্ষয়বস্ত্রসহ বিভিন্ন অলঙ্কার ও আভরণ, বিশ্বকর্মা দিলেন কুঠার সহ নানাবিধ অস্ত্র, অভেদ্য কবচমালা, হিমালয় দিলেন বাহন সিংহ, কুবের দিলেন অমৃতের পানপাত্র, শেষনাগ দিলেন নাগহার। অন্যান্য দেবতারাও তাঁদের সাধ্যমত উপহার দিলেন।

আসলে ব্যাপারটা হল এই যে শক্তির কোন রূপ নেই কিন্তু আমরা যেহেতু কোন একটা আকৃতি না পেলে ব্যাপারটা ঠিক কল্পনায় আনতে পারি না, তাই শক্তিপূজার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটা আকারের, একটা মূর্তির।

সঙ্গীতের ব্যাপারটাও তাই। খুব উঁচুস্তরের সঙ্গীত সাধকেরা হয়ত নিরাকার সঙ্গীতের মর্ম বুঝতে পারেন, কিন্তু আমরা যারা সাধারণ, আমরা সঙ্গীতেরও একটা চেহারা, একটা কাঠামো, একটা আকৃতি অনুভবে আনতে না পারলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। উদাহরণ দিয়ে কাছাকাছি একটা ধারণা করা যেতে পারে। যেমন ধর আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপের অংশটি। যদিও আলাপেরও একটা কাঠামো আছে, তবে সেটা কোনো গান বা গৎ- এর মত বাঁধাধরা কাঠামোয় আটকে রাখা নেই। একই রাগে, একই শিল্পীর আলাপের অংশটা কয়েকবার যদি শোন, দেখবে - কিছুতেই একেবারে একই রকম হবে না। আবার যাঁরা রীতিমত তালিম পাওয়া উস্তাদ, তাঁরা ঐ আলাপের মধ্যেই সুরের কাঠামো, স্বরের চলন, স্বর সমন্বয় (নোট কম্বিনেশন) ইত্যাদি মিলে একটা পরিষ্কার আকৃতি দেখতে পাবেন।

উচ্চাঙ্গ বাদে ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য সঙ্গীতের কাঠামোটা যদিও বা মোটামুটি ধরতে পারি, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অপেরা, ওরাটোরিও বা সিম্ফনিতে বসিয়ে দিলে আমার মত হরিদাসরা সবজান্তার মত মুখ করে শোনার পর মনে মনে বলবে শব্দগুলো মাঝেমধ্যে বেশ জোর হচ্ছিল আবার কখনও খুব আস্তে শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু মোটের ওপর বিশেষ করে কোন সুর বোঝা গেল না। অনভ্যস্ত কানে এটুকুই এই ধরণের সঙ্গীতের বাইরের আকৃতি বা ফর্ম। কিন্তু যদি মন দিয়ে এর উপাদানগুলো বোঝার চেষ্টা করা যায় তাহলে বাইরের আকৃতিটা মুছে গিয়ে আস্তে আস্তে অনুভবে আসতে থাকবে এর ভেতরের স্বরবিন্যাস, স্বরের ক্রম ইত্যাদি।

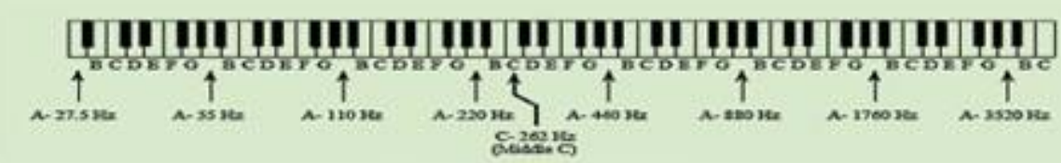

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

দেখ না, পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে একটা মন্দির দেখতে যেমন লাগে, কাছে গিয়ে তার গঠনশৈলী, একেকটা অংশের বিভিন্ন কারুকাজ এসব দেখার সময় পাহাড়ের ওপরে থেকে বাইরের চেহারা দেখাটার চেয়ে কতটা আলাদা হয়ে যায় না? অথবা ধর যেটা দেখে সাধারণ ভাবে মনে হয় একটা টানা অখন্ড লোহার পাত, সেটাই যারা একটু বিজ্ঞান জানে তারা বলবে এটা আসলে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ছাড়া দেখা যায় না এমন ছোওট্ট ছোওট্ট লক্ষ কোটি পরমাণু দিয়ে গড়া, আর সেই পরমাণুগুলোর ভেতর ফাঁকও আছে বেশ খানিকটা করে। আরও গভীরে যে দেখবে, অনুভব করবে, সে বলবে আসলে অন্যান্য সব বস্তুর মত এটাও শক্তিরই একটা রূপ - একটা কোন নাচের ফ্রিজ শট্- এর মত।

এইভাবেই খুব মন দিয়ে, যত্ন করে প্রকৃতির ব্যাপারস্যাপার যে লক্ষ্য করল, অনুভব করল, সে হয়ে গেল কবি। আবার যে ওইগুলোই আর একটু অন্যরকম করে দেখল সে হয়ে গেল ভূতাত্বিক বা জীববিজ্ঞানী।

তাহলেই দেখ বাস্তবটার, রিয়েলিটির, এতগুলো যে স্তর, সবই কিন্তু আমাদের একেবারে নিজস্ব ব্যক্তিগত দেখা, শোনা, জানা, অনুভবের ওপর পুরোপুরি নির্ভর। আর তাই এই পৃথিবীর কোন বাস্তবটা যে আসল, সেই অনুভবটা একের জনের কাছে একেক রকম তো হবেই।

হাজারো লাখো জাগতিক বস্তুর আকার, প্রকার, রং, গন্ধ ইত্যাদির অনুভবের অভিজ্ঞতায় আমরা এতটাই পূর্ণ যে এখন আর কল্পনার পাখায় ভর করেও ফিরতে পারি না অতি শৈশবের সেই দিনগুলোয় - সেই যে সময়ের কথা বলতে গিয়ে মনস্তাত্বিকেরা বলেন যে শিশুদের চারদিকে কী আছে না আছে তাদের সে বোধই নাকি থাকে না। আমরা শুনে আরও বেশি অবাক হই যে শিশুরা এমনকি তাদের চারপাশের বস্তুগুলো থেকে নাকি নিজেকে আলাদা করে বুঝতে পারে না। পাড়া জাগানো চিল- চীৎকার যার কোলে উঠে থেমে যায়, ওরা নাকি তখনও বুঝতে পারে না কে কোলে উঠে কান্না থামাল!

জীবনের ভোরের এই গোলমেলে সময়টুকু আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির জগতের থেকে একেবারেই আলাদা রকম। আমরা যত বড় হতে থাকি, ততই বাইরের সব কিছুর থেকে নিজের শরীরটাকে আলাদা ভাবতে পারার অভিজ্ঞতা জমে জমে তৈরি হতে থাকে আমাদের মন। বেড়ে ওঠার এই অভিজ্ঞতা সবার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একই দেশে, পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে বাইরের পৃথিবীটা সাধারণভাবে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথে প্রায় একই রকম করে দেখি। আর তাই আমাদের মনগুলোও অন্ততঃ কিছুটা পর্যন্ত একে অন্যের সাথে মেলে। উৎসবের দিনে অন্য এইসব নিজের মত মনগুলোর সাথে মেলার অদৃশ্য টানই আমাদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায় প্রতিবার।

শক্তিপূজার দিন ক'টায় প্রাণের ভেতর নিরাকার শক্তির অনুভব না ও যদি হয়, মূর্তিময় দুর্গার উৎসবের কটা দিন যতটা সম্ভব জটিল জীবনের টানা- পোড়েন ছেড়ে, যতটা সম্ভব শিশুর মত মনটা করে, নিজের গড়ে তোলা অস্তিত্বটা ভুলে যদি উৎসবটাতেই ভাসিয়ে দেওয়া যায় নিজেকে, তাহলেও পৃথিবীর সাথে নিজের আলাদা অস্তিত্বের দূরত্বটা একটু হলেও তো ঘোচে!

ভেবেছিলাম এবার হার্মনি আর কর্ড নিয়ে একটু আলোচনা করব - কথা বলতে বলতে দেখা গেল উৎসবের দিনে আমাদের সবার মন- যন্ত্রগুলোয় যে আকারহীন সুরেরা গুনগুনিয়ে ওঠে, সঙ্গীতে আমরা তো সেই হার্মনিটাই খুঁজে ফিরি!

শম্পা গুহমজুমদার

আজ তো স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করব। স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি শুনলেই মনে হয় এ আর এমন কী ব্যাপার! রাস্তায় ক্যামেরা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকব, সামনে দিয়ে কত লোকজন যাচ্ছে, গাড়িঘোড়া যাচ্ছে! সুযোগমতন ক্লিক করব।

প্রথমেই বলি, স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি হল সবথেকে কঠিন ব্যাপার। স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি মানে যে শুধু রাস্তার আশপাশের ছবি তুলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমরা যখন স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি করব, খেয়াল রাখতে হবে, কোন ঘটনা ঘটছে এমন ছবি তুলতে হবে। ছবি থেকে একটা গল্প যেন ভেসে ওঠে। রাস্তার ওপর কোন দোকানের ভেতরের ঘটনার ছবিও তোলা যেতে পারে। রাস্তা ছাড়াও সমুদ্র বা নদীর ধারের ঘটনা, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পশুপাখির ছবিও চলবে। কিন্তু ফটোটিতে একটা ঘটনা থাকতে হবে বা ছবিটি অর্থযুক্ত হতে হবে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরো, একটা দোকানের সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আর তুমি রাস্তার ওপর দিক

থেকে ছবিটা তুললে। ছবিটা যখন দেখছ, খেয়াল করে দেখ এর মধ্যে কী কোন গল্প বা ঘটনা লুকিয়ে আছে? যদি না থাকে তবে কিন্তু এটা স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি হল না। কিন্তু, এই ছবিতে দেখানো দোকানটির নাম দেখ ‘ফটো ডিভাইন স্টুডিও’ আর তার সামনে দুটি লোক বেশ ভক্তি

ভক্তি সাজপোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কিন্তু একটা গল্প তৈরি হল। অথচ ঐ নামের দোকানটার সামনে লোকদুজন যদি সাধারণ প্যান্টশার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে সেটা অর্থহীন ছবি হয়ে যেত।

স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। ছবি তোলবার আগের মুহূর্ত অবধিও অধিকাংশ সময় জানা যায় না তোমার সামনে ঠিক কী ঘটনা ঘটতে চলেছে। এছাড়াও রাস্তাঘাটে ফটো তোলবার আরো অন্য বিপদ আছে। কেউ আপত্তি করতে পারেন, বাজে কথাও শুনতে হতে পারে। আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি, একবার এক মাছবাজারের ছবি তুলছিলাম। হঠাৎ এক মেছুনি এক মগ জল আমার ক্যামেরার দিকে তাক করে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে নানান কথা। ভাগ্য ভালো যে ক্যামেরাতে জল লাগে নি। আমি কিন্তু তার ছবি তুলছিলামই না। এসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি স্পট থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া যখনতখন অনেক মন্তব্যও শুনতে হতে পারে। এইসব মনে রেখেই তোমাকে ক্যামেরা হাতে রাস্তাতে বেরোতে হবে। স্ট্রিট ফোটোগ্রাফির একটা জরুরি কথা হল, সাবজেক্ট যদি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে পোজ দেয় তাহলেই সমস্যা। সে আর স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি থাকবে না।

এক কথায় খুব সচেতনভাবে চারদিকে নজর রাখতে হবে। কী ঘটনা ঘটতে চলেছে তার আন্দাজ লাগাতে হবে, যার ছবি উঠছে তাকে সচেতন করে দেয়া চলবে না, আর নিজের বিপদ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

রাস্তাতে মানুষের পোর্ট্রেট তোলা যেতে পারে। কিন্তু কখনই সেটা ইনডোর শট হবে না। পোজ দিলেও চলবে না।

ডকুমেন্টেশান বা তথ্যছবি অথবা সংবাদছবি আর স্ট্রিট ফোটোগ্রাফির মধ্যেও তফাৎ আছে। কোনো জায়গায় হয়ত বেড়াতে গেছ। জায়গাটা সম্বন্ধে ধর ফিরে এসে তোমাকে লিখতে হবে। ধরা যাক সেখানে একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। তাহলে এই মন্দিরের ছবিটা খুবই জরুরি। তুমি রাস্তা থেকেই হয়ত মন্দিরটির ছবি তুললে। সেখানে কোন লোকজন থাকতেও পারে, না থাকলেও ক্ষতি নেই। সেটা সাধারণত ডকুমেন্টেশান। কিন্তু তুমি ধরো যদি মন্দিরের ছবি তুললে তার সামনে কোন ঘটনা ঘটছে এমন একটা অবস্থাতে, তাহলে সেটা তথ্যছবি আর স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি দু-ই হবে। কিন্তু রাস্তার ধারে একটা মন্দির, আর কিছুই নেই সে ছবিকে স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি বলা যাবে না।

ইভেন্ট ফোটোগ্রাফি মানে কোন অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ঘটনাও হতে পারে। রাস্তাতে ঘটছে এইরকম ইভেন্টের ছবি স্ট্রিট ফোটোগ্রাফির আওতাতে পড়বে। আশা করি এইবারে বোঝাতে পেরেছি কী ধরনের ছবি তুলতে হবে।

যেকোন ছবি তোলবার সময়েই মনে রাখতে হবে যেন সেটি একটু অন্যধরনের ও আকর্ষণীয় হয়। তোমার তোলা ছবিটা দেখে সবাই যেন সেইটে নিয়ে এক মিনিট চিন্তা করে। ছবির মধ্যে দিয়ে যে গল্পটি আলোকচিত্রী বলতে চাইছে তা যেন বুঝতে পারে। তাই, যখন স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করবে বলে ভাবছ একটু তখন একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা, যেমন কালীঘাটের মন্দির, কিংবা ধরো মুম্বাইতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, বা দিল্লির পুরানা কিলা এইসব এলাকা ছবি তোলবার

জন্য বাছা প্রয়োজন। হাওড়া ব্রিজের তলায় মল্লিকবাজার স্ট্রিট এ জাতীয় ফটোগ্রাফির জন্য উপযুক্ত। সারা পৃথিবী থেকে আলোকচিত্রীরা এই মল্লিকবাজার কিংবা কালীঘাট, বাবুঘাট, কুমোরটুলিতে ছবি তুলতে আসেন। মল্লিকবাজার স্ট্রিটে কলকাতার পাইকিরি ফুলের বাজার। হলুদ, কমলা, লাল ফুলেদের আশ্চর্য স্তূপগুলি অতি নোংরার মধ্যে পড়ে থাকে। খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেনাবেচা চলতে থাকে। সকালবেলা এখান থেকেই কলকাতার সব বাজারে ফুল সরবরাহ হবে।

ক্রেতাবিক্রেতাদের মুখের ভঙ্গীগুলোও খুবই আকর্ষণীয়। তুমি দাঁড়াতেই পারবে না এত ঠেলাঠেলি। তার মধ্যেই তোমাকে সঠিক মুহূর্তে শট নিতে হবে। কেউ যখন সে ছবি দেখবেন তখন এই ফুল, কাদা, ময়লা আর মানুষের মুখের অভিব্যক্তি সব মিলিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করবার খোরাক পেয়ে যাবেন।রাস্তার দেয়ালে, বাসের গায়ে অনেক মজার মজার ফটো বা পোস্টার আর মজার মজার কিছু লেখা বা ক্যাপশান থাকে। একটু চোখকান খোলা রাখলেই এইসব মজাগুলো দেখতে পাবে। দেয়ালে হয়ত পোস্টারে কেউ কাউকে তাড়া করেছে। তার ঠিক সামনে দিয়ে কোনো লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটা কিন্তু পোস্টারটাকে খেয়ালই করে নি। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখান থেকে মনে হচ্ছে পোস্টারটার ব্যক্তিটি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকা লোকটাকে তাড়া করেছে। তোমাকে তখন অতিদ্রুত শটটা নিতে হবে। লোকটা কোনক্রমে একটু বেশি এগিয়ে গেলে মজাটা আর ছবিতে ধরা যাবে না। এই হচ্ছে আসল স্ট্রিট ফটোগ্রাফি।

মজার কাজ , তাই না? চেষ্টা করে দেখ। ভালো লেগে যাবেই। কারণ স্ট্রিট ফটোগ্রাফির দুনিয়ায় প্রতিটা মুহূর্তই পরিবর্তনশীল। বিপদ যেমন আছে, তেমনই আছে উত্তেজনার খোরাক।

ক্যামেরা হাতে বাড়ির সামনের রাস্তায় গিয়ে একটুখানি চেষ্টা করে দেখতেই পার। ছোটোদের হাতে ক্যামেরা দেখলে লোকজন তত বিরক্ত হয় না। বাড়ির পাশের পার্কে গিয়েও বাচ্চাদের নানান কান্ডকারখানার শট নিতে পারো। ছবিগুলো যখন দেখবে তখন বারবার ভাববে সেগুলো ইন্টারেস্টিং কিছু হয়েছে কিনা, ওর মধ্যে কোন গল্প লুকিয়ে আছে কী না। তেমন কিছু ছবি এইসঙ্গে দিয়ে দিলাম।

আচ্ছা, আনন্দ করে ফটো তোলো। পরেরবার চলো কোথাও একটা বেড়াতে যাই ক্যামেরা নিয়ে। প্রাণ ভরে শুধু ছবি তুলব আর গল্প করব।

দা বুক অফ লাইফ

মহাশ্বেতা

একপাল দুষ্টু ছেলেমেয়েকে একটা স্কুলবাস ছেড়ে দিয়ে গেল একটা জাদুঘরের সামনে। বুড়ো টুরগাইডকে তারা সঙ্গে সঙ্গে হেনস্থা করতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য আরেকজন সুন্দরী গাইড এসে তাদের দলে ভিড়ল। একে হেনস্থা করার চেষ্টা করলেও বাচ্চারা শেষমেশ হার মানল। তার পিছু পিছু চলল তারা মিউজিয়ামের ভেতরে। একটা গোপন রাস্তা দিয়ে তাদের ঢুকিয়ে গাইড- দিদি তাদের নিয়ে এল একটা কক্ষে আর তারপর শুরু করল গল্প। গল্পটা অতি সাধারণ। মেক্সিকোর মরুভূমির মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম। তাতে নিয়মিত দুর্দান্ত দস্যুদের আক্রমণ হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল চাকাল। সেই গ্রামে থাকে তিন বন্ধু, হোয়াকিন, মারিয়া ও মানোলো। হোয়াকিনের বাবা চাকালকে শায়েস্তা করতে গিয়ে পটল তুলেছে, মারিয়ার বাবা গ্রামের প্রধান ও মানোলোর বাবা বিখ্যাত বুলফাইটার। তারা হেসে খেলে আনন্দে জীবন কাটিয়ে দেয় নিজেদের ছন্দে।

একদিন, সে আবার কোন যে সে দিন নয়, সাক্ষাৎ মৃতদের মর্ত্যে ফিরে আসার দিন, পরকালের দুই দেবতা, লা মুয়ের্তে, যিনি স্মরণ করা আত্মাদের দুনিয়ার দেখভাল করে ও জিবাল্বা, যে ভুলে যাওয়া আত্মাদের দুনিয়ার দেখভাল করে, মেক্সিকোর সেই গ্রামে এল সব অনুষ্ঠান দেখতে। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল তিন বন্ধুর কান্ডকারখানা। নিছক মজা করেই দুজন মিলে বাজি ধরল। যদি বড়ো হয়ে মানালোর সাথে মারিয়ার বিয়ে হয় তাহলে জিবাল্বা আর জীবন্তদের দুনিয়া নাক গলাবে না, আর যদি হোয়াকিন মারিয়াকে বিয়ে করে তাহলে লা মুয়ের্তে তার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে জিবাল্বার ভুলে যাওয়ার রাজ্যে, আর জিবাল্বা তার জায়গায় এসে স্মরণের দুনিয়ার রাজা হবে।

জিবাল্বা কিন্তু কথা রাখল না। লা মুয়ের্তের অজান্তে গিয়ে ছদ্মবেশে হোয়াকিনের হাতে সে ধরিয়ে দিল তার অমরত্বের মেডেল। তাতে হোয়াকিন হয়ে উঠল অপরাজেয়। তার কিছুকাল পরেই তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মারিয়া গেল স্পেনে পড়াশুনা করতে, মানোলোকে তার বাবা নিয়ে গেল তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ষাঁড়ের লড়াই শেখাতে, আর হোয়াকিনকে গ্রাম প্রধান বিরাট যোদ্ধা বানাবার তোড়জোর করতে লাগল।

এরপর অনেক কাল কেটে গেল। তিন বন্ধুই এখন বড়ো হয়েছে। হোয়াকিন গ্রামের বিরাট যোদ্ধা। আশপাশের দস্যুদলকে পিটিয়ে বেড়ায় সে। কিন্তু নরম প্রকৃতির মানালো ষাঁড়ের সাথে লড়াই করতে পারলেও খেলার শেষ প্রাণে ধরে মেরে ফেলতে পারে না জন্তুগুলোকে। তার ওপর লড়াইটড়াইয়ের চাইতে তার গানবাজনা করতেই বেশি ভাল লাগে। তাই তার বাবার বড় রাগ তার ওপর। পরিবারের সমস্ত মান সম্মান সে ধুলিসাৎ করেছে। মারিয়াও ফিরে এসেছে স্পেন থেকে। কিন্তু এবার তার হোয়াকিন বা মানালো- কোন একজনকে বেছে নেওয়ার পালা। কাকে বাছবে সে? লা মুয়ের্তে না জিবাল্বা, কে জিতবে বাজি? আর অমরত্বের মেডেলের খোঁজে আসা দুর্দান্ত দস্যু চাকালের আক্রমণ থেকেও বা গ্রামকে কীভাবে বাঁচাবে তারা সবাই? আর তার চেয়ে বড়ো কথা, সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার পর পরলোক থেকে মানালো ফেরৎ আসতে পারবে কি?

জর্জ গুতিয়েরেজ- এর এই ছবিটা প্রকাশ পাওয়ার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তক্কে তক্কে ছিলাম। ইউটিউবে ট্রেইলার দেখে দারুণ লেগেছিল। ছবিটা থ্রি- ডি অ্যানিমেশনের হলেও, তাতে পরিচালক বেশ কিছু নতুনত্ব এনেছেন। দেখে মনে হয় ছবিটা আগাগোড়া কাঠের খেলনা দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটা মানুষ ও জন্তুর নড়াচড়ায় কাঠের বিভিন্ন জোড়া লাগানো অংশের খটাখটি যেন দেখতে পাওয়া যায়। আর তাদের গায়ে খোদাই করা আছে ছোট ছোট নকশা, একটু খুঁটিয়ে দেখলে সেগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া আছে বেশ কিছু সুন্দর গান ও দৃশ্য। রঙের ব্যবহারেও কোন কার্পণ্য করেননি পরিচালক। স্মরণ করা আত্মাদের রাজ্যে মানালোর আবির্ভাব, আর তারপর সেই রঙ, গান ও আলোর বিস্ফোরণ, এখনও সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়লে

ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে। মৃতদের এই রাজ্যে কোন দুঃখ নেই। জীবিতদের দেশের মতই সারাদিন এখানে উৎসব চলে, তাতে অপার আনন্দ করে সবাই। সব কিছুই একটু বেশি রঙিন এখানে, আর সবার জন্য লা মুয়ের্তের দরজা সর্বক্ষণ খোলা। আর আছে শেষে একখানা চমক, কিন্তু সেটা যে কী তা জানতে হলে দেখে নাও এই ছবিটা।

কিছু তথ্যঃ
নাম- ‘দা বুক অফ লাইফ
পরিচালনাঃ হর্জ গুতিয়েরেজ
সাল- ২০১৪
দৈর্ঘ ৯৫ মিনিট
রেটিং→ বাবা মায়ের সঙ্গে দেখলেই ভালো।

জয়ঢাক শারদ সংখ্যা ২০১৫

প্রতি সংখ্যাতেই কিছু কিছু লেখা আমরা জয়ঢাকের ইবুকটি তৈরি হয়ে যাবার পরে সম্পাদনা করতে বাধ্য হই। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি জয়ঢাকের ডাউনলোডেবল ই বুকটিতে দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এ নিয়ে পাঠকদের থেকে অভিযোগ আসে অনেক। তাই এ সংখ্যা থেকে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে সম্পাদিত লেখাগুলোকে নিয়ে জয়ঢাকের মূল ই বুকের এই সাপ্লিমেন্টারি বইটি তৈরি করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

সূচিপত্র

(সাপ্লিমেন্টারি)

বিষয়	নাম	লেখক
গল্প	সোনার কাঠি	অনিরুদ্ধ সেন
ভ্রমণ	চল যাই ঘুরে	দেবাশিস সেন
ধারাবাহিক উপন্যাস	অলোকপর্ণার বিড়াল	রোহন কুদ্দুস
খেলার পাতা	নেচার ক্যাম্প গজাবুরু	পিয়ালি ব্যানার্জি

সোনার কাঠি

অনিরুদ্ধ সেন

প্রেরণা

তুলি একটি ছোট্ট মেয়ে, ক্লাস সিক্সে পড়ে। হ্যারি পটার খুলে বসে পড়ার অবসরে। একদিন মা এনে দিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

"এ কী, এ যে বাংলা গল্প", অবাক হ'ল তুলি।

"পড়েই দেখিস, এই ঝুলিতেও অনেক যাদু আছে। এসব গল্প কত শুনেছি ঠা'মা- দিদার কাছে।" তুলি বইটা তুলে নিল ডিনার সারার পর। সাধু ভাষার হোঁচট, কিন্তু গল্পটা সুন্দর। দেখতে দেখতে 'কলাবতী রাজকন্যা' শেষ। সেদিন রাতে তুলির স্বপ্নে নিঝুম পুরীর দেশ।

পরদিন ডিনারের সময় তুলি মায়ের কাছে এসে বলল, "আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। রাজা, রানি, রাজকন্যা এখন কি আর নেই?"

"গণতন্ত্রে যে নাগরিক, দেশের রাজা সেই।" বললেন মা, "সেই সুবাদে তোরাই রাজকন্যে।"

তুলি বলল, "আরও একটা প্রশ্ন তোমার জন্যে। রূপকথার রাজপুত্তুর অনেক লড়াই করে রাজকন্যার দেশে গিয়ে সোনার কাঠি ধরে গোটা রাজ্য জাগিয়ে তোলে। আর দ্যাখো, রাজকন্যা – তার কাজ কি কেবলই ঘুম, সাজগোজ আর কান্না?"

বাবা বলেন অবাক হয়ে, "ঠিক বলেছে তুলি – একরত্তি মেয়ের মুখে নতুন দিনের বুলি! এ যুগে সব রাজকন্যাও দেশ- বিদেশে যাবে, আকাশ- পাতাল খুঁজে শেষে সোনার কাঠি পাবে। সোনালী সেই উপলব্ধির যাদুর ছোঁয়া লেগে এখনও যাদের চোখ খোলেনি তারাও উঠবে জেগে।"

প্রয়োগ

সুমিত তিনদিন স্কুলে আসছে না। মোবাইলও সুইচড- অফ। বন্ধুরা চিন্তায় – কী হল? ছেলেটা একদিনও অ্যাবসেন্ট হয় না! কে যেন টিচারদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বলল, ওর অসুখ।

"এই তুলিকা, তুই তো ওর পাড়াতেই থাকিস। একটু খোঁজ নিস না?" সৈকত বলল।

"বাড়ি চিনি না যে।" তুলি চিন্তিতভাবে বলল, "ঠিক আছে, অফিস থেকে ঠিকানা জেনে নেব।"

সেদিন বিকেলেই তুলি সুমিতদের ফ্ল্যাটে গিয়ে কলিং বেল বাজাল। দরজা খুলে এক মহিলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

"আমি সুমিতের বন্ধু তুলিকা। ও স্কুলে যাচ্ছে না, তাই খোঁজ নিতে এসেছি।"

"ভেতরে এস। আমি সুমিতের মা।"

"তোমার নাম?" ভেতরে যেতে যেতে তুলি জিজ্ঞেস করল।

"নীলিমা। কিন্তু কেন – কেউ তো জিজ্ঞেস করে না?"

"বা রে, তুমি কী কাকিমা জানতে হবে না?"

নীলিমা অবাক খুশিতে তুলির গাল টিপে দিলেন। তারপর তাঁর মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠল।

"জানো, সুমিতের খুব অসুখ। এক্ষুণি ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছি।"

"ওর কী হয়েছে?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল তুলি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলিমা বললেন, "ও খুব ভয় পেয়েছে। কথা বলছে না।"

তুলির মুখ চুণ হয়ে গেল। বলল, "কেন, কীসের জন্য?"

"সেটাই তো জানা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন সেটা জানতে পারলে হয়তো ওকে সুস্থ করে তোলা যাবে।"

"ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

"যাও, তোমরা বন্ধুরা যদি কথাবার্তা বলে কিছু একটু করতে পারো। তবে ওকে কথা বলাতে বোধহয় পারবে না।"

ওদের কথা শুনে সুমিতের বাবা বেরিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে নীলিমা বললেন, "অরুণ, এ সুমিতের ক্লাস ফ্রেন্ড তুলিকা। ও কিন্তু খুব ম্যাচিওর্ড মেয়ে, নাম না বললে তোমার সঙ্গে আলাপই করবে না।"

"গুড ইভনিং, অরুণ কাকু।" তুলি মাথা ঝুঁকিয়ে বলল। অরুণের ক্লিষ্ট মুখে একফালি হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "যাও, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস।"

সুমিতকে দেখে তুলি একটা ধাক্কা খেল। হাসিখুশি ছেলেটা সব সময় 'জোক' করে। খুব নরম, শান্ত প্রকৃতির, গুড বয়। আজ কিন্তু বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে কেমন শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তুলিকে দেখে যেন তার চোখে একটা ঝিলিক দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

"গুড ইভনিং, সুমিত। কী হয়েছে, স্কুলে যাচ্ছিস না?"

সুমিত চুপ।

"তোর কী হয়েছে? আমাকে বল, আমি কা- উক্কে বলব না।"

সুমিতের ঠোঁট কাঁপল, কী যেন বলার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ অবধি অসহায়ভাবে চুপ করে রইল।

"আচ্ছা বেশ, না বললি। তাচ্চেয়ে আয় আমরা লাঞ্চের সময় যা করতাম, 'অন্তাক্ষরী' খেলি। দাঁড়া, আমিই নয় শুরু করছি।" বলে ভুরুটুরু কুঁচকে তুলি ইচ্ছে করেই একটু মোটা গলায় গেয়ে উঠল, "আমার হা- আ- ত ধরে তুমি নিয়ে চ- লো- ও সখা, আমি যে- এ পথো- ও চিনি না- আ- আ। নে ধর – 'না'।"

তুলি এমন মজা করলে সুমিত হেসে কুটিপাটি হয়। আজও ওর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল, কিন্তু তারপরই আবার সেটা মিলিয়ে গিয়ে ফিরে এল বিষণ্ণভাব। তুলি একটু হতাশ হলেও মুখে সেটা প্রকাশ না করে চোখ মটকে বলল, "বুঝেছি। তুই কিছু খাসনি, তাই গলায় জোর পাচ্ছিস না। দাঁড়া, তোর জন্য খাবার আনি।"

হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে তুলি যখন নীলিমার কাছে এল, তার মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

"কাকিমা, সুমিতের জন্য কিছু একটু খাবার করে দেবে?"

নীলিমা চিন্তিতভাবে বললেন, "এখন তো ও ফলটল খায়। কিন্তু খাবে কি? আজকাল তেমন রুচি নেই।"

"সে আমি ঠিক খাইয়ে দেব। কিন্তু তুমি এবার বলো তো, ঠিক কী হয়েছিল? কখন থেকে ওর এই অবস্থা?"

"গত শুক্রবার সন্ধেবেলা ওর হোম- ওয়ার্ক হয়ে গেছে। ঘরে বসে কী যেন করছে। হঠাৎ দৌড়ে বেরিয়ে এসে আমায় আঁকড়ে ধরল, চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। আমি সাথে সাথে ওর গায়ে- মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম – কী হয়েছে, বাবা? ও কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ভাবলাম খুব ভয় পেয়েছে, একটু পরই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পরও ও কিছুই বলে না। আমরা তাড়াতাড়ি ওর ঘরে গিয়ে দেখলাম ভয়ের কিছু আছে কিনা। কিন্তু নাঃ, তেমন কিছুই খুঁজে পেলাম না। তারপর থেকেই –"

"ও কি কোনও বই পড়ছিল, বা মুভি দেখছিল?"

"একটা কমিক বই খোলা ছিল, অ্যাস্টারিস্ক আর ওবেলিস্কের।"

"সে তো পেটফাটা হাসির কমিক। আর কোনও স্মার্টফোন?"

ওর মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীলিমা বললেন, "না না, ওকে আমরা স্মার্টফোন দিইনি। স্রেফ দরকারে ফোন করার জন্য একটা সাদামাটা মোবাইল –"

কথাবার্তা শুনে অরুণ ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তুলি তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা কাকু, তুমি ওদিন কাকিমাকে বকোনি তো?"

"ওরে পাকা বুড়ি!" নীলিমা এগিয়ে এসে তুলিকে একটু আদর করে বললেন, "না রে – তোর কাকু ভীষণ নরম মানুষ, আমাকে কক্ষণও বকে না। বরং আমিই কাকুকে মাঝে মাঝে বকে দিই, তোর বন্ধুকে একটুও বকে না দেখে।"

"কাকুতো ঠিকই করে, সুমিত এত 'গুড বয়'!"

"তাও তো বটে। কিন্তু বল তো, তার হঠাৎ কী হল?" নীলিমার চোখ আবার ছলছল করে উঠল।

"কাকিমা, তুমি চিন্তা কোরো না। ডাক্তারকাকু বলেছে না, ও ভালো হয়ে যাবে?"

"সে তো ওর ভয় পাওয়ার কারণটা বের করতে পারলে তবে। কিন্তু আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, ও নিজেও তো কিছু বলতে পারছে না।"

"ওকে দিয়ে লেখাবার চেষ্টা করেছ?"

"করেছি। কিন্তু সে ব্যাপারেও ওর কোনও উৎসাহ নেই। কে জানে এখন কী হবে!"

"ভেবো না, কিছু একটা উপায় ঠিক বেরিয়ে যাবে। তুমি বরং ওর জন্য একটু খাবার দাও।"

বিছানায় সুমিতের পাশে বসে তুলি ওকে একটা একটা করে আপেলের টুকরো খাইয়ে দিচ্ছে। প্রথমে সুমিতের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তুলি কথাবার্তা বলে, মজা করে ওকে লাইনে এনেছে। খাওয়া শেষ হলে তুলি একগাল হেসে বলল, "বাঃ, গুড বয়!"

খালি প্লেটে কতগুলো আপেলের বিচি পড়ে আছে। টিচার বলেছে জঞ্জাল সব সময় আবর্জনার পাত্রে ফেলতে হয়। তুলি তাই করে। শুধু ফলের বিচির ব্যাপারে ও একটু দুষ্টুমি করে – সুযোগ পেলেই ওগুলো মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। সাধারণতঃ কিছু হয় না, তবে একবার ওর ফেলা পেঁপেবিচি থেকে কয়েকটা চারাগাছ গজাতে দেখে ওর ভীষণ আনন্দ হয়েছিল।

এখানেও তাই তুলি এদিক- ওদিক চেয়ে ঘরের মাঝবরাবর একটা খোলা জানালা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল – নিচে যদি মাঠ বা বাগান থাকে, ওপর থেকে বিচিগুলো ছুঁড়ে দেবে বলে। কিন্তু দু'পা যেতেই হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গোঙানি শুনে ও চমকে পেছন ফিরল। দ্যাখে সুমিত দুহাত তুলে ওকে নিষেধ

করছে। উত্তেজনায় তার মুখ লাল, কিন্তু সেসব ছাপিয়ে তার চোখে ফুটে উঠেছে এক বিকট ভয়ের ছাপ।

"কী রে, কী বলছিস – ওদিকে যাব না?"

সুমিত নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তুলি সাথে সাথে বলল, "বেশ, যাব না। তবে তোর যখন এত আপত্তি – দাঁড়া, জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি।"

তাহলে ঐ জানালাটাতেই সুমিতের ভয়! ভেজানোর নাম করে ওদিকে গিয়ে কিন্তু তুলি এক ঝলকে চারপাশ দেখে নিয়েছে। তারপর এসে সুমিতের মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "নে, এবার নিশ্চিন্তে একটু ঘুমো দেখি।" সত্যিই সুমিত কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তুলির মনে হল সুমিত যেন এক রূপকথার রাজপুত্তুর – কোন মায়াবীর রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আপন মনে বলল, "ওকে জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠিটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

"কাকিমা, সুমিত ঐ জানালাটা দিয়ে কিছু দেখে ভয় পেয়েছে।"

তুলির কথায় নীলিমা একটু অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু ওটা দিয়ে তো বাইরের তেমন কিছু দেখা যায় না।"

"এক ঝলকে দেখে আমারও তাই মনে হল। তবে কি কোনও জন্তু বা – ইয়ে, মানুষ ওখানে এসে –"

এবার অরুণ বললেন, "না না, ঐ খাড়া দেওয়াল বেয়ে কারও আসা সম্ভব নয়। তারপর আবার গ্রিল লাগানো। এতদিন আছি, কোনওদিন কিছু আসেওনি। এক যদি বাইচান্স বেড়াল এসে পড়ে – কিন্তু সুমিত তো বেড়াল খুব ভালোবাসে।"

"কিন্তু ও ওখান থেকেই ভয়ের কিছু দেখেছে", বিশ্বাসী কণ্ঠে বলল তুলি। এবার তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। নীলিমা অবশ্য তাকে একটু কিছু মুখে না দিয়ে যেতে দিলেন না।

সুমিতদের ফ্ল্যাটটা তিনতলায়। নিচে নেমে তুলি ওদের জানালার ঠিক তলায় এল। নাঃ, দেওয়ালটা খাড়া। কোনও পাইপও নেই। স্পাইডারম্যান-গোছের কোনও হীরো বা অপরাধীর পক্ষে কি টিকটিকির মতো বেয়ে, কার্নিশ ধরে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মারা সম্ভব? ভাবতে ভাবতে তুলি কমপ্লেক্সের গেটে এসে পড়েছে। সেখানে দ্যাখে সিকিউরিটি অফিসার বসে গম্ভীরভাবে কীসব দেখছেন। তাঁর বুকের ব্যাজে লেখা – ত্রিলোক শর্মা। একটু নজর করে তুলি বুঝল – কমপ্লেক্সে সিসি টিভি লাগানো, তার ফুটেজ দেখা চলছে।

এখানে সবাইকে সই করে ঢুকতে-বেরোতে হয়। বেরোবার সই করার সময় তুলি মিঃ শর্মার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "বন্ধুর বাড়ি এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।" তুলি বলল, "আসলে কি জানো আঙ্কল, আমার বন্ধুর একটা দরকারি জিনিস হারিয়ে গেছে। তাই ও খুব মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে আছে।"

"কী জিনিস?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

"সোনার কাঠি, সে আপনি বুঝবেন না।" নিজের মনে বলল তুলি। তারপর মিঃ শর্মার দিকে ফিরে বলল, "আঙ্কল, ঐ চুরিটা যখন হয়েছে – মানে গত শুক্রবার সন্ধে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে – তখন কোনও ভিজিটর এসেছিল?"

"আরে, এ যে দেখছি লিলিপুট গোয়েন্দা!" মনে হল মিঃ শর্মা বেশ মজা

পেয়েছেন। তারপর খাতা দেখে বললেন, "মোটে একজন – সে ইস্ত্রিওয়ালা, গত চার বছর ধরে এখানে আসা- যাওয়া করছে।"

"আঙ্কল, বাইরের থেকে কেউ এলে কি খাতায় সই না করে ঢুকতে পারে?"

"এখানের রেসিডেন্ট ছাড়া সবাইকেই সই করে ঢুকতে হয়।" বলেই মিঃ শর্মা একটু কিন্তু- কিন্তু করে বললেন, "আর যদি কেউ কোনওভাবে নজর এড়িয়ে ঢুকেও যায়, সিসি টিভি ফুটেজ আছে না?"

তুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু অবাক হয়ে তারপর তিনি হেসে ফেললেন, "ও, খুদে ইয়োমকেশ বক্সীর বুঝি ফুটেজ চাই? আচ্ছা, দাঁড়াও।" এরপর মিনিট কতক কম্পিউটার হাতড়ে তিনি ফুটেজ চালু করলেন। তুলি দেখল শুধু গেট নয়, সুমিতের জানালার দিকের দেওয়ালটাও দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ফুটেজ চলার পর সে নিশ্চিত হল ওই ইস্ত্রিওয়ালা এসে লিফটের দিকে চলে গেছে, তাছাড়া আর কেউ আসেনি। আর দেওয়াল বেয়েও কেউ বা কিছু ওই সময়ে ওঠেনি।

"তুমি তো চ্যাটার্জি সাবের বাড়ি গিয়েছিলে? উনি তো বলেননি কিছু খোয়া গিয়েছে।"

"না, টাকায় দামি কিছু নয় – তবে আমার বন্ধুর জন্য ওটা খুব দরকারি। এনিওয়ে, থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল – এখন বুঝলাম ওটা হারিয়েই গিয়েছে, চুরি যায়নি। তাহলে ঠিক আবার খুঁজে পাওয়া যাবে।"

তুলি এ পাড়া মোটামুটি চেনে। সুমিতদের জানালা দিয়ে বাইরে যা দেখা যায় তা হচ্ছে কম্পাউন্ডের মধ্যে একটু খোলা জায়গা, বাইরে একটা রাস্তা, তারপর একটা পার্ক। তার ওপাশে একটা পরিত্যক্ত কারখানার শেড। কম্পাউন্ডে ভয়ের কিছু যে ছিল না, সেটা সিসি টিভি দেখে বোঝা গেছে। আর রাস্তায়, পার্কে তখন লোকজন – সেখানে কিছু ঘটলে তো জানাই যেত। বাকি থাকে পার্কের ওপাশের কারখানার শেডটা। কিন্তু সেটা এত দূরে যে ওখানে কিছু দেখে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে?

বাড়িতে গিয়ে তুলি মা- বাবাকে সব খুলে বলল। তাঁরা খুব চিন্তিত হলেন। বাবা বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জির নম্বরটা দিস তো, ফোন করব। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর এসব ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞতা। দরকার হলে যোগাযোগ করিয়ে দেব।"

পরদিন তুলি স্কুলে গিয়ে সুমিতের খবরটা ভাঙল। বন্ধুরা সবাই বিষণ্ন।

"সুমিত শেষ অবধি পাগল হয়ে গেল!" দুঃখ করে বলছিল গৌরব।

"অমন বলিস না।" তুলি ওকে বকে দিল, "কারুর পেট খারাপ বা জ্বর হওয়া মানে তো এই নয় যে সে মরে গেল। তাকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে। শরীরের মতো মনেরও অসুখ করে, তখন মনের ডাক্তারবাবুদের কাছে যেতে হয়। তাঁরা কথাবার্তা বলে, দরকার হলে ওষুধপত্র দিয়ে রোগ সারিয়ে দেন। কী যেন নাম তাঁদের –"

"ঐ সাইকো কী যেন?" নন্দিতা ভয়ে ভয়ে বলল।

"হ্যাঁ, অমনই একটা কিছু। সুমিত কেন ভয় পেয়েছে বললেই তিনি ওকে সারিয়ে তুলবেন।"

"কিন্তু ভয় পাবার কারণটা যে বোঝা যাচ্ছে না।" মণিকা বলল।

"হুঁ, সেটাই বের করতে হবে", বলে তুলি গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল।

ছুটির সময় হঠাৎ ঋদ্ধি তুলির কাছে এল। ঋদ্ধি ক্লাসের গুড বয়, ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয়। সাধারণতঃ নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকে, বিশেষ কারও সাথে মেশে না। সুমিতের অবশ্য ও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

"আচ্ছা তুলি, তুই তো কাল সুমিতের বাড়ি গিয়েছিলি। একটা জিনিস যদি তোর চোখে পড়ে থাকে –"

"কী জিনিস?"

"ইয়ে – একটা বাইনোকুলার। আসলে আমি সুমিতকে শুক্রবার দেখতে দিয়েছিলাম, সোমবার ফেরত দেবার কথা। এখন ওর এই অবস্থা। এদিকে যন্ত্রটার মালিক বাচ্চুদা যে কোনও দিন ফেরত চাইতে পারে। কী করি, বল তো?"

ঋদ্ধি প্রায় কাঁদোকাঁদো। কিন্তু হঠাৎ তুলির দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের ছাপ। ফিসফিসিয়ে বলল, "কী বললি, বাইনোকুলার?"

"হ্যাঁ রে, ওকে দিয়েছিলাম।"

"ইউরেকা!" বলেই তুলি বাড়ির দিকে প্রায় দৌড় লাগাল। আর ঋদ্ধি ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল।

"আয়", নীলিমা তুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "সুমিত একটু ভালো, তবে এখনও –"

"কাকিমা, ও ভাল হয়ে যাবে। মনে হয় ওর ভয় পাওয়ার কারণটা এবার বের করতে পারব। আচ্ছা কাকিমা, ওর কাছে একটা বাইনোকুলার দেখেছ?"

"বাইনোকুলার – উঁহুঃ, আমরা তো ওকে বাইনোকুলার দিইনি।"

"ও এখন কী করছে?"

"বোধহয় ঘুমোচ্ছে। ডেকে দেব?"

"না না, দরকার নেই।" বলে তুলি দৌড়ে সুমিতের ঘরে ঢুকে গেল।

সুমিত সত্যিই ঘুমোচ্ছে। ভালোই হল, ওকে না বলে ঘরে তল্লাসি করা যাবে। এদিক- ওদিক তাকাতে লাগল তুলি, কিছু চোখে পড়ল না। টেবিল, মেঝে, খাটের তলা কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু নাঃ, তেনার দেখা নাই!

"এভাবে হবে না, মনের মধ্যে খুঁজতে হবে", সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের কথাটা নিজের মনে আউড়ে তুলি ভাবতে বসল। ওর ধারণা সত্যি হলে, সুমিত জানালায় দাঁড়িয়ে ঐ বাইনোকুলার দিয়ে দূরে এমন একটা কিছু দেখেছে, যাতে ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। তারপরই ও দৌড়ে কাকিমার কাছে গিয়েছে। কাকিমা যন্ত্রটা দেখেনি, ওটা পথে কোথাও পড়ে গেলেও তো অ্যাদ্দিনে চোখে পড়ত। তাহলে?

তুলি এবার জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি মারল। যা ভাবা – জিনিসটা জানালার ঠিক নিচে কার্নিশের ওপর পড়ে আছে। নিশ্চয়ই সুমিত ভয় পাবার পর ওর হাত ফস্কে পড়ে গেছে! তুলির ছোট্ট ছোট্ট হাত অবশ্য অদ্দুর পৌঁছলো না। শেষে কাকু একটা হুকওয়ালা লাঠি জোগাড় করে ধীরে ধীরে ওটাকে তুলে আনলেন।

কী সৌভাগ্য, সুমিত তখনও ঘুমোচ্ছে। তুলি জানালায় দাঁড়িয়ে যন্ত্রটা বাইরে ঘোরাল আর সাথে সাথে সুদূর তার হাতের মুঠোয় চলে এল। সেই পার্কের ওপারের পরিত্যক্ত কারখানার শেডটা যেন সামনেই দেখা যাচ্ছে। তুলি সেখানে ফোকাস করল আর তার হাত থেকে বাইনোকুলারটা পড়ে যাবার উপক্রম হল। তার মুখচোখের অবস্থা দেখে কাকু তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা হাতে নিলেন আর পরক্ষণেই বলে উঠলেন, "উঃ, কী ভীষণ কাণ্ড!" তারপরই তিনি দ্রুতহাতে মোবাইলে

একটা নম্বর ডায়াল করতে লাগলেন।

তুলি বাইনোকুলারটা আবার চোখে লাগাল। না, কোনও ভুল দেখেনি – ঠিক যেন তার ক'হাত দূরে বেঞ্চে বসে একটা ছোট ছেলে। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত আর তার সামনে- পেছনে দুটো ভয়ঙ্কর দেখতে লোক পিস্তল আর চাবুক নিয়ে হাত- পা নেড়ে তাকে শাসাচ্ছে। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা সাইলেন্ট ফিল্ম!

তারপর তো ঘটনা এমন ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল যে তুলি আর তাল রাখতে পারল না। অরুণ কাকুর সাথে এস- পি মিঃ সেনের চেনা ছিল। তাঁকে ফোন করামাত্র তিনি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তারা গিয়ে ঐ গুণ্ডা দুজনকে গ্রেফতার করে অভিমন্যু বলে ছেলেটিকে উদ্ধার করল। পরদিন কাগজে, টিভিতে হৈ- চৈ – এক ক্লাস নাইনের ছেলের দারুণ সাহস আর এক ক্লাস সিক্সের মেয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলে দুই খুনি প্রমাণসহ গ্রেপ্তার। ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হলেও ওই ছেলেমেয়ে দুজনের নাম গোপন রাখা হল, যাতে ওরা পরে ঐ খুনেদের দলের প্রতিশোধের লক্ষ্য না হয়।

কিন্তু তাতে তো তুলির মূল উদ্দেশ্য সফল হল না। সুমিত যে এখনও সুস্থ হল না! কিন্তু ডঃ মুন্সী বললেন ওর অসুস্থতার কারণ যখন জানা গেছে, তখন আশা করা যাচ্ছে তিনি ওকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে পারবেন। ডাক্তারবাবু, সুমিতের মা- বাবা, এস- পি মিঃ সেন আর তুলি মিলে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এক ছোটোখাটো কনফারেন্সের পর একটা প্ল্যান ঠিক করা হল।

সেদিন শনিবার, স্কুল ছুটি। সন্ধেবেলা তুলি সুমিতের বাড়ি গিয়ে ওর সাথে দেখা করল। সুমিতকে একটু ফ্রেশ লাগছে। তুলি কিছুক্ষণ গল্পগাছায় ওকে মাতিয়ে রেখে শেষে টুক করে ছাড়ল, "কী রে, অ্যাদ্দিন চুপচাপ ঘরে বসে – চল, একটু বেরিয়ে আসি।"

সুমিতের চোখে হঠাৎ ভয়ের ছায়া। তুলি মিষ্টি হেসে বলল, "ভয় পাচ্ছিস? তোর ভয়ের কারণ কেটে গেছে। চল, দেখবি।" বলে ওকে হাত ধরে জানালার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

সুমিত আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই ঘরে ঢুকল একটি বছর চোদ্দর ছেলে। সুমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় কীসের? চেয়ে দেখ – আমি কি ভয় পেয়েছি?" সুমিত ওর দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, "তুমি – তুমি না ঐখানে ছিলে? তোমাকে না মারছিল?"

ছেলেটি সুমিতের কাঁধ চাপড়ে বলল, "না রে, গুণ্ডা দুটো ধরা পড়েছে। আমাকে আর কেউ মারবে না। কিন্তু ভাগ্যিস তুই সেদিন আমায় দেখেছিলি, নইলে –"

কিন্তু ওকে শেষ করতে না দিয়েই তুলি চেঁচিয়ে উঠেছে, "সুমিত কথা ব- লে- ছে!" আর সাথে সাথে ঘরে ঢুকে পড়েছেন নীলিমা, অরুণ, ডঃ রুদ্র আর মিঃ সেন। সবাই হাসছেন। প্রথম কথা বললেন ডঃ রুদ্র, "তাহলে আমাদের প্রথম প্ল্যানেই কাজ হাসিল, দ্বিতীয়টার আর দরকার হল না।"

তুলি বলল, "তা'বলে আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম বাতিল করছি না। এদিকে আয় সুমিত, দ্যাখ –"

সুমিতকে ও হাত ধরে জানালার কাছে নিয়ে এল। এবার সুমিত তেমন আপত্তি করল না। তুলি এবার ওর হাতে বাইনোকুলারটা তুলে দিল। সুমিত মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ভাঙা কারখানার শেডের দিকে ফোকাস করল আর বলে উঠল "এ কী!"

তুলি খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সুমিতের চোখের সামনে তখন একটা

আলোকমালায় সাজানো উঠোন। সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে খুশিতে ঘুরছে-ফিরছে।

"ওখানে একটা পার্টি হচ্ছে।" বললেন মিঃ সেন, "পুলিশের তরফ থেকে আমরা পার্টিটা দিচ্ছি, তোমাদের তিনজনের সম্মানে। চলো, এখন আমরা ওখানে যাব।"

যেতে যেতে অভিমন্যু সুমিতকে শোনাল তার রোমহর্ষক কাহিনী। ও উত্তর কলকাতায় থাকে। মোবাইলে ফটো তুলে বেড়ানো ওর বাতিক। সেদিন বাড়ির থেকে একটু দূরে এক নির্জন রাস্তায় কিছু গাছপালার ফটো তুলছে, এমন সময় দেখে দুটো গুণ্ডা একজনের ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে। ও তখন অনেকটা দূরে, কাছাকাছি কেউ নেইও যে চিৎকার করে ডাকবে। তাই ও মোবাইলেই ঘটনাটার ভিডিও তুলতে থাকে। হঠাৎ দেখে ব্যাগের মালিক একজন গুণ্ডাকে জাপটে ধরল আর গুণ্ডাটা মালিকের বুকে গুলি করল। অভিমন্যুর বুক হিম হয়ে গেল। তক্ষুণি অন্য গুণ্ডাটা ওকে দেখতে পেয়ে তাড়া করল। অভিমন্যু পাগলের মতো দৌড়তে দৌড়তে একফাঁকে এক চেনা পানওয়ালার কাছে ওর ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা সাবধানে রেখে দাও, আমি পরে নেব।" কিন্তু তারপর পালাতে গিয়ে সে লোকদুটোর হাতে ধরা পড়ে গেল।

খুনে দুজন বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ওকে একটা গাড়িতে তুলল, তারপর এখানে- ওখানে ঘুরিয়ে ওদের এই ডেরায় নিয়ে এল। ওরা দেখেছিল যে ছেলেটা মোবাইলে খুনের ঘটনাটার ফটো তুলছে, কিন্তু ওর কাছে মোবাইলটা পেল না। অভিমন্যু তখন ওদের ধাপ্পা দিল যে মোবাইল ও একজনের কাছে রাখতে দিয়েছে আর বলে এসেছে যে সাতদিনের মধ্যে যদি সে ওটা ফেরত নিতে না আসে তবে যেন ওটা পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয়। খুনে দুজন জিনিসটা কোথায় বলার জন্য ওর ওপর অনেক অত্যাচার করে আবার লোভ দেখায় যে জিনিসটা পেলেই ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। সাতদিন যত ঘনিয়ে আসে, অত্যাচার ততই বাড়তে থাকে। কিন্তু সব সহ্য করেও ও মুখ বন্ধ করে থাকে – কারণ ও জানত খুনের ও-ই একমাত্র সাক্ষি, তাই জিনিসটা হাতে পেলেই লোকদুটো ওকে শেষ করে দেবে।

এভাবে আধপেটা খেয়ে চাবুক আর পিস্তলের বাটের মার সহ্য করে ও কদ্দিন টানতে পারত কে জানে। এমনও নয় যে ও কোনও লোকের চোখে পড়তে পারত। ঐ ডেরাটার আশেপাশে কোনও লোকবসতি নেই। কারখানার উঁচু দেওয়ালের জন্য পাশের পার্ক থেকেও কারখানার ভেতরে কী হচ্ছে দেখা যায় না। তাছাড়া কারখানার লাগোয়া অংশে খুব ঝোপঝাড় দেখে সেদিকে লোকজনও বিশেষ যায় না। অনেক দূরে সুমিতদের যে হাউসিং কমপ্লেক্স, সেখান থেকেও ঐ কারখানা নজরে আসার কথা নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে যেদিন ওরা অভিমন্যুকে নিয়ে এল সেদিনই ওই শেডের দিকে বাইনোকুলার তাক করল সুমিত।

"আমি হঠাৎ দেখি, ঠিক যেন আমার সামনেই দুটো ভয়ঙ্কর চেহারার লোক একটা ছেলেকে অমানুষিক মার মারছে। দেখেই আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, মনে হল ওরা এবার আমাকে ধরবে।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই মনে হয় – যেন ঘটনাটা আমাদের থেকে ক'হাত দূরে ঘটছে।" তুলি ওকে সমর্থন জানাল।

"তারপর যে কী হল ঠিক বলতে পারব না। যেন আমার বুকের ওপর একটা বিরাট পাথর চেপে বসে আছে, কিছু বলতে গেলেই কে চেঁচিয়ে উঠছে – খুন করে ফেলব! ইস, আমি যদি তখন হুঁশে থাকতাম – তবে এই ছেলেটা আরও কতদিন আগে রেহাই পেত!"

"বেটার লেট দ্যান নেভার!" অভিমন্যু সুমিতের পিঠ চাপড়ে ভরসা দিতে দিতে বলল, "কিন্তু দেখলি তো –যতটা দেখায়, ভয় আসলে তত বড় নয়। ভবিষ্যতে মনে রাখিস।"

সুমিত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

নীলিমা তখন তুলির দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু তারপর তোরা দুজনেই কিন্তু রেহাই পেলি এই ছোট্ট বন্ধুটার জন্যে। ধারালো বুদ্ধি দিয়ে ও একের পর এক ধাপ পেরিয়ে আসল সত্যে না পৌঁছলে অভিমন্যুর ব্যাপারটাও আমরা জানতাম না আর সুমিতও তাহলে সুস্থ হোত কিনা কে জানে!"

সবার সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে তুলি একটু লজ্জা পেয়ে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, "আচ্ছা, অভিমন্যুর মোবাইলটা আবার পাওয়া গেল?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার ভিডিওতে তো খুনের ঘটনাটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। খুনিদের সাজা দিতে আর কোনও অসুবিধা হবে না।" বললেন মিঃ সেন।

"অভিমন্যুর বাড়ির লোকজন কোনও খোঁজ করেনি? পুলিশে খবর দেয়নি?"

"তা আবার দেয়নি! কাগজে, টিভিতেও নিরুদ্দেশ ঘোষণা করা হয়েছিল।"

"তবু পানওয়ালার খেয়াল হয়নি?"

"নাঃ! সে নাকি সারাদিন দোকানে বসে থাকে, তাই কাগজ পড়ার বা টিভি দেখার সময় পায় না। শুধু এফ- এম রেডিওয় গান শোনে।"

তুলি বিজ্ঞের মতো বলল, "সেনকাকু, এবার থেকে তাহলে তোমরা নিরুদ্দিষ্টদের বাড়ির লোকজনকে কাগজ, টিভির সাথে সাথে এফ- এম রেডিওতেও বিজ্ঞাপন দিতে বোলো।" সবাই হেসে উঠল।

তারপর আর কী? অনেক নাচাগানা, আনন্দ- ফুর্তি, খাওয়া- দাওয়ার মধ্য দিয়ে পার্টি সারা হল। যাবার আগে মিঃ সেন এই ঘটনার তিন নায়ক- নায়িকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তারা বড় হয়ে কী হতে চায়।

"আমি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হব", সুমিত বলল। অভিমন্যুর ইচ্ছে, সে ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার আর ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার হবে।

"আর আমাদের পিন্ট সাইজের সত্যান্বেষী?"

সবার কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে তুলি কিন্তু কী যেন ভেবেই চলেছে। শেষে প্রায় নিজের মনেই ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি সোনার কাঠি খুঁজব।"

“সোনার কাঠি খুঁজবে?” কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকার পর মিঃ সেন হো হো করে হেসে উঠলেন, “মানে গোয়েন্দা হবে? বাঃ, বাঃ! তদ্দিনে এই কাকুটা হয়তো চাকরিতে থাকবে না। তবু তুমি আমার কাছে এস, আমি সাহায্য করব।”

পরিণতি

চলো এবার দেখে আসি যাদুর ঝাঁপি চড়ে – কী ঘটছে এখন থেকে বছর বারো পরে। অভিমন্যু সাব- এডিটর জার্নালিজম প’ড়ে। সুমিত এখন ‘বোসন’ নিয়ে ‘সার্ন’- এ রিসার্চ করে। সেদিনের সেই ছোট্ট তুলি আজকে পাক্কা ‘লেডি’। ডাক পড়লেই যাবার জন্যে গাড়িও আছে রেডি। তবে কী, তার কাজটা তো সেই সোনার কাঠি খোঁজা – বোবাকাঠি হঠিয়ে মনের হালকা করা বোঝা। গোয়েন্দা নয়, তুলি এখন শিশুর কাউন্সিলার। ওদের কাছে তুলি আন্টি বেজায় পপুলার।

এখন সবার জীবন যেন ফোর্থ গীয়ারে, তাই ইঁদুর দৌড়ে ছোটোদেরও কোনও রেহাই নাই। অঙ্ক, ড্রইং, ক্রিকেট, গীটার – চাপের ঘুর্ণিঝড়ে ছুটতে গিয়ে মন কখনও মুখ থুবড়ে পড়ে। ছুটতে ছুটতে পড়ে গিয়ে শরীরে চোট পেলে আঘাত কোথায় লেগেছে তার খোঁজ সহজেই মেলে। মনের আঘাত খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়। ছোট ছোট বুকের ভেতর জমতে থাকা ভয় একদিন মন অবশ করে। পারফরমেন্স ডাউন। ফ্যালফেলিয়ে বসে থাকা ঠিক যেন এক ক্লাউন। “কী হল রে? তুই তো পারিস, আর একটু পড়।” তাতেও কোনও কাজ না হলে টিটকিরি, কিল, চড়। তবুও যদি কেস গুবলেট, বেবাক ফন্দি ফাঁক, তখন পড়ে লেক টাউনের তুলি আন্টির ডাক।

তুলি এসে দরদ দিয়ে সমস্যাটা বোঝে। খুদের সাথে ভাব করে সে সোনার কাঠি খোঁজে। কোথায় ব্যথা খুঁজে পেলে স্নেহের পরশ লাগায়। ভরসা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে অসার মনকে জাগায়। বলে – ভয়কে যত দেখায় অতটা সে নয়, ছুটতে গেলে ছাড়তে হবে হোঁচট খাবার ভয়। পরীক্ষা ফেল হয়েও জেনো নোবেল পাওয়া যায়। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলো তোমার দুনিয়ায়।

ভবিষ্যতের গপ্পোটুকু বিশ্বাস না হলে – বছর বারো ধৈর্য ধরো, দেখবে কেমন ফলে!

চল যাই ঘুরে

দেবাশিস সেন

গুপীবাঘাকে আমার বড্ড হিংসে হয়। ভূতের রাজার বরের জোরে কেমন যেখান খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে। আমারো তো ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়তে -- বনেতে, পাহাড়ে, মরুপ্রান্তরে। কিন্তু কী করব, আমার তো আর ওদের মত জাদু জুতো নেই! আর মানিব্যাগটাও সবসময় সহযোগিতা করেনা। তাও মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। দ'ুচোখ আর হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করি প্রকৃতি, মানুষ, জীবজন্তু .....। আর লেন্সবন্দি করি মুহূর্তগুলিকে ... ভবিষ্যতে স্মৃতিরোমন্থনের জন্য। রইলো এখানে তারই কয়েক ঝলক।

তাজপুর সমুদ্র সৈকত। দীঘা, পুরীর তুলনায় পর্যটকের সংখ্যা কম, তাই লাল কাঁকড়ার দল অনেকটাই নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে দেখা যায় চলমান লাল চাদর। কাছাকাছি গেলেই অবশ্য বোল্ট, লুইসদের গতিতে ঢুকে পড়ে গর্তে। কপালজোরে দলছুট এই কাঁকড়াটি পেয়ে গেছলাম ক্যামেরার নাগালে। অনেক সময় নিয়ে অতি সন্তর্পণে পৌঁছে গেছলাম ওর কাছে। গর্তে ঢুকে যাবার আগের মুহূর্তে শিকার করলাম ওকে। ক্যামেরায়।

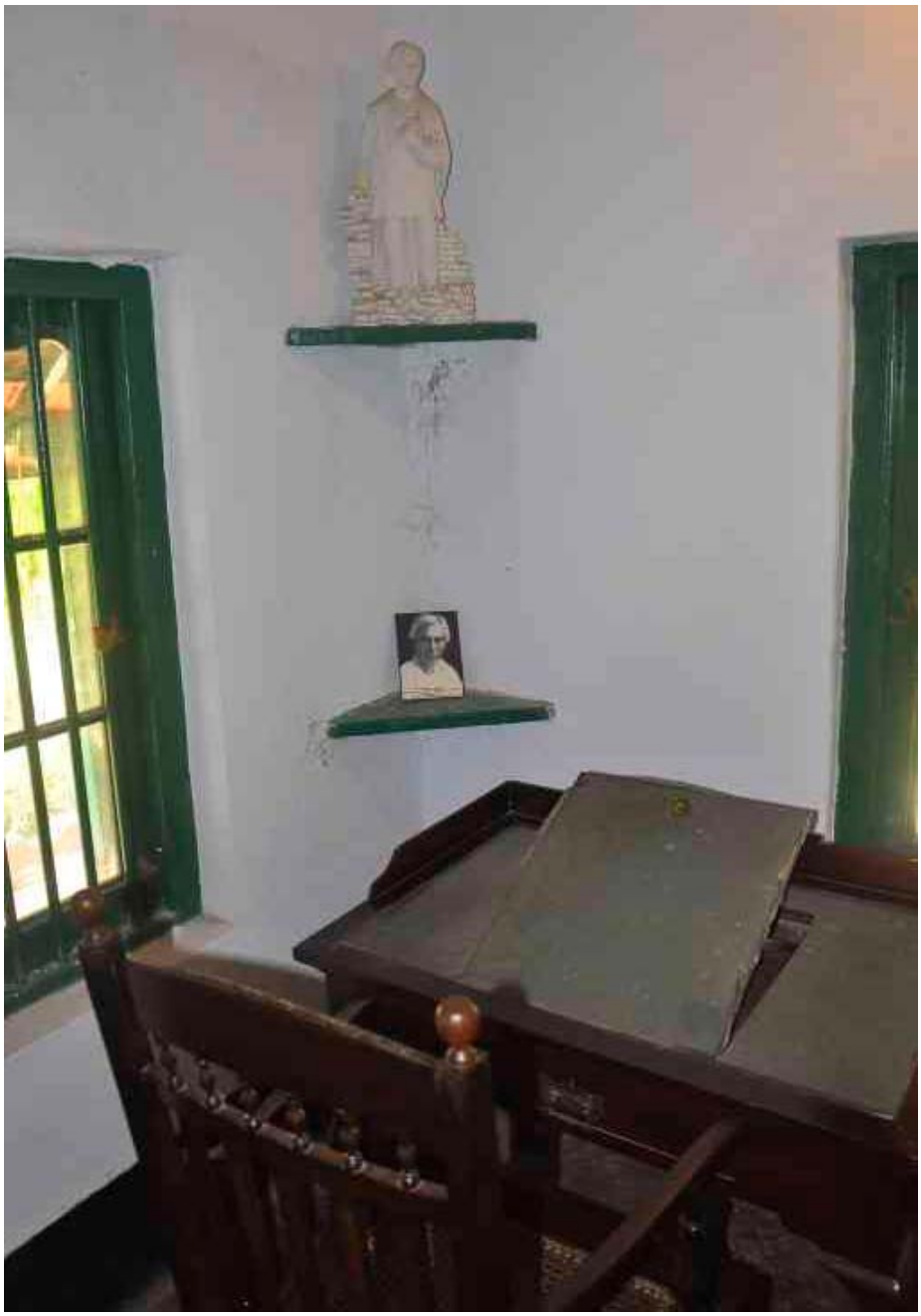

খুব সাদামাটা একজোড়া টেবিল ও চেয়ার। কিন্তু এদের ইতিহাস জানার পর সকলেরই শ্রদ্ধায় মাথা নত হবে। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। ছোটবেলার স্কুলের ক'জন বন্ধু সপরিবারে একদিনের ছুটি কাটাতে এসেছিলাম কলকাতার খুব কাছে, দেউলটিতে। নিরালা রিসর্টে। কাছেই সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণের পারে অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ওখানেই থাকতেন তিনি। দোতলা বাড়ি। লাল টালির ছাদ। বিভিন্ন ঘরে রয়েছে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত খাট, বিছানা, গড়গড়া, চটি, চরকা, ঠাকুরের সিংহাসন, আলমারি ইত্যাদি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিপ্লবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আস্তানা ছিল এই বাড়ি। পরিষ্কার ছিমছাম যত্নে রাখা। মন ভরে যায়। কিন্তু এই টেবিল চেয়ারের সামনে এসেই শরীরে কাঁটা দিয়েছিল। এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন বিপ্রদাস সহ বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প। মনে প্রবল ইচ্ছে থাকলেও স্পর্শ করিনি ওদের। কল্পনায় ছবি আঁকলাম ..... ওই চেয়ারে বসে তিনি লিখছেন ..... আপনমনেই প্রণাম জানালাম।

বীরভূমের গড়জঙ্গল। লাল মোরাম বিছানো পথ। চার পাশে শাল, সেগুন ও আরো কত জানা অজানা মহিরুহর জঙ্গল। তির ধনুক হাতে শিকার উৎসবে সামিল স্থানীয় কজন অদিবাসী। শান্তিনিকেতনের খুব কাছেই এই অঞ্চলের ইতিহাস বহু প্রাচীন। পুরাকালে এই অঞ্চলের নাম ছিল মেধসাশ্রম, মেধস মুনির শিক্ষাকেন্দ্র। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের নাম হয় গড়চন্ডীধাম। এখানেই রচিত হয়েছিলো শ্রী শ্রী সপ্তসতী চন্ডী, দেবীমঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, মঙ্গলচন্ডী, ধর্মমঙ্গল, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি। রাজা সুরথ বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন এখানেই। এখানেই রয়েছে রাজা ইছাই ঘোষের দুর্গামন্দির, শ্যামরূপা মন্দির। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরাণী, জয়দেব, লক্ষণ সেন, ফুল্লরা, চাঁদ সদাগর .....। ইতিহাস আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মিলে মিশে রয়েছে এখানেই।

দীঘার সমুদ্রতীরে জনজোয়ার। কাছেই মোহনা। পর্যটকরা সেখানেও যান। উত্তাল সমুদ্র দেখতে। নয়তো ট্রলার থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা ইলিশ, চিংড়ি, ভেটকি পাইকারি দরে কিনতে। কিন্তু এদের কি কেউ একবার দেখেন? সারা দিন রাত জীবনমৃত্যুর সুতোয় ভর করে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে পাইকারি বাজারে নিয়ে আসেন যাঁরা ?

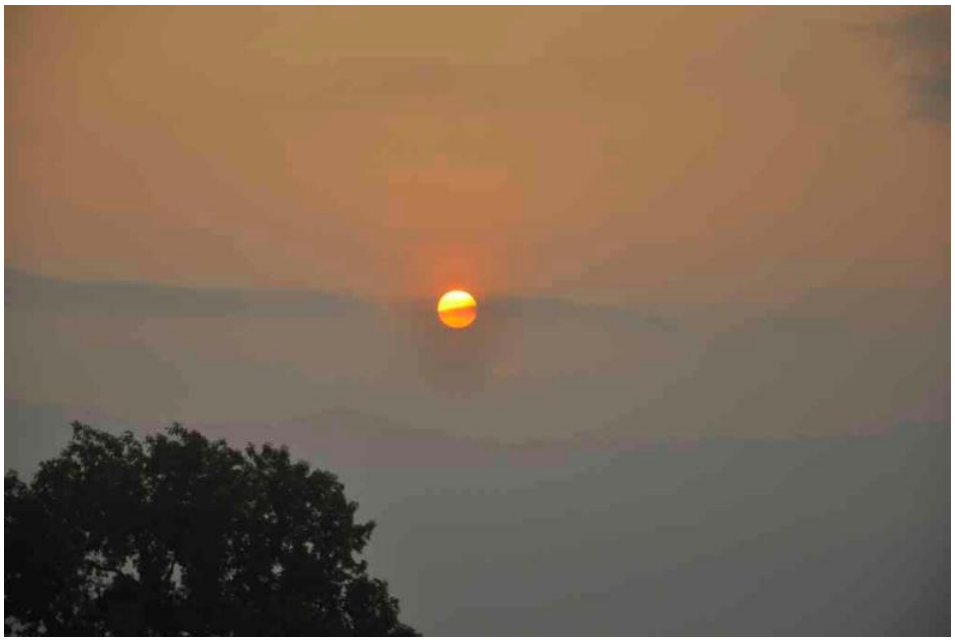

ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়। সামনে মেঘ কুয়াশায় ঢাকা সবুজ পাহাড়ের সারি। ওদিকেই মিজোরাম। বাতাসে হাল্কা শীতের আমেজ। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মেঘ পাহাড়ের বাধা টপকে সূর্যদেব দেখা দিলেন। সমুদ্রে, তুষার শৃঙ্গে, কংক্রিটের জঙ্গলের ফাঁকে দেখেছি সূর্যোদয়। কিন্তু সুর্যের শরীরে একসঙ্গে তিনটি রং কখনো দেখিনি। সাদা, হলুদ, লাল রংএ নিজেকে সাজিয়ে জম্পুই হিলস এ সূর্যের উদয় ভুলবনা কখনো।

শান্তিনিকেতনের কাছেই অজয় নদীর তীরে রাজা ইছাই ঘোষের দেউল। পাল রাজত্বের শেষভাগে এই অঞ্চলের এক সামন্ত ছিলেন রাজা ইছাই ঘোষ। দুশো ফিট উচ্চতার পোড়া মাটির ইটের তৈরি এই মিনারটির প্রস্থ পঁচিশ ফিট। উপর দিকটি সামান্য সরু। দেউলটির শরীরে কিছু দেবদেবী, ফুল ইত্যাদির কারুকাজ রয়েছে। ভেতরে রয়েছে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। অবশ্য ইছাই ঘোষ এই মিনারটি তৈরি করেছিলেন দেবী ভগবতীর জন্য।

তিস্তার পাড়ে জলপাইগুড়ি শহর। ডুয়ার্স যাবার পথে এক সহকর্মীর বাড়ি জলপাইগুড়িতে ছিলাম দিনদুয়েক। এক সকালে চলে গেলাম তিস্তার পারে। শান্ত নদী। ধনুকের মত বাঁকা এক চমৎকার সোনালী সৈকত। ঘন্টার পর ঘন্টা এই শান্ত নদীতীরে বসে থাকা যায়। নিরাপদ নৌকাযাত্রাও করা যায় নদীর বুকে। কিন্তু আমার সহকর্মীর কাছে ১৯৬৭ এর ভয়াবহ বন্যার গল্প শুনে শিউরে উঠে ছিলাম। সেদিন এই শান্ত তিস্তা হয়ে উঠেছিল ভয়ংকরী।

দমদম থেকে আগরতলা। ছোট্টো বিমানসফর। মাঝ আকাশে বিমানচালকের ঘোষণায় জানতে পারলাম নিচে বাংলাদেশ আর নদীটি পদ্মা। পূর্বপুরুষের দেশটির প্রথম দর্শন ..... শরীরে শিহরণ। আর এত উঁচু থেকেও পদ্মার বিশালতা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ।

লঞ্চে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি সুন্দরবনের নদীতে, খাড়িতে। সবার উদগ্রীব দৃষ্টি পাড়ের জঙ্গলের দিকে --- যদি একবার দেখা দেন দক্ষিণরায়। শেষবেলায় খাড়ি থেকে বড়ো নদীতে। দুপাশের বন অনেক দূরে। হঠাৎ চালক মাঝনদী থেকে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন পাড়ের দিকে। বাঘ দেখার আশায় সকলেরই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। কিন্তু না। জঙ্গল আর নদীর মাঝখানে একটা ছোট্ট ঘাসজমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারো তেরোটির এক চিতল হরিণের দল। মনে মনে একটাই প্রার্থণা করলাম --- এই মুহূর্তে দেখতে চাইনা দক্ষিণরায়কে। তাহলেই যে পরবর্তী ছবিটা হয়ে যাবে রক্তাক্ত।

ডুয়ার্সের জয়ন্তী নদী। চওড়া নদীখাচের মাঝখানে সরু কিন্তু খরস্রোতা জলের ধারা। ওপারেই সবুজ ভুটান পাহাড়। প্রকৃতির মাঝে রসভঙ্গের মত দাড়িয়ে আছে কয়েকটি ট্রাক।

মানুষের তৈরি দুটি অপূর্ব স্থাপত্য। সবুজদ্বীপ এলিফ্যান্টা থেকে ফেরার পথে ক্যামেরার লেন্সে একটা ফ্রেমে পেয়ে গেলাম তাজ হোটেল ও গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, মুম্বাই শহরের দুটি দর্শনীয় গর্ব।

যতই ঘুরি দেশের আনাচে কানাচে -- কদিন পরেই মন টানে ফিরে আসার জন্য --- আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর কলকাতা -- আমার কলকাতায়। আমার জন্ম আসামের ডিগবয়ে, শৈশব কৈশোর কেটেছে আসামেরই আরেক শহর দুলিয়াজানে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বছরে একবার ছুটিতে কলকাতায় আসার জন্য ছটফট করতাম। গত চার দশক ধরে এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে, শহরের নানান অসুবিধেকে নিত্যসঙ্গী করেও ভালোবাসা কমেনি একছিটেও। এই কংক্রিটের জঙ্গল, মাঝেমধ্যে হাল্কা সবুজের ছোঁয়া, দ্বিতীয় হুগলী সেতু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ---- ---- আজীবন থাকতে চাই এ শহরেই।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

অলোকপর্ণার বিড়াল

রোহণ কুদ্দুস

কৌতূহলবশত মিনিমিনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে মিঠিদিদিকে অনুসরণ করল অলোকপর্ণা। বসার ঘরের পাশেই সজ্জনবাবুর ছোট স্টাডি রুম। টেবিলে একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার। টেবিলের এক প্রান্ত থেকে ঝুলছে একটা কিবোর্ড। চেয়ারের পাশে মেঝেতে হতভম্ব মুখে পড়ে আছে জেলি ঘোষাল। তার পাশে উলটে আছে একটা ব্লু-টুথ মাউস। মিঠিদিদি ঘরে ঢুকে জেলি ঘোষালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, "কী রে! লেগেছে?" সে কোনও রকমে উঠে বসে দরজার বাইরে তাকাল। অলোকপর্ণা দরজার চৌকাঠে, তার পায়ের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে মিনিমিনি। এর আগে সে বিড়াল একেবারেই যে দেখেনি, তা নয়। কিন্তু এ বাড়িতে এর আগে কোনও মার্জারের পদার্পণ ঘটেনি। তাই এই নতুন অতিথির সঙ্গে ঠিক কীরকম ব্যবহার করা যায়, সেটাই সে ভাবতে শুরু করল। মিঠিদিদি ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করলেন। তাই জেলি ঘোষালকে সামান্য কড়া গলায় বললেন, "ওকে একদম বিরক্ত করবে না। ও আমাদের গেস্ট।"

ততক্ষণে সজ্জনবাবু ড্রয়িংরুম থেকে আবার হাঁক পাড়লেন, "জেলি-ই-ই-ই।" সে অলোকপর্ণা আর মিনিমিনিকে পাশ কাটিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে হাজির হল তাঁর কাছে। সজ্জনবাবু তার ঝোলা কান ধরে একটু আদর করে দিলেন, "আবার কী দুষ্টুমি করেছিস? কম্পিউটার ঘাঁটছিলি?" জেলি ঘোষাল জুলজুল করে তাকিয়ে রইল কিছু না বলে। মিঠিদিদি ততক্ষণে কিবোর্ড আর মাউসটা টেবিলের ওপর তুলে রেখে অলোকপর্ণাকে বললেন, "ও যে সারাক্ষণ কম্পিউটারে কী খুটুর-খুটুর করে কে জানে।"

অলোকপর্ণা একটু অবাক হয়ে বলল, "ওকে আপনারা কিছু বলেন না? যদি কিছু খারাপ করে ফেলে?" মিঠিদিদি ফিক করে হেসে বললেন, "কিছু খারাপ করে ফেলার মতো বুদ্ধি যদি জেলির থাকত, তাহলে কবেই ও নিজের ফেসবুক এ্যাকাউন্ট খুলে ফেলত।" তারপর অলোকপর্ণাকে তাড়া দিলেন, "মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে নাও। মুখচোখ শুকিয়ে গেছে। সকাল থেকে কিছু খাওনি নিশ্চয়?"

অলোকপর্ণার পেট চুঁইচুঁই করছে খিদেতে। সেই কোন সকালে কুকি খেয়েছিল প্রোফেসর টফির বাড়ি। এখন পেটে ছুঁচো ডন দিচ্ছে। তবু ভদ্রতা দেখিয়ে বলল, "না, না, ঠিক আছে। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

মিঠিদিদি ছদ্মরাগ দেখালেন, "আর পাকামি করতে হবে না। কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। আজ এমনিতেই তিন-চারজনের এখানে লাঞ্চ করার কথা ছিল।" তারপর সজ্জনবাবুর দিকে ইশারা

করে বললেন, "ইনি সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছেন পায়ে সেঁক দেওয়ার বাহানায়। বাথরুম ঐদিকে। মুখহাত ধুয়ে এসো। আমরা খেতে বসি।"

খেতে বসে অলোকপর্ণার দিকে একবার দেখে নিয়ে সজ্জনবাবু প্রোফেসর টফিকে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো তো।" ভাতের সঙ্গে কিছুটা উচ্ছেভাজা মেখে মুখে গ্রাস ঢোকালেন, "এডকাল পলে হডাট উডয় হলে..." তারপর নিজের উচ্চারণে সামান্য লজ্জা পেয়ে মুখের খাবারটা জলদি শেষ করলেন। তারপর আবার প্রশ্নটা করলেন, "এতকাল পরে হঠাৎ উদয় হলে আমার বাড়ি। বিশেষ কোনও ব্যাপার আছে, নাকি এই মেয়েটিকে চিড়িয়াখানার বাঘ-ভাল্লুক দেখানোর মতো করে আমায় দেখাতে এসেছ।"

প্রোফেসর টফি মুড়িঘণ্ট দারুণ ভালোবাসেন। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে নেড়ে তা- ই উপভোগ করছিলেন। সজ্জনবাবুর প্রশ্নটা তাই পুরোটা না শুনলেও আন্দাজ করলেন। তাই মিটিমিটি হাসিমুখে বললেন, "আমরা জেলি ঘোষালের সঙ্গে তোমার কথপোকথনের ব্যাপারটা কেমন করে শুরু হয়েছিল সেটা জানতে চাই। কারণ..." অলোকপর্ণা তাঁর বাঁদিকে বসে আছে, তার দিকে হাত দেখালেন, "আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে তার বিড়াল হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। তাও আবার বাঙলাতে।" এবার টেবিলের উলটোদিকে সজ্জনবাবুর দিকে তাকিয়ে সামান্য থমকালেন। তিনি একবার প্রোফেসর টফিকে আর একবার অলোকপর্ণাকে সরু চোখে দেখছেন। প্রোফেসর টফি তাই যোগ করলেন, "অলোকপর্ণার সন্দেহ ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা। তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম। যদি তুমি জেলি ঘোষালের সঙ্গে তোমার কথাবার্তার ধরনটা আমাদের জানাও, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে অলোকপর্ণার মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে কিনা।" তারপর সজ্জনবাবুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভাতের সঙ্গে পোস্ত- আলু মাখতে মাখতে বললেন, "বা তোমাদের দুজনের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে কিনা।" মিঠিদিদি এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে চুপচাপ খাচ্ছিলেন। প্রোফেসর টফির শেষ কথাতে ফিক করে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমার বন্ধুর মাথা সুস্থ- স্বাভাবিক থাকলে আমাদের সঙ্গে কোনওদিনই জেলি ঘোষালের দেখা হত না।" এরপর কিছুটা মিঠিদিদির মুখে আর কিছুটা সজ্জনবাবুর থেকে গল্পটা শোনা গেল।

সজ্জনবাবু প্রায়ই একসঙ্গে প্রচুর জিনিস কিনে বাড়ি ফেরেন। ভুল বলা হল। তিনি একই জিনিস প্রচুর পরিমাণে কিনে বাড়ি ফেরেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়তো রাস্তায় দেখলেন, এক ফেরিওয়ালা বাঁশের কঞ্চির তৈরি ছোট চরকি বিক্রি করছে। তার থেকে প্রায় কেউ সেই খেলনা কিনছেই না। সজ্জনবাবু এগিয়ে যাবেন, "তা হ্যাঁ গো ভালোমানুষের পো, এই চরকির দাম কত?" হয়তো জানা গেল দাম পাঁচ টাকা। সজ্জনবাবু তাঁর বাহারি দাড়িতে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, "এই পাঁচ টাকায় তোমার আর কী লাভ থাকে? তৈরি করতেই তো খরচ হয় বোধ হয় তিন- চার টাকা।" চরকিওয়ালা সুযোগ বুঝে তার দুঃখের সাতকাহন শোনাতে শুরু করে। শেষে দেখা যায়, সজ্জনবাবু শ দুয়েক চরকি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। আর তাঁর পেছনে মিছিল করে আসছে পাড়ার শ চারেক কুকুর। ব্যাপারটা বেশ দর্শনীয় সন্দেহ নেই। গোলাপি-

সবুজ দাড়ির একজন মানুষ নকশাদার জোব্বা পরে কাঁধে একটা বাঁশের লাঠিতে গুচ্ছ গুচ্ছ কঞ্চি আর বাহারি কাগজের চরকি নিয়ে হেঁটে চলেছেন। পেছনে শোভাযাত্রা করে চলেছে নানা রঙের ও নানা আকারের কৌতূহলী কুকুরের দল।

একবার তো শখানেক বাঁশের চোঙের ফুলদানি কিনে এনে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলেন। দেখা গেল, নিমন্ত্রণ পেলেই জন্মদিন বা বিয়ে বা অন্নপ্রাশনে সজ্জনবাবু গিয়ে হাজির হচ্ছেন ফুলদানি নিয়ে। এমনিতে ফুলদানিগুলো বেশ দর্শনীয়, বাঁশের চোঙের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা। কিন্তু কাঁহাতক আর একই উপহার দেওয়া যায় সবাইকে! এমনকী তাঁদের নিয়ে আড়ালে এই নিয়ে হাসাহাসিও শুরু হয়েছিল। তাই বাইরের নিমন্ত্রণে ওই উপহার দেওয়া বন্ধ হল। কিন্তু এরপর বাড়িতে যারা দেখা করতে আসতেন, তাঁরা পেতে শুরু করলেন সজ্জনবাবুর ফুলদানি।

তা একবার এইভাবেই সজ্জনবাবু দু বস্তা কাঁঠালি কলা কিনে নিয়ে এলেন। কলা তো আর চরকি বা ফুলদানি নয়, যে রয়ে- সয়ে মানুষজনকে দেওয়া যাবে। তাই কিছু কলা এই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটগুলোর মানুষজনকে দেওয়া হল। অতিথিরা কিছু কলা পেলেন। এমনকী গোপাল তখন সদ্য কাজে লেগেছে। সেও স্পিডপোস্ট করে নদীয়ায় তার বাড়িতে একছড়া কলা পাঠিয়েছিল। কিন্তু দু- তিনদিন পরেও অর্ধেকের বেশি কলাই পড়ে রইল। বোঝাই গেল, সেগুলো নষ্ট হবে। সজ্জনবাবু নাছোড়বান্দা। অত কলা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলে সেগুলো পচবে। তার ওপর মাছি বসবে। তার থেকে নানা রকম রোগ ছড়াবে। তাই নিজে দায়িত্ব নিলেন কলা সাবাড় করার। ব্রেকফাস্ট- লাঞ্চ- বিকেলের টিফিন- ডিনারে শুধুই কলা। একটা বড় মিক্সিতে দুধ আর কলা মিশিয়ে তৈরি হতে লাগল ঢালাও বানানা- মিল্কশেক। মিঠিদিদি অনেক বারণ করলেন, "পেট খারাপ হবে। বদহজম হবে।" সজ্জনবাবু মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন, "তাহলে কি বলতে চাও, গ্রাম-বাংলায় ওঝারা সাপগুলোকে লাঞ্চে পেঁপে- কাঁচকলার ঝোল খাওয়ায়? দুধ- কলা খেলে পেট ঠান্ডা থাকে।"

প্রথম রাতেই পেট গরম হল। দুধ আর কলা মিলে পেটের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে দিল। কিন্তু সে কথা তো আর মুখ ফুটে মিঠিদিদিকে বলা যায় না। দু- তিনবার চুপিচুপি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সজ্জনবাবু ঠিক করলেন ছাদে যাবেন। ঠান্ডা হাওয়ায় মাথা ঠান্ডা হলে হয়তো পেটও ঠান্ডা হবে।

"তা ছাদে গিয়ে সামান্য ভয় পেয়ে গেলাম। একটা বিচিত্র আওয়াজ আসছে এক কোণ থেকে। ফড়ফড়, ফড়ফড়।" সজ্জনবাবু মনোযোগ দিয়ে মাছের কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন,"ভূতের ভয় আমার কোনওদিনই নেই। যদিও ভূত কখনও ফড়ফড়িয়ে ভয় দেখায় না। তারা বড়জোর খটখট করে বা মচমচ করে। আসলে আওয়াজটা হচ্ছিল আমার ঘুড়িটা থেকে। সেটা ছাদের ওপর ঝুলিয়ে রাখা কাপড় শুকোতে দেওয়ার দড়িতে আটকে গিয়েছিল।"

কম্পিউটারের সামনে বসে জেলি ঘোষালও ওদিকে একই গল্প শোনাচ্ছিল মিনিমিনিকে। "ঘুড়ির সোলার প্যানেলগুলো ঠিকই কাজ করছিল, কিন্তু দিনের বেলা মেঘলা থাকায় ব্যাটারিগুলো ঠিকমতো চার্জড হয়নি। তাই রাতে ওড়ার ব্যাপারটা একটু ঝুঁকির ছিল। বিশেষত এই গ্রহে আমার ন্যাভিগেশান সিস্টেমটাও কাজ করছিল না। তবু আমি একরকম জোর করেই বলা যায়

মিস্টার আই- কে খুঁজছিলাম।” মিনিমিনির মাথায় কিছুই ঢুকল না। সে তাই জিজ্ঞাসা করল,“আর একবার বুঝিয়ে বল।”

জেলি ঘোষাল খটাখট টাইপ করল কম্পিউটারের কিবোর্ডে। তারপর গুগল ক্রোমের একটা উইন্ডোতে দেখাল, “এই দ্যাখ, এটা হল মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। এতে হাজার হাজার তারা আছে।” মিনিমিনি অবাক হয়ে কালোর ওপর সাদা রঙের সেই চাকার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

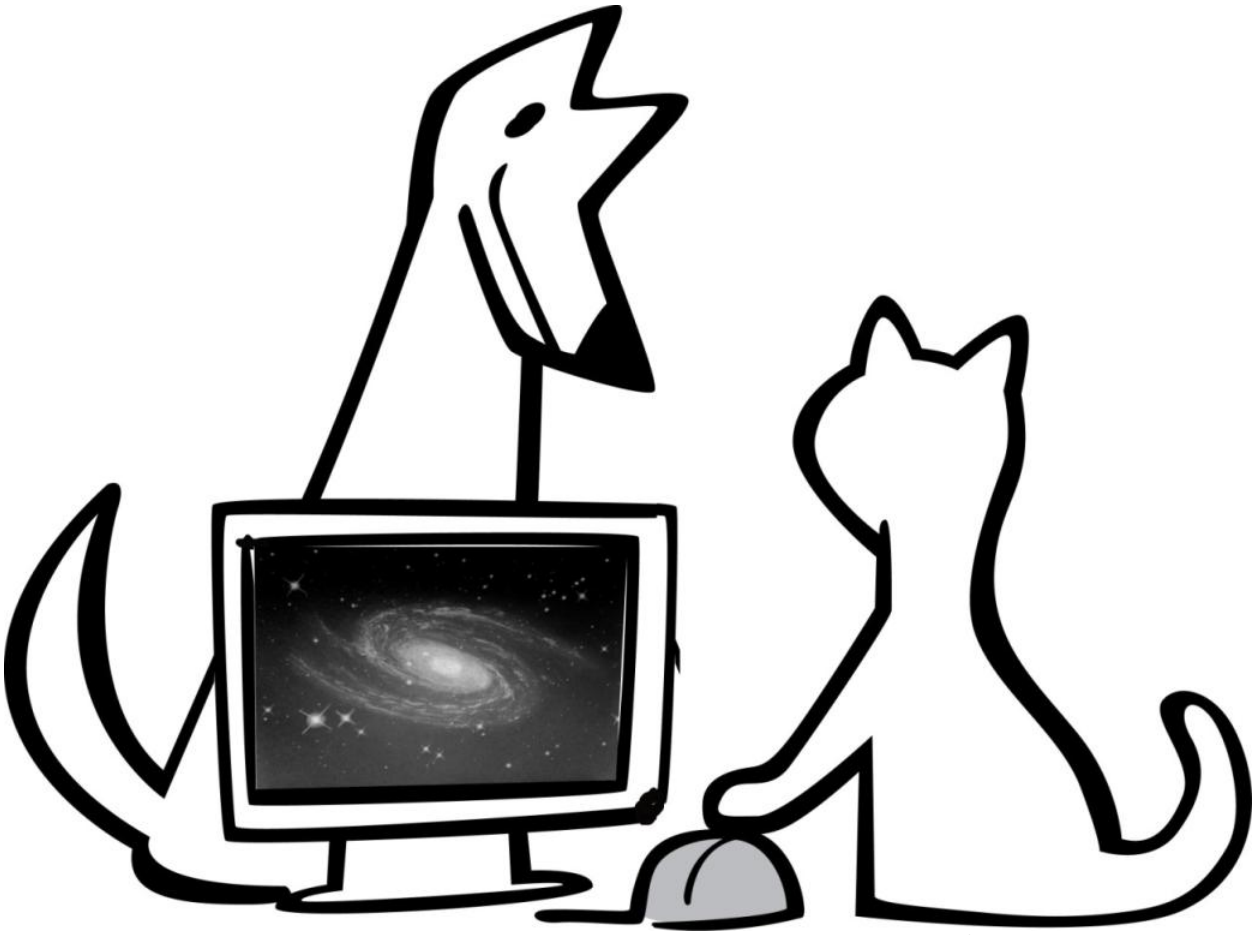

“রাতের আকাশে যে তারা দেখা যায়?” জেলি ঘোষাল মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। সেই তারার কথাই বলছি। এরকমই একটা তারা হল তোদের সূর্য। তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই গ্রহ। তোরা যাকে বলিস পৃথিবী।”

মিনিমিনি বেচারি এসব কথা শুনে হাঁ। শুধু কোনওমতে প্রশ্ন করল, “সূর্য তারা হলে রাতে কেন দেখা যায় না?” জেলি ঘোষাল মাড়ি বের করে হেসে ফেলল,“সূর্য পৃথিবীর অনেক কাছে আছে বলে সেটা খুব বেশি আলো দেয়। তাই দিন হয়। কিন্তু অন্য তারাগুলো পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে আছে। তাই সেগুলো রাতে মিটমিট করে জ্বলে।”

তারপর একটু দম নিয়ে স্ক্রিনের একটা জায়গায় মাউস ক্লিক করে জুম করল সে, “এটা হল তেমনই একটা তারা। এর নাম আলফা সেন্টাউরি। সূর্যের পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের

তারা। এই তারার কাছেই আর একটা তারা আছে জেটা ক্যাভেন্ডিস। আমি সেই তারার একটা গ্রহে থাকি। আমাদের গ্রহের নাম জুয়েলকা।"

একটু থেমে মিনিমিনির গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তোর মাথায় আদৌ কিছু ঢুকছে?" সত্যি বলতে কী, মিনিমিনির মাথাতে কিছুই ঢোকেনি প্রায়। সে তবু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল,"হ্যাঁ। হ্যাঁ। কিছুটা তো বুঝতেই পারছি।" জেলি ঘোষাল উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করল, "আসলে আমাদের গ্রহে দুটো কোর- ব্যাটারি ছিল। আমাদের গ্রহের পেটের ভেতর যে কোর অংশ, যেখানে লাভা- ম্যাগমা ফুটছে, সেই কোরের তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা এই ব্যাটারিগুলোর কাজ। একটা ব্যাটারি যখন কাজ করে, তখন অন্যটা তোলা থাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। বছর দশেক পরপর ব্যাটারি বদলানো হয়। কিন্তু শেষবার ব্যাটারি বদলানোর সময় জবুঙ্গা নামের এক বদমাশ বিশ্বাসঘাতক আমাদের গ্রহ থেকে একটা ব্যাটারি চুরি করে পালিয়ে যায়। তার ঘুড়ির ট্রাজেক্টরি আর ন্যাভিগেশান হিস্ট্রি দেখে আমাদের প্রধান বিজ্ঞানী লপা লতুরা জানিয়েছিলেন, জবুঙ্গা পৃথিবীতে পালিয়ে এসেছে। কারণ বসবাসযোগ্য গ্রহ বলতে কাছাকাছির মধ্যে পৃথিবীই আছে।" জেলি ঘোষাল এবার থেমে একটু মিটিমিটি হেসে বলল, "আমি জানি এরপর তুই জিজ্ঞাসা করবি, আমাদের গ্রহের কোর- ব্যাটারি পৃথিবীতে নিয়ে এসে জবুঙ্গা করবেটা কী।"

মিনিমিনি ঘাড় নেড়ে বলল, "ঠিকই। আমি সেটা জিজ্ঞাসা করতেই যাচ্ছিলাম।" বেচারি মনে মনে বলল, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না ঠিক করে। এ ব্যাটা বোধ হয় মাঝে মাঝেই তাড়ি খায়।"

দুম করে তাড়ির কথাটা এলই যখন, গল্পটা শুনিয়ে রাখি। আসলে এর আগে মিনিমিনি তার পাড়ার কুকুরগুলোকে একবার তাড়ি খেতে দেখেছিল। একদিন ভোরে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ বাইরে থেকে একটা হইহই আওয়াজ কানে এল। যদিও তখনও মিনিমিনির ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়নি, কিন্তু কুকুর আর মানুষের গলা একসঙ্গে শুনে সে কান খাড়া করল। কুকুরগুলোর গলা কেমন সন্দেহজনক ঠেকছে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে এসে দেখল। তিনটে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তাদের পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। তাদের পেছনে লাঠি উঁচিয়ে ছুটছে একদল খাকি পোশাক পরা মানুষ। মাঝারিও বেরিয়ে এসেছিল আওয়াজ শুনে। সে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল, "যে লোকগুলো আগে দৌড়চ্ছে, ওরা রিকশাভ্যানের ওপর বড় বড় ড্রামে কীসব আনছিল। পেছনের লোকগুলো এদের দেখে দৌড়ে আসছে দেখে ছুরি বের করে ড্রামগুলো ফুটো করে পালিয়ে যাচ্ছে।" মিনিমিনি দেখল কালো কালো ড্রাম থেকে হাল্কা হলুদ রঙের তরল বেরিয়ে পিচ রাস্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট গর্তগুলোতেও কিছুটা করে তরল জমা হয়েছে। পাড়ার কুকুরগুলো মজা দেখতে জড়ো হয়েছিল। এখন তারা রাস্তা চেটে চেটে খাচ্ছে। চারদিকে উৎকট গন্ধে টেকা দায়। খেটে খাইও কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে। মিনিমিনি আর মাঝারিকে সে জ্ঞান দিল, "ওটাকে তাড়ি বলে। কুকুরগুলো চেটে খাচ্ছে এখন। দ্যাখ একটু পরে কী করে।" মাঝারি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুই কী করে জানলি

এসব?" খেটে খাই মুচকি হাসল, "আমি মানুষগুলোকে খেতে দেখেছি।" বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই দেখা গেল, কুকুরগুলো হাঁটতে গিয়ে টলে টলে এ- ওর গায়ে পড়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই সুর করে ডাকছে, "ভেউ- উ! ভেউ- উ! হিক! হিক! ভেউ- উ!" সে কথা মনে পড়ে যেতেই মিনিমিনি ফিক করে হেসে ফেলল।

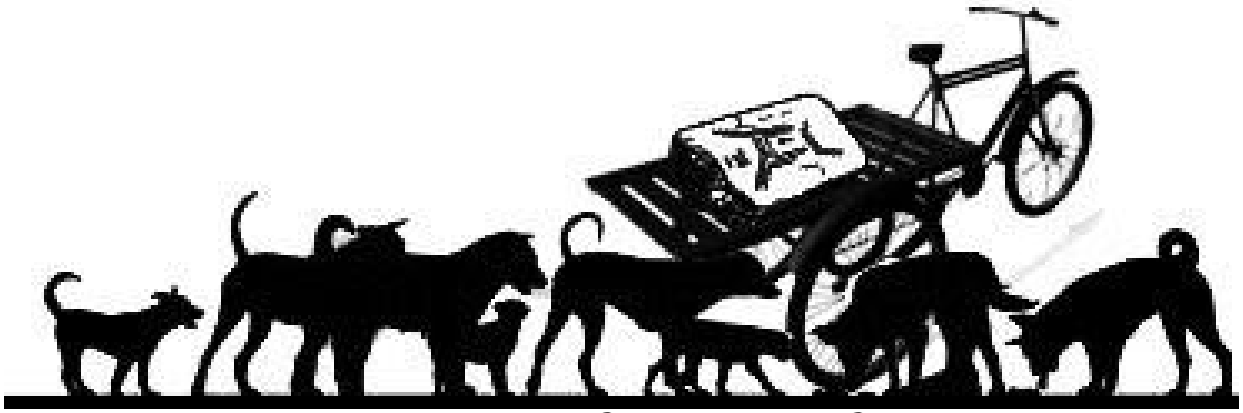

জেলি ঘোষাল ওদিকে শোনাচ্ছিল, পৃথিবীর হাল- হকিকত কীভাবে তাদের গ্রহে বসে জানা যায়। জুয়েলকাকে প্রদক্ষিণ করছে বেশ কয়েকটা উচ্চ গ্রাহকশক্তির এ্যান্টেনা। তারা সোয়া চার আলোকবর্ষ দূরের পৃথিবীর ওপর নজর রাখে। এমন সময় মিনিমিনিকে হাসতে দেখে সে বেশ বিরক্ত হল, "বিশ্বাস হচ্ছে না তো? পৃথিবীর বাসিন্দাদের এই তো সমস্যা। এত পিছিয়ে আছিস সবদিক থেকে, তাই উন্নত কিছু ব্যাপার- স্যাপার শুনলেই হেসে উড়িয়ে দিতে চাস।"

মিনিমিনি একটু থতমত খেল, "না, না, আমি তো অন্য একটা ব্যাপারে... মানে... আচ্ছা বল, তোদের ব্যাটারি জবুঙ্গা পৃথিবীতে এনে কী করবে?" জেলি ঘোষাল চিন্তিত মুখে বলল, "জবুঙ্গা পালিয়ে যাওয়ার পরে তার কমিউনিকেশান লগ থেকে যতটা জানা গেছে, তাতে সে এই ব্যাটারি পৃথিবীতে মিস্টার আই নামের কাউকে দিতে চায়।" মিনিমিনি কৌতূহলী হল, "কেন?" জেলি ঘোষাল বলল, "এই মিস্টার আইয়ের ওপর ভার দেওয়া ছিল পৃথিবী সামলানোর। হয়েছিল কী, সেই ভদ্দরলোক কয়েকশ বছর আগে সামান্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন কয়েক শতাব্দী পরে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখে, পৃথিবী রসাতলে যেতে বসেছে। ওজোন লেয়ারের ফুটো, গ্রিন হাউস এফেক্ট, বন- জঙ্গল ধ্বংস, মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাওয়া, সব মিলিয়ে তার ঘুমের সুযোগে তোরা সবাই মিলে এই পৃথিবীতে একটা জঘন্য ব্যাপার করেছিস। তাই জুয়েলকার কোর ব্যাটারি দিয়ে পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এই মিস্টার আই চারদিকে দৃষ্টি চালিয়ে জবুঙ্গাকে বশ করেছে।" জেলি ঘোষাল নিজের লেজের দিকে দেখাল, "আমাদের সবার লেজই এরকম বাঁটকুল টাইপের। সেই নিয়ে আমাদের কোনও দুঃখও নেই। কিন্তু তোদের এই মিস্টার আই লম্বা বাহারি লেজের লোভ দেখিয়ে জবুঙ্গাকে দিয়ে চুরি করিয়েছে।" দাঁত কিড়মিড় করে উঠল জেলি ঘোষাল, "বদমাশ লোক! মিথ্যে করে আবার বলেছে সে নাকি পৃথিবীর সব প্রাণীকেই লেজ দিয়েছে। তাহলে এই যে ধেড়ে মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের লেজ কই? তুই দেখেছিস কোনও লেজওয়ালা মানুষ?" মিনিমিনি হঠাৎ লাফিয়ে

উঠল, "লেজ দিয়েছে মানে? তেমন তো একজনই আছে। তোর এই মিস্টার আই আমাদের ঈশ্বর নন তো?" জেলি ঘোষাল মিনিমিনির ইউরেকা- দৃষ্টিতে একটু থমকে গেল, "তোদের ঈশ্বর মানে? সেটা আবার কে?" মিনিমিনি হড়বড় করে বলতে লাগল, "আরে সে- ই তো সব। এই দুনিয়ার নাটের গুরু। এই যে আমার নাম আমি মিনিমিনি না বলে মিনিমিনি বলি। বা ধর এই যে আমি অলোকপর্ণার সঙ্গে কথা বলতে পারি। বা ধর এই যে তোর মতো দেখতে হাজার হাজার কুকুর এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসবের পেছনে তো সে- ই।" তারপর একটু চিন্তিত মুখ বলল, "কিন্তু বড়ই খামখেয়ালি লোক। মানুষের লেজ না থাকার কারণও সেটাই।" জেলি ঘোষাল শশব্যস্ত হয়ে তাড়া লাগাল, "সে গল্প পরে শোনাবি। আগে বল তোর এই ঈশ্বর থাকে কোথায়? এক্ষুণি দেখা করতে যেতে হবে।"

ক্রমশ

গ্রাফিক্সঃ ইন্দ্রশেখর

নেচার ক্যাম্প গজাবুরু

ডিসেম্বর ২০১৪

রিপোর্ট লিখলেনঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনক্ষণ ঠিক হতেই জল্পনা শুরু।

নেচার মানে প্রকৃতি আর সেই প্রকৃতির কোলে ধুলো মাটি মেখে কয়েকটা দিন- ক্যাম্পিং।

শুনেই সবার চক্ষু চড়কগাছ!

“প্রকৃতির কোলে মানে? ডর্মিটরি?”

“ না না ডর্মিটরি নয়, মাটিতে টেন্ট পেতে থাকা, সামনে পাহাড়, তার কোলে নদী, নদীর বুকে বাঁধ, তারও সামনে চাষের খেত, তারপর গ্রাম। গ্রামের বাইরে বেশ পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে গাছগাছালির মাঝে কদিনের আস্তানা। না, ইলেকট্রিক আলো পাখা কিস্যু নেই। অস্থায়ী টয়লেটও বানিয়ে নিতে হবে নিজেদেরই।

কিন্তু যাচ্ছি কাদের সাথে? প্রশ্নে আশঙ্কা আর কৌতূহল!

নিয়ে যাবে ভোরুকা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রাস্ট, সংক্ষেপে বি এম টি। ১৯৮০ সাল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন এরা। উদ্দেশ্য আর কিছুই না, ছেলেমেয়েগুলোকে প্রকৃতির কোলে কিছুদিন হুটোপাটি করতে দেওয়া। যাতে প্রকৃতির সবুজ ওদের মনে গেঁথে যায়। ভালোবাসতে পারে। মনে মনে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হয়ে ওঠে খুদেগুলো।

তা, কী নেই ক্যাম্পে! পাহাড় চড়া, পাখি দেখা, তারা চেনা, পাথর চেনা, গ্রামের মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাপ জমানো, বন্ধু হওয়া, জঙ্গলে ট্রেকিং করতে যাওয়া, চড়ুইভাতি... কত বলব। সারাটাদিন খালি হইহই আনন্দ। গতানুগতিক ছকবাঁধা রোজকার জীবন থেকে মুক্তি। বহুবছর ধরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছেন এঁরা। সুতরাং এঁদের সাথে বেরিয়ে পড়ায় কোনোই দ্বিধা নেই।

শুনে টুনে রাজি হয়ে গেলো জনাকুড়ি এগারো- তেরোর মা- বাবারা। কেউ কলকাতা কেউবা আসানসোল কেউ মল্লিকপুর তো কেউ বারাসাত।

প্রথম জমায়েতঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪; হাওড়া স্টেশন, নতুন প্ল্যাটফর্ম ২১ এ, রিপোর্টিং সাড়ে সাতটা, আর সেখানে –

হই হই	এলি তুই?
আয় আয়	আর কই?
রাখ রাখ	ব্যাকপ্যাক
কই তোর	রুকস্যাক
চুপ চুপ	শোন শোন
দাঁড়া দেখি	লাইনে
দেখ দেখ	কই ট্রেন
বাঁয়ে নাকি	ডাইনে

নড়ে উঠল আদ্রা চক্রধরপুর এক্সপ্রেস। রাত এগারটা পাঁচ। কেউ খেয়ে এসেছে, কারো খাওয়া মিটল ট্রেনে, এবারে সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতর।

পরদিন সতেরোঃ

ট্রেনও থেকে ভোর হওয়া দেখতে যে কী দারুণ ! সবার মনেই একজন করে ছড়াকার এসে বাসা বাঁধে, এই যেমন সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই, ট্রেনও থেমেছে কি থামেনি, কে যেন বলে উঠল,

নাম না নাম না
এসে গেছে টামনা

আর অমনি টুপটাপ নেমে পড়ল খুদেদের দঙ্গল। ছোট্টো টামনা স্টেশনে। ট্রেন চলে যেতেই শুনশান। হাতে হাতে চায়ের ভাঁড়। জাঁকিয়ে শীত। ছোটোরা সব্বাই কেমন চনমনে, মা বাবা সাথে নেই কে বলবে! অথবা নেই বলেই হ্যাঙ্গাম নেই। শুধু টিম লিডার দাদা দিদিদের নির্দেশটুকু মানলেই হল। তাদেরই ঘেরাটোপে লাইন দিয়ে রেললাইন টপকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ওঠা। আর তারপর?

তারপরঃ-

লাল ধুলো উড়িয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে
চলল ট্রেকার চার ডুংরিডিহির ধার

ক্যাম্পসাইট

ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা পলাশ বাবলা নিমের সবুজ পেরিয়ে দূরে দেখা গেল গজাবুরু। ডুংরিডিহি গ্রামের ধারে। রঙিন তাঁবুগুলো আগে থেকেই খাটিয়ে রাখা ছিল। কারো গায়ে নাম দেয়া নন্দাদেবী, কেউ নন্দাদেবী পূর্ব, কারো আবার ভাগীরথী ১, ২, ৩। কোনটা সুখরাম কেভ এইসব। সবই হিমালয়ের শৃঙ্গ অথবা উচ্চতম স্থানের নামে। বেশ মজাদারও বটে। যেমন পানীয় জলের ড্রামের কাছে লেখা গোমুখ। রান্নাঘরের বাইরে মস্তো করে টাঙানো- "পঞ্চচুল্লি।" তার ভেতর থেকে আসছে ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ, মানে এই ক'দিনের পেটপুজোর জোগাড়যন্তর। একটা ছাই ছাই রঙের তাঁবুর গায়ে লেখা মেরু। ওটা মেডিক্যাল টেন্ট। ডাক্তারবাবুর এলাকা।

বিএমটির নীল পতাকা উড়তেই ক্যাম্প শুরু। এবারে সিসি মানে ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট বা শিবিরের সর্বাধিনায়ক, পরিচালক দাদা দিদিদের সাথে পরিচিত হবার পালা। চারটে দলে

ভাগ হয়ে ক্যাম্পের কাজ আর হ্যাঁ, ক্যাম্পের যাবতীয় নিয়মকানুন রীতিনীতি জেনেবুঝে নেওয়া। আজ থেকে শিক্ষার্থীদের চারটে দল, গর্গাবুরু, মাঠাবুরু, ঢলবুরু আর চেমটাবুরু। পুরুলিয়ার পাহাড়ের নাম এগুলো।

পাউরুটি আর কাবলির তরকারি খেয়ে সব চললে পাথরে চড়ার কলাকৌশল শিখতে। নির্মাল্যদার সাথে। দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ল গজাবুরু।

কি শেখা হল রক ক্লাইম্বিং- এ?

অনেক কিছু। মোদ্দা কথা পাহাড় যতই উঁচু আর শক্ত হোক না কেন, তারও দুর্বল জায়গা আছে। আর তা খুঁজে পেলেই, তার ঘাড়ে পিঠে চড়ে তার সাথে বন্ধুত্ব পাতানো যাবে। এই পাওয়ার মধ্যে কোনো অহঙ্কার নেই। শুধুই ভালোবাসা আর প্রকৃতিকে নিজের করে পাওয়া।

দুপুরে লাঞ্চ সেরে কাছেই পাহাড় থেকে নামা জল ধরে রাখার জন্য দেয়া উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চলল কনটুর রিডিং। মানে? মানে ম্যাপ, মানচিত্র পাঠ। দিকনির্দেশ। মানচিত্রে বুঝে নেয়া তুমি কোথায়, গজাবুরু কোথায় এইসব। মানচিত্র ধরে ধরে পথ চলার পদ্ধতি।

বিকেলের আলোয় সবাইকে ক্যামেরা বন্দি করে ফেলছিল সৌগতদা। আরেকটু বিকেলে দেখি সুমন অঞ্জন তন্ময় সব ট্রেনার দাদারা হাতে হাতে দড়িদড়া নিয়ে এসেছে। পাথরে চড়ার জন্য রোপ নট শিখতে হবে তো! আরে সঠিকভাবে গিঁট বাঁধার কায়দা।

সন্ধে নামছে দেখে পাখি দেখার নিয়মকানুন শেখানোর জন্য সাদা বোর্ড এল। গাছের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হল। সামনে এনে রাখা হল

হ্যাজাক। কাল ভোরভোর পাখি দেখার পাঠ যে! পাখি দেখার নিয়মকানুন শেষ হতেই গোল হয়ে মাঠে বসে পড়া গেল। একে অন্যের সাথে পরিচয়। সবকিছুই নিয়ম মেনে চলছে। তবু ইশকুল ইশকুল ভাব নেই। চমৎকার নিয়মমত সকলে একে একে নাম ধাম জানছে, ট্রেনার, অবজারভার, ট্রেনি সবাই সবার আপনজন হয়ে উঠছে একটু একটু করে।

চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। নির্মাল্যদা সকলকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে চললেন আকাশের তারা চেনাবেন বলে। ও এত অন্ধকার হলে হবে কী, টয়লেটে যাবার রাস্তায় কিন্তু মাঠের মাঝে দু তিনটে পরপর হ্যাজাক রাখা আছে। ওগুলো থাকবে সুবিধের জন্য।

ওদিকে কালো আকাশের তলায় জমা হয়েছে সব্বাই। মুখ তুলে আকাশে তাকাতেই অবাক।

নিঃঝুম আন্ধার হিম হিম শির শির
শুন শান ধানক্ষেত তারা- দেখা জমায়েত

একসাথে এত তারা। দেখিইনি কখনো। এত অজস্র তারারা কোথা থেকে এল? শহরে তো দেখাই যায় না এদের! সেখানে এত দূষণ!

আদিগন্ত খোলা মাঠ। হিমেল হাওয়া। একদল নির্ভীক ক্যাম্পার। যার যার এতটুকু ভয় ছিল, সাহসী বন্ধুদের পাশে পাশে তারাও সাহসী হয়ে উঠেছে। টর্চ নিয়ে আর বন্ধুকে সংগে করে দিব্যি টয়লেটে যাচ্ছে। রাত নটা বেজে গেল। এবারে খাবার পালা। খেয়ে দেয়ে সোজা তাঁবুতে। আশ্চর্য সারাদিনে একবারও তাঁবুতে ঢোকার কথা মনেই হয়নি কারো!

পৌনে দশটাতেই সব্বাই ঘুমের দেশে। সারাদিনের ধকল, নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু! আজন্ম পরিচিত ঘুমের পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও ফিসফিস হাসি গল্প গান ক্রমে নিভে এল। চারদিক নিশ্চুপ। হ্যাঁ, শোবার আগে আগে দাদা দিদিদের কথা মতো একগ্লাস করে ঈষদুষ্ণ জল খেতে হল বটে!

আঠেরোর ভোর

ভোরেরও আগে বাইরে কে যেন গাইছিল, চোখ পিটপিট...তাপসদার গলা না? বেড- টিয়ের কেটলি হাতে গুনগুন গুনগুন...।

“শুক বলে ওঠো সারি ঘুমায়ো না আর
এ জীবন গেলে ফিরে আসে না আবার।”

কোনো অ্যালার্ম নেই। স্কুলে বা টিউশনে যাবার তাড়া নেই। শীতের ভোরে কুচোকাঁচারা একলাই উঠে মুখ ধুয়ে রেডি। যোগব্যায়ামের জন্য সব প্রস্তুত। খালি হাতে একটু ব্যায়াম, সূর্য

প্রণামে প্রাণায়াম - ব্যাস একটা ঝরঝরে সকাল শুরু হয়ে গেল।

সূর্য প্রণাম শেষ হতে না হতেই গাছের ফাঁকে লাল সূর্যের আলো এসে পড়ল তাঁবুগুলোর

মাথায়। পাখি দেখার প্রস্তুতি। একদম হইচই নয়, রঙচঙে পোশাক নয়। জলের বোতল, বাইনোকুলার আর খাতা পেন নিয়ে কেউ চলল জলের ধারে, কেউবা মাঠের দিকে, কেউ পাহাড়ের দিকে। ধানকাটা মাঠে খড়ের গোড়া পড়ে আছে। মাঠ হলদে দেখাচ্ছে দূর থেকে। বাঁশবনের ওপাশটায় গ্রাম। এক ক্যাম্পার হঠাৎ মাঠের মাঝ দিয়ে গোলাপি জামা পরে পা টিপে টিপে চলেছে। সে একটা হলদে পাখি দেখেছে, তাই এত সাবধান। যদি উড়ে যায়! ফিসিফিস করে কে বলল ওই যে বেনেবউ; এদিকে মাঠ জুড়ে বক ফিঙে দোয়েল ইতি উতি ঘুরছে।

ফিরে এসে লুচি ঘুগনি দারুণ জমে গেল। এবারে আবার গজাবুরু পাহাড়ের গায়ে। দড়ি বেঁধে পাথর চড়ার অভ্যাস। মধ্যে একটু বিশ্রাম নিয়ে আঙুল চেটে দালিয়ার খিচুড়ি। ওহ সে কি স্বাদ! থালা বাটি অবশ্য যার যার তার তারই ধুতে হবে। তাতেও মজা। সবতাতেই মজা।

আজকে গ্রামের লোকেদের সাথে আলাপ করার দিন। দুপুরেই খাবার পর বেরিয়ে পড়া হল। সুখেন মাহাতো গ্রামের ছেলে। সেইই পরিচয় করিয়ে দেবে। তাই সুখেনদাদার সাথে সাথে চলল সবাই সার বেঁধে। মাটির রাস্তা। খড়ের আঁটি ডাঁই করা উঠোনে। কার বাড়িতে কুথির

ডাল ঝাড়াই হচ্ছে, খড় থেকে ধান আলাদা করছে কেউ । জলের অভাব। মাটি যেন পাথর। অমানুষিক পরিশ্রমে ফলে সামান্য ফসল। রাঢ়ভূমের লাল কাঁকুরে মাটি। খাপরার টালির চালের একতলা সারসার বাড়ি। দেয়ালে সাদার ওপর শাড়ির মতো গেরুয়া পাড়। গায়ে নকশা কাটা। গা লাগোয়া বাড়ি সব। উঠোনে হাঁড়ি করে ধান সেদ্ধ হচ্ছে। বাড়িতে বসে থাকলে কি এইভাবে জানা যেত দেশের মানুষদের?

ভাবসাব করে খুদে ক্যাম্পাররা ঢুকে পড়ল তাদের বাড়িতে। এ গ্রামের ছেলেমেয়েরাও স্কুলে

পড়ে, কিন্তু যেতে হয় হেঁটে। গাড়িঘোড়া নিদেন সাইকেল অবধি নেই। বেশিরভাগই গরিব। কিন্তু কি সহজেই হাসে!

জলের জন্য একশ বছরের পুরোনো একটা কুয়ো। গরমে জলের কষ্টও খুব। ক্যাম্পের জলের জোগানও এখান থেকেই। গ্রামবাসীরা সাহায্য করে বলেই না! জল ব্যবহারে তাই খুবই কড়াকড়ি। খুদেরা অবাক চোখে দেখে শোনে লিখে রাখে। ছাগল মুরগি শুয়োর প্রতিপালনের কথা, গ্রামের কাছাকাছি ইশকুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কথা, উৎসবের কথা। ফিরে গিয়ে পর্যবেক্ষণের একটা ফিরিস্তি দিতে হবে যে!

সময় যে বাঁধা আছে হাতে।
শিখে নিতে হবে কমলিকাদির কাছে,
পাহাড়ের ধারে, নদীটির পাড়ে
যেভাবে চলতে হবে, পাছে
কোনোকিছু গোলমেলে ঘটে,
পিছনের দল,
তাদেরও মনে রেখে,
পথ চল পথ চল।

ব্ল্যাকবোর্ডে ফুটে উঠছে মজার মজার সব চিহ্ন। এটার মানে ওই পথে যাবে না। এটার মানে ওই পথেই গেছে তোমার বন্ধু; এইও শোনো এটা মনে রাখো, এর মানে এ জল খেও না, এই গ্রামে বন্ধু আছে, ওই গ্রামে খাবার, এখানে মোটেও তাঁবু ফেলো না... আরও কত কত কী যে ! একে বলে ট্র্যাক সাইন, পথের চিহ্ন, জঙ্গলে পাহাড়ে পথ চলতে কাজে দেয়। আর কত রকম সিগন্যালিং এর ভাষা। এক ক্যাম্পার দাদা আবার ডাক্তার। সে এসে শেখালে প্রাথমিক চিকিৎসার পাঠ। হইহই করে কাটছে সময়।

এইবারে চা খাওয়ার ছুটি। চা মুড়ি নিয়ে মাঠেই বসে পড়েছে সকলে, বাঁধনহারা আনন্দের স্বাদ। গপ্প করতে করতেই চলছে কালকের পরিকল্পনা। খোলা চত্বরে ঠান্ডা নামছে। নামছে

অন্ধকার। দাদা দিদিদের সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি। কে কে গরম জামা গায়ে দেয়নি? কার হাতে টর্চ নেই? কে চায়ের কাপ ধুয়ে রাখেনি?

এসো, সন্ধের আগেই, সকলে গোল হয়ে ঘিরে বোসো। জঙ্গলে একলা বা দুই বন্ধু গিয়ে পড়লে, রাতের অন্ধকার নেমে এলে, কী করব না করব তার কৌশল কিছু জেনে নিই। ক্যাম্পের রান্না ঘর থেকে টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে। টিমটিম দুটো হ্যাজাক জ্বলছে মাঠে তাঁবুগুলোর আশে পাশে। শান্তনুদাদা দাদা ব্যাগ থেকে কী কী জরুরি জিনিস আছে তাই বার

করতে করতে বলে চলেছে সেগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি। এমন কিছু জিনিস নয় ত। ওমা, প্লাস্টিকের চাদর, কয়েকহাত লম্বা একটা দড়ি, জলের বোতল, ছুরি, টর্চ আর আগুন জ্বালাবার জিনিস। সেসব দিয়েই দিব্যি একটা অস্থায়ী তাঁবু বানিয়ে ফেলল দাদা। জঙ্গলের কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুনও জ্বালিয়ে ফেলল। ওমা তাইতে জল ফুটিয়ে, কাদামাখা ডিম আগুনে ফেলে সেদ্ধ করে, আলু পুড়িয়ে খাবার ব্যবস্থাও করে ফেলল যে!

তারপর হঠাৎ খেয়াল হল, ওহো বন্ধুর কথা যে ভুলেই গেছি। তাকে তো খুঁজে আনতে হবে। অমনি সার বেঁধে অন্ধকারে টর্চের সিগনাল করে তাকে খুঁজতে বের হওয়া গেল। সঙ্গে খুদেদের দল। শেষমেষ দূরে আলোর রেখা ধরে তাকে পাওয়াও গেল। ক্রমে সে কাছে এলে, দেখা গেল, ওমা সেকী? এ তো ক্যাম্পেরই আরেক দাদা, তাপসদা। খুব হাসাহাসি হল একচোট।

ফিরে এসে চাঁদোয়ার নিচে বসলে সবাই। এমন আঁধার রাত ভূতের গল্প ছাড়া জমে? অতএব ঘিরে ধর দেবজ্যোতিদাদাকে। তার তো অফুরান গল্পের ভাঁড়ার। সত্যি দেখা গা ছমছমে ভূতের গল্পে দুচোখে কুয়াশা ভর করলে যেন। গল্প যত এগোয়, জমায়েত ততই ঘন হয়ে আসে।

রাত নটা। রাতের খাবার গরম গরম। খেয়ে দেয়ে মুখ ধুয়ে, বাসন ধুয়ে সোজা যে যার তাঁবুতে ঢুকে ঘুম।

উনিশে ডিসেম্বর

ভোর হতে খানিক বাকি তখনো। আকাশের গায়ে তারাগুলো বিদায় নিয়েছে। হইহই করে ওঠে একদল, " আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে কি যেন গোঁ গো করে..."
হাসতে হাসতে বাইরে যাই,

গোঁ গোঁ তে ভাই ভয় পেলি !
তাঁবু ছেড়ে কেন তাও এলি?

ওইইই দেখ। কুকুর পালাচ্ছে। চল উঠে পড়ি। আজ সারাদিন দেদার মজা। আজ যে চড়ুইভাতি। ডে আউট।

মহুলটাঁড়ের দিকে

গজাবুরুর পায়ের কাছের বড়ো বড়ো পাথর টপকে শুধু ওপরের দিকে উঠে যাওয়া, উত্তর পশ্চিম দিক বরাবর। পথ বলে কিছু নেই। বনতুলসির ঝাড়, কালোমেঘের ঝাড়, নাম-না-জানা ফুলের কাঁটাগাছ। পিঠে ব্যাগ, সার দিয়ে হাঁটা। পিঠের ব্যাগে সারাদিনের রসদ। এই পথের আশে পাশেই আছে ট্র্যাক সাইন, পথের নিশানা। তাই দেখে পৌঁছে যেতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না করে খাওয়া।

প্রথমেই দেখা গেল পাথর সাজিয়ে কেয়ার্ন করে পথের নিশানা দেয়া। তা দেখে

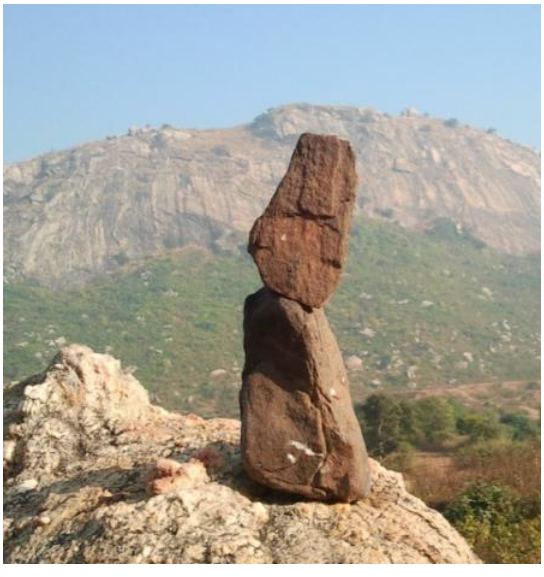

বাঁদিকের পথ ধরে চলতে চলতে দেখা পাওয়া গেল চিঠির চিহ্ন। চিঠি উদ্ধার হল। তাতে লেখা ডান হাতে ঢলবুরু বাঁয়ে গজাবুরু/ এই হল আমাদের পথচলা শুরু। /মাথার ওপরে রোদ পশ্চিমে পথ /ছুটবে ওদিকপানে পায়েচলা রথ।।

উঁচু পাথর টপকে, পাহাড়ের বুকে নুড়ি আর জলপড়া রাস্তা ধরে উঠতে হাঁপ ধরে যাবার জোগাড়। মাঝে মাঝে বুনো কুল পেড়ে খাও। কাঠিকুটি কুড়িয়ে রাখো। গজাবুরু কল পেড়িয়ে

ওপারে নামা। লাল মাটির দেশ ছড়ানো নীচে, পেছনে ফেলে আসা বিস্তীর্ণ সে ভূমি। পথের নেশায় হাঁটো। পৌঁছে যেতে হবে ঝটপট। চার হাতপায়ে পাথরে চড়ে ওঠে সক্কলে অনায়াসে।

অবশেষে পিকনিক। উনুন বানাও, আগুন করো, জল আনো, কুটনো কোটো, চাল ধোও, মশলা বাটো – এক দল আরেক দলকে পলাশের পাতায় নেমন্তন্নপত্র পাঠাও, সে কি কম ঝকমারি ? তবে কিনা আনন্দ আরও চতুর্গুণ। হবে না! একই জিনিস দিয়ে এক এক দলের

আলাদা রকম রেসিপি যে ! আশ্চর্য এই রান্নার মেনুটাও দেখা গেল কার্যত প্রায়ই এক। তবু...। যতক্ষণ রান্না চলল জায়গাটাতে একটা চুপচাপ মজা ভেসে রইল সারাক্ষণ। আর খাবার? সে

সবই অমৃত সমান। আজ সব্বাই অন্য আনন্দে ভরপুর।

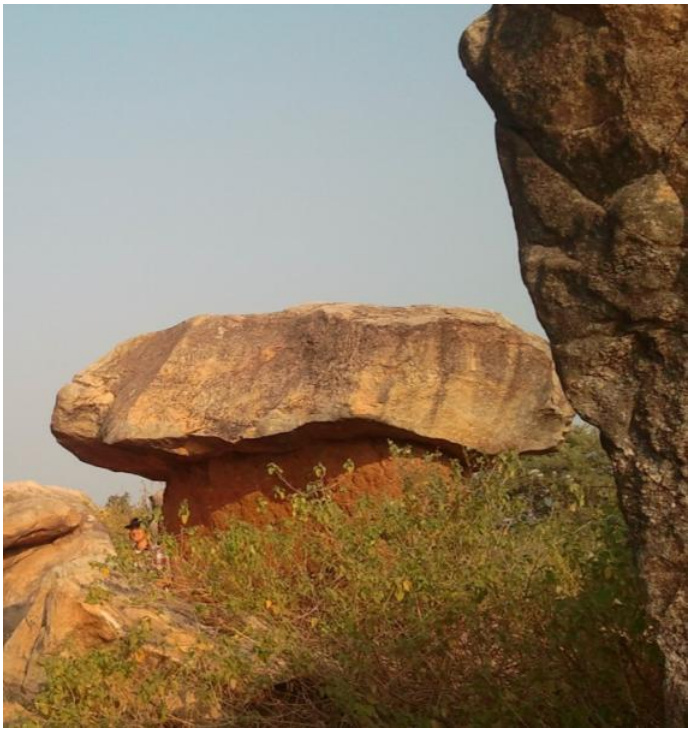

বেলা পড়ে এল। ক্যাম্পে ফিরে চলো। সহজ পথে। ঢেউ ঢেউ লাল কাঁকুরে মাটি। বৃষ্টি জলের কারুকাজ। ব্যাঙের ছাতার মতো পাথর। ফেরার পথে একটা শুনশান পুকুর। ওপারে মহুলটাঁড় গ্রাম। দাদারা বলল। আজ সারাদিনে প্রায় সাত আট কিলোমিটার হাঁটা হল।

সন্ধেয় জমজমাট ক্যাম্পফায়ার। বাঁশি, গান, নাচ, নাটক সবই হল। বুদ্ধুভুতুম লালকমল নীলকমলও হোলো। বড়রাও ছোটোবেলা ফেরত পেলেন আজ। ক্যাম্পফায়ারের আগুন নিভু নিভু। খাবার সময় হয়ে এল। এবারে তাঁবুর ভেতর। পৌনে দশটা।

বিশে ডিসেম্বর

বিদায়বেলার প্রস্তুতি।

যোগব্যায়াম এ'কদিন টানাই হয়েছে। আজ জলখাবারের পরই দড়ি ধরে নামার পদ্ধতি শিখে নেয়া, র‍্যাপেলিং। এই কয়েকদিনেই পাথরে চড়ায় দক্ষ হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েরা। ভয়

কেটেছে। টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের বনপাহাড়ের দেশ দেখতে দেখতে পাখির মতো মন। গায়েও যেন হালকা পালকওয়ালা ডানা, তরতর করে নেমে আসছে সাহসি মেয়ে দড়ি বেয়ে। আনন্দ আর আনন্দ। কান্নাকাটি করেছ কি হাসি ছাড়া নিস্তার নেই। সে কি যে সে কাজ! দিদিরা দাদারা সারাক্ষণ ছোটোদের সাথে লেপ্টে লেপ্টে থাকে যাতে তাদের গায়ে আঁচ কিংবা আঁচড়টি না লাগে।

বেলা শেষ। এইবারে ফেরার পালা। লাঞ্চ শেষে ব্যাগ গোছানো। মনটা কি ভার ভার! সময় এগিয়ে এলো। পতাকা নামানোর। সব্বাই একজোট পতাকার নীচে। পতাকা নেমে এল। ক্যাম্প শেষ হল না তবুও। ক্যাম্প জেগে রইল প্রত্যেকটা ক্যাম্পারের মনে আর প্রকৃতির মাঝে।

লেখার সম্পাদনাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যামেরাঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য